৩য় খণ্ড

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

# বাসন্তী

১ম বর্ষ ] ৬ই মাঘ শনিবার ১৩২৯, ইং ২০শে জানুয়ারি। [ ২৫শ সংখ্যা

## সরস্বতী পূজো।

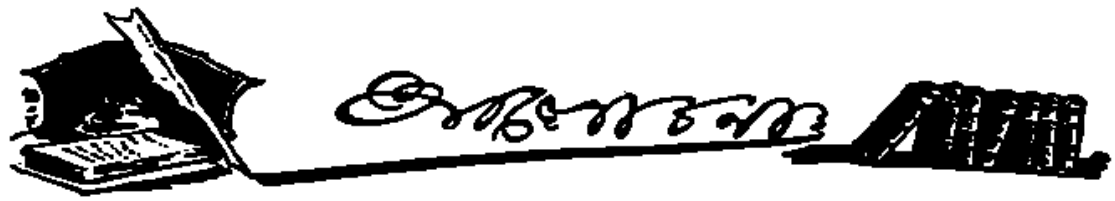

চৌরীচারার কাণ্ড ভারতে শাসন ও শৃঙ্খলার ইতিহাসে উজ্জ্বল বর্ণে মুদ্রিত থাকিবে। বিচারের নামে ১৭২ জন লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ইহাদের অপরাধের মাত্রা কাহার কতখানি তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই, অথচ ইহাদের সকলকেই হত্যাপরাধে অপরাধী করিয়া চরম দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এতবড় নৃশংস, এমন ভীষণ ব্যাপার যে এই সভ্য যুগেও ঘটিতে পারে আমাদের তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভারতবাসী আজ এই স্বপ্নাতীত কল্পনাতীত দণ্ডাদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত, শিহরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিচার, শাস্তি ও শৃঙ্খলার আদর্শ দেখিয়া আজকে প্রাণ তাহাদের আঁতকাইয়া উঠিয়াছে।

• • • •

যদিই ধরিয়া লওয়া যায়, ইহারা অপরাধী, তবুও প্রশ্ন হইতে পারে যে সকলেই কি হত্যাপরাধী? না কেহ কেহ সহযোগিতার অপরাধেও অপরাধী ছিল? বিচারের রায় দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে সকলেই হত্যার অপরাধে অপরাধী। আর যদি তাহা নাও হয়—তবে এই ১৭২ জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। ভারতবাসীর অস্থির চিত্ত যে ইহাতে ভীত শঙ্কিত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে, এইটুকু শিক্ষা দিতেই শাসন ও শৃঙ্খলা-রক্ষাকর্ত্তা বিচারক হেন আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এটা কি খুব বড় রকমের শিক্ষা নয়? এই বাবালক আত্মবোধ ও আত্মশক্তিহীন ভারত বাসী তাঁহাদের অভিজ্ঞতাবর্ষে অনেক জিনিস শিখিয়াছে, শিখিতেছে এবং পরেও শিখিবে।

• • • •

পাতাবের জালিয়ানীলায় ভারতবাসী এক শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, মোপলা ট্রেণ ব্যাপারে আরও এক শিক্ষা পাইবার তাহাদের সুযোগ হইয়াছিল, এই চৌরীচারা কাণ্ডে আর এক অভিনব শিক্ষা হইল। আজ আমরা এই সমস্ত ঘৃণ্যাবলীর আলোচনা করিতে গিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইতেছি কিন্তু ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে আমরা সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাই। তখনওবিদেশী বণিক জাতি এই দেশের রাজ্যশাসনকল্পে যে নৃশংস নীতির পরিচয় দিয়াছিল, আজও, দুই বছর পরেও, যখনই তাহাদের তেমন পড়া জন্মিবে—তাহারা যে সেই নীতিরই অনুসরণ করিবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি?

• • • •

বঙ্গদেশের প্রচার বিভাগ গত ১৮ই জানুয়ারী রবিবার ভারত সভাগৃহে পল্লী সংস্কার সম্বন্ধীয় এক ছায়াচিত্র দেখাইয়াছিলেন। আমরা সেদিন অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় সে দৃশ্য দেখিতে যাইতে পারি নাই। তবে যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় গবর্ণমেণ্ট এইবার একটা কাজের মত কাজে হাত দিয়াছেন। আমাদের বাংলার পল্লীগুলির যে অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে সেদিকে যদি শীঘ্র আমাদের মন না পড়ে ও অদূর ভবিষ্যতে বাংলার পল্লীগুলি শ্মশানে পরিণত হইবে। গবর্ণমেণ্ট সাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

• • • •

দেশে স্বাধীন শাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলে দেশীয় লোকের শারীরিক, মানসিক উন্নতি কর্ম্মদক্ষতা ও স্বাধীন কর্ম্ম প্রচেষ্টার ভাব ও বুদ্ধি স্ফূরিত হইতে পারে না। দেশের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য দেশবাসীর মনে সহযোগিতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার ভাব থাকা ভাল—কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য স্বাধীনতাই এ সমস্ত গুণাবলীর লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

• • • •

জগতের ইতিহাসে সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বদেশেই দেখা যায় স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোকেরাই সাহসিকতার কার্য্যে সহন-ক্ষমতায় এবং দেশ প্রাণতায় অগ্রণী হইয়া সকলের আগে দাঁড়াইয়াছে। অ-স্বাধীন দেশের পরাধীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকেরা সকল কার্য্যেই পিছু পড়িয়া রহিয়াছে।

এক দেশের সমস্ত জাতি এক-ভাষা-ভাষী না হইলে এবং দেশে ছত্রিশ বর্ণ ও ছত্রিশ জাতি থাকিলে এক জাতীয় ভাবে দেশ প্রবুদ্ধ হইতে পারে না—এইরূপ একটা চলিত কথা শোনা যায় বটে। কিন্তু এ কথা পূর্ণ সত্য নহে। অবশ্য অনেক জাতি ও অনেক ভাষা এক দেশে চলিত থাকিলে তাহাতে দেশ গঠন ও জাতি গঠনের কিছু অসুবিধা হয় বটে কিন্তু দেশপ্রাণতা ও জাতীয়তা গঠনের যে ইহাই প্রধান অন্তরায় তাহা নহে।

• • • •

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় এক ভাষা-ভাষী না হইয়াও বিভিন্ন ভাষার কথা কহিয়াও জগতের অনেক দেশের অনেক জাতি দেশপ্রাণতায় ও জাতীয়তায় উজ্জ্বল আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র সুইজর-ল্যাণ্ড—যাহার সাধারণ তন্ত্র জগতের আদর্শস্থানীয়, জাতীয় ভাব যে জাতির অতি উগ্র সেই ক্ষুদ্র দেশে চারিটি ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে। এক এক ভাষার বহু সহস্র লোকে কথা কহিয়া থাকে। দেশ সভা গৃহে (লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লিতে) কোন সভ্য ফরাসী বা জার্মেন ভাষায় কথা না কহিলে একজন দোভাষী সকল সভ্যের অবগতির জন্য তাহা ভাষান্তরিত করিয়া দেন। বেলজিয়ামেও সম্পূর্ণ দুইটি স্বতন্ত্র ভাষা চলিত। চীন সাম্রাজ্যের বহু প্রদেশে বহু ভাষা চলিত। একদিকের লোক আর একদিকের ভাষা আদৌ বুঝিতে পারে না। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে।

• • • •

দেশ জীবন ও জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে ও তাহাকে পূর্ণাঙ্গীন সম্পূর্ণতা দিতে হইলে দেশে প্রকৃত ত্যাগী ও কর্ম্মীর উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন। একজন, দুইজন বা দশজন প্রকৃত ত্যাগীর ও সাধকের কর্ম্ম প্রচেষ্টা দেশ সাধনার বিফল হইতে পারে বটে, ত্যাগী ও কর্ম্মীর জীবন দুঃখে কষ্টে যাইতে পারে বটে কিন্তু দেশের পক্ষে তাহাতেই প্রকৃত ও সত্য উপকার হয়। ত্যাগ ও কর্ম্মের ফল এক জীবনে না মিলিলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। জাতীয়তার উন্মেষ তাহাতেই হয়, জাতীয় জীবনের সফলতা তাহা হইতেই আসে।

• • • •

ইটালীর জাতীয় জীবনে ও দেশ জীবনে লাহনা ও গঞ্জনার পরিসীমা ছিল না। বার বার বহু ভাবে সে ক্ষমতাশালী কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। সেই ইটালী দান্তে, মিওনার্ডো, মাকিয়াভেলো, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, গ্যালিলিও, ক্যাভোর, গ্যারিবল্ডির মত প্রকৃত ত্যাগী কর্ম্মী ও দেশপ্রাণ পুরুষের জন্ম দিতে পারিয়াছিল বলিয়াই তাহাদের মধ্যে একতা ও জাতীয়তা আসিয়াছে। তাই মিলিত দেশ ও জাতি সে দেশকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল মুকুট পরাইতে পারিয়াছে।

• • • •

স্বাধীনতা কি যে বিচিত্র মধুর জিনিস, জগতের লোকে যুগ যুগ হইতে ইহারই সাধনা করিয়া আসিতেছে, ইহার সন্ধানে কত অমূল্য প্রাণবলি গিয়াছে—কত লোক কত বংশের উপর কত অসহনীয় নির্য্যাতন গিয়াছে কত জাতি উৎসন্নের পথে যাইতে বসিয়াছে—তবু মরণের মুখে দাঁড়াইয়াও জাতি স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে সবরকম ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে।

• • • •

জাতেরা চিরদিন স্বাধীনতার উপাসক। স্বাধীনতার জন্য ইহারা বহুকালব্যাপী সমর করিয়াছে। এলিজাবেথের বিজয়ী নৌবহরবাহিনী, ক্রমওয়েলের স্বাধীনতা-নীতি, রিফর্ম-মেশনের জনগত ও ধর্ম্মগত স্বাধীনতা-নীতি ও মানুষের বলিবার কহিবার স্বাধীনতা ইংরেজদিগের রাজনীতি, বাণিজ্য-নীতিতে স্বাধীনতার অপূর্ব্ব প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে।

• • • •

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাজনীতিক দার্শনিকেরা মানবের স্বাধীনতার যে মন্ত্র গাহিয়া গিয়াছিলেন তাহারই ফলে ধীরে ধীরে ফরাসী বিপ্লবের জন্ম। মানব স্বাধীনতার বিকাশ তাহাতেই। আমেরিকার মাটিতে ধর্ম্মযাজকেরা ও ভ্রমণকারীরা ইংরেজ ও তাহ স্বাধীনতার যে বীজ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন তাহারই ফলে জগতের শ্রেষ্ঠ সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

• • • •

আজ স্বাধীন দেশের লোকেরা সকলেই জোর গলায় বলিয়া থাকে 'স্বাধীন দেশের লোক বা জাতিই অধিকতর মানসিক ও নৈতিকবলের অধিকারী হয়। আমাদিগের জীবন, ইতিহাস, অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিতেছে এবং প্রতিকার্য্যে আমরা এই প্রমাণই

পাইতেছি।' সত্য কথা, স্বাধীন দেশের লোকেরা এ গর্ব্ব করিতে পারে বটে!

• • •

স্বাধীন গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, সুইজার ল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, সম্মিলিত রাষ্ট্র এ গুলির যে কোন একটির পানে চাহিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়।

• • • •

রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক জীবনের স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতা ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা অপূর্ব্ব সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও কর্ম্মক্ষমতা হইতেই ইহাদিগের জাতীয় জীবন ও অপূর্ব্ব সমৃদ্ধ হইয়াছে। জাতীয় জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে কর্ম্মক্ষমতা দেখাইবার সুযোগ থাকিলেও তাহাতে অর্থাগম হইলে তবে জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে। তবেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

• • • •

স্বাধীনতা হারাইয়া, পরমুখাপেক্ষী হইলে জাতী কর্ম্মক্ষমতা হারাইয়া কেলে জাতির স্বাধীনতার পথও ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেশে আজ সবচেয়ে নগ্ন, বীভৎস মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে অভাব। এই অভাবে লোকে একবেলা এক মুঠি খাইতে পাইতেছে—কেহ তাহাও পাইতেছে না। এ অভাবের দেশে অভাবের জ্বালায় পিতামাতা সন্তানের মৃত্যু কামনা করিতেছে, নিজেদের দুর্ব্বহ জীবনের ভার মিটাইবার জন্য সকাতরে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতেছে। পেটে ভাত নাই পরণে বসন নাই।

• • • •

অভাব যখন সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া এইরূপ উগ্র রাক্ষসী মূর্ত্তিতে দেখা দেয় তখন জাতীয় জীবন হইতে সব রকম উচ্চপ্রবৃত্তি ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। আজ যাহার পেটের ভাতের সংস্থান নাই সে অন্য কোন দিকে মন দিবে কোথা হইতে? আমাদিগের জাতীয় জীবনের সব দিকে এত অবসাদের প্রধান কারণও এই অভাব। স্বভাবে আমরা মহত্বের মাইরা ফেলিয়াছি। মর্য্যাদা জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমরা যে মানুষ হইয়া মানুষের অধিকার লইয়া জন্মিয়াছি তাহাও ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি।

ন্যায়জ্ঞান, নীতিজ্ঞান, সত্যজ্ঞান অভাবে সবই ভুলাইয়া দেয়। যাহাকে মানুষের উচ্চ প্রবৃত্তি সমূহ একেবারে লোপ করিয়া দেয় এবং যাহার পেষণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য লোকে সকল কুকর্ম্মই করিতে রাজী হয় সেই অভাবের প্রতিকারের জন্যই মহাত্মা দেশবাসীকে স্বদেশী বিলাসিতা ও আড়ম্বর বর্জ্জন করিয়া নিজেদের অভাব নিজেদের মিটাইবার জন্য দেশবাসীকে কৃষাণ ও তন্তুবায় সাজিতে বলিয়াছিলেন। নিজেও তাহাই সাজিয়াছিলেন। মোটা ভাত মোটা কাপড় এক রকম করিয়া জোগাড় হইলে মানুষের দিন চলিবার সংস্থান কোনরূপে হইলে বাহিরের অভাব অভিযোগ তাহাদের তেমন ভাবে পীড়া দিতে পারে না।

• • • •

মহাত্মা মৃত্যু শ্রীকৃত অনেক অ-সহযোগী আইন ব্যবসায়ীরা পেট চলে না বলিয়া আবার আইন ব্যবসায়ে যোগ দিতেছেন। যে আইনকে মহত্মার পরিদর্শী ও ঘৃণিত বলিয়া সম্মানে তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন আবার অভাবের তাড়নায় পেটের ভাত ও কাপড়ের সংস্থান করিবার জন্য তাঁহারা জান পাণী সাঁপিয়া সেই আইন ব্যবসায়েই যোগ দিতেছেন। দেশের শিক্ষিত সন্তানেরাই দেশের সবচেয়ে উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও যদি অভাবের তাড়নায় এই সব কার্য্য করিতে পারেন তবে অশিক্ষিতেরা অভাবের জ্বালায় কি করিতে না পারে!

• • • •

অভাবের জ্বালায় দেশের চুরি, ডাকাতি হীনতা, নীচতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। লোকেরা কি করিবে, না খাইয়া মরার চেয়ে চোর ডাকাত হাজার লোকে মন্দ বলুক। দেশের এই অবস্থায় দেশের সর্ব্বপ্রধান এই সমস্যার আমরা কি উপায়ে মিটিতে পারে তাহাই আজ দেশবাসীর সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয়। এই অভাব প্রশমনের কোন ব্যবস্থা না হইলে দেশের কোন কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না—পারিবেও না।

কোন দেশকে বা জাতিকে জন্মের স্বাধীনতা না দেওয়া দেশ ও জাতির পক্ষে তাহা কত অগৌরবের আমরা তাহা পূর্ব্ব বহু প্রবন্ধে ও আলোচনায় দেখাই-

যাহি। অস্ত্র আইনের স্বাধীনতা না থাকায় ভারতের সাহসিকতা লোপ পাইয়া যায়। শাসক ও শাসিত কাহারও পক্ষে ইহা গৌরবের কারণ নহে।

আজকাল কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে একদল অস্ত্রধারী ডাকাতের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারা কোন উপায়ে দু'একটা বন্দুক বা পিস্তল সংগ্রহ করিয়া—দু'একটা গোলা গুলি ছুঁড়িয়া সমগ্র গ্রামবাসীর ভীতি উৎপাদন করিয়া এক এক রাত্রে বহু-ধন রত্ন অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। সমগ্র গ্রামবাসী তিন চারি শত লোকে মিলিয়াও এই ডাকাতদলকে কোনরূপে বাধা দিতে পারে না। আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে নিরস্ত্র শত সহস্র লোক কি করিবে!

"স্বদেশী ডাকাতেরা এই উপদ্রব করিতেছে" এই প্রকার একটা কথা শোনা যায়, কিন্তু ডাকাত ডাকাতই, সম্পত্তির অপহারক যে সে সম্পত্তির অপহারকই। সে স্বদেশীই হউক আর বিদেশীই হউক। পল্লীবাসীরা আজ নিশ্চিন্ত চিত্তে রাত্রে ঘুমাইতে পারে না। দেশে অভাব অভিযোগের তাড়নায় চোর ডাকাত ত আছেই, তাহার উপর আবার অস্ত্রধারী ডাকাতের উপদ্রব।

শাসক সম্প্রদায় যাহারা দেশকে নিরস্ত্র নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিবার জন্য অতি সচেষ্ট তাহাদের এরূপ ক্ষমতা নাই যে দেশবাসীকে নিরস্ত্র রাখিয়াও তাঁহারা এই উপদ্রব নিবারণ করিতে পারে। নানা কার্য্যে তাহা প্রমাণ হইয়াছে। অস্ত্রধারী ডাকাতের হস্তে শুধু অস্ত্রের ধারাই বাধা দেওয়া যায়। তাহা ছাড়া অন্য কোনরূপ বাধায় ইহারা ভ্রূক্ষেপও করে না। সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার কোন গ্রামের সাহেবের কুঠি হইতে তিনটি বন্দুক ততধিক গুলি টোটা সমেত চুরি গিয়াছে। এই বন্দুক চুরি যাওয়ার পর হইতেই পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে বন্দুকে দুই তিনটি করিয়া বন্দুক ডাকাতী হইতেছে। অনেক স্থলে গ্রামবাসীরা সকলে সমবেত হইয়া ডাকাতের দলকে বাধা দিবার চেষ্টাও করিয়াছে। কিন্তু বন্দুকের গুলির মুখে কাহার সাধ্য অগ্রসর হইয়া বাধা দিবে। সমগ্র গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ডাকাতদল তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া বিজয় গর্ব্বে চলিয়া গেল তাঁহাদের এমন ক্ষমতা নাই যে তাহারা ইহার প্রতিকার করে।

পুলিসের রক্ষা-রীতি চলিত তদ্বিহ তদারক চলিতেছে কথা বাহা হইবার হইয়াছে। কিন্তু দেশের সেচ্ছিকর এই নিসহায় ভাব এই যে পুতুলের মত এর অবস্থা ইহা কি কোন দিন ঘুচীভূত হইবে না? ইহার কি বাস্তবিক কোন প্রতিকার নাই?

যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয় তবে আর রক্ষার কোন উপায় থাকে না। সিলেটের পুলিসকেসের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সিলেটের জাতীয় দলের মুখপত্র "জনশক্তির" সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগে পুলিশ এক মকর্দ্দমা করিয়াছিল। "মাইজবাগের ছিন্ন কোরাণ" শীর্ষক প্রবন্ধই এই অভিযোগের কারণ। "জনশক্তি" না-কি খবর দিয়াছিল যে পুলিশ কোরাণ ছিঁড়িয়াছে, পদদলিত করিয়াছে, ইত্যাদি। পুলিশের নিরীহ শিষ্ট কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করার ফলে কোন এক ডেপুটিপুত্রব সম্পাদক ও মুদ্রাকরের পাঁচ শত ও দুইশত টাকার অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। "জনশক্তির" পক্ষ সম্প্রতি হাইকোর্টের জজের নিকট এই বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করেন। পুলিশ প্রভুরা চিরদিনই জানেন যে সিভিলিয়ানগণ তাঁহাদের পরম হিতৈষী ও রক্ষাকর্ত্তা। এই জন্যই সর্ব্বদা সিভিলিয়ানগণ ঘোর গুণ টানিবার জন্য সর্ব্বোচ্চস্থানে আসীন থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুলিসের সর্ব্বকল্পনাকে মিথ্যা করিয়া দিয়া সিলেটের জাতীয় জজ শ্রীযুক্ত বি, এল, রাও, আই-সি-এস মহাশয় বিচারে আসামীদ্বয়কে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া রেহাই দিয়া পুলিসের আসল মূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়াছেন। জজ অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—কোরাণ যে পুলিসই ছিঁড়িয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কোরাণ ছাড়া পুলিস গৃহের বহু আসবাবাদি নষ্ট করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উকীল খাঁ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের শিষ্ট পোষ্যপুত্রগণের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া যে সকল সাক্ষ্যই গাহিয়াছিলেন, জজসাহেবের বিচারে সে সকলই ঠকয় ও পরম মিথ্যা বলিয়া ধরা জজ রায় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাও মহাশয়ের হাতে পুলিসের উর্দ্দিওয়ালা পুরুষদিগের পর্দ্দায় মুখোস ছিঁড়িয়া গিয়া বরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, 'রক্ষা করিবার ভার যাহার সে যদি এমন করে ত যাই কোথায়?'

শনিবারে ছুটির দিনে দিনেই কলিকাতার মাঠে ঘোড়দৌড় হইত, ইহাই আমরা জানিতাম। বছরের মধ্যে ছ'টি দিন মাত্র। এই ঘোড়া ছুটত কলিকাতায়, টালিগঞ্জে, বারাকপুরে আমাদের দেশের বাবুদের দৌড় করিয়া লইয়া বেড়াইত। এখন দেখিতেছি, শনিবার ও ছুটির বার ছাড়াও সহরের মাঠে ঘোড়দৌড় হইতেছে। গত বুধবার দিন ঘোড়দৌড় হইয়া গিয়াছে। এবার হইতে বোধহয় বছরের যে ছ' তিন মাস Slack season বা বন্ধ থাকিত, তাহাও আর রাখা হইবে না। যত তাড়িতেই যখন লোকসান এবং চালাইতে পারিলে বিপুল লাভের সম্ভাবনা তখন ইহা যে বন্ধ থাকিবে না তাহা সহজ বুদ্ধিতেও বুঝা যায়। বাবুরাও বোধহয় ভরসা করিতেছেন হপ্তায় একদিনে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, এখন হইতে তাঁহাদের অব্যর্থ সন্ধান Sure Tips।

* * * *

কিন্তু কথা হইতেছে যে এই রেসখোরী অধিকাংশই বাঙ্গালী, চাকুরীজীবি। 'উইক্ এণ্ডে' খেলা হইলে তাঁহারা কি করিয়া যোগ দিবেন তাহা ত ভাবিয়া পাইতেছি না। এবং যোগ দিতে না পারিলেও তাঁহাদের যে চিত্ত স্থির হইবে না ইহাও সুনিশ্চিত। আমরা এমনটী নিত্যই শুনিতে পাই যে অর্থাভাবে যদি কোন দিন কোন বাবুর ঘোড়দৌড়ে যোগ দিবার সৌভাগ্য না ঘটিয়াছে, সেই দিনই বা পরদিন প্রত্যুষে খবরের কাগজ মিলাইয়া তিনিই আক্ষেপ করিয়া থাকেন, সেদিন যাইলে তিনি জাকাল হইয়া আসিতে পারিতেন। কাজেই এই লাল হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে আফিসের বাবুদের কিছুমাত্র কমিবে এমন ভরসা নাই। সম্ভবতঃ আফিসের মনিবরা সেদিন অনেক বাবুর পিতৃ-মাতৃ-জায়া বিয়োগ সংবাদ পাইবেন কিম্বা ডায়োরিয়া, কলেরার খবর তাঁহাদের হস্তগত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালাদেশের পিতামাতা বা স্ত্রীদের আত্মীয়গণের হাতে এইরূপ অপমৃত্যু হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

* * * *

আগামী সোমবার বাকদেবী সরস্বতীর পূজা। বাঙ্গালার শিশুমহলে সরস্বতী পূজার আনন্দ আগেও যেমন ছিল অনেকটা তাই আছে বলিয়া মনে হয়। যুবক সম্প্রদায়ে সরস্বতী পূজার আনন্দও বোধকরি পূর্ব্ববৎ আছে, বাড়ার ভাগ—সেদিন ঘোড়দৌড় আছে, কাজেই কথাই নাই।

---

# আবাহন

[ শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ]

মন্দির মম আলোকিয়া এস
পুণ্যোজ্জ্বলা জননী,
এস বীণাপাণী বিদ্যাদায়িনী—
নিখিল-অমলাকরী!
সার্থক করি পূজা আয়োজন,
এস মা ভুবন-বাঞ্ছিত ধন,
উজল তব দীপ্তি ধারায়
উজল হোক্ ধরণী;
স্বাগত করি সঙ্গীত রাগে
মন্দিরে এস জননী!
শত কোটি সিক্ মুখরিয়া দিক্
গায়ে কমল-গীতি,
তব জয় রথ অম্বর পথ
উজলিয়া আজ নিতি।
বিশ্বের মুখে দিলে আনন্দ,
কত নব গান—নবীন ছন্দ,
মুক্ত স্বাধীনী দিলে প্রেমে ভরি,
হৃদে দিলে জ্ঞান-দীপ্তি;
মুখর করি অম্বর মম
মন্ত্রিত তব গীতি।

আজি মধুবাস রসের প্রকাশ—
বসুধা আপনা হারা,
গগনে পবনে এ শুভ-লগনে
উছলিছে রস ধারা।
আত্মা-হৃদয়ের তরুণ তপন—
এনেছে বহিয়া নব জাগরণ,
নিখিল ভুবন পুলক মগন—
লভেছে হিয়ার সাড়া,
আকাশে বাতাসে আজি মধুমাসে
উছলিছে রস ধারা।
এ শুভ-লগনে নব আবাহনে
এস মা মোর আনন্দা,
এস দেবজন— বাঞ্ছিত ধন—
বিশ্বভুবন বন্দ্যা!
তব ও চরণ- নূপুরের ঘায়—
সুরের কমল ফোটে বসুধায়,
অমল হাস ভরে তোমায়—
অতুল মুখরতা;—
জয় দেবজন— বাঞ্ছিত ধন—
বিশ্বভুবন বন্দ্যা।

# কংগ্রেসে চারদিন।

[ শ্রীসরসীবালা বসু ]

২৩শে ডিসেম্বর রবিবার বেলা আড়াইটার ট্রেণে শিয়ালদহ হইতে আমরা গয়া রওনা হইলাম। রাত্রি এগারটার পর কিউলে নামিয়া গয়া যাত্রী ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। ষ্টেশনে লোকের সংখ্যা নাই, শুনিলাম সকলেই গয়া যাত্রী, সুতরাং বুঝিতে পারিলাম ভিড় যাহা হইবে তাহা সহজেই অনুমান যোগ্য। রাত্রি তিনটার সময় রক্ত চক্ষু দানবের ন্যায় জিনেন্দ্রধারী ট্রেণ ভীম গর্জ্জনে দিক কাঁপাইয়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। শত শত যাত্রীর হুড়াহুড়ি ঠেলিয়া আমরা কোনরকমে ফিমেল ক্যারেজে আশ্রয় লইলাম, সঙ্গে আবার তিনটী শিশু, সুতরাং তাহাদের লইয়া সেই ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় পাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার।

কলির রাজসূয়যজ্ঞের বিরাট অনুষ্ঠান দেখিবার উৎসাহে সমস্ত অসুবিধা ও বাধাবিঘ্নকে ঠেলিয়া তবু আমরা দুটিমাত্র নারী তিনটী শিশুকে লইয়া অভীষ্ট স্থানে যাত্রা করিয়া চলিয়াছি। পরদিন সকাল সাতটার সময় ট্রেণ আসিয়া গয়ায় পৌঁছিল, ষ্টেশনে সে কি বিরাট জনতা ও কল কোলাহল, অগণ্য নরমুণ্ড ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না! ট্রেণ থামিবামাত্র স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কংগ্রেস যাত্রী?" আমরা স্বীকার করিবামাত্র তিনি সেই মুহূর্ত্তে কুলি ডাকিয়া আমাদের মোট উঠাইয়া যেখানে কংগ্রেস যাত্রীদিগের মোট প্রভৃতিতে কংগ্রেসের ছাপ দিয়া নম্বর লিখিয়া লইতে বোম্বাই দেওয়া হইতেছিল সেইখানে লইয়া আসিলেন। অবিলম্বে আমাদিগের মালপত্রের ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে প্যাসেঞ্জার লরীতে তুলিয়া দেওয়া হইল, ষ্টেশন হইতে কংগ্রেসের স্বরাজপুরী প্রায় পাঁচমাইল। ষ্টেশন হইতে যাত্রীদিগকে লইয়া যাতায়াত করিবার জন্য প্রত্যহ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে পাঁচখানি প্যাসেঞ্জার লরী এবং পাঁচখানি মাল-বোঝাইকরা লরী নিযুক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক আরোহীকে ছয় আনা হিসাবে লরীর ভাড়া দিতে হইতেছে এবং মাল পিছু এক আনা। আমাদের কোলের শিশুর ভাড়া দিতে হইল না, ছোট ছেলেদের তিন আনা করিয়া এবং আমাদের ছয় আনা হিসাবে মোট আঠার আনা দিতে হইল। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা স্বরাজপুরীতে গিয়া পৌঁছিলাম। প্রকাণ্ড পাঁচ ছয় মাইল ব্যাপী একটী পতিত জমির বাগানে এই নূতন গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেখিবামাত্র চমৎকৃত হইতে হয়, অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেস কর্ম্মীরা কেমন করিয়া যে এতোবড় একটী বৃহৎ গ্রামের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

অক্ষরের বিচিত্র পতাকা শোভিত সুবৃহৎ ফটকের মধ্য দিয়া আমাদের লরী অগ্রসর হইয়া থামিয়া গেল, যাত্রীরা নামিবামাত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ অগ্রসর হইয়া সকলকে যথাস্থানে পৌঁছিয়া দিতে লাগিলেন; আমরাও তাঁহাদিগের সাহায্যে বেঙ্গল ক্যাম্পে আশ্রয় পাইলাম। ইতিপূর্ব্বে এই দেশের বহু ভাষাভাষী, বিচিত্র পরিচ্ছদধারী বহু নর নারীতে সকল ক্যাম্পই পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে চাহিবামাত্র একটী বিরাট ভাব সহজেই সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া বসে, আমরা আশ্রয় পাইয়াই জিনিষপত্রগুলি পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, যেহেতু জিনিষপত্র যাহা কিছু সবই বাক্স ও বিছানার মোটের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ষ্টেশন হইতে মোট বোঝাই লরী আসিয়াছে বটে, কিন্তু অগণ্য মোটের মধ্য হইতে আপন আপন মোট বাহির করিয়া লওয়া কিছু কঠিন কাজ, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একজন আসামী ভদ্রলোকের সাহায্য পাইয়া ধন্য হইলাম, তিনি আমাদিগের নিকট হইতে রসিদ লইয়া মাল আনিতে গেলেন, বেলা বারোটা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আমাদের দুটি ট্রাঙ্ক ও দুটি বিছানার বাণ্ডিল উদ্ধার করিয়া দিলেন, তাহার মজুরীর দক্ষিণা দিতে হইল, চারি আনা।

অতঃপর স্নানাহার সারিয়া আমরা ক্যাম্প দেখিতে বাহির হইলাম। দরমার বেড়া দেওয়া গোলপাতার ছাউনি সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে, প্রত্যেকটি তাঁবুগায়ে বেঙ্গল, আসাম, অন্ধ্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বোম্বে প্রেসিডেন্সি, আসাম এইভাবে কার্ড টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এক একটী ব্লকে আবার ঘর নম্বর এক দুই করিয়া বারো তেরটী করিয়া কামরার সারি। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছেন এবং খুবই আনন্দ ও উৎসাহের বিষয় যে অনেকেই সপরিবারে শিশু সন্তান লইয়া এ উৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছেন। সহর হইতে এতোদূরে প্রত্যহ সবগুলি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া অসম্ভব বলিয়া অনেকে আগে হইতে বন্দোবস্ত করিয়া ক্যাম্পে আসিয়া বাস করিতেছেন।

বিশেষ আনন্দের কথা যে পর্দ্দানশীন বাঙ্গালী মেয়েরাও

অনেকে ভেলিগেট হইয়া এবং দর্শক হইয়া এই জাতীয় মহা মহোৎসবে যোগ দিতে সমবেত হইয়াছেন, চারিদিকে লোকান বসিয়াছে, ফলতঃ নানাবিধ বিদেশী দ্রব্যের কিছুরই অসদ্ভাব নাই, দেশী কাপড় ছিট, খদ্দর অনেক রকমই আমদানী হইয়াছে, ক্রেতার ও বিক্রেতার সমানই উৎসাহ। আগ্রার প্রস্তুত জুতার লোকানটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য, তাঁহারা প্রদর্শনীর জন্যই বিশেষ ভাবে আসিয়াছেন, নানা রকমের জুতা বেল্ট, ব্রাস প্রভৃতি এমন সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য ভাবে প্রস্তুত করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছিলেন যাহা আজ কালকার দুর্মূল্যের দিনে বেশ আনন্দেরই কথা। বোম্বে প্রেসিডেন্সীর সোলাপুর ফ্যাক্টরির প্রস্তুত চামড়ার ব্যাগগুলিও চমৎকার। এসব দেখিতে দেখিতে অদূরে কংগ্রেস মণ্ডপ দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। কংগ্রেস মণ্ডপের সুবৃহৎ উদ্যানটি অল্প দিনের মধ্যেই নানাবিধ গাছপালা মাটির টবে রাখিয়া একটি কৃত্রিম উদ্যান রচিত হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে ফোয়ারাও দেখা যাইতেছে। সুবৃহৎ পটমণ্ডপ, প্রায় পঁচিশ হাজার নর নারীর বসিবার স্থান, কেবল নানাবিধ রঙ্গিন খদ্দর বস্ত্রে প্রস্তুত। স্থানে স্থানে খদ্দর পাত্রে হিন্দী উর্দ্দু ও ইংরাজীতে লেখা বড় বড় অক্ষরে লেখা "জালিয়ানওলা বাগের কথা স্মরণ রাখিও"—"বাধা উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হও"—"ভারত শাসনই রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল"—মহাত্মা গান্ধীর নানাবিধ বৃহৎ ক্ষুদ্র চিত্র নানাভাবে চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছিল। আমরা এ মণ্ডপটী দেখা শেষ করিয়া অতঃপর ভলিয়ার উল উলেমা দেখিতে গেলাম, ইহার শোভা সৌন্দর্য্য নির্ম্মাণ প্রণালী অনেকটা কংগ্রেস মণ্ডপেরই ন্যায়। সেদিন কংগ্রেস অধিবেশন ছিলনা, সমস্ত দিন রাত্রি কেবল লোক সমাগম হইতেছে, ক্যাম্পে ফিরিয়া অতি ক্লান্ত ভাবে আমরা শয্যাতে আশ্রয় লইলাম। রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হইল। মধ্য রাত্রে 'বন্দেমাতরম' শব্দে চকিত হইয়া জানিতে পারিলাম, এই সুবৃহৎ স্বরাজপুরীতে কোনরূপ পুলিশ প্রহরীর অবস্থান নাই, কেবল স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রহরীর স্থান অধিকার করিয়া বন্দেমাতরম শব্দে দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্যাম্পের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্বরাজপুরীতে আলোকের বন্দোবস্ত ও দিবা চমৎকার কোথাও এতোটুকু অন্ধকারের কালিমা নাই, দিবালোকের ন্যায় চারিদিকে উজ্জ্বল। সেবক স্বেচ্ছাসেবিকা নিযুক্ত স্থান বলিয়া কাহাকে এতোটুকু অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে না।

রাত্রি চারিটা হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে ভজনের সঙ্গীত শুনিতে পাইলাম। নানাবিধ যন্ত্রের সুমধুর ঝঙ্কার নহবৎ সুমধুর ঝঙ্কারে এক অপূর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল, বাহিরে দারুণ ঠন ঠনে শীত, কিন্তু ভজন শুনিবার আগ্রহে শয্যায় শুইয়া থাকিতে পারিলাম না, গায়ে কাপড় জড়াইয়া বাহিরে বাহির হইয়া দেখি আমাদের ন্যায় অনেকেই এই পবিত্র মুহূর্ত্তের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের আস্বাদনে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, বিভিন্ন ক্যাম্প হইতে বিভিন্ন ভাষার জাতীয় সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—দেখিতে দেখিতে ভোর হইয়া আসিল, অমনি সে কি এক অপূর্ব্ব মহান দৃশ্য!

দলে দলে পতাকা হস্তে লইয়া সকলে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়াছেন, বিহার পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি উৎকল নানা ভাষায় বিভিন্ন সুরের সঙ্গীত ধ্বনি উঠিয়াছে, সঙ্গীতের মধ্যে মধ্যে দিক কাঁপাইয়া প্রভাত পবনে ধ্বনি উঠিতেছে 'বন্দেমাতরম'! স্বামী মহাত্মাজীকী জয়! ভারত মাতাকী জয়! পতাকা গুলিতেও সেই সব কথা অঙ্কিত। আমাদের বাঙ্গালী ছেলেরাও একবার তোরা "মা বলিয়া ডাক, জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক" গানটি গাহিতে গাহিতে আসিয়া আমাদের "বেঙ্গল ক্যাম্পের" সুমুখে দাঁড়াইল, আমরা অনেকগুলি বাঙ্গালী মহিলা তাহাদের শোভাযাত্রায় বাহির হইলাম। লক্ষ্য করিলাম, প্রত্যেক জাতীয় দলেই তাঁহাদের মহিলারা অবাধে পুরুষদিগের শোভাযাত্রায় সঙ্গীনী হইয়াছেন। দেখিয়া আনন্দ হইল, নারী আজ আর পশ্চাতে পড়িয়া নাই, বাহিরের ডাক তাঁহাকে অন্তঃপুরের অবরোধ হইতে সুদূরেই আকর্ষণ করিয়াছে। নারী যে শুধু গৃহকোণে মাতা বা ভগ্নী নহেন, সমাজ সেবায়, দেশের সেবায়ও যে তাঁর অধিকার, নারীত্বের দিক বিকশিত হইবার, সার্থক হইবার সুযোগ পায় সে কথা আজ নরনারী সকলেই বুঝিয়াছেন। মহান রূপ বৃহৎ বিশ্বমানবের একটি চক্ষু নারী, এ নারী যদি আজ এই মহাজাতীয় অনুষ্ঠানের দিনে তাঁর গৃহকোণেই অন্ধের ন্যায় অচল হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ জাতীয় উৎসব সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইত কি?

(ক্রমশঃ)

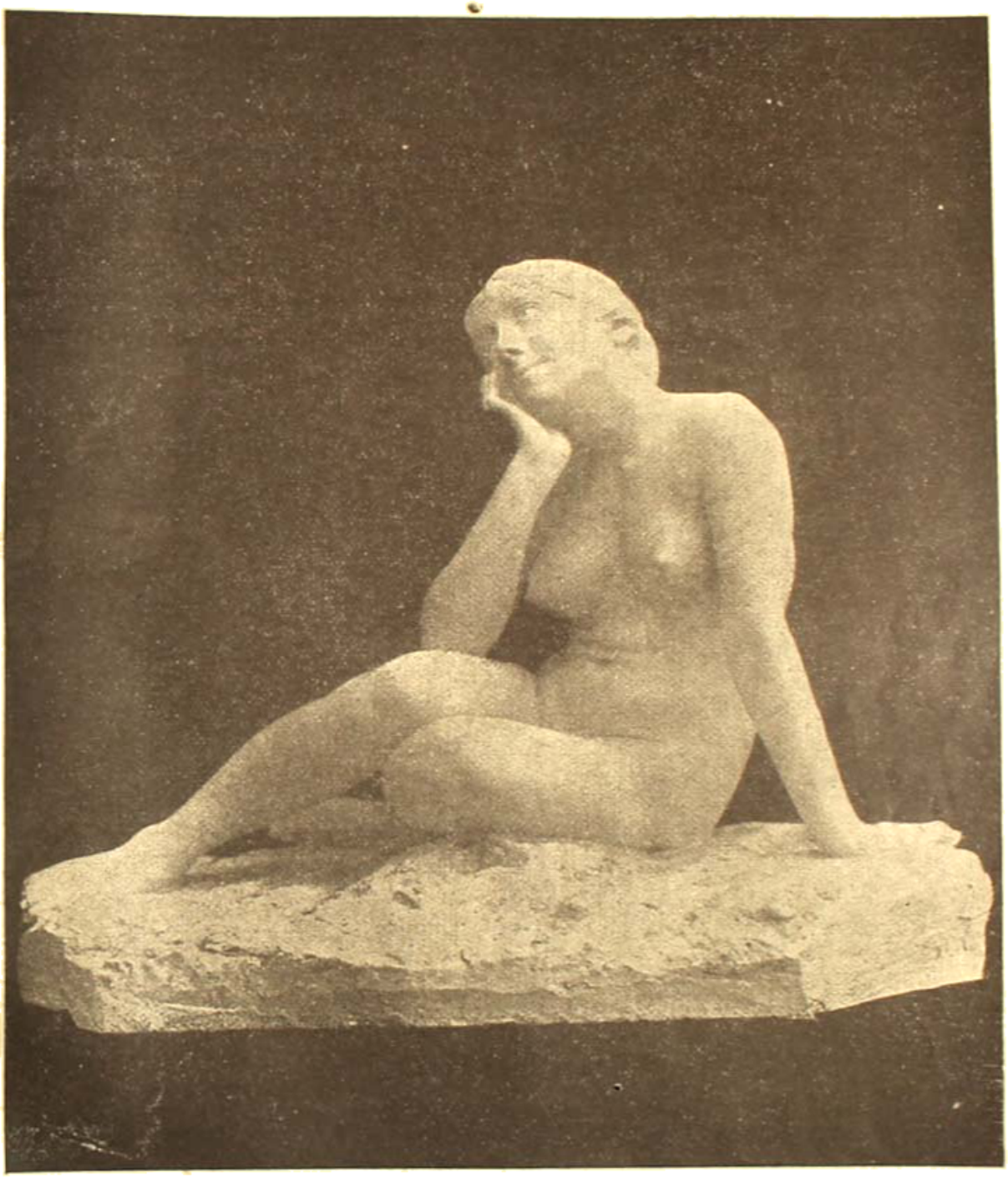

বিহ্বলা।

"প্রভাতী"র সৌজন্যে।

# মন-মত

( শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ )

কাকী-রাজনন্দিনী উৎপলা।...রাজারাণীর কত দান-ধ্যানের, কত রাগযজ্ঞের, কত তপস্যার ফল, ভগবানের দেওয়া আশীর্ব্বাদ এই মেয়ে।...তাই বড় আদরের...মেয়ে ত নয়, যেন স্বর্গের ফুটন্ত পারিজাতটী,—চাঁদের জ্যোৎস্নার মত ঘর আলো করা রূপ, ঠোঁট গোলাপের পাপড়ি, চোখে হরিণের দৃষ্টি, পিঠ ছেয়ে মেঘবরণ কালো চুলের ঢেউ, সারা অঙ্গের সৌষ্ঠব যেন একটা কিসের সাড়া পেয়ে জেগে উঠেছে, বুকে তার প্রাণের স্পর্শ, চলনে রক্ত পদ্মের বিকাশ, হাসিতে মাণিক-বৃষ্টি।...জ্যোৎস্না রাতে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে ফুটন্ত রজনী গন্ধাটীর মত ষোল বছরের মেয়ে—রাজনন্দিনী উৎপলা।

রাজারাণী মেয়ের বিয়ের জন্য বড় একটা চিন্তিত ছিলেন না, অমন রূপে গুণে আর অতবড় একটা রাজ্যের রাজার একমাত্র মেয়ে, যেদিন ইচ্ছা করবেন সেই দিনই যে কত শত দেশের রাজপুত্র এসে কাকীরাজপুরের সিংহ দরজায় ধন্না দিয়ে পড়বেন।

দিন যায়। উৎপলাও ষোল পেরিয়ে সতেরতে পড়লো।

রাণী রাজাকে বলেন, ওগো, উৎপলের বিয়ের একটা যোগাড় দেখ-না, মেয়ের পানে যে আর চাইতে পারা যায় না।

রাজা বলেন, পারা যায় না না-কি। তাইত!

২

হেসে খেলে রাজ্যে রাজ্যে উৎপলার স্বয়ম্বরের ঘোষণা হ'লো। দেশ বিদেশের রাজপুত্রেরা হাতী ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে ছুটলেন কাকী রাজ্যের রাজকন্যা লাভ করতে। সারা রাজ্য একটা উৎসবের ঢেউ-এর দোলনায় দুলে উঠলো।

উৎপলা শুনলো, তাকে স্বয়ম্বরা হ'তে হবে, কত দেশ বিদেশের রাজপুত্র তার জন্য ছুটে আসছে।...উৎপলার গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠলো,—বিদ্রূপের হাসি...রাজকন্যা কেউ সে হাসির অর্থ বুঝলো না।

একদিন ভরপুর রাজসভায় হঠাৎ মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর মত উৎপলা আবির্ভূত হ'য়ে তার বাপকে মাত্র একটী কথা ব'লে আবার বেরিয়ে চ'লে গেল,—বাবা, আমি বিয়ে কর্ব্বো না।

রাজকুমারীর কথা শুনে রাজা স্তম্ভিত হ'লেন, সভা-শুদ্ধ সবাই ভীত হ'য়ে উঠলো।... কিন্তু বড় আদরের বড় সোহাগের মেয়ে উৎপলা, তার অনিচ্ছায় ত কোনো কাজই হ'তে পারেনা।

রাজপুত্রেরা বড় আশা ক'রেই এসেছিলেন, হতাশ হ'য়ে যে যার দেশে রওনা হলেন।

সখীরা জানলা খুলে সেই রাজপুত্রদের বাড়ী ফিরে যাওয়া দেখতে দেখতে উৎপলাকে হেসে হেসে বল্লে, আহা, বেচারাদের কি দুঃখ, মুখগুলো মুষড়ে গেছে!

৩

একদিন ভোরে নহবৎ বাজনার সাথে সাথেই রাজবাড়ী শুদ্ধ লোক মহাব্যস্ত হ'য়ে উঠলো; কি? না রাজকুমারী উৎপলার অসুখ ক'রেছে।

আশী বছরের বুড়ো রাজ-বৈদ্য তখনি এসে হাজির।... কিন্তু বুড়ো কোনো রোগই রাজ কুমারীর ঠিক করতে পারলে না। কিন্তু রোগ হয়নি, একথাত আর বলা চলে না।...রাজকুমারী যখন নিজেই বল্‌ছে তার অসুখ করেছে।...বিশেষতঃ আজ মালিনী মাসীর দেওয়া ফুলের মালা তেমনি সাজিতে পড়ে আছে, দুধ ধোয়ার কস্তুরী-জল তেমনি সোণার ঝারায় রয়ে গেছে,—উৎপলা স্পর্শও ক'রেনি।...তার বড় আদরের শুক পাখীটা 'উৎপলা উৎপলা' ক'রে চেঁচিয়ে গলা কাটাচ্ছে, কিন্তু উৎপলা তার দিকে ফিরেও চাইছে না।—সুতরাং অসুখ ত তাই করেছেই।...বুড়ো কবিরাজ একটা ঔষধের ব্যবস্থা ক'রে মানে মানে বিদায় হ'লো।

কিন্তু উৎপলার রোগ আরোগ্যের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না,—যেমনকার রোগ তেমনি রয়ে গেল।

রাজকুমারীর দুরারোগ্য ব্যাধি, রাজ্যময় একটা মহা অশান্তি।...রাজারাণীর মনে সুখ নাই, দাসদাসীরা খেটে খেটে অস্থির।...রাজ্যের বড় বৈদ্য সবাই এসে হার মেনে চ'লে গেল, উৎপলার রোগ আর উপশম হয় না।...রাজা

কলিকাতায় গিয়া দুই চারিদিন শিবের মোকদ্দমাই খাকিল। কিন্তু সেখানে একমুঠা খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজই নাই, কাজেই বাড়ী সমস্তটা চুপ করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলেই সন্তোষপুরে যাইবার জন্য মনটা উদ্গ্রীব হইয়া উঠে। সুতরাং তুপতি সন্তোষপুর গমনে উদ্গ্রীব মনটাকে কাজে লাগাইয়া তাহার চাঞ্চল্য প্রশমন করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু দুই চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে তুপতি রান্নাঘরকে ঢুকিয়া পড়িল এবং যতদূর সাধ্যের মধ্যে মনের চাঞ্চল্যটাকে ডুবাইয়া দিতে লাগিল। মন কিন্তু ডুবিল না, কম্পাসের কাঁটার মত সে সন্তোষপুরাভিমুখীন হইয়া রহিল।

এমনই ভাবে পক্ষাধিক কাল অতীত হইল। তারপর একদিন সে মনের সুখে বর্দ্ধমান অঞ্চলে যাত্রা করিতে চলিল। ট্রেণে আসিবার সময় গাড়ী যখন পীরপুকুর ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তুপতির বুকের ভিতর একটা আলোড়ন উপস্থিত হইল। এই পীরপুকুর ষ্টেসনে নামিলেই সন্তোষপুরে যাওয়া যায়। এখানে নামিয়া একবার অনুপমাকে দেখিয়া আসিবে কি? দেখা না হইলেও তাহার সংবাদটা একবার জানিয়া আসিতে দোষ কি? কাল সকালে রান্না হইবে। তা অনুপমার খবরটা লইয়া ভোরের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে বর্দ্ধমানে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিবে। দুই তিনটা ষ্টেসন বৈ ত নয়। কিন্তু অনুপমার সংবাদ লইয়া তাহার কি এমন লাভ হইবে যে, তজ্জন্য সে একটা পরিশ্রম স্বীকার করিতে যাইবে? লাভ কিছুই নাই, তবে তাহাকে কেমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছিল, কেমন আছে জানা যাইতে পারিবে।

ভাবিতে ভাবিতে গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনে দাঁড়াইল। তুপতি নামিবে কি নামিয়াই যাইবে তাহাই স্থির করিতে লাগিল। স্থির করিতে করিতে দুই মিনিট অতিবাহিত হইয়া গেল, গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টার শব্দ শুনিল। তুপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া নামিবার উদ্যোগ করিল। মনের একদিকটা তুপতির হাত ধরিয়া বলিল, "গাড়ী ছাড়বে, এখন সময় নেই।"

তুপতি বলিল, "এইখানে একটা কাজ আছে নেমে পরের গাড়ীতে আমি যাব।"

হাতটা টানিয়া লইয়া তুপতি নামিয়া পড়িল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

তুপতি সন্তোষপুরে উপস্থিত হইল। তাহাকে যে দেখিল, সেই বিস্ময় জড়িত আনন্দ প্রকাশ করিয়া, সে এতদিন কোথায় ছিল, কি করিতেছিল ইত্যাদি প্রশ্নে অস্থির করিয়া তুলিল। তুপতি তাহাদের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে দিতে কাহারও বাটী অতিক্রম করিয়া, দিব্যপুরে ভিতর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। বৈঠকখানার কাছে যাইতেই তারকনাথ বলিয়া উঠিল, "তুপতিবাবু যে!"

তুপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তারকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর হঠাৎ কি মনে করে? খবর কি?"

গভীর উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক স্বরে তুপতি বলিল, "আগে এখানকার খবর কি বলুন।"

তার। এখানকার কার খবর? অনুপমার?

তুপ। হাঁ।

তার। খবর খুব ভাল নয়।

তুপতি অন্দর পথে বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল, এবং শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তার, সে—বেঁচে আছে তো?"

গভীর ভাবে তারকনাথ উত্তর করিল, "বেঁচে ঠিক বলতে পারলাম না। কেননা আজ তো তারানাথ বাবুর চিঠি পেয়েছি, অবস্থা খুব মন্দ।"

উদ্বিগ্ন সহকারে তুপতি জিজ্ঞাসা করিল, "অনুপমা কি এখানে নাই?"

মাথা নাড়িয়া তারকনাথ বলিল, "না না, আজ দুটি পনের দিন হইল, হাওয়া বদলাইতে পুরীতে গিয়েছে, শোন নি কি?"

তুপতি বলিল, "না।"

তারকনাথ বলিল, "পুরীতে কিছুদিন থেকে মধুপুরে যাবার কথা ছিল। পরন্তু তারানাথবাবু লিখেছিলেন যে পুরীতে কোন উপকার না হওয়ায় দু'চারদিনের মধ্যে মধুপুরে যাওয়া হবে স্থির হ'য়েছে। কিন্তু আজ তো লিখেছেন যে, অবস্থা খুই খারাপ, মধুপুরে যাওয়া হবে না, রোগীকে যানান্তরিত করবার উপায় নাই।"

তুপতি মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া এই নির্দ্দারুণ সংবাদ-আঘাত সহিল তারপর অবসাদভরে চেয়ারে বসিয়া পড়িবার নিমিত্ত উদ্যত হইল।

বালকগণ বুঝিতে পেরে [illegible] দেখিয়া অকৃত্রিম বই- [illegible] ব্যর্থ রক্ষার্থে [illegible] নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে অনেক [illegible] আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৃপতি ঈশ্বরায় এই তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইয়া নিজের বিশেষ প্রয়োজন জানাল। পূর্ণিত মতটা টাকা [illegible] তদ্রূপ প্রার্থনা করিল। কেদারী, এই বেলা কোন কালেই এই পরিমাণের সম্ভাবনা নাই জানিয়া প্রথমতঃ টাকা দিতে অস্বীকৃত হইলেও তৃপতির সকাতর অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে টাকা দিতে হইল। টাকা হাতে পাইয়াই তৃপতি সন্তোষপুর ত্যাগ করিল এবং সেই দিনই রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া পুরী যাত্রা করিল।

(ক্রমশঃ)।

---

# ক্যারাণী পত্নী

[ শ্রীবলোকবিহারী গুপ্ত ]

[ 'কেরাণীদের দুর্ভাগ্যের' কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। আফিসে সাহেবে, পথে, ঘাটে, মুদীর দোকানে, ধোপার কাছে কেরাণী বাবুর কোথাও প্রতিপত্তি নাই। তবু জানিতাম এই হতভাগাদের মেসের কাছেও হয় ত পৌষের বড়াই চলে। সম্প্রতি দেখিতেছি তাঁহাদের পত্নীরাও বিরূপ! অহো দুর্দৈব ছাড়া আর কি বলিব? আমরা কেরাণীবাবুদের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গীতটি মুদ্রিত করিতেছি। সত্য হইলে ইহা প্রতিচ্ছবি আর মিথ্যা হইলে—ত হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ—সম্পাদক ]

ও জনমে যা হবে সেইছে আর ক্যারাণীর
মাগ হবনা হবনা।
যত খাটি তত আরো বলে খাট
খালি বলে হাঁড়ি ঠেল না, ঠেল না।
না পোহাতে নিশি উঠনে আগুন
ফুটনো যাইনা কোথা তেল নুন
খাঁসনের গাদা মেজে হই খুন
তবু মন যাঁর পাবনা পাবনা।
তিনটে বাজিতে না বাজিতে কেল
আপিস যাবার সকালের বেল
ভাল ইলেও তবু বলে যেন যেন
কিছু কি যাঁধিতে জাননা।
(বলে) কি কর দুপুরে কিছুত বুঝি না
বাবিসের ওয়াড় কাচিতে পার না
ব'লে ব'লে তোমায় আর হলনা
মেসে খাব ঘরে রব না রব না।
যদি কোন দিন চাহি কিছু ভাল
দিব বলে শেষে কলা দেখাইল,
ওরে ওরে হাকেন হ্যাঁ গা চা-কি হল
কি হল কি ছাই বল না বল না।
ঘরে ছেলে আর ছাই থাকে খাটে
বিছে পিটে স্বামী তাতে তারি চটে
কেহ বা আবার পিঠে 'ডেরে কেটে'
সাধে লো গাধনের বাজনা।
সাহেবেরি ত তো খেয়ে বিবি যত
আসিলেন চটে কেকে বাঁক যত
সে দিনের লোহাগ (আর) কহিব লো কত
অন্ন উদরে গেল না গেল না।
সোহিনী——তাল, এক তালা

# সুইজার ল্যাণ্ডের সামরিক শিক্ষা

( শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ )

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও শত্রুর কবল হইতে স্বদেশের ধন সম্পত্তি এবং গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সামরিক আয়োজন ও প্রতিষ্ঠান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অবশ্য সাম্রাজ্য বর্দ্ধন ও নিঃসহায় ক্ষুদ্র জনপদগুলির ওপর শাসনেও বর্ত্তমানে প্রচুর সামরিক শক্তির প্রয়োজন উপলব্ধি হইতেছে। ইউরোপের শান্তি বৈঠকে যতই আত্ম নিয়ন্ত্রণ শক্তির ( Self determination ) মিঠা বুলি আওড়ান হউক না কেন মূলে স্বার্থ ঘোল আনা বজায় আছে এবং তাহারই ফলে আজ সমগ্র জগৎ ব্যাপী এই ভীষণ অশান্তির দাবানল হুহু করিয়া জ্বলিতেছে। যাহা-হউক, আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আজের সঙ্গে সঙ্গে দেশ রক্ষার ব্যবস্থাও যে করিতে হইবে এ সম্বন্ধে বোধহয় কোন দ্বিমত হইবে নাই। কি উপায়ে অল্প সময়ে ভারত বাসী যথারীতি সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহারই মীমাংসা কল্পে আমরা ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশ সুইজারল্যাণ্ডের সামরিক শিক্ষা প্রণালী পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

সুইজারল্যাণ্ডে মাত্র ৩০০০০০০ লোকের বাস কিন্তু ইহার সৈনিক সংখ্যা প্রায় ৫০০০০০ অর্থাৎ মোট জন সংখ্যার প্রায় ১ অংশ। এই সৈনিক সংখ্যা দেশের সঙ্কট সময়ে প্রয়োজন হইলে এক ঘণ্টার মধ্যে সশস্ত্র অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে। ইহারা সকলেই সুশিক্ষিত এবং স্বদেশ সেবক। দেশের জন্য প্রাণ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

সৈনিক সংগ্রহের প্রণালীও অন্যান্য স্বাধীন ও সভ্য-দেশ অপেক্ষা অল্প ব্যয় সাপেক্ষ এবং সম্পূর্ণ দেশোপযোগী। প্রত্যেক সক্ষম পুরুষকে কিছুদিনের জন্য সামরিক শিক্ষা লইতে হয়। সচরাচর যাহার বয়স্ক বয়স পূরণ হইবে সেই ১০ বৎসরের জন্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর, একবার অর্থাৎ মোটের উপর পাঁচ বার সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। সুবিধা এই তাহাতে তাহাদের দৈনন্দিন জীবিকা-র্জ্জনের কোন অসুবিধা হয় না। আবার এই শিক্ষাও কোন বৎসরে মাত্র ১০ দিন বা ৩ মাসের অধিক দিন স্থায়ী হয় না এবং তাহাও প্রায় প্রথম বৎসরেই হইয়া থাকে। শিক্ষার সময় ক্রমশঃ কম হইয়া আসে। এত বড় সেনা বিভাগে বার্ষিক ব্যয় মাত্র ২০০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ দেশ রক্ষার্থে নাগরিকগণকে জন প্রতি বার্ষিক অষ্ট পাউণ্ড দিতে হয়। এই অর্থের সহিত রাজনৈতিক চালুরির কোন সংস্রব নাই। কেননা সুইজারল্যাণ্ডের সামরিক ব্যবস্থায় অর্থের অপব্যয় একেবারেই অসম্ভব। এই অর্থ হইতে সৈনিকগণের শিক্ষার ব্যয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্র-শস্ত্র, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম এবং সৈনিক ও কর্ম্মচারীগণের বেতন প্রভৃতি যাবতীয় খরচ সরবরাহ করা হয়। কর্ম্মচারীগণ যতদিন সামরিক বিভাগে কর্ম্ম করেন ততদিন যথোপযুক্ত বেতন পান মাত্র।

যে গোলন্দাজ সৈন্য হইতে চাহে তাহাকে ৭৫ দিন, অশ্বারোহীর পক্ষে ৯০ দিন এবং পদাতিক সৈনিককে ৬০ দিন শিক্ষালাভ করিতে হয়। যত বয়স বেশী হয়, অর্থাৎ ৪২ বৎসরের কাছাকাছি হইয়া আসে তত্তই তাহার কার্য্য-কাল কম হইতে থাকে। শিক্ষার তৃতীয় বৎসর, পঞ্চম বৎসর, সপ্তম ও নবম বৎসরে এই শিক্ষার দিন কমিয়া ক্রমে ১২ হইতে ১৫ দিনে গিয়া দাঁড়ায়। সৈনিকগণ যখন, জাতীয় সেনাদলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে তখনই বেতন পায়। অর্থাৎ শিক্ষাকালে খরচপত্র বাবদে কিছু অর্থ ব্যয় এবং নিয়মিত সৈনিক দল রক্ষার্থে যাহা প্রয়োজন তাহাতেই সামরিক বিভাগ চলে। শিক্ষা শেষ করিয়া যে যাহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া যায়, আবার যখনই তাহাদের 'আহ্বান আসে অমনি উপস্থিত হয়; অবশ্য সেই সময় তাহাদিগকে বেতন দেওয়া হয়। সম্ভব হইলে অনেককে সামরিক বিভাগে তাহার ব্যবসাদুযায়ী চাকুরীও দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন কটীওয়ালা হয়তো 'রসদ' বিভাগে চাকুরী পায় অথবা বিদ্যুৎ বিভাগে অভিজ্ঞ আর একজন হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে নিযুক্ত হয় ইত্যাদি।

সেনাপতিগণ ব্যবস্থাপক-সভা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন। সৈনিকগণও কার্য্য তৎপরতা প্রদর্শন করিলে কালে ঐ পদলাভ করিতে পারে। তবে সাধারণতঃ বিশিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ সৈনিকগণই ( Senior men from the ranks ) সরকার কর্ত্তৃক কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত হন।

এইরূপে সৈন্যব্যবস্থা হইতেই সুইজারল্যাণ্ডবাসী

বালকগণ বুঝিতে শেখে যে তাহাকেও একদিন-স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার্থে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে; কাজেই দেশ-প্রীতি তাহার নিকলঙ্ক শিশুহৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে। জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশকালে তখন বিদ্যার্থী মূলক 'সাময়িক' জীবন এবং বে-সাময়িক কর্ত্তব্যে (Civil duty) বিশেষ পার্থক্য দেখে না। পাঠ্যাবস্থা হইতে দেশকে ভালবাসিতে না শিখিলে দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে না। কথায় বলে Students of to-day are citizens of to-morrow.

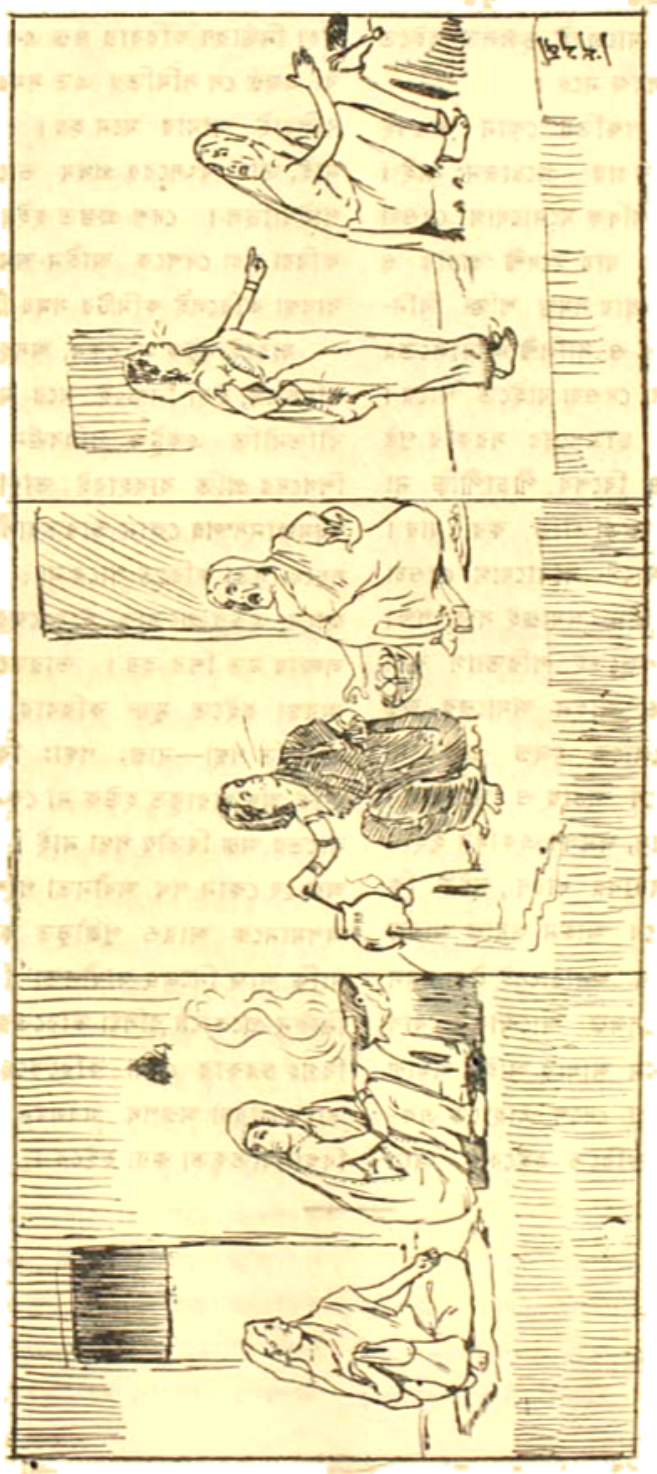

# মিঃ বি জি হর্ণিম্যানের পত্র।

## পূর্ব্বানুবৃত্তি।

কাউন্সিল প্রবেশের যে আরও অনেক বিঘ্ন না আছে তাহা নহে। কাউন্সিলে সরকারী দলের সহিত যোগাযোগের ফলে তাহাদের দূষিত প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। মানুষ মাত্রেরই দুর্ব্বলতা হইতে অব্যাহতি লাভ কাহারও পক্ষে সহজ নহে।

আমার বিশ্বাস, অসহযোগ পদ্ধতির কোন অংশেই কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা হ্রাস করার প্রয়োজন নাই। কোনও একটি বিশেষ বিভাগে অধিক মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় স্বদেশী প্রচার ও বিলাতী জিনিষ বর্জ্জনের উপর প্রায় সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করিয়া জাতীয় শিক্ষা প্রচার ও সালিশী আদালতের উপর অপেক্ষাকৃত অল্প মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। উকীলগণের আদালত-বর্জ্জন ও ছাত্রগণের সরকার পুষ্ট স্কুলকলেজ বর্জ্জন সম্বন্ধে এখনও বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিলেও চলে। কতকগুলি তাড়াতাড়ি করা যায়। শেষোক্ত জিনিষগুলির প্রতিই আগে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। অসহযোগের তূণীরে আইন অমান্যই সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বাণ। সুতরাং ইহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা চলে না। যদি সাধারণ এখনও আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তবে লোকে প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসের এ বিষয়ে প্রচার ও আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অবশেষে একদিন ইহার জন্য প্রস্তুত হইবেই। আমার বরাবর ধারণা, দুইটি কি একটি জেলা লইয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে আইন অমান্য আরম্ভ করা ভুল। এরূপ করাতে সরকার অনায়াসেই ইহা দমন করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং সেজন্য আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে যখন আবার আইন অমান্য আরম্ভ করিতে হইবে, তখন সমগ্র দেশে যাহাতে একযোগে আরম্ভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যতদিন এরূপ ব্যাপকভাবে আরম্ভ করিবার অবস্থা না হয়, ততদিন ইহার আরম্ভের চেষ্টা না করাই যুক্তিসঙ্গত। দেশবাসী আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কি না ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটা তদন্ত-সমিতি গঠন করা বা এজন্য সে সমিতির এত সময় নষ্ট করা উচিত ছিল না বলিয়াই আমার মনে হয়। কারণ দেশ যে প্রস্তুত হয় নাই, তাহা বৎসরের প্রথম ভাগের ঘটনাবলীতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। দেশ প্রস্তুত হইয়াছে কি না ইহা তদন্ত না করিয়া স্বয়ং দেশকে আইন-অমান্যের জন্য প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলেই কমিটির সময় ঠিকভাবে ব্যয়িত হইত।

যাহাই ঘটুক না কেন, অসহযোগের মূলনীতি পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই মরে নাই। মুসোলিনী তাহার রীতিনীতি একটুও পরিবর্ত্তন করে নাই। অকালী শিখদের প্রতি ব্যবহারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আত্মসম্ভ্রমজ্ঞানসম্পন্ন কোন ভারতবাসীই এই মুসোলিনীর সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না; যাহারা ভিতরের অবস্থা জানে, এরূপ প্রত্যেক ইংরেজেরই মুসোলিনীর ব্যবহারে লজ্জায় নত শির হয়। ভারতকে তাহার হীন লজ্জাকর অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার একমাত্র উপায় মহাত্মার প্রদর্শিত পন্থা—নাস্তঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। বর্ত্তমান যতই অন্ধকারাবৃত হউক না কেন স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান লাভের অন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই। মহাত্মার পথ ছাড়া অন্য অন্য যে কোন পথ অধীনতা পাশকে আরও দৃঢ় করিবে, অপমানকে আরও পুঞ্জীভূত করিবে। যে জন্য মহাত্মা আজি আজ নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া কারাগারের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত-বিগ্রহ চরকার সেবা করিতেছেন, দেশবাসী যদি তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যপথ অবলম্বন করে, তবে তাহারা ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।" (হিন্দু—মাদ্রাজ)

## দুই

সুশান্ত চিরদিনই দরিদ্র। সংসারে আপনার বলিতে মা ছাড়া তার কেহই ছিল না, মা অতি কষ্টে সংসার চালাইয়া ছেলেটিকে মানুষ করিবার আশায় কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কত বুকপোরা আশা, ভবিষ্যতের কত মন রঙীন স্বপ্ন দেখিয়া চোখের জলে ভাসিয়া অঞ্চলের নিধিটিকে দূরে সহরে পাঠাইয়াছিলেন। সে আজ ছয় বৎসর আগেকার কথা। সুশান্ত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। দারিদ্রের ছাপ সর্বাঙ্গে মাখা, কেশ-বেশ সংস্কার শূন্য। জীর্ণ শীর্ণ বৃক্ষের মত কলিকাতার মত একটা সহরে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যে কলেজে সে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল সেই কলেজেরই অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন, রাজেশ্বর বসু মহাশয়। কেমন করিয়া ঠিক বলা যায় না, তবে সুশান্ত এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বোধ করি তাহার ধূলি-মলিন বেশ, রুক্ষ দীর্ঘ কেশদাম এবং পাড়াগাঁয়ের হাবভাব সহরবাসী এই ধনবান ব্যক্তির চক্ষে নূতন বা বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল। সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বালক স্পষ্টই বলিয়াছিল, এখানকার নাপতে চায় পয়সা চায় চুল ছাঁটতে, আমাদের দেশে একটা নারকেল—আর পয়সাও বারুয়ায় নয়, পেলে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যেত। আর রুক্ষ চিরুণী কেনবার পয়সা থাকে না। কি মাসেই মনে করি কিনব, মাস শেষ হলে দেখি একটা পয়সাও বাঁচে নি।

এমন স্পষ্ট, সরল সত্য যে এই বয়সের কোন যুবক বিনা দ্বিধায় অসঙ্কোচে বলিয়া যাইতে পারে সম্পাদক মহাশয়ের সে ধারণাই ছিল না। এক ত, কাহারো আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা যেমন আধুনিক সভ্যতা ও ভদ্রতা সঙ্গত নহে, তেমনি-বক্তা সেরূপ প্রশ্নে আন্তরিক বিরক্ত হইয়াও যথেষ্ট রাখিয়া ঢাকিয়া সোজাসুজি পরাইয়া উত্তর দিয়া থাকে, সম্পাদক মহাশয় এইরূপই দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন। স্পষ্ট নিষ্কপট ও হ্রাস-বৃদ্ধি সকলের শ্রবণ যোগ্য স্বরে এমন কথা বলিতে তিনি কোনদিনই শুনেন নাই।

নূতন কিছু দেখিলেই মানুষ সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। রাজেশ্বরবাবুর ঝোঁক হইয়াছিল, এই নির্ভীক সত্যবাদী যুবককে কোনমতে সাহায্য করিয়া যদি তাহার জীবন যাত্রার পথটি মসৃণ করিয়া দিতে পারেন তবে ভবিষ্যতে ইহার মনুষ্যত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, কালে সে জন সমাজে একটা প্রকৃত মানুষের আদর্শ স্থাপন করিতে পারিবে!

রাজেশ্বরবাবু যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথায় কথায় একদিন বলিলেন—তুমি যে মেসে থাক সেটা ত ভদ্রলোকের থাকবার উপযুক্ত বলে মনে হয় না। তোমার মুখেই শোনা, সেখানে যত কোলো লোকের আড্ডা—সেখানে থাকা ত ঠিক নয়।

যুবক দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিল, তারা লোক খারাপ নয়। সকলেই সারাদিন কলে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া আসে, আসিয়াই খাইয়া দাইয়া শুইয়া পড়ে।

রাজেশ্বর বাবু কহিয়াছিলেন—তা না হয় ভদ্র, কিন্তু ছোটলোক ত! তাদের সঙ্গে থাকলে মানুষের নৈতিক অবনতি হওয়ারই সম্ভাবনা।

যুবক সগর্বে উত্তর দেয়—তাহাদের ছোট লোক মনে করিলে সেখানে থাকিতাম না। আর চরিত্র! তারা মহৎ।

রাজেশ্বরবাবু আপনার ভুল বুঝিলেন; বুঝিয়া নিরস্ত হইলেন। যুবক তাঁহার টেবিলটির সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া, পূর্বে অনেকবার তাহাকে বসিতে বলা হইয়াছে, সে বসে নাই। রাজেশ্বর বাবু লিখিবার প্যাডটির উপরে

মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়া বহিলেন; আর কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। যুবক দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সবিনয়ে বলিল—যেতে পারি ?

না, দাঁড়াও—রাজেশ্বরবাবু আর একবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বলিলেন—ও বাসাটা তোমার কলেজ থেকে অনেক দূরে হয়। কাছাকাছি কোন একটা বাসা দেখে নাও-না, তোমার ও সুবিধেই হবে আর খরচ পত্র যদি কিছু বেশী হয়, আমিও তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি।

যুবক উত্তর দেয়—খরচ কম বলিয়াই আমি সেখানে থাকি। আর দূর! ওটুকু আমাদের মত পাড়াগাঁয়ের ছেলের পক্ষে কিছুই নয়।

না হোক্। আমি বলছি কি, আমাদের কাছাকাছি একটা মেসে এস, দেখা শুনোও হবে, কলেজও কাছে হবে। খরচ যদি কিছু বেশী হয়, বলছি ত!

খরচ বাড়াবার ক্ষমতা আমার নেই। আর যতদিন সাধ্য নিজের ক্ষমতা দিয়েই আপনাকে পালন করিব। আপনি অনুমতি করিলে আমি একদিন আসিয়া দেখা করিয়া যাইব।

রাজেশ্বর মুগ্ধ, বিমোহিত। অনেকক্ষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না।

যুবক বলিল—আমি আসিতে পারি ?

রাজেশ্বর 'হ্যাঁ, এস, আর সময় পেলেই আমার বাড়ীতে আসবে, বুঝলে ?' বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে তাঁহার হৃদয়ের পরতে পরতে এমন একটা ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনা চিন্তা সব সেই একটি যুবকেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল! এমন আত্ম-নির্ভর, দৃঢ় অথচ নম্র, সংযত দরিদ্র ইতিপূর্ব্বে তিনি আর দেখেন নাই। দরিদ্র যে এমন হয় বা হইতে পারে ইহাও ছিল তাঁহার কল্পনার অতীত। মহত্বের এই ধন-গ্রাসী ছাপটির সহিত দেখের দরিদ্রদের যে পরিচয় ছিল না তাহা নহে কিন্তু সেই দরিদ্রের যে মূর্ত্তি আজ তাঁহাকে বিস্ময় সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিল, সে মূর্ত্তি তিনি কখনও দেখেন নাই, দেখিবার আশাও করেন নাই। যে অভাগা দেশে দরিদ্রের কন্যা ধনীর নিরানব্বই ভাগ বেশী সে দেশের দরিদ্র-সন্তানের যে সর্ব্বপ্রথম ধনীর মুখের দিকে হা করিয়া তাকাইয়া অবস্থান করে—এ ত কিছুমাত্র নূতন নহে, একটা মহত্বের খেয়া আপনিতেই আমাদের এখানে মহত্ত্ব আহ্বানের ঠিক পাশিয়া যায় সেখানে দরিদ্রের এই মূর্ত্তিই নূতন, দরিদ্রের এই রূপই আশ্চর্য্যজনক।

কয়দিন রাজেশ্বর বাবুর ইহাই হইয়াছিল ধ্যান, জ্ঞান সমস্ত। একমাত্র কন্যাকে স্বৈকিয়ৎস্বরূপ বলিয়াছিলেন না, একটা অদ্ভুত মানুষ দেখেছি, তারই কথা ভাবি।

কন্যা ভাবিয়াছিল বুঝি সে মানুষটার শরুর মত দুইটা শিং অথবা মোটা চারেক পা গজাইয়াছে কিম্বা সে মাথাটা নিচে করিয়া দুই পা তুলিয়া পটাপট হাঁটিয়া চলে, কহিয়াছিল—আমি দেখ্‌বো বাবা! বল না বাবা কোথায়? চিড়িয়াখানায় না 'সোসাইটে'?

পিতা হাসিয়া কন্যার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিয়াছিলেন—না না' সে রকম অদ্ভুত নয়। আকৃতিতে সে অবিকল আর পাঁচ জনেরই মত, কেবল ভেতরটা তার—একেবারে আলাদা, আশ্চর্য্য, একেবারে মানুষের মত।

কন্যা হাসিয়া বলে—ভেতরটা কার আবার মানুষের মত নয় বাবা! হ্যাঁ—তোমার বেয়ন্‌ড যে কি ফুঁদিয়ে দিয়ে গেছে বুঝি ?

পিতা গদগদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, ফুঁদে না মা। একটা সত্যি মানুষ এসেছিল আজ। বড় গরীব, পয়সা অভাবে চুল কাটতে পায় না, মাঠকোটার বাসা করে থাকে, দু'মাইল পথ হেঁটে কলেজে যায়, তবু এক পয়সা তাদের কাছে সাহায্য নেবে না! বলে নিজের ক্ষমতায় যা না হবে—করব না।

কন্যা অনেকক্ষণ ধরিয়া পিতার কথাগুলি মনে মনে আলোড়ন করিয়া বলিল—কি করতে এসেছিল তবে?

নিতে আসে নি মা, আমি ডেকেছিলুম।

কেন বাবা ?

তাকে দেখে বড় কষ্ট হয়েছিল মা, কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিলুম, নিলে না।—কথা কয়টি বলিতে বলিতে রাজেশ্বরের কণ্ঠ গভীর হইয়া উঠিল।

কন্যা বলিল—তোমায় কলেজেই পড়ে? কোন্ ইয়ারে পড়ে বাবা ?

হ্যাঁ-মা! আমাদের কলেজেই। সবে পাস করে এসেছে—পাড়াগাঁ থেকে। মাথায় চুল যোয়ের আধ হাতের চেয়েও বেশী লম্বা, কাপড় হাঁটুর নিচে নামে কি-না সন্দেহ!

কন্যা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল—ম্যাগো! আমাদের ঘরে উড়ে আর কি?

পিতা সস্নেহে কন্যাকে বুকের কাছে আনিয়া বলিয়াছিলেন—বেশ-ভূষায় ত মানুষ নয় কামনা, মানুষ মনে চরিত্রে। এইমাত্র তার যে পরিচয় আমি পেয়েছি, মানুষের মধ্যেও সে-যে কত বড়, কত উচ্চ তা কেবল আমিই বুঝতে পারছি। গরীব শুনেই উপহাস কর না মা!

কামনা অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিল—অন্যায় করেছি, আমাকে মাপ কর বাবা!...এবার যদি আসে আমাকে কিন্তু ডেকো বাবা!

পিতা বলিয়াছিলেন—না কামনা। হঠাৎ তার সামনে তোমাকে ডাকা হবে না। পল্লীগ্রামের ছেলে, সে হয়ত এমনটায় অভ্যস্ত নয়, অপ্রস্তুত হবে, তা হলে আর যে কোনদিন আসবে তখন, তা আমার মনে হয় না।

কন্যা আর কিছু বলে নাই। প্রায় দুই মাস পরে তাহাকে সে প্রথম দেখে, পিতার শয্যা-পার্শ্বে। তাহার

পতি পূজা!

পিতা একবার অসুস্থ হইয়াছিলেন, সুধান্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। উপরে উঠিয়া শয্যাপার্শ্বে আসিতেই মাতৃস্বসা বলিলেন—দাদা, এইটি আমার মেয়ে।

কামনা সঙ্গে সঙ্গেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়াছিল, সুধান্ত তাহা দেখিয়াও কোন উত্তর দেয় নাই। মুখে বিনয় নম্রকণ্ঠে একটা শুধু 'ও:' বলিয়া বিছানার পাশেই বসিয়া পড়িয়াছিল।

এও পূজা! কি পূজা—কি জানে!

রাজেশ্বর ভাবিয়াছিলেন, অনভ্যাসজনিত সঙ্কোচ। কিন্তু কয় মুহূর্ত্তেই তাঁহার সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রাত্রি জাগিতে হইতেছে শুনিয়া সুধান্ত কামনাকেই বলিল—আপনিই থাকেন রাত্রে? আজ থেকে আমিই থাকবো, আপনাকে আর থাকতে হবে না।

কামনা কিছু বলিবার আগেই সে আবার বলিল—আট-টার সময় আসব। হঠাৎ বুঝি তার মনে হইয়া পড়িয়াছিল যে ইহাদের অনুমতি ব্যতীত প্রস্তাবটা করাই হয়ত অনুচিত হইয়াছে। মনে হইতেই সে তাড়াতাড়ি রাজেশ্বরের দিকে ফিরিয়া বলে—আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

না, আপত্তি কিসের? তবে তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে না ত?

না।...ওই কথা রইল। আটটা কি কিছু আগেই আসব।—বলিয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

কামনা পিতার কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—তা হ'লে এইখানেই খাবেন, বলে দাও বাবা!

পিতা সহর্ষকণ্ঠে বলিলেন—শান্ত, আট-টার সময় তুমি এইখানেই খেও—তবে।

আমি সন্ধ্যেবেলাই যাই। কলেজ থেকে ফিরেই হাঁটি, খেয়ে একটী ছেলেকে পড়াতে যাই, পড়িয়ে সাড়ে সাতটা আটটায় ফিরি।

তুমি নিজেই হাঁট বুঝি?

নিশ্চয়ই।—বলিয়া সে প্রবলবেগে হাসিতে লাগিল। মিনিট দুই হাসিয়া, মুখোপাধ্যায়বাবুর দিকে হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া, শর্ষহীন নেত্রে কামনাকে বিদায় করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাজেশ্বরবাবু কন্যার দিকে ফিরিলেন, দেখিলেন, অতি বিস্ময়ে দুহিতার মুখখানি কেমন-যেন হইয়া গিয়াছে। মুখে সে উজ্জ্বল্য নাই, আবার তাহা রক্তহীন বিবর্ণও নয়। মানুষ আনন্দে ও বিস্ময়ে হতবাক্ হইলে তাহার মুখের চেহারা এমনই হয়।

পিতা জিজ্ঞাসিলেন—কি-মা?

ওঁর নাম কি বাবা?

সুশান্ত।—চৌধুরী বুঝি!

সেই প্রথম সাক্ষাৎ। চার বছর আগের কথা।

তারপর...

(ক্রমশঃ)

---

## বংশীরব

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

( ১ )

বাসর [illegible] আজ ভাসে,
আসছে ভেসে গাঁয়ের মলয় বায়;
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, মধুর ভানে—
আজায় প্রিয় কদম তরুর ছায়।

( ২ )

এমন মধুর মধু-রাতের নিশি
গাছের মাথায় জ্যোৎস্নাবালা হাসে;
কুহুম ফোটে আলো ক'রে দিশি,
পরাণ আকুল কদম ফুলের বাসে।

( ৩ )

সন্ধ্যারাণী কালো কাপড় গায়,
তাহার উপর মুক্তা কত জ্বলে!
কাহার সনে অভিসারে যায়,—
প্রণয়—ফাঁসী পরাতে কার গলে?

( ৪ )

এমন সময় ওই যে তাকে বাঁশী,
বাঁশীর ধ্বনি দিকে দিকে ছোটে;
আরতো ঘাটে রইতে নারি আমি,
পরাণ যেন কেমন ক'রে ওঠে।

( ৫ )

হোলোনা আর কলসী ভ'রে নেওয়া,
রইল পড়ে কমল তোরা ঘর।
হোলোনা আর বাড়ী ফিরে যাওয়া,
বাঁশীর গানে ডাকছে প্রিয়তম।

( ৬ )

ওই যে [illegible] বাঁশী 'কালা',
হোলোনা আর সমন পাওয়া দায়;
রইল গাঁথা [illegible]
কইছে বাঁশী সময় ব'য়ে যায়।

# বাংলার বন্যা

## ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েনের সংবাদদাতার বিবরণ।

গত ১২ই নবেম্বর উত্তর বঙ্গে বন্যাপ্লাবিত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েনের বিশেষ সংবাদদাতা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন দিবস এরূপ প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, যে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্যার বাণবিদ্ধ রাজাবাড়ী রাজী ঘর দার ভাসাইয়া দিয়া যায়। প্রায় ১২০০০ গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে। বাড়ী ঘরের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা আর কি বলিব! ১০০ মাইলের কিছুর অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। শস্য একেবারে নাই বলিলেই হয়।

একটা মজার কথা এই যে, উত্তর বঙ্গ যখন এই অর্দ্ধ প্রলয়ের হুঙ্কারে, ভয়ে, উৎকণ্ঠায় কম্পমান তখনও নাকি সরকার বাহাদুর সৈন্যোপরি বিস্তার করিতেছিলেন। এরূপ গুরুতর ব্যাপারে অনতিবিলম্বে প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন জনসাধারণ এই আশাই মনে মনে পোষণ করিতেছিল, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল, যে সরকার বাহাদুর অনিচ্ছায় অতি মন্থর গতিতে আসরে নামিয়া আসিতেছেন। ইতিমধ্যে স্যার পি, সি, রায় তাঁহার দলবল লইয়া কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। তিনি এরূপ হৃদয়গ্রাহী আবেদন সকলের নিকট উপস্থিত করেন যে এক মাসের ভিতর বাংলা হইতেই দুঃস্থদের সাহায্যকল্পে ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিয়া গেল এবং দলে দলে যুবকবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে লাগিল।

মহিলাগণও এ ব্যাপারে কম সহায়তা করেন নাই। তাঁহাদের বহুমূল্য বসন ভূষণাদি অর্পণ করিয়া নারী-হৃদয়-সুলভ করুণার পরিচয় দিয়াছেন। বালক বালিকারাও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বন্যার সাহায্যার্থ চাঁদা আদায় করিয়াছে। যুবকেরা এক প্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সাহায্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

জনসাধারণ সরকারের প্রতি এই নিমিত্তই অসন্তুষ্ট যে সরকার জনসাধারণের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া রেল রাস্তার প্রসার সাধনে সততই সচেষ্ট। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে রেল রাস্তাই বন্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

স্যার পি, সি, রায়ের আহ্বানে সমস্ত বাংলার কেন এমন সাড়া পড়িয়াছে তাহার কারণ নির্ণয়ে বেশী প্রয়াস পাইতে হইবে না। সাধারণ বিদেশী শাসন হইতে স্বতন্ত্র হইতে চাহিতেছে। বাংলার সকলের প্রাণই দুঃস্থদের অবস্থাবিপর্য্যয় পরিদর্শনে করুণায় সম্পূর্ণ ভরপুর হইয়াছে। আর স্যার পি, সি, রায়ের ব্যক্তিত্বের মহিমার কে আর মুগ্ধ নহেন? সে কথা আর কি বলিব। তিনি একজন প্রবীণ বৈজ্ঞানিক। তাঁহার যশোগৌরব জগৎ-ব্যাপী। তিনি কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজের একজন উদ্যোক্তা। তিনি শিক্ষাবিভাগের সহিত এরূপ ঘনিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করেন, যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি অসহযোগী নহেন বটে; তবে স্বাধীনতার তাঁহার মহৎ প্রাণ সর্ব্বদাই ভরপুর। তিনি সহ-কারের একজন কঠোর সমালোচকও বটেন। তিনি সমালোচনাস্থলে যাহা বলেন তাহা অকাট্যযুক্তিপূর্ণ। তিনি যুবকদের মত কর্ম্মী এবং বালকদের মত সরল। তিনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে একজন ইউ-রোপীয় বলেন "মিঃ গান্ধী যদি আরও দুইজন প্রফুল্লের সৃষ্টি করিতে পারিতেন তবে নিশ্চয়ই একবৎসরে স্বরাজ-প্রাপ্ত হইত।"

বন্যাপ্লাবিত স্থান সমূহে সাহায্যের জন্য যে কয়েকটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে আচার্য্য রায়ের বেঙ্গল রিলিফ কমিটিই প্রধান। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অসহ-যোগীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। যাঁহার অধীনে সাহায্যের কার্য্য পরিচালিত হইতেছিল তিনি একজন বাঙ্গালী যুবক। তিনি সিভিল সার্বিস পাশ করিয়া (শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু) সরকার বাহাদুর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু মিঃ গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়া অসহযোগ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার অধীনে দুই শত স্বেচ্ছাসেবক কার্য্য করিতেছেন; তন্মধ্যে অধিকাংশই অসহযোগী। দুএকজন কৃতপূর্ব্ব আন্তরীনও যে তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন না এমন নয়। একজন হিন্দু ও আর একজন খৃষ্টীয়ান আন্তরীনকে খুব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীরা যে স্থানে স্থানে সাহায্য না

করিয়াছেন তাহা নহে; তবে তাঁহাদের সাহায্য অতীব অপ্রচুর। আর স্বেচ্ছাসেবকদের মত সরকারী কর্ম্মচারীরা এত পরিশ্রম স্বীকার করিতে পারেন নাই। আবার সরকারী তহবিলও এব্যাপারে মুক্তহস্ত নহে। এই সকল কারণ বশতই স্বেচ্ছাসেবক অসহযোগীরা গ্রামবাসীদের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এবং সরকার লোকের সহানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছেন। আচার্য্য রায়ের স্বেচ্ছাসেবকেরা ধন্য! তাঁহারা কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াই না জনহিতসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন!

সরকারের প্রতি জনসাধারণের অসন্তোষের আর একটা কারণ এই যে সরকার রেলওয়ে নির্ম্মাণ ব্যাপারে জনসাধারণের আপত্তিতে কখনও কর্ণপাত করেন নাই। জমীদার, প্রজা উকিল ব্যারিষ্টার, সহযোগী অসহযোগী, সরকারী ও রেলওয়ে কর্ম্মচারী সকলকেই জিজ্ঞাসা করুন—সকলেই বলিবেন যে ৬ বৎসর আগে উত্তর বঙ্গের রেল রাস্তা আরও ছোট ছিল। তখনও রেল রাস্তার উপর সময় সময় বৃষ্টির জল জমিয়া যাইত। এরূপ অবস্থায় আবার জনমত পদদলিত করিয়া রেলকোম্পানী রেল-রাস্তাকে বড় করিয়াছেন। ফলে ১৯১৮ ও ১৯২০ সালে বন্যা দেখা দেয় এবং সম্প্রতি বন্যায় উত্তর বাংলাকে একেবারে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবক সমিতির সহিত সরকারী রিলিফ কমিটির তুলনায় নগণ্য। সরকারী কর্ম্মচারীরা অনেক সময় সাহায্যার্থে অর্থের অনটন বোধ করিয়াছেন; কেন না সরকার সাহায্য ব্যাপারে মুক্তহস্ত নহেন। কোনও কোনও রাজকর্ম্মচারী নাকি এরূপও মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সরকারকে বদান্যতার প্রতিষ্ঠান মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। আর এ ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারীরা বেশী নিপুণও নহেন কেন না এরূপ জানা গিয়াছে যে বিশ হাজার টাকা মূল্যের শস্য বীজ বিতরণ করিতে সরকারের বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক রিলিফ কমিটীর কার্য্য কি সুচারুরূপেই না সম্পন্ন হইয়াছে। সরকারী রিলিফ কমিটি যাহা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অপ্রচুর, আর স্বেচ্ছাসেবক রিলিফ কমিটি যাহা করিয়াছেন তাহা খুবই প্রশংসার্হ; এই জন্যই বলিতে হয় যে এই বন্যা ব্যাপারে আচার্য্যের স্বেচ্ছাসেবকেরা এক মহৎ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন—তাঁহারা তাহার উপযুক্ত ফল নিশ্চয়ই ভোগ করিবেন। ইতিমধ্যেই জনসাধারণের ভিতর বলাবলি হইতেছে যে, গান্ধী মহারাজের অনুচরদের চেষ্টায় তাহারা এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল। ইহা হইতে জনসাধারণের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অসহযোগীরাই প্রকৃত বন্ধু—সরকারী কর্ম্মচারীরা মোটেই নহে।

এ সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পাঞ্জাবের গুরুকাবাগ দুর্ঘটনা ও উত্তরবঙ্গের বন্যা ব্যাপারে অসহযোগীরাই প্রকৃত কার্য্য করিয়াছে,—অসহযোগীদেরই সম্পূর্ণ জয়লাভ হইয়াছে।

---

## যৌবনের স্পর্দ্ধা

[ শ্রীভক্তিসুধা রায় ]

সেদিন আমার যৌবনেতে
ক্ষুব্ধ সিন্ধু উছালে,
জিজ্ঞাসিল কতই কথা
ক্ষুব্ধ বুকের উচ্ছ্বাসে।
হেলায় তারে দিলাম ঠেলে;
কইনু 'অবোধ বুদ্ধিহীন!'
সজল চোখে পড়ল সরে
আপনাকে সে ভাবলে দীন।

আজ যে তারে মুখর দেখে
যখন গিয়ে সভায়।
জ্ঞানের আলো উঠছে তাহার
তরুণ মুখে উছাসি।
কইতে গেনু সে সব কথা
বল্লে সে তা রাখবে না।
জিজ্ঞাসিলে জবাব দিলে
'বৃদ্ধ তুমি বুঝবে না।'

# তোড়া।

[ শ্রীউমাপ্রসন্ন দে, বি-এ ]

নখের ইতিহাস—ডারুইন্ সাহেবের ক্রমোন্নতিবাদের কথা শুনেছো বোধহয়। মানুষের উন্নতি একদিনে হয়নি—প্রকৃতির সাথে লড়াই কর্ত্তে কর্ত্তে তবে উন্নতি হয়েছে তাদের। মানুষ ছিল আগে বানরের মত—বানরগুলি আরো আগে ছিল চারপাওয়ালা পশুদের মত। প্রমাণ চাও?—হাতের নখগুলির দিকে চেয়ে দেখো! একদিন বাঘ বিড়ালের মতই এগুলি ছিল ধারালো অস্ত্র। আঁচড়ে দিতে, শিকার ধরতে আচ্ছা সুবিধা। কিন্তু যেই নতুন নতুন অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী হ'তে লাগল, নখের কাজও কমে গেল। কাজ না করে সব জিনিষেই মরচে পড়ে যায়। বানরের নখও তত ধারালো নয়। মানুষের তো আরও ভোতা। কিন্তু যা' হক নখের কাজ একেবারে শেষ হয়নি—মাঝে মাঝে সুবিধা করে যাই কি! তা'ছাড়া শুনা যায় যে কেউ কেউ নাকি কলমাতে নখের সদ্ব্যবহার কর্ত্তে মোটেই কুণ্ঠিত নন্। বাঘের মত আঁচড়ে, কামড়ে—নখানাবুদ!

• • • •

চুলের স্বাস্থ্য—এতেও যদি বিশ্বাস না হয় তো মাথার চুলের দিকে একটু নজর রেখো, 'মুখ-ভরা' দাড়িও তো সবারই আছে। কারো আবার বুকে, পিঠে, কাণেও বাদ যায় না—দেখতে যেন বুনো মানুষের মত! মানুষ জাতির মাতুব্বর যারা তাদের মাথা এখনো লোমে ভরা, শীত গ্রীষ্মে গায়ে গায়ে বেশ লাগিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যেই কাপ্তিরী খান, তারী তারী আমার চলতি হ'ল, লোমের কাজও সেদিন থেকে ফুরিয়ে গেল। ছিলাব বিকাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে' পড়ছে বাকী আছে শুধু মাথাটা, মাথাটা নেড়া হ'লেই পশুত্বের চিহ্ন সব ঘুচে যায়। এজন্যই আমাদের দেশে মাথা নেড়ার বড় বেশী কিনা বলতে পারলুম না।

• • • • •

চোখের চুলের আনুকূল্য—যদি বলি সদা-সর্ব্বদাই তুমি কাঁদছ তা'হ'লে হয়তো লাঠি নিয়ে উঠবে। ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি সত্যি তাই। চোখের নীচের পাতার কাঁক দিয়ে ভাল করে দেখলে খুব ছোট একটা নল গর্ত্ত পাবে—ঠিক নাকের সাথে গিয়ে মিশেছে। আমাদের চোখের ভিতর সর্ব্বদাই জল আসছে, আর এ পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে—একটু টেরও পাই না। কিন্তু যেই বুক ফেটে কান্না আসে তখন জলের আমদানী হয় বেশী; পথটী ভুলে ভরপুর, হু'কূল যায়। তাই কান্নার সময় দেখবে সবাই খুব নাক কচলায়—আঁচল দিয়ে নাক মুছে। কিন্তু চোখে এত জল জমা হয় যে তবু ঝর ঝর করে পড়তে থাকে। এ কান্নাই শুধু অন্যের চোখে পড়ে।

• • • •

চোখের ভুল—কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া হ'লেই তুমি বল, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু তোমার চোখদু'টী যে সত্যি দেখতে তারই বা বিশ্বাস কি? যারা ফুটবল খেলে তাদের চোখে অনেক সময়ই একটা বল দু' তিনটা হয়ে দেখা দেয়। একখানা কাগজে গোল দাগ এঁকে তার বেশীর ভাগই মুছে দেও। বৃত্তের মত সামান্য একটু বাঁকা অংশ বাকী থাকবে, কাগজটা যদি এখন খুব ঘুরাতে থাকো তো দেখবে যে সে সামান্য অংশটুকুই সম্পূর্ণ গোলাকার হয়েছে, একটি কাঠির মাঝখানে ঠিক তার সমান আরেকটা কাঠি দাঁড় করিয়া দিলে নীচের কাঠিটিকে ছোট বলে মনে হবে।

• • • •

চোখের চৌকিদারি—চোখদু'টী যেন দুইটী পুলিশ। তাদের প্রধান আড্ডা হয়েছে মগজের ভিতর। পুলিশ বেচারী নিজে কিছুই কর্ত্তে পারে না—যারোগাবাবুর হুকুম ছাড়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের টেলিফোঁ করে মগজে পাঠানো হচ্ছে। তোমার সামনে হয়তো একটা ফুল পড়ল অমনি টেলিফোঁ—কে এল, কি রকম চোখে দেখছ? সেখান থেকে অমনি উত্তর—লালফুল, পাঁচ-পাপড়ি! এ খবরা-খবরে একটুখানি সময়ও নষ্ট হয়। যে-কোন জিনিষ চোখের সামনে আসা কি যাওয়া মাত্রই নজরে পড়ে না—এই একটুকু দেরীও পরে! এজন্যই আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ চোখ বুজলে কোন কোন সময় আলোটী চোখে ভাসতে থাকে।

---

## সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সুকবি শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ঢাকা পূর্ব্বঙ্গ সাহিত্য সমাজ কর্ত্তৃক আহূত শোক সভায় স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য-জীবনের একটি সুন্দর আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচনাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি আমরা এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিয়া ফেলিয়াছি। পত্রে-পত্রে ছত্রে ছত্রে স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের ললিত ছন্দ মাধুরী, সেই অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ তাঁহার আড়ম্বর শূন্য সহজ সরল ভাবাবেগ—শ্রীপতিপ্রসন্নের হাতের লেখা ফুটিয়া রহিয়াছে। শ্রীপতিপ্রসন্ন স্বর্গীয় কবির শোকসভায় অশ্রুজল ঢালিয়াছেন—সে মমতার অশ্রুজল, প্রিয়জনবিরহের মর্ম্মোচ্ছ্বাস। কবির তরে কবির আকুল ক্রন্দন।

অধিক কথা বলিবার কিছু নাই। শুধু এই কথাটি মনে হয় যে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সুধাও যেমন মধুর শ্রীপতিবাবুর এই কথাগুলিও তেমনি মধুর মর্ম্মোদ্গম হইয়া লেখা দিয়াছে।

# দেশ-বিদেশ

'ধূমকেতুতে' "আত্মসমর্পণের আহ্বানে" ও "বিপ্লবীর কৈফিয়ৎ" এই দুইটী প্রবন্ধ লেখার অপরাধে 'ধূমকেতু' সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারামতে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। ঐজন্য চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মামলার দায়ে একাশ করিয়াছেন। বিচারে আসামীর প্রতি ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

—

সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে মিঃ এস্ কুমার মুখোপাধ্যায় বি, এল, আসি পরিচালন করিয়াছেন। মুদ্রণ সম্বন্ধে আসামীর সহিত ৩০ বৎসর হইতে ছিল। মামলা পরিচালনে পূর্বে তাহাদের সম্পর্ক ছিল। এক মাস হইতে তিনি হাজতে জেলে মুদ্রিতেছিলেন।

—

বিচারের পূর্বে সংবাদে প্রিন্টার ও পাবলিশার কাজী রফিউদ্দিন আহমেদ ও মুদ্রাকর কাজী সাবের হোসেন হইতে আদালতের প্রতিশ্রুতি সন্তোষ্য এবং ১০০৲ টাকা জামিন লওয়া হয়। উক্ত ৩ সপ্তাহ অতীত হইলে নিয়মমত কাজী সাহেব ও মুদ্রাকর পুনরায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এ কথা জানাইলেন বলিয়া তিনি করিয়াছেন এবং আইন অমান্য করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা কাজি উক্ত প্রতিশ্রুতি সন্তোষ্যের জন্য অবশ্য আবেদনও করিয়াছেন। আবার মেয়াদের সংশ্রবীত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে আবেদনও চলিতেছে।

—

বার্লিনে অন্তরা ও বিদেশে না, এখন আসি ঢাকাতে ফিরে যাই—সেখানে জানায় কথা যে, ফরাসীদের সহি বাজিম হইয়া গিয়াছে। এ-অঞ্চলে ফরাসী আসি আরও অধিকতর অঞ্চলে হইয়াছে। ফৌজিক প্রতিবাদে ছাড়া আর্মেনিয়া ফেরে প্রতিবাদ জানাইল সরকার এখনও সাড়া দেয় নাই। ফরাসী প্রবন্ধে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

—

আর্মেনিয়া জানাইয়াছে যে, তাহারা পরিত্যক্ত রাজ্য আর ফিরাইয়া দিবে না। ফরাসী এজেন্ট আসী ও ফিরে পাঠানোর আসামী অন্তর্ধান-পুত্র করিবার নিমিত্ত এই ব্যাপার তুলিয়া সরকারে প্রার্থনা জানায়। মুদ্রণ ফিরিয়া যেয়ে কাজ করিয়াছে, ইহা ফেরার কথা নয় (ফেরার কথা নয়) বলিয়াছিলেন মুদ্রণকে জানান হিয়াছেন। এজেন্সের পরিচয়ন্তরের অধিক কৃষ্ণাঙ্গীদের তুলিয়া-দেয় যাই। এ সম্বন্ধে কি করা যায়, তাহা স্থির করিবার জন্য বসিবে পরিবর্তে মুদ্রণ ফরাসী অর্থনীতি পুনর্বিবাহের সহিত এবং য় সিদ্ধু বাবদুর সহিত পুনর্মেলন করেন। আলোচনায় স্থির হয় যে, অঞ্চল পরিত্যাগের যদি বিজিত্তি না করার জন্য, ফরাসী এবং বেলজিয়াম পরিত্যক্ত সেনা-দিগের হাতে দিয়ে—তাহা হইলে অর্থাৎ পাত্র হইয়া ফরাসীর মুদ্রিতে কাজ করিতে হইবে এবং জোরার জোটিয়া লওয়া চালান হইবে।

—

উহার ফরাসীদিগের উপরোক্ত আপত্তি যাহা মতের বাহা আসিবে আলোচনার সহিতে আলোচনার ঐকটী আসিবেশন হইবে। মহীয়সাব এই আলোচনার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পীকৃত হইয়াছেন।

—

মেয়ে সাবের এজেন্সী আমাদের মুদ্রণী সেবী একসঙ্গে এই সুর এবং একটী কথা এবার করিয়াছে। বিস্তার এবং আরো মুদ্রণেই ভাল আছে।

—

মুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার ঘটায় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার পরিচালন সভ্য অন্যতম রাজপ্রতিনিধির বাজেট ১৯২৩ সালে ফিরে ফেরার কার্য আলোচনা সম্বন্ধে হইয়াছেন। এজন্য ভাল যে, ব্যবস্থাপক ফিরাই ব্যাপারকার ব্যয়-সংকোচ করিবেন।

—

বোম্বাইয়ের "বা) ফেরে" পত্রে একাশ যে, সরাসরি আসি. সাহেবের ফেরে মানসিক অবসাদে ( Melancholia ) ভুগিতে হইয়াছেন।

—

ঢাকার ইনস্পেক্টার ঐপলটন সাহেব আসি অনুমতানী করিয়াছেন যে, ছাপরাল স্কুলের ছাত্রদিগকে সরকারী স্কুলে ভর্তি করিতে হইলে তাহা-দিগকে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইতে হইবে ;- অভিভাবক-গণের ফেরের অনুমোদন চরিত্রের জন্য আসিন দিতে হইবে। ঐপলটন সাহেব মুসলমী আবদের লোক ;—সুতরাং তাঁহার এই অদ্ভুত আবদের আমরা বিস্মিত হই নাই। আমরা যদি ভর্তি হওয়ার পূর্বে বেসরি ছাত্রের ফেরে, ছাত্রদের পীপলদের প্রায়শ্চিত্ত ও পুনরুদ্ধার করিতে এবং ঐপলটন সাহেবের মুষ্টিকে গরু বাসিয়া অবস্থায় অবলম্বের ব্যবস্থা করা উচিত।

( আবদবাজার )

—

শ্রীমতী সরোজিনী দেবীকে ফেরে একজন সাধারণ অভিনীর ন্যায় ব্যব-হার করা হইয়াছে। উপরিকে ফেরের পোষাকে রাখা হইয়াছে এবং দুই ইংরেজমহিলার তখন রক্ষার হইয়াছে। এই ব্যাপারে পরিচালন বিষয়ে শ্রীমতী পরিচালিকার ঘরে অবস্থানকারিণী মহিলাদের করিয়াছে, অভিযোগটির পরিচালন এক-মাত্র একজনা আসার তাহার অধিকার রহিয়াছে। শ্রীমতী ফেরের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার কর্তৃপক্ষের অভিযোগের পর, এইরূপ-তিনি ব্যবহার করিবার অধিকার হন। তাহা হইলে ঐ ব্যাপারে তাঁহাকে অধিকারী সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

বাজারা সরকারের হয় সরকার হুকুমের প্রতিনিধি ও আসী নিযুক্ত করিবার উদ্দেশে সরকার একটী বৈঠক বসাইয়া ছিলেন। বৈঠকে তার ঠিকুর মুখোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় ছিলেন—মজুমদার, আর আসে ছিলেন শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বাহিন, শ্রীযুক্ত (আর) ঘোষাল, শ্রীযুক্ত আইনজীবী শ্রীযুক্ত অধিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ও আরো। এই বৈঠকে প্রতিনিধি নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। মেজিয়ার বৈঠকের অনুপস্থিতির কারণে, সরকারের ইহাতে আপত্তি ছিল। বিচারে সভা হয়। এখন মুদ্রণ কি করেন। এই বৈঠকের মধ্যেও উহার আমাদের সুবিধা আসামী আছে বলিয়া।

—

ইংলণ্ডেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স অব ইয়র্ক একটি বন্ধ জাহাজের সুবিধা সহিত ফেরে পড়িয়াছেন। তাঁহার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা।

বাপীতটে।

শিল্পী—শ্রীপরেশচন্দ্র বসু।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

# বাসন্তী

১ম বর্ষ ] ২০শে মাঘ শনিবার ১৩২৯, ইং ৩রা ফেব্রুয়ারি। [ ২৭শ সংখ্যা

## কেন্দ্রদানি

শিক্ষার জন্য, অর্থাভাব ; স্বাস্থ্যের জন্য, তাগাই ; বিলাতে প্রদর্শনীর টাকা চাই !

কাহার দরকার কত বেশী ?
এই সব পিলে-রোগীর না সব মোটা ভোগীর ?

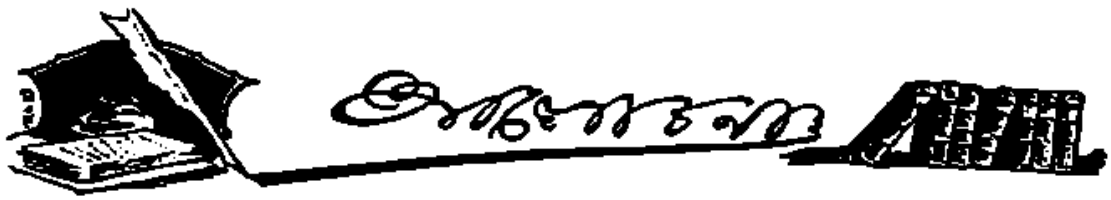


ভারতের রেলওয়েগুলি যে কেবল গাড়ীর গায়ে ও ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমেই সাদা কালার পার্থক্য লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। তাঁহারা সকল ব্যবহারেই এই বর্ণ বৈষম্যটুকু পুরা মাত্রায় বহাল রাখিয়া চলেন। এ দেশের অন্যে পুষ্ট রেলকোম্পানীগুলি এ দেশবাসীকে কিরূপ সম্মান ও অধিকার দিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। মাদুরা মাসের অডার্স রিভিউ পত্রে নিম্নরূপ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

| | বেতন | কালা |
|---|---|---|
| ষ্টেশন-মাষ্টার | ৫২৫৲ | ৮৫৲—১৫০৲ |
| সহকারী | ৩২৫৲ | ৮৫৲ |
| গার্ড | ২১০৲ | ১৩০৲ |
| টিকেট কালেক্টর | ৭৫৲ | ৪৫৲ |

এ ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও পার্থক্যটা বেশ চালোয়কমই আছে। যথা, ১২৫০৲ হইতে উর্দ্ধে ৩০০৲ টাকা বেতনের ৬১টি পদের মধ্যে ৫৭টি বরাদ্দ ইউরোপীয়ান আর ৪টি এই কালোরা পাইয়া থাকে, তাহাও আবার সর্ব্ব-নিম্ন দ্বারে (১২৫০৲ এ)

১৯০৲ হইতে ৩০০৲ বেতনের ১০৬টি পদের মধ্যে ৯৯টিতে কালা আদমীরা নিযুক্ত। কেহ ভাবিবে না যে ঐ ৯৯টিতে কালারা বেশ উচ্চ পদ পাইয়াছে—কালার দৌড় বরাতে সেটা দুরাশা!

• • •

"মাকেটার গাডিয়ানের" বিশেষ সংবাদদাতা সম্প্রতি ভারতের বর্ত্তমানকালের যুবকদিগের এক মনস্তত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—সম্প্রতি কোন এক ব্যাঙ্কে আমার সহিত একটী ছাত্রের দেখা হয়। আমি ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতি সম্বন্ধে তাহার মত জানিতে চাওয়ায় সে বলে "সত্যের সে একজন অসহযোগী, তবে অসহযোগে পয়সা নাই বলিয়া সেক্রেটারিয়েটের দ্বারে দ্বারে চাকরীর সন্ধানে ফিরিতেছে।" এক যে ভারতেরই এমন ছাত্রদেরই সহস্র সহস্র সত্য উক্তি যে ভারতবাসীর মতই তাহা না বলিলেও চলে। অর্থের অভাবে, অন্নের চিন্তায় মনুষ্যত্বের হ্রাস যে কি পরিমাণে হয় তাহা উল্লিখিত চিত্রেই পরিস্ফুট।

• • • •

সাড়ে চার লক্ষ না-হিন্দু না-মুসলমান লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া বেড়াইতেছে—সংবাদে মুসলমানগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। দিল্লীর জমায়েৎ-উল-উলেমা এই সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই সাড়ে চার লক্ষ ধর্ম্মান্তরকারী ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার পাইবেন সে সম্প্রদায় যে বলশালী হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান—এক জাতিত্বে পরিণত হইতে চাহিতেছে, এই সাড়ে চার লক্ষ লোক আজ যে সম্প্রদায়ে আসুন, একই কথা। মুসলমান সম্প্রদায় যে ইহাদের সম্বন্ধে তদন্তাদি আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আমরা আনন্দিতই হইয়াছি। সেই সঙ্গে হিন্দুর হিন্দুত্বের গলা কাটা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। আমাদের হিন্দু-নিদ্রার যে এতটুকু ব্যাঘাতও হইল না, এই আশ্চর্য্য!

• • • •

লাহোরের লরেন্স প্রতিমূর্ত্তি লইয়া গোল বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসী আজ মান-অপমানের জ্ঞানটুকু চিনিতে ও বুঝিতে শিখিতেছে, এখন আর তাহারা চোখের সামনে অপমানকর প্রতিমূর্ত্তিটি রাখিতে দিতে চাহে না। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় লরেন্স মূর্ত্তির একটী প্রতি চিত্র প্রকাশিত করিলাম। মূর্ত্তির এক হাতে তরবারী, অন্য হাতে লেখনী বর্ত্তমান। ভাবটা ভারত-বাসীকে দেখান হইতেছে যে তোমরা তরবারী আঘাতে অথবা লেখনীমুখে শাসিত হইতে চাও—ভারতবাসীর পক্ষে এই উক্তি যে কত বড় অপমানকর, দেশবাসী আজ তাহা জানিতে পারিয়াছে। তাই আজ আর তাহারা মাথা পাতিয়া এ অপমানের বোঝা বহিতে প্রস্তুত নয়। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তারা মূর্ত্তিটি সরাইতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু পাছে ইংরাজজাতির মনে আঘাত লাগে তাই তাঁহারা দেশবাসীর অপমানটা অগ্রাহ্যই করিয়া ফেলিলেন। ইংরাজের আঘাতটা আঘাত আর দেশ-

স্বাধীন মুখের কথা, কথাই নহে এই যদি তার বিচার হয় তবে কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তকে সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। কংগ্রেস সেচ্ছাসেবকগণ প্রতিমূর্তি সরাইবার ভার নিজেরাই লইয়াছেন। কল্য রেঙ্গুনারী হইতে তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিবেন। এই সম্পর্কে একটা সোলমাল না হইলেই ছিল ভাল, জানি, কিন্তু এমন করিয়া অপমান ভারতবাসী আর কতকাল নীরবে সহিবে? মানুষ যখন একান্তই নিরুপায়, অসহায়, তখনই তার নিষ্ক্রিয়তির উদ্বোধনের অবসর মিলে!

• • • •

বড়লাটের আসনখানি কি লর্ড রেডিংকে বেশ মানাইতেছে না? তাঁহার পদত্যাগ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে মিথ্যা গুজবই এত উঠিতেছে কেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই বা তার প্রতিবাদ দেখা যায় কেন? এ সমস্ত গুজবেরই জন্মস্থান বিলাতে। বিলাতের সংবাদপত্র মহল কি আজকাল গুজব সৃষ্টিতেই তার লইলেন না-কি? সম্প্রতি-ও এই ধরণের একটী গুজব বিলাত হইতে ভারতে ভাসিয়া আসিয়াছিল, ভারত-সচিব বলিয়াছেন, সংবাদটী ভিত্তিহীন ও অমূলক। ভারত সচিব মহাশয় এইসঙ্গে অনুসন্ধান করিতে পারিতেন, যা রটে কিছু সত্য বটে—এমন কথা ভিতরে নাই ত?

• • • •

তুরস্কের অবস্থা যে ঠিক কি তাহা এখন বুঝিবার কোন উপায় নাই। লুসেন বৈঠক ভাসিয়া গিয়াছে, ধমক-চমকেও তুর্কীর তরী তুলে নাই, মিটমাটের আশায় তখনই ছাই, পড়িয়াছিল, এখন যা দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় না যে গুলকেরী বাধিতে খুব বেশী বিলম্ব আছে। তুরস্কের আকাশ-বাতাস গভীর হইয়া উঠিয়াছে, ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ অন্ধকার।

• • • •

তুরস্কের মুহূর্টমণি বেশপ্রাণ মুস্তাফা কামাল পাশা তাঁর স্বর্গগতা জননীর সমাধি ক্ষেত্র দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। জননীর পবিত্র সমাধির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বীরপুত্র জননী জন্মভূমির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়াছেন যদি তুরস্ককে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় তবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবেন, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ বিজয়লাভ করিবেন ততদিন কোষমুক্ত তরবারী কোষবদ্ধ করিবেন না। মুস্তাফা কামাল বীর, দেশভক্ত, জন্মভূমির বরপুত্র, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অক্ষুণ্ণ হৌক! বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার কণ্ঠে বিজয় মাল্য পরাইয়া দিউন।

• • • •

কামাল পাশার শপথ শুনিয়া আজ আমাদের মনে পড়িতেছে, সে এক অতি পূর্ব্বকালের অতি পুরাতন একজন হিন্দু রাজার প্রতিজ্ঞার কথা। তিনিও এক ভারত-বিজয়ী অতিত প্রতাপ সম্রাটের হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে এইরূপই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যতদিন না মাতৃভূমিকে পরপ্রাস মুক্ত করিতে পারি ততদিন ভূ শয্যায় শয়ন করিব, মৃন্ময়পাত্রে আহার করিব, বিলাস-বাসন বর্জ্জন করিব! ভারতে আজ আর সে বীরের জাতি নাই, যদিও থাকে, আজ তাহারাও পরপদলেহী হইয়া আছে, আজ ভারতবাসীর অস্তিত্বে সে কিছুই নাই—বুঝি তাহার স্বটিটুকুই বুকের মাঝে জমিয়া আছে। তাই আজ কামালের কথা শুনিয়া তাহার সেই কথাই মনে পড়িতেছে, আর বুকের মাঝে তাহার হাহাকার ধ্বনিত হইতেছে।

• • • •

কামাল পাশা তুর্ক নারীদিগের স্বাধীনতা বিষয় লক্ষে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলেন, নারীদিগকে স্বাধীনতা না দিলে সমাজেরই ক্ষতি। কামালের এই যুক্তি ভারতবর্ষীয় মুসলমান সম্প্রদায় কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, সত্যই তাঁহারা আদর্শ-পুরুষ কামালের যুক্তি প্রভাব মানিয়া লইতে পারিবেন কি-না লক্ষ্য করিয়া দেখিবার বিষয়!

• • • •

কামালের ঐ উক্তি, আশা করি আমাদের হিন্দুসমাজেরও কর্ণ স্পর্শ করিবে। ইহাতে যদিও আমাদের সেই সনাতন অবরোধ প্রথা ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই, তবে হিন্দুরা যদি এই কথাটা ভাবিয়া দেখেন যে যে জাতিই জগতে উন্নতির পথে চলিয়াছে বা চলিতে চাহিতেছে তাহারাই এই অবরোধ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নারীদিগকে প্রকাশ্যে বাহির করিয়া সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গকেও বল দিতে চেষ্টা পাইয়াছে বা পাইতেছে তবে মন্দ হয় না। অন্যদেশেও নারীদিগের জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে কিন্তু সে ঘুমের ঘোরে চক্ষুমেলা! জীবনের সাড়া তার মধ্যে নাই! উহাদের জাগরণের দিনেও "আমরা অবলা, আমরা

নারী, "আমরা মানুষ" এ সব বাধা যুক্তিগুলি ছাড়িতে পারেন নাই; নারী-সমস্যা লইয়া যাঁহাদের মাথার ঘাম পায়ে করিয়া পড়িতেছে তাঁহারাও অমনি প্রলাপ বকিতেছেন—আসল জীবন যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। আজ তাঁহারা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ করিতে চাহেন—চাহিবার পূর্ব্বে নারী সে শক্তি সঞ্চয় করুন, তাঁর অধিকার আপনিই পুরুষের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনারদের মিটিংএ স্থির হইয়া গিয়াছে, বাড়ীভাড়া আইনটি তুলিয়া দিতে পারা যায়। "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রের সম্পাদক মিঃ মোল্স একটি কমিটি করিয়া সহরের বর্ত্তমান বাড়ীর অভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইতে চাহিয়াছিলেন, সভায় এ প্রস্তাবটিও না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। কর্পোরেশনে যে কয়জন বাঙ্গালী কমিশনার বিলটি উঠাইয়া দিবার পক্ষে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়াছেন তাঁহারা যে ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন না এ কথা বোধ হয় সর্ব্বজনবিদিত এবং তাঁহারা যে অনেকেই বাড়ীওয়ালা তাহাও কাহারো অজানা নাই, ভাড়া বাড়ীর আইনটি উঠিয়া গেলে যে তাঁহাদের কসাইয়ের ব্যবসা পূর্ব্বের মতই নির্ব্বিরোধে চলিতে পারে তাহাও দেশবাসীর জানা আছে। তাঁহারা যে আইনটি উঠাইয়া দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? তাঁহারা ত আর ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে আসেন নাই, এটুকু সুবিধা না করিয়া লইলে যে পাপের ভাগী হইতে হইবে।

কর্পোরেশন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে যদি সন্ধান করিয়া জানাইতে পারিতেন যে সহরে যাদের পক্ষে বাড়ীর কোন অভাব নাই, যতগুলি দরকার ঠিক ততগুলিই আছে, তাহা হইলে কোন কথা উঠিতে পারিত না। সে অনুসন্ধানের স্পৃহা বা প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় নাই। যেহেতু প্রয়োজনমত বাড়ী যদি আর নাই থাকে—তাঁহাদের ত সে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। তাঁদেরই তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমরা সাদা চোখে যাহা দেখিতেছি তাহাতে অভাব যে কিছুমাত্র কম তা ত মনে হইতেছে না। ইহারই মধ্যে কত বেশ্যা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অকূলে ভাসিয়া বেড়াইতে হইতেছে, কোথাও কোথাও দুই চারিটি পরিবার একত্রে এক বাড়ীতে অতিকষ্টে মাথা গুঁজিয়া আছেন। স্থানাভাব, পরিবার বৃদ্ধি নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কেহই নিজ নিজ "আস্তানা"টি ছাড়িতে পারিতেছেন না—এই ত সহরের অবস্থা। অথচ সহরের সহরবাসীর যাঁহারা প্রতিনিধি স্বরূপ কর্পোরেশনে কমিশনর হইয়াছেন তাঁহাদের বিচার বুদ্ধিতে স্থির হইল, সহরের সহরবাসীর ঘোর অভাবই নাই! অনর্থক এ বিলটি আর রাখিয়া কি হইবে—হাও উঠাইয়া।

ভাইসীর হাতে পুত্র সমর্পণ কথাটি কতকাল ধরিয়া যে প্রচলিত তাহা জানি না তবে ঐরূপ সমর্পণের যাহা ফল তাহা জানি। মেটিয়াবুরুজ বিলটির বিরুদ্ধে কলিকাতার বাড়ীওয়ালাদের এক কমিটি হইয়াছে। মেম্বের মধ্যে অনেকগুলি বহুমূল্য হইয়া গিয়াছে সত্য। তার মধ্যে সুরেন্দ্রবাবু ও একজন। জানিতে পাই সুরেন্দ্রনাথের তাড়াটিয়া বাড়ী আছে আরও শুনিতে পাই, বিলটিতে মন্ত্রীপ্রবরের নাকি কিছু হাত আছে। ফল যাহা হইবে তাহা না বলিলেও চলে। আর যে সব মহাত্মা এই কমিটির সভ্য কম বেশী সকলেই জমিদার, কাউন্সিলে তাঁহাদের প্রতাপও কম নয়; বাকী যাহারা ঐ সভায় সভ্য হন নাই, তাঁহারা অনেকেই হয়ত সহরের ভূম্যধিকারী নন্ অথবা তাড়াটে বাড়ী তাঁহাদের নাই। তাঁহারা যে বিলটি লইয়া মাথা ঘামাইবেন এমন মনে হয় না! যাঁহারা ঘামাইবেন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া উঠিয়াছেন—সহরে দরিদ্র অধিবাসীর প্রতি তাঁহাদের অসীম কর্ত্তব্য, দায়িত্ব যে কতদূর তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? এখন অগতির গতি গভর্ণমেণ্ট মাত্র! দেখা যাক্।

কামাল পাশার বিবাহ! কামাল পাশা যে বিবাহী বীরই শুধু তা নয়। তিনি একজন পরম প্রেমিক পুরুষ! বৃদ্ধবয়সে চিত্তটিকে প্রেমরসে সিক্ত করিয়া লইতে তিনি বৃথাতেই বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবী প্রিয়তমা সুন্দরী, বিদুষী—তিনি এখন সমানে সমানে সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনিই এই প্রণয়ী যুগলকে সুখী করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

[ শ্রীসরসীবালা বসু ]

গোড়া যাত্রার যোগ দিয়া সব চলিতে চলিতে মনে হইল, পুরুষ দিগের উদ্যোগেই মহিলারা এভাবে বাহির হইয়াছেন। একদিন যদি শুধু মহিলারা নিজেরাই উদ্যোগ করিয়া বাহির হইতে পারেন তো বেশ হয়, তখনি সে কথাটি আমেরিকা তনিনী হেমপ্রভা মজুমদার এবং মোহিনী ঘোষকে বলিলাম। তাঁহারাও দেখিলাম, একই মত। বৈঠকে নয়টির মধ্যে আমরা সমস্ত কাজ প্রতিদিন করিয়া নিজেদের আস্তানায় ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি পর্ব সারিতে মনোযোগী হইলাম। এইবার রন্ধনশালার কথা বলিব, বিভিন্ন শ্রেণীদের জন্য সারি সারি বিভিন্ন রন্ধনশালা স্থাপিত হইয়াছে। প্রকাণ্ড বৃক্ষের গায়ে স্থানে স্থানে কার্ডে বড় বড় অক্ষরে kitchen এই কথাটি লিখিয়া টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং এই রন্ধনশালা গুলি সবই কংগ্রেসের তরফ হইতে স্থাপিত. ইহার সঙ্গে কয়েকটি ভাণ্ডারীতে আমার তাঁহারা ইচ্ছা করিলেন আলাদা চুলা আলিয়া নিজেরা উদ্যোগ করিয়া রন্ধন করিয়া লইতে-ছেন।

কংগ্রেসের রন্ধনশালায় জন্য সেই বিষয়টই চিকিট বিক্রয় হইতেছে। দৈনিক দুটি আহার এক সঙ্গে লইলে মূল্য পাঁচসিকা, নতুবা একবেলার জন্য বার আনা। পাঁচ বৎসরের বয়স্ক শিশুর জন্য কিছু দিতে হয় না, তদূর্ধ্ব হইতে বার বৎসর বয়স পর্যন্ত অর্ধ মূল্য। বাঙ্গালা রন্ধন-শালার বন্দোবস্ত সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও পরিপাটী সেজন্য এখানে ভীড় ও খুব বেশী। বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী সকল জাতি যাঁহারা বাঙ্গালির রন্ধনের আস্বাদের সহিত পরিচিত তাঁহারা সকলেই এই রন্ধন শালায় অতিথি, দিন রাত্রে পাঁচ শত হইতে সহস্র লোক পর্যন্ত আহার করিতেছেন, আঠারজন বাঙ্গালি সেচ্ছা সেবকদের লইয়া দুইজন অধ্যক্ষ প্রাণপণ যত্নে এই রন্ধন শালাটির সমস্ত কার্যকর্ম অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। পাচক ব্রাহ্মণগুলি কলিকাতা ও পুরুলিয়া হইতে আসিয়াছে সকলেই বাঙ্গালি একজন মাত্র উড়িয়া। নানাবিধ তরী, তরকারী, ডাল, দাল, পাপরভাজা, চাটনি, ঘৃতপুরী, দই, চিনি, ইহাই হই-তেছে দিনের আহার, রোগের জন্য ও বাবস্থা, উপরন্তু সুচিও মিঠাই আছে, যাঁহার যাহা অভিরুচি খাইতে পারেন। পার্শ্বের অন্যান্য রন্ধন শালার কর্মীরা বাঙ্গালির এই শুচি ভোজনের আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে। সত্য কথা বলিতে গেলে বাঙ্গালির খাবার আয়োজনের বাহুল্যতা একটু বেশী রকম, নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থের ভাই, দাল তরকারী, ভাজা তার উপর একটা কিছুর টক মিষ্টি না হইলে আহার করেন না, সম্পন্ন বা ধনীর তো কথাই নাই, অন্যান্য জাতীয় যেখা আমরা সামান্য নিয়া আহার করিয়া তাহাদের শরীর বাঙ্গালি অপেক্ষা বেশী সুস্থ ও কর্মঠ বলিয়া মনে হয়। রন্ধন শালার সেচ্ছা-সেবকগুলি সকলেই অল্পবয়স্ক, তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ গুলিই গত দুইবৎসর হইতে মহাত্মা গান্ধির আহ্বানে স্কুল কলেজ ছাড়িয়া কংগ্রেস কর্মে ব্রতী হইয়াছে, অভিভাবকগণের অনুরোধের ভয়ে বাড়ীতেও তাহারা আর ফিরিয়া যায় নাই, কংগ্রেসের আবেশ মত এখানে সেখানে থাকিয়া কিছু কিছু কাজ কর্ম করিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেস তাহাদিগকে এখন একটি কর্মে নিযুক্ত রাখিতে পারে নাই, যাহাতে তাহারা তাহাদের ভবিষ্যৎকে একটু উজ্জ্বলরূপে দেখিয়া অদম্য উৎসাহে তাহার দিকে অগ্রসর হয়। ছেলেগুলির মধ্যে সে জন্য অবসাদ আসিয়াছে।

অধিকাংশদের মধ্যে দেশের প্রতি এখন একটি অনু-রাগ রহিয়াছে এবং সকলেরই মধ্যে এখন এক একটি কর্মঠ সজীব প্রাণ বিরাজ করিতেছে যাহাতে মনে হইল এই সব জীবনগুলি যদি আজ উপযুক্ত আয়োজনের অভাবে শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে দেশের দুর্ভাগ্য এবং কংগ্রেসের ন্যায় বিরাট জাতীয় অনুষ্ঠানের পক্ষে ও লজ্জার কথা।

এই সব ছেলেদের বেকারীর হাত কয়েক চালাইবার জন্য তারী ইচ্ছা। কংগ্রেস যে তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য বিস্তর টাকা তুলিয়াছিলেন, যদি সেই টাকার স্থানে স্থানে ঐ রকমের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া এই সব বেকার ছেলে-দের নিযুক্ত করিতে পারিতেন, তবে আর কর্মের অভাবে ইহাদের অবসাদগ্রস্ত হইতে হইত না। দুঃখের বিষয় অনেক নেতারা এ দিকে দৃষ্টিই নাই।

আমাদের ছেলে গুলি এই বাঙ্গালি ছেলেদের সদ্ভাবে প্রীত হইয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ছেলেরা যখন ইহাদের জিজ্ঞাসা করিল ইঁহারা যাত্রীদের সেবা করিতে ইচ্ছুক কি না? ইহারা

খুব আনন্দের সহিত তাহাতে রাজি হইয়া গেল, তবে একটি সত্য কথা যে ভলেন্টিয়ারদের ব্যাজগুলি নিজেদের অঙ্গে পরিবার বাসনাটিই হইতেছে আসল কথা, আমি যখন বলিলাম ভলেন্টিয়ার যখন হইলে, আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া যখন করিয়া এই ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের কাজ করিতে হইবে"—তাহারা আমার কাণে কাণে বলিল "আগে ব্যাজ পরি, তবে ত ?" ছেলেরা তাহা শুনিয়া হাসিয়া নিজেদের ব্যাজ খুলিয়া ইহাদের সাজাইয়া দিল, তখন ইহাদের আনন্দ আর কাজ করিবার উৎসাহ দেখে কে ? আর কংগ্রেস বসিবার দিন। বেলা বারোটার মধ্যেই সবলে প্রস্তুত হইয়া কংগ্রেস অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। আমরা ইতিমধ্যে একবার আকালি-দের ক্যাম্প ঘুরিয়া আসিলাম, এই বীর অবয়ব, বীর প্রাণ নির্ভীক কণ্ঠ জাতির কথা এই কংগ্রেস মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, মাথায় নীল রংয়ের উষ্ণীষ, পিরান ও নীল রংয়ের, হাতে তিন ইঞ্চি চওড়া লাল বা হলদে রংয়ের ব্যাজে গুরুমুখী ভাষায় কিছু লেখা, কটিবন্ধে কৃপাণ, প্রত্যেকেরই বদনমণ্ডল শুভ্র শোভিত দেখিলাম এই বীরাকৃতি পুরুষগণ প্রত্যেকেই সৌজন্য ও বিনয়ের অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কন্ভেনীয়ে অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া ইহাদিগের সতরঞ্চ তাঁবু পড়িয়াছে, গুরুগ্রন্থ সাহেবের কেওয়ান বসাইয়া ইহারা দুইবেলা নিয়মিত পূজা ভজন করিতেছেন, এবং রন্ধনশালায় গুরুর ভোগ রাঁধিয়া দুইবেলা শত শত অতিথিকে ভোজন করাইতে-ছেন। দক্ষিণা লইতেছেন না।

রন্ধনশালার চালের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা "স্বাগতম্" (Welcome.) ইহাদিগকে প্রত্যহ দুইবেলায় অন্ততঃ দুই হাজার লোককে আহার যোগাইতে হইতেছে, দাল, রুটি, একটী তরকারী আর হালুয়া ইহাই ভোগ রাঁধিয়া গুরুর নামে উৎসর্গ করিয়া পরে বিতরণ হইতেছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে এতো লোকের আহার্য্য রাঁধিবার জন্য স্বতন্ত্র পাচক প্রভৃতির ব্যবস্থা নাই, ভোরে উঠিয়া ইহারা নিজেরাই অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া সব আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। আর যথা সময়ে সভা সমিতি প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানে যোগ রাখিতেছেন। পূর্ব্ব সন্ধ্যায় ইহাদিগের শ্রীগুরু জন্মোৎসব ছিল, সেজন্য বিকালের দিকে বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সঙ্গীত, তজন পরে বক্তৃতা ইত্যাদি হইয়াছিল, সভাস্থলে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সি, আর, দাস, সরোজিনী নাইডু, হাকিম আজমল খাঁ প্রভৃতি গণ্য মান্য নেতৃবৃন্দ সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক হিন্দুমুসলমান্ও ভেলিগেট হইয়া আসিয়াছেন, কতকগুলি নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাও আসিয়াছেন, আমার সঙ্গিনী তাঁহা-দেরই একজন, ইহারা যাবতীয় রন্ধনশালার সংলগ্ন কামরায় নিজেদের আস্তানায় প্রস্তুত করিয়া লইলেন, কিন্তু কাঁচা কাঠে আগুন ধরাইতে গিয়া ইহাদের নাকাল যাহা হইল তাহা বাস্তবিকই কষ্টকর ব্যাপার, অনেকে একদিন উপবাস করিবেন এই প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। সমর্থন করিবারও লোকের অভাব হইল না, অবশ্য কংগ্রেস রন্ধনশালার ক্ষুদ্র ভোজনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার যাঁহাদের সুবিধা ছিল তাঁহারা প্রতিবাদও করিলেন। নানা অসুবিধা সহ করিয়া এই সব মহিলারাও যদি আজ এ ভাবে আসিয়া মিলিত না হইতেন, এ মহা মিলন যজ্ঞ সে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত তাহা জোর গলায় বলা যায়। ( ক্রমশঃ )

---

## ঘাটের পথে

[ শ্রীলীলা দেবী ]

মিছে কেন তোরা অতদূর যাবি'
ফুলবাড়ী ঘাটে গিয়ে কি ফল ?
তালদীঘি কাছে কাঁচা আম পাবি
সেথায় কলস ভরিব চল্ !
এ তোদের ছল মুখটিপে হাসি
আমি কি বুঝিনে—"অশোকি ফুল
নদীতে বকুল ঝ'রে প'ড়ে রাশি,"
এ লোভ আমারে দেখানো ভুল !
তাদের কলস ফুলে ফেলে এলি
এ কথা এখন মরণ তোর ?

সব মিছে কথা ছোঁয়া এত পেলি
ছলনা চতুর মুখের তোর ?
বেশ তোরা যা' না ফুলবাড়ী ঘাট
আমি ফিরি ঘরে অনেক কাজ,
আছে রাঁধা বাড়া সাঁঝ-জ্বালা পাট
গৃহ প্রেয়তার শয়ন সাজ।
যায় উপহাস অধিকে চাবনা
কাটার মতন বেঁধে তা আজ
যাবোনা যে আমি কখনো যাবোনা
ফুলবাড়ী ঘাট পড়ুক বাজ।

আমাদের একটা ধারণা আছে জাতির কর্মক্ষমতা বাড়াইবার জন্য সর্বসাধারণের মধ্যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রথা প্রবর্তন করা আবশ্যক। কিন্তু সরকের ইহা যে অপরিহার্য্য বিধানরূপে পরিণত করিতে হইবে এবং ইহা না হইলে যে জাতীয় উন্নতি আদৌ হইবে না তাহারও কোন সঙ্গত হেতু নাই। প্রায় শতাব্দী অতীত হইয়াছে জার্মেন দেশে এইরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে জার্মেনরা নানা বিভাগে উন্নতি বিধানও করিয়াছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া অন্যদেশের স্বাধীন সত্তা লোপ যে তাহাদের চেয়ে সব বিষয়ে পিছু পড়িয়া আছে তাহাও নহে। ইটালীতে এরূপ শিক্ষা প্রথার প্রচলন মোটেই ছিল না। ইংলণ্ডেও ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত এরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষার কোন আয়োজন ছিল না। ফ্রান্স তাহার সাধারণ তন্ত্রের আমলেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রথা চালাইয়াছে। আমেরিকার সাধারণ তন্ত্রে বহু বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তো যাইতেই পারে না—প্রাথমিক অন্তে উচ্চতর বিদ্যামন্দির দেখিবার সৌভাগ্য তাহাদের অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। তাই বলিয়া এসব জাতি কিছু পিছনে পড়িয়া নাই। অবশ্য শিক্ষা—সুশিক্ষা সব সময় সর্ব্ব অবস্থায় সকলের পক্ষেই ভাল কিন্তু জাতীয় জীবন যে তাহা ছাড়া চলা সম্ভব নহে এ ধারণা ভুল।

• • • •

দেশের সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে সকলেই যে বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রথম শ্রেণীর হইবে তাহা নহে। দেশে কর্ম্মী, অকর্ম্মী দুই শ্রেণীর লোক বরাবরই আছে ও থাকিবে। স্বাধীন দেশের কর্ম্ম শক্তি সম্পন্ন লোক যাহারা তাহারা জাতির ও দেশের কি অভাব আছে কি ভাবের কার্য্যে দেশের আর্থিক উন্নতি হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। সেই ভাবের কার্য্য তাঁহারা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। স্বাধীন দেশের ধন সম্পদের মধ্যেই এইরূপ কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন লোকের আবির্ভাব বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

• • •

আমাদের দেশে আমরা বড় আইন ব্যবসায়ী, বড় চিকিৎসক বহু অনেক শিক্ষিতই পাইয়াছি। কিন্তু কোন উৎকৃষ্ট আইন গ্রন্থ বা ভাল চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ বা চিকিৎসা জগতে নূতন তেমন কিছু আবিষ্কার আমরা পাই নাই। দু'একটি লোকের প্রচেষ্টায় তাঁহাদের ফুল হইতে রাসায়নিক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিছু কিছু হইতেছে বটে, তাহা আমাদের পক্ষে উল্লেখ যোগ্য অবশ্য ব্যাপার, ও নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল গোছের অবস্থা হইলেও জগতের চোখে তাহার মূল্য বেশী নহে।

• • • •

বিদেশী পেটেন্ট ঔষধ ভারতের বাজার ছাইয়া আছে। সহরের বড় বড় দেশীয় বিদেশীয় চিকিৎসকেরাও ব্যবস্থা দিতে সেই সব বিদেশীয় পেটেন্ট ঔষধের ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে দিয়া থাকেন। বিদেশীয় যে সমস্ত পেটেন্ট ঔষধ বড় বড় ডাক্তারদের ব্যবস্থায় প্রস্তুত তাঁহারা তাহাদের পরীক্ষিত দ্রব্যে নিজেদের প্রশংসার ছাপও আঁটিয়া দেন। এমন অনেক বিদেশী পেটেন্ট ঔষধের কথা জানি—যাহা এদেশে আসিবার পূর্ব্বেই এদেশীয় প্রধান প্রধান ডাক্তারেরা ডাক্তারী কাগজে ঔষধের প্রশংসা দেখিয়াই তাহা অতি কঠিন রোগেও ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমাদের দেশে সেরূপ বিশ্বস্ত কোন পেটেন্ট ঔষধ নাই। একমাত্র আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গলকেমিকেল দেশে এইরূপ ঔষধাদি প্রচলনের চেষ্টা করিতেছে। জনসাধারণেরও ক্রমে তাহার উপর আস্থা আসিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশ যত বড় রোগীর সংখ্যা ও রোগের সংখ্যা যত অধিক সে তুলনায় এরূপ এক আধটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে দেশের অভাব পূরণ হইতে পারে না। এরূপ আরও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান দেশে স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য।

• • • •

আমাদের দেশে অধিকাংশ পেটেন্ট ঔষধাদি বিক্রয়ের ব্যবসায় একরকম ঠকের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপনের বাহুল্যে ইহার প্রচার ও প্রসার হয়। মানুষ ভাল করিবার গুণ না থাকিয়া বহু অনিষ্টের গুণ থাকিলেও আমাদের দেশের লোকের বদান্যতায় এইরূপ পেটেন্টের প্রচলন যাঁহারা করেন তাঁহারা লক্ষপতি হইয়া দাঁড়ান। ইহারা অনেকেই আবার গর্ব্ব করিয়া বলেন—হাজার কয় দেশে একজন

লোকও কি সুখী নাই—তাহা থাকিলেই আমাদের ব্যবসায় চলিয়া যাইবে। হায়রে দেশ—হায়রে দেশের ব্যবসায় বুদ্ধি!

দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে শিক্ষা ও সমবেত দেশ স্বাধীন ভাবে করিতে পারিলে যত উপকার হয় অস্বাধীন কিম্বা স্বেচ্ছাচারী দেশে তাহা সম্ভব হয় না—এ সম্বন্ধে কোনও বিখ্যাত লেখক লিখিতেছেন "We may reasonably believe that there is a power in free institutions which leads Straight efficieney in the fudustries of the country and, in the long run and after many experiments and failurgs, to the efficient management of its government al concerns, and that this efficiency can be brought to a higher condition in a republic or a constitutional monarchy than in any despotic or autocratic government.

বড় বড় বিচক্ষণ রাজনীতিবিদদের মত জাতীয় কর্মদক্ষতা স্বাধীন দেশের লোকেরই বেশী হয়। স্বাধীন দেশের মধ্যেও ইঁহারা দুইটি শ্রেণী বিচার করিয়াছেন। আর্জেন্টী, অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া, তুরস্ককে ইহারা এক শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, হল্যাণ্ড স্কানডেনেভিয়া প্রভৃতি দেশকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। এক দেশ যেখায় লোক মতের প্রাধান্য ও প্রভাব নাই অপর দেশ যেখায় লোক মতই সব যেখায় লোকসঙ্ঘেরই প্রভাব সর্ব্বকার্য্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের মতে শেষোক্ত দেশ সমূহের লোকের কর্মক্ষমতাই বেশী হয়। নূতন নূতন আবিষ্কারে নূতন নূতন তথ্য উদ্ভাবনে শেষোক্ত দেশ সমূহই অগ্রণী হইতে পারে।

স্বেচ্ছাচারের দেশে—লোকমত যে দেশে নিয়ন্ত্রিত হয় সে দেশের প্রতিভা বিকসিত হইতে পারে না। আমাদিগের এই ধারণার কয়েকটি প্রমাণ আমরা ক্রমে দেখাইব।

বাষ্পকে কার্য্যকরী করিয়া তাহাদ্বারা যানবিমান হিসাবে গমনাগমন করার প্রথম প্রবর্ত্তন ইংরেজ ও আমেরিকানরাই করিয়াছিল। রাসায়নিক আবিষ্কার সমূহের প্রাথমিক ভিত্তি ইংরেজ ও ফরাসী রসায়নবিদেরাই করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসীর যন্ত্রবিদ্যার দ্বারা কারখানা প্রথার উন্নতি সাধনও ইংরেজরাই প্রথমে করেন পরে আমেরিকান ও অন্যান্য জাতিরাও করিয়াছে। টেলিগ্রাফ টেলিফোন এবং অন্যান্য কার্য্যকরী যন্ত্র প্রভৃতির উদ্ভাবনে আমেরিকানরাই প্রথম উদ্যোগী। জাতির কর্ম জীবন, বাণিজ্যিক জীবন, আর্থিক জীবনের ধারা তো এই সমস্ত যন্ত্র প্রভাবে অনেক উন্নত হইয়াছেই তাহার উপর পারিবারিক জীবন ও অবসর জীবনেও ইহা অনেক নূতন সুখময় বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়াছে।

তারহীন টেলিগ্রাফের আবিষ্কার ও ব্যবহার একজন ইটালীয়ানের দ্বারাই হয়। আমেরিকানরাই বিদ্যুদ্যন্ত্রের আবিষ্কার ও তাহাকে কর্ম্মে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা প্রথমে করেন। বিস্ফোরক কার্য্যে লাগানোর ব্যবস্থা ফরাসীই প্রথমে করে। গ্যাসোলিন মোটর ও অটোমোবাইলের উন্নতি বিধান আমেরিকান, ফরাসী ও ইংরেজরাই করেন।

ফিজমোনিয়ান ইনষ্টিটুটের অধ্যাপক লাংলে প্রথমে বায়ুর চেয়ে ভারী এরোপ্লেন আবিষ্কার করেন পরে রাইট নামক আমেরিকান ভ্রাতৃদ্বয় ইহাকে ব্যবহার উপযোগী করেন।

সেলাইর কল, টাইপরাইটার ছুতী তৈরীর কল, এবং কটনজিন প্রভৃতি আমেরিকানদেরই আবিষ্কার। রোটারী প্রেস দ্রুত সংবাদ ছাপাইবার জন্য যাহার ব্যবহার অপরিহার্য্য তাহার উদ্ভব যাহা হইতে তাহাও আমেরিকানদেরই আবিষ্কার, তাহারাই প্রথমে লিনোটাইপ ও মনোটাইপ নির্ম্মাণ করে ও ইংরেজরা প্রথম ছেঁড়া নট তৈরী করে।

ঔষধ হিসাবে রাসায়নিক আবিষ্কার আমেরিকানরাই প্রথম Anaesthisia আবিষ্কার ও তাহার ব্যবহার করেন। লিষ্টার নামক বৃটিশ প্রথা Asepsis আবিষ্কার করেন। টাইফয়েডের টীকা এও বৃটিশ আবিষ্কার। রবারের ব্যবহার ও কার্য্যকরী হিসাবে তাহার প্রচলন আমেরিকানরাই করে।

বড় বড় ব্যবসায়ের ভিত্তি পত্তন এও লোকমত যে দেশে প্রবল সেই দেশ হইতেই হইয়াছে। ওলেন সাহেবের আজ যাহা সহস্র বিঘ পরিব্যাপ্ত করিয়া বেড়াইতেছে ইহা বৃটিশ কারখানা প্রসূত। ফুলর্ড হইতে পেট্রোলিয়াম আহরণ ও রফতা করিতে তাহার বিস্তার ইহা আমেরিকারই কৃতিত্ব। ষ্টীল কর্পোরেশনের মত বিরাট ট্রাষ্ট গঠন করিবার কল্পনা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা এক মাত্র যুক্ত সাম্রাজ্যেই সম্ভব। এই সব ব্যবসায় সংগঠিত হওয়াই সেই সব দেশের স্বাধীন বিদ্যালয় ও স্বাধীন মতোন্নতি সম্পন্ন লোকের উদ্ভবও যথেষ্ট সম্ভব হইয়াছে।

# । তরবারী অথবা লেখনী ।

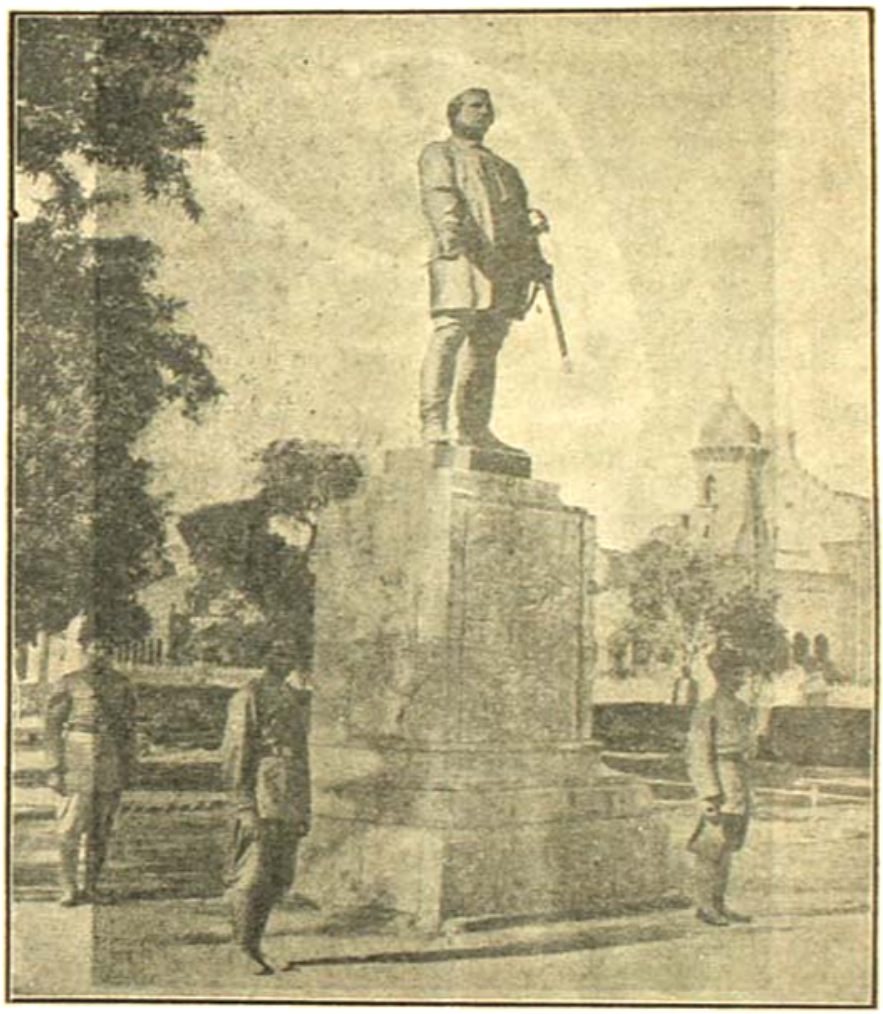

এই সেই প্রতিমূর্ত্তি—সরেন্দ্র প্রতিমূর্ত্তি—যে বীরপুঙ্গবের এক হাতে মুক্ত তরবারী অন্য হাতে লেখনী বিরাজ করিতেছে। দম্ভভরে যিনি ভারতবাসীকে [illegible] যে তোমরা তরবারী মুখে অথবা লেখনী-অগ্রে শাসিত হইতে [illegible]

# নর্ত্তকী-রাণী অ্যানা প্যাভলোভা।

কয়েকদিন পূর্ব্বে নর্ত্তকী-রাণী অ্যানা প্যাভলোভা "এম্পায়ারে" নৃত্য-লীলা দেখাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে ইনিই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী বলিয়া পরিচিত ও আদৃত। আমরা এই সুন্দরীশিরোমণির নৃত্য-লীলা দেখিয়াছি। ইয়ুরোপীয় সম্প্রদায়ে একটি মন্তব্য প্রচলিত আছে যে "অ্যানা প্যাভলোভার নাচ না দেখা আর জীবন্মৃত হইয়া থাকা দুই-ই সমান";—কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, ইহাই আমরা বলিতে পারি।

# স্মৃতি চিহ্ন

[ শ্রীগিরিবালা দেবী ]

অপরাহ্নে শয়ন কক্ষে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিতেছিলাম। ঝি কহিল "বাবু তোমায় ডাকছেন দিদিমণি।" চিরুণী খানা হাতে লইয়া বাবার নিকটে যাইতেই তিনি কহিলেন "তোর দিদিমা কাশী থেকে বাড়ী এসে—তোকে নিয়ে যেতে চিঠি লিখেছেন কলি, এই তাঁর চিঠি-পড়ে দেখ।" বাবার হস্ত হইতে চিঠি খানি লইয়া এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিলাম। কিন্তু দিদিমার আহ্বানে মনটা আমার প্রসন্ন হইল না। আমার উল্লাস-ভরা হৃদয় কি এক অজ্ঞাবিত আশঙ্কায় অকস্মাৎ ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিল। দিদিমার উপর খুব রাগ হইতে লাগিল—তাঁহার যেন তিন কাল কাটিয়া গিয়াছে, কাশীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণপুরের জঙ্গলে মরিবার সাধ হইয়াছে। কিন্তু আমাকে আবার সেই বন্য জন্তুর আবাস স্থলে টানিয়া লইবার জন্য এত ব্যাকুলতা কেন বাপু!

আমাকে নীরবে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বাবা আস্তে আস্তে কহিলেন "চুপ করে রইলি কেন কলি? চল-মা, দেশে ফিরে যাই। আজ দশ বছর দেশছাড়া হয়ে তোর দিদি-মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি; নিজেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাইনি।" আবেগে বাবার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। একটু থামিয়া পুনরায় করিতে লাগিলেন "তোর মাকে হারিয়ে—তোকে নিয়ে যখন এখানে এসেছিলাম, তুই তখন পাঁচ বছরের। তারপর আর বাড়ী যাইনি, কেন জানিস তো? তার—তোর মার শত সহস্র চিহ্ন সেখানে যেলেই দেখতে পাব বলেই যাইনি। বাড়ী, ঘর ত্যাগ ক'রে মা কাশী ছিলেন বলে যাবার দরকারও হয়নি। এখন তুই বড় হয়েছিস, ইচ্ছত দেখে দিতে চাচ্ছি; আমারো অবসর নেবার সময় হয়েছে। এখন ঘরের ছেলের ঘরে ফেরাই ভাল।" বাবার কথাগুলির মধ্যে কত বর্ণাতীত গভীর ব্যথা যে লুক্কায়িত ছিল, সেটা বুঝিতে আমার বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইল না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টায় মনোভাব গোপন করিয়া হাসি মুখেই কহিলাম "এখানে থেকে আর দরকার কি বাবা? দিদিমা যখন ফিরে এসেছেন, তখন তাঁর কাছেই যাই চলুন। আমাদের পেয়ে তিনিও খুসী হবেন; আমরাও শান্তি পাব।" বাবা প্রেম দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন "তা হ'লে শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাবার আয়োজন কর মা। আমার আর একদিনো এখানে থাকতে ইচ্ছা নেই।" বাবার কথায় তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে পারিলাম না। এখানে থাকিতে বাবার আর একদিনও ইচ্ছা নাই বটে, কিন্তু বাবার মেয়েটির ইচ্ছা যে তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এত বড় মিথ্যাটাকে গোপন রাখিব কি করিয়া! অন্তরের উদ্বেগ অন্তঃকরণে লুকাইয়া বাবার সহিত ছলনা করিতে লজ্জা হইতেছিল। কিন্তু যেন সাহসে আমার ধারণাটা তাঁহাকে জানাইয়া ব্যথা দিতেও মন সরিল না।

বাল্যের মধুর স্বপ্নময় স্মৃতি, পল্লীর চিত্র বিমোহন দৃশ্যাবলী, স্নেহময়ী দিদিমার মমতার অনাবিল উচ্ছ্বাস, শরতের লঘু মেঘ রাশির মত আমার অন্তরাকাশ হইতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই আমার উচ্ছ্বসিত হৃদয়টি সেই অপরিচিত স্থানে যাইবার সম্ভাবনায় নিতান্তই বিমুখ হইয়া উঠিল। সুরম্য অট্টালিকা, বিদ্যুৎপাখা, বিদ্যুত বাতি, চারিদিকে বিলাসের বিপুল দ্রব্য সম্ভার; সর্বোপরি যেখন স্কুলের সহপাঠিনীদের হাস্য কৌতুক সব আমার মনের মধ্যে একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ভয় হইতেছিল এসব ফেলিয়া যেখানে যাইব সেখানে কি, এমন সোজা সৌন্দর্য্য আছে? এমনি করিয়া হাতের মাথার উপর নারিকেল বৃক্ষের অন্তরালে সূর্য্যোদয় হইয়া সূর্য্যরশ্মি কখনো উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিয়া উঠে কখনো বা ম্লান আভায় নিবিয়া যায়? মুক্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না সে দেশে কি গৃহের ভিতর লুটাইয়া পড়ে? সন্ধ্যার প্রাক্কালে টবের পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া সেখানে কি সান্ধ্য সমীরণকে সুগন্ধটুকু বিলাইয়া দেয়? নীরব নিভৃত নিশীথে পিঞ্জরের কোকিল অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধ জাগ্রত মানবের কর্ণে সুধার ধারা বর্ষণ করে? না-না, সেখানে ইহার কিছুই নাই, সে বুঝি একটি ভেপান্তরের মাঠ,—মাঠের আশে পাশে কেবল বন আর জঙ্গল।

আমার বিমনাভাব লক্ষ্য করিয়া বাবা কহিলেন

"যেতে যেতে তোর বুঝি তাল লাগ্‌বে না কলি? তাহ'লে মাকে এখানেই নিয়ে আসি, নাই বা গেলাম সেখানে।" "না, বাবা, যেতেই হবে। এখানে আর থাক্‌ছি না। সেখানে গেলেই আমার মন ভাল হ'য়ে যাবে।" বাবার বদনে আনন্দ জ্যোতি বিকশিত হইল, তিনি স্নেহের সহিত আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কয়েকদিন পর কলিকাতায় বাসা উঠাইয়া দিয়া ঠিনিলেন্স কতক বিক্রি করিয়া, কতক বাঁধিয়া এক মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আমরা দেশে রওনা হইলাম।

রাত্রার গাড়ীর কোণে বসিয়া আমি কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পথের দুইধারে বন বন, বাঁশঝাড়ের বিচিত্র আন্দোলন, পানাপুকুর, ভগ্ন দেবালয় কিছুতেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল না। সঙ্গিনী-দের স্নেহ ভালবাসা, দাস দাসীদের বিনয় ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। চোখের পাতা দুটি বার বার ভিজিয়া যাইতেছিল। গৃহের প্রত্যেক দ্রব্য, প্রতিদিনের ক্ষুদ্র কাজগুলি পর্য্যন্ত আমার নিকটে রাজমান হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই রাত্রার পাশের ছোট বাড়ীটি প্রভাতের চির পরিচিত হাস্যময় রৌদ্রে ভরিয়া যাইবে, পোষা পায়রাগুলি ডাকিয়া ডাকিয়া আহার পাইবে না, বিড়ালটা ব্যাকুল হইয়া আমায় খুঁজিয়া বেড়াইবে। দশ বছরের মধ্যে একটি রাত্রিও যে অশ্রুর অভিবাহিত করে নাই, এ রজনী তাহার কোনখানে কোন্ অপরিচিত স্থানে প্রভাত হইবে?

বিগত দিনের নানারূপ সুখ দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া বাবার মনটাও ভাল ছিল না। বীর গম্ভীর বদনে তিনি বাহিরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যোগাবিষ্টের মত বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে—পরিবর্ত্তনশীল চল-চিত্রের ন্যায় কত ষ্টেশন, কত বাত্রী চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পর বাবা মৃদুস্বরে কহিলেন "রাত বারোটা বেজে গেছে, কলি, একটু ঘুমো, রাত্রায় আমাদের নামা ওঠার হাঙ্গামা নেই,—ভোরবেলা নাগরপুর গিয়ে একেবারেই নাম্‌তে হ'বে।"

২

প্রভাতে আমরা যখন বাড়ী পৌঁছিলাম তখন তরুণী-উষা সুবর্ণাঞ্চল সোনাটা সরাইয়া হাসিমুখে দেখা দিতেছিল। বিহগেরা মুক্তে মুক্তে কলরব তুলিয়াছিল। বন পরিবৃত বৃক্ষশীর্ষ মৃদু তপন রশ্মিপাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। নবীন বেশের নব নব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আমার চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

কয়েকখানি মৃন্ময় কুটীর। বেড়া পরিষ্কার অঙ্গণে গোত্রে পিঠ দিয়া দিদিমা বড়ি দিতে ছিলেন, তাঁহারই অদূরে কোমল দুর্ব্বাদলের উপর একটি পুষ্পিত শেফালী গাছ হইতে ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া সে স্থানটিকে ফুলে ফুলে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। গোয়ালে দাঁড়াইয়া কাল রঙের গাভীটি পরম স্নেহের সহিত তার রাঙ্গা বাছুরটির গা চাটিয়া দিতেছিল।

সহসা আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া দিদিমা আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন "তোরা এলেচিসরে, তোরা এসেচিস।" দিদিমার অবয়ব আমার একটুও স্মরণ ছিলনা। কিন্তু আজ এক মুহূর্ত্তে দৃষ্টি পাতেই আমি তাঁহাকে আমার অতি আপনার চির পরিচিতের মত চিনিয়া ফেলিলাম। যে স্নেহ মমতা মাখা বুকের অমৃত পান করিয়া বাবা মানুষ হইয়াছিলেন, যে বুকে মাথা রাখিয়া, যে মুখের পানে চাহিয়া মা চির-প্রাণ অভিভূত হইয়াছিলেন সেই শীষুষ পূরিত বক্ষ পুণ্য প্রভায় মণ্ডিত বদন মণ্ডল দেখি আমার বিস্মৃত হইবার? এমন ভাগ্য সোণার সমুজ্জ্বল দেশ, কত আত্মত্যাগী মহাপুরুষের পদ-ধূলিতে পবিত্রতম গৃহাঙ্গণ, এখানে আসিতে আমার কতই না ভয় কত সংশয় হইয়াছিল, এমন মূঢ় আমি!

দীর্ঘ দিনের পর আমাদের দেশে ফেরার সংবাদটা নিমেষের মধ্যেই গ্রামে প্রচার হইয়া গেল। প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীগণ বাবাকে ও আমাকে দেখিতে আসিলেন কুশলপ্রশ্ন, প্রণাম আশীর্ব্বাদের ধুম পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বিবাহের আলোচনা আরম্ভ হইল। দিদিমা আমাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আমার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন "তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর ভাই, কলির যেন এইবার বিয়ের ফুল ফোটে। তীর্থের যারা ত্যাগ করে ওর বিয়ের জন্যেই আমি দেশে ফিরেচি। বাপ বেটা ছেলে, মা নেই, আমি না করলে কে করবে বল?" "আহা, তাকি আমায় বল্‌তে, তুমি এতকাল দেশে থাক্‌লে কোন্ কালে কলির বিয়ে হ'য়ে যেত

ব্যাটার মা হত। এবার যখন এসে পড়েছে আর দেরী করো না, সাবুনের যাব যাবেই দুহাত এক করে দাও।" বলিয়া পাড়ার ঠানদিদিরা দিদিমার নিকটে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিলেন।

সমস্ত দিনটা গ্রামবাসিনীদের সরল আলাপন শুনিয়া, দিদিমার হাতের রান্না খাইয়া, রান্না করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় পুলকোচ্ছ্বাসে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা দিদিমা কহিলেন "আমি নদীতে গা ধুতে যাচ্ছি তুই যাবি নাকি দিদি?—আমি বলি কি, অজানের দেখ বেলা ঠাওা পড়েছে, তোর গা ধুয়ে কাজ নেই; এমনি বেড়িয়ে আয়বি চল।" দিদিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাঁকা বাঁকা রাস্তায় নদীতীরে আসিয়া হৃদয় আমার মুগ্ধ হইয়া গেল। গ্রামের ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আমার নয়নে স্বর্গের সোতা ফুটাইয়া তুলিল। নদীর স্বচ্ছসলিলে পা ডুবাইয়া পরপারের শুভ্র বালুকা স্তূপের প্রান্ত সীমায় শ্যাম অরণ্যানীর ঘন ছায়ার পানে আমি অনিমেষে চাহিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ মলিন হইয়া আসিল।—ওপারের বনের ছায়া নদী গর্ভে প্রতিফলিত হইয়া বৃদ্ধ সমীরণে কখনো কাঁপিতে লাগিল, কখনো বা নড়িয়া উঠিল। ছোট বড় অগণিত নৌকা সারা পাল তুলিয়া দাঁড়ের আঘাতে জলরাশি আন্দোলিত করিয়া কোথা হইতে আসিয়া কোথায় যেন ভাসিয়া চলিল। চারি দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল, বন ফুলের মিষ্ট গন্ধে বাতাস উতলা হইয়া উঠিল। অনাবৃত অবারিত আকাশতলে দাঁড়াইয়া তটিনীর কলোল গীতি শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয় কোন অজানিতের উদ্দেশে ব্যথিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পর গা মুছিয়া, সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া দিদিমা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "চুপটি ক'রে কি ভাবছিস বলি? কল্‌কাতার কথা মনে হ'লে মনটা বুঝি খারাপ হ'য়েছে রে?" কহিলাম "না দিদিমা, একেবারেই না। তোমাদের দেশটা এইদিনেই আমার খুব ভাল লাগছে; মনে হচ্ছে সমস্ত জীবন এইখানেই কাটাই।" দিদিমা মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন "আমিও তোকে সেই আশীর্ব্বাদ করচি দিদি, এই গাঁয়ের বুকে চিরসুখে, চির শান্তিতে তোর জীবন যেন কেটে যায়।"

(৩)

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর ঘরের মধ্য হইতেই শুনিলাম কে যেন বাহিরে দিদিমার সহিত গল্প করিতেছে। গলাটা পুরুষের; কিন্তু আমার অপরিচিত কণ্ঠস্বর। এ কয়েক দিন অনাগত অভ্যাগতদের আগমন বিরহ হইয়া উঠিয়াছিলাম। সকাল বেলাই কোনো লোকের মুখ দেখিয়া ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু কুতূহল মুদ্রিত নয়নে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া যখন উঠিলাম, তখন বেলা হইয়াছে; পূবের জান্‌লা দিয়া রৌদ্র তখনি হইতে অঙ্গনে লুটাইয়া পড়িয়াছে। দিদিমা পুজার ফুল তুলিয়া বারান্দায় চরকা কাটিতে বসিয়াছেন। তাঁহার নিকটে মাদুরে বসিয়া বাবা সংবাদ পত্র পড়িতেছেন। দিদিমার কাছে দুইটি সন্দেশের ভাঙ্গা টুকরা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানেও কলি ঢুকেছে না-কি দিদিমা?" দিদিমা কহিলেন, "রাত্রের বেলা এ-গুলো দিয়ে গেল। এসব তার আমলের সুখ্যাতি। এখানকার লোকেরা তো পয়সা খরচ করে সহরে থেকে কলি এনে খেতে পারে না; কলির পুটও সম্বন্ধের জানা নেই। তাই বলব, কত ছেলে ধরে বাজারে কলি কলিয়ে সকলের ঘরে ঘরে বিলিয়ে দেছে। গ্রামের জন্যেই ওর সব করা, নিজে তো আপনা কোলা বামুন। তুই বুঝি রসগুল্লে খেয়িস্‌নি কলি?" আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, রাত্রের মধ্যে কেহই এগুলির আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। বাবা বাহির হইতে মুখ তুলিয়া দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি নাকি খুবই ভাল, একপক্ষে ওর খুব সুখ্যাতি করে, আমার যারা কুচরিত্র তারাই কেউ কেউ গুণ্ডা বলেও অপবাদ দেয়। ভাল মানুষে দেবতা বলে পূজো করে। অমন ছেলে গাঁয়ে থাকা গাঁয়ের যে কত সৌভাগ্য, তা দুই দুদিনেই বুঝতে পারবি মণি।" বাবা একটু চিন্তার পর করিলেন "ওর আর কে, আছে মা-কি?" "কে আর থাকবে, একটি বোন মাত্র আছে। সেবার কলেরায় বাপ মা মারা যাবার পর মলয় রাজগাঁই থেকে বাড়ী ফিরে আসে। সেবার ওর 'এলে' না-দি, বড় সেই পরীক্ষা দেবার কথা ছিল, কিন্তু বাপ মা মরা, ছোট বোনটাকে ফেলে আর বিদেশে যাওয়া হ'ল না। সেই অবধি গাঁয়ে থেকে গাঁয়ের কত ভাল কাজ করেছে যে তার সীমাই হয় না। ওর কাজ লোক চক্ষুর অন্তরালে, বড় গোপনে, কেউ জানতেই পায় না। আর বছর বোনটাকেও বিয়ে

দিয়েছে, এখন পুরোণ চাকর ছিদামকে নিয়েই মনমরা সংসার। ছেলেটি বড় ভাল—বড় মহৎ।"

দিদিমার কথায় আমি হাসি গোপন করিতে পারিলাম না। আহা, দিদিমা বেচারী নেহাৎ সেকালে জন্মিয়াছিলেন; একালের অভূতনীয় আত্মত্যাগ, অমর্দনীয় মহত্ত্বের মর্ম্ম বোঝেন না। একটি গ্রাম্য যুবক বাগানের কলি বিলাইয়া দিয়া ছয় মাসে সর্দারী করিয়া দিদিমার মনোমন্দিরের উচ্চাসন দখল করিয়াছে। ইহারই প্রেমে বাঁধা পড়া প্রাণের পক্ষে গৌরবময় মনে হইতেছে। আরো যেন কত কি শুনিতে হইবে। নাম আবার মনমরা, কানা-ছেলের নাম পদ্মলোচন। যেখানে পটু, পটোল, বড়জোর 'ফটাধর' ছেলেদের নামকরণ হয়, সেইখানকার একটি মূর্খ (মূর্খ নয় তো কি! সে বিশ্ব বিদ্যালয়ের আই, এ পরীক্ষার ত্রিসীমা পর্য্যন্ত পার হয় নাই) ছেলের নাম মনমরা, করিমের পূর্ণ বিকাশ! আমার পানে চাহিয়া দিদিমা কহিলেন "হাসচিস কেন, কলি?" "তোমাদের পাড়াগাঁয়ে মনমরা নাম থাকে, তাই শুনে হাসচি দিদিমা!" "তাতে হাসির কিছু নেই দিদি, মেয়েদের মেয়ের নাম কলি, সেখানে ছেলের নাম মনমরা না হলে চলবে কেন?" দিদিমা সেকেলে মানুষ, কিন্তু তাঁর কথার ধাঁধুনী শুনিয়া লজ্জায় সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

সেদিন পৌষের শিশির সিক্ত কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে পাতলা গায়ে জড়াইয়া রাত্রের আশ্রয় ছাড়িয়া বাগানে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় দেখিতে ছিলাম। তখন কুজ্ঝটিকা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। আম গাছের ঘন বিন্যস্ত মুকুল সুবাস বিলাইয়া নিজেদের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছিল। আর বাগানের অদূরে নদীতীরে ও বনপথ নীরব নিস্তব্ধ,—সমস্তের সংসার অপ্রশস্ত পথের বাঁকে দুই একটী ধূসর বস্ত্র মাটির কলসীকক্ষে জল লইতে আসিতেছিল। ক্রমে নদীর পরপারে বাঁশঝোপের উপর একখানি সুবর্ণ থালার ন্যায় সূর্য্যদেব উদয় হইলেন। রাখাল বালকেরা গায়ে হাঁটুর চেয়ে চাদর জড়াইয়া গরু পশ্চাৎ পশ্চাৎ "সোনা রাজের" গান গাহিতে গাহিতে দিগন্ত প্রসারিত মাঠের পানে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হঠাৎ আমার অল্প দূরে কাশফুলবনের অন্তরালে "ঘুপ" করিয়া একটী শব্দ হইল। নদীর পাড় ভাঙ্গিয়াছে ভাবিয়া আমি নদীকূলে উপনীত হইয়া উঁকিঝুঁকি দৈনিক্রিয়ার—একটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের যুবক পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে এই নিদারুণ শীতে অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিতেছে। আমি বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। কিয়ৎকাল পরে যুবক একটী মাছ হাতে করিয়া কূলে আসিয়া উঠিলেন। বিনা আয়াসে, বিনা চেষ্টায় কেহ যে জল হইতে মাছ ধরিতে পারে এ ধারণা আমার আদৌ ছিল না। আমি নিজের অজ্ঞাতসারে অভিভূতের মত বলিয়া ফেলিলাম "আপনারা সাতার দিয়ে জল থেকে মাছ ধরতে পারেন, বড় আশ্চর্য্য।" যুবক প্রাণখোলা উচ্চহাসির মধুর মূর্চ্ছনায় নিভৃত তটিনীতীর মুখরিত করিয়া উত্তর করিলেন "জলের ভিতর কেউ কি শুধু শুধু মাছ ধরতে পারে? দেখ্‌তে পান না, মাছটা আমার 'হিপের' সুতো কেটে নিয়ে পালিয়েছিল, তাই ধরতে পেরেচি।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া নতচক্ষু তুলিতেই দেখিলাম তিনি আগ্রহভরা কোমল নয়ন দুইটি মেলিয়া আমাকেই দেখিতেছেন। আমার যাহা দেখিবার আমি কিন্তু তাহা দেখিয়া লইয়াছিলাম। তাঁহার বয়স বোধহয় কুড়ি একুশ বছরের বেশী হইবে না। নির্ম্মল বদনে নবীন রোমাবলীর সবে আভাস দিয়াছে। গায়ের বর্ণ তামা, নব বর্ষার মেঘের মত দীপ্তিভরা, নবীন দুর্ব্বাদলের মতই মনোহর। বিশাল চক্ষু; প্রসন্ন হাস্যময় ওষ্ঠাধর, অতি সুন্দর সৌকুমার্য্যে পরিপূর্ণ। প্রশস্ত বক্ষ, সুদৃঢ় বলিষ্ঠ অবয়ব। ভাল প্রতিভার প্রদীপ্ত ললাট-বিলম্বিত অবসিক্ত চুলগুলি বায়ুস্তরে ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছিল। তাঁহার পরিধানে খদ্দর, অনাবৃত দেহটি সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য বর্জ্জিত।

আমি এ অপরিচিত যুবকটির সহিত সরল ভাবে কথা কহিতে আমার কেমন কুণ্ঠা হইতে লাগিল। এ কুণ্ঠা এ সঙ্কোচ পূর্ব্বে ছিল না। এ যে কিসের সংশয়, দিধা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। একবার উপযাচিকা হইয়া কথা বলিবার অপরাধে আবার কথা বলিতে হইল। আস্তেআস্তে কহিলাম "ভিজে কাপড়ে আপনার সর্দ্দি কষ্ট হচ্চে না? আপনার বাড়ী বুঝি খুব দূরে?" "না, খুব কাছে। ভিজে কাপড়ে কিছু কষ্ট হচ্চে না আমার, এটা অভ্যাস আছে।" চলুন মাছটা আপনাদের ওখানেই দিয়ে আসি, মনমরাটার এমন মনে থেকে ভোলা মাছ তো খেতে পান না!" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। সাশ্চর্য্যে, সানন্দে, আমি তাঁহার সঙ্গ লইলাম।

অনকাল পর তিনি আমাদের বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাকিলেন "দিদিমা, ওদিদিমা, কোথায় তুমি, একটা মাছ ধরে এনেচি।" দিদিমা হাতের কাজ ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া অনুযোগের স্বরে কহিলেন "আজও এই হিতের মধ্যে মাছ ধরতে নেমেছিলি মলয়? ব্যারামে না ভুগলে তোর আক্কেল হবে না।" মাছ রেখে স্নিগ্ধ গা মুছে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বসল। মাছ মাটীতে নামাইয়া হাত ধুইয়া দিদিমা প্রসন্ন হাস্যমুখে তিনি গা মুছিতে লাগিলেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই মলয়, যেমন মিষ্টি নামটি, তেমনি কোমল মধুর প্রকৃতি। ইহার বিষয়ে একদিন কত ভুলকথাই না ভাবিয়াছি! মনে মনে অনুশোচনা জন্মিয়া উঠিল। [ আগামীবারে সমাপ্য ]

# নিরর্থক।

[ শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। ]

( ১ )

কেন দিয়াছিলে বিধি প্রেমে,
ওগো চিরদুখী মানবেরে;
হায়! সরল—পরাণ—হেমে,
যদি দুদিনেই লবে কেড়ে।

( ২ )

কেন দিয়াছিলে প্রভু সুখে,
মধু, অমিয়, শীতল রাশি;
যদি সুখ দিবে পুনঃ দুখে,
নিঠুরের মত আসি।

( ৩ )

কেন গড়েছিলে বিধি নরে,
শত বাসনা কামনা দিয়ে;
যদি নিতে যায় ক্ষণ পরে,
হায়! না হ'তে তৃপ্ত দিয়ে।

( ৪ )

কেন গড়েছিলে প্রভু মায়া,
যদি ছিঁড়ে যায় তার বাঁধ;
কেন গড়েছিলে প্রভু ছায়া,
যদি র'বে যায় অবসাদ।

( ৫ )

কেন নিরমিলে প্রভু স্মৃতি,
যদি তাতে দিবে জ্বালা;
কেন নিরমিলে প্রভু ক্ষিতি,
যদি নরকের বিষ ঢালা!

( ৬ )

কেন, এত লীলা তব প্রভু;
ওগো দেখাইছ মানবেরে;
হায়! দিওনাকো কিছু কভু,
যদি দুদিনেই লবে কেড়ে।

# ধনবতী মহিলা সমাজ।

[ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ]

ধনবতী মহিলাদিগের মধ্যে কুমারী হেলেন গোল্ডের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইহার সমস্ত সম্পত্তিই ইনি দানে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহার পিতা মৃত্যুকালে অপরাপর সম্পত্তি ও নগদে ৬,০০০,০০০ পাউণ্ড কন্যাকে দিয়া যান। কন্যা তাহা সৎকার্য্যেই ব্যয় করিতেছেন।

শোনা যায় মিস্ গোল্ড বিবাহের একজন ভয়ানক বিরুদ্ধ বাদী ছিলেন। একদিন তিনি একটি বালিকাকে মিনার্ভার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। বালিকা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'এ কি বিবাহিতা?' মেরী গোল্ড হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন 'না—না ইনি বিবাহিতা নন—ইনি হচ্ছেন জ্ঞানের রাণী।' এমন যে বিবাহের বিরুদ্ধবাদিনী মহিলা, তিনি অবশেষে একদিন হঠাৎ ব্যালক্ টমাস নামক এক ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিয়া বসিলেন।

ডাচেস্ অব রকসবারো

ডাচেস্‌অব রকসবারো ইহারও সম্পত্তির পরিমাণ ৫,০০০,০০০। ১৯০৩ খৃঃ রকসবারোর ডিউকের সঙ্গে ইহার বিবাহ হয়। ইহার বেলজুয়ার পারিপাট্য ও মণি-মুক্তার গহনার ঝাঁক খুব বেশী।

শ্রীমতী আলি ভেরেন্যান ওয়াকার পিতার মৃত্যুকালে ২৫,০০০,০০০ পাউণ্ড পাইয়াছিলেন। ইহার পিতা বাল্যকালেই ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গিয়া তথায় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে থাকেন। এই ব্যবসায়েই প্রচুর অর্থাগম হয়। শ্রীমতী অনন্যসাধারণের সাহায্যে মুক্ত হস্ত।

গ্রেট ব্রুটেনের সুন্দরীকুলের মধ্যে বার্নিডেল অব গ্র্যাহামেরই সব চেয়ে ধনবতী বলে খ্যাতি। ইনি মৃত

বার্নিডেল অব গ্র্যাহাম

ডিউক অব হ্যামিল্টনের একমাত্র দুহিতা, পিতার মৃত্যুকালে ইনি বংশের সঞ্চিত অগাধ ধন রত্ন তো পেয়েছিলেনই তা ছাড়া প্রচুর সম্পত্তিরও মালিক হন। সব রকম ক্রীড়াতেই ইনি অতি সুদক্ষ। শোনা যায় ইহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। ইহার উপরে বাৎসরিক সম্পত্তির আয় ১১৫,০০০ পাউণ্ড। ইহার মাতামহী গ্র্যাণ্ড ডিউক অব ব্যাডেনের কন্যা ছিলেন এবং সম্পর্কে তৃতীয় নেপোলিয়ানের ভগিনী ছিলেন। নিউ ক্যাসেলের ডিউক, সোমারসেটের ডিউক, ডিফলসায়ারের ডাচেস্ ইহারা সকলেই মাতামহের অব গ্র্যাহামের আত্মীয়। ১৯০৫ খৃঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি সম্পত্তির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন—ইহার অল্প কিছুদিন পরেই লর্ড গ্র্যাহামের সঙ্গে বিবাহ হয়। রাজনীতিক ক্ষেত্রে যশ ও প্রতিপত্তি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ইহার খুব বেশী। পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া ইনি বিফল মনোরথ হইয়াছেন।

ব্যারনেস ডন একার্ডলিনও একজন বিখ্যাত ধনবতী।

বিখ্যাত ব্যবসায়ী "সারথম ব্লাসডেল বেলমোর" মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র কন্যাই পিতার ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। প্রাপ্ত বয়স্কা হইয়া ইনি লণ্ডনস্থ আর্জেন্ট লেফেটারী ব্যাঙ্কের একার্ডলিনকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর

বাসডেল একার্ডলিন

অর্থে ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এ লইয়া অনেক মামলা মোকর্দ্দমাও হইল। শোনা যায় ইহাঁরও সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪,০০০,০০০, পাউণ্ড। সব মকদ্দমাতেই ইহাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা।

কর্ণেলিয়াস ভ্যাণ্ডারবিল্টের কন্যা গ্রাডিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্ট পিতার মৃত্যুকালে ৮,৫০০,০০০, পাউণ্ড পান। ইনি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও সুশিক্ষিতা। হাঙ্গেরীর রাজনীতিক কাউণ্ট সেকেনির সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ইউরোপীয় সমাজে এই মহিলার খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা নাই।

জন্ বোলিন হলব্যাক ইনি জার্মেনীর বিখ্যাত ক্রপ কারখানার মালিকের একমাত্র কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। সম্পত্তির পরিমাণ ১৬,০০০,০০০ পাউণ্ড। বহু ধনশালী ও প্রতিপত্তিশালী লোক এই সুন্দরীকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন, কিন্তু ইনি জন বোলিন হলব্যাক নামে এক দরিদ্র ব্যক্তিকেই পতিত্বে বরণ করেন। ১৯০৬ খৃঃ এঁর বিবাহ হয়। প্রায় ২৫০০০ লোক এই মহিলার বিশ্ববিখ্যাত কারখানায় জীবিকা অর্জ্জন করে। সুন্দরী এসেন সহরে বাস করেন। শ্রমজীবীদের উন্নতির জন্য ইনি নানা প্রকার কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত রাখেন।

---

# তোড়া

[ শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ ]

## অদ্ভুত রীতি

পারস্যদেশে এক অদ্ভুত রীতি আছে যে, বাড়ীতে কেহ মারা গেলে, যাহারা মৃতের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করিতে আসে, তাহাদের প্রত্যেককে এক একটি বোতল দেওয়া হয়। ঐ বোতলে শোকের অশ্রুজল ভরিয়া অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, চিকিৎসক যে রোগীর আশা ছাড়িয়া দিয়াছে, এ অশ্রুজল সেবনে তাহার ব্যাধি দূর হইতে পারে।

## বিচিত্র দেশ

স্পেনের অন্তর্গত লাস হার্ডেস নামক একটি প্রদেশ আছে। উহার পরিধি সাড়ে চারিশত বর্গমাইল এবং জন সংখ্যা প্রায় আট হাজার। ঐ স্থানের বৈচিত্র্য এই যে, সেখানে একটি পথও নাই। না আছে ডাক্তার—না আছে ঔষধ। রোগ আছে কি না তাই বা কে জানে?

## নিজেই নিজের ঠাকুর্দ্দা

যেমন কর্ণেলিয়াস নেপুলসের অনৈক নাবিক। এই লোকটি নিজেই নিজের ঠাকুর্দ্দা হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—আমি এক বিধবাকে বিবাহ করি, এই বিধবার পূর্ব্বস্বামীর ঔরসে একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম সিলাভিয়েচা। আমার পিতা এই বালিকার প্রেমে পড়েন, এবং তাহাকে দ্বিতীয় স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করেন। এইরূপে বাবা আমার জামাতা হইলেন এবং আমার সৎকন্যা

আমার মা হইবেন। কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিলে দোকা হইল মাতার সংতাই এবং আমার বিমাতার ভাই। কিন্তু কেবল তাই নয়, কিছুদিন বাদ যাবার স্ত্রী (দ্বিতীয়) একটি ছেলে প্রসব করিল। সে হইল আমার ভাই এবং আমার মেয়ের ছেলে। আমার স্ত্রী হইল আমার বিবিমা, কেন না সে হইল আমার মায়ের মা। তাই আমি আমার স্ত্রীর একদিক দিয়ে স্বামী ও অপর দিকে দৌহিত্র। অবশেষে সেই বিবিমার স্বামী বলিয়া আমি স্বভাবতই আমার ঠাকুর্দা। (সম্মিলনী)

## স্ত্রীলোকের মর্ম্মর মূর্ত্তি

লণ্ডন ইংলণ্ডে মাত্র চারিটি মহিলার মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহাদের নাম—(১) ভোয়া (২) ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (৩) সারা সিডন্স (৪) কেডেল।

## খুচরা খবর

কিঙ্কন গ্রামের স্ত্রীলোকগণ চর্ব্বি রাখিয়া প্রথমে নিজেদের বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য সাবান প্রস্তুত করিত। এখন সমগ্র গ্রামের সাবানই তাহারা সরবরাহ করে।

• • •

প্রত্যেক আড়াই বৎসর পরে একবার একমাসে দুইবার পূর্ণিমার মিলন ঘটে।

হাঁস পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

• • •

সাধারণতঃ একটি সুস্থ ব্যক্তি প্রায় দুই মিনিট পর্য্যন্ত জলের নীচে থাকিতে পারে। কিন্তু ১৯১২ সনে এক করাসী প্রায় সাড়ে ছয় মিনিট পর্য্যন্ত জলের নীচে ছিল।

দেখা গিয়াছে, ফরাসীদেশে এক বৎসর বয়সের মধ্যে প্রতি চারিটিতে একটি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

• • •

হিমুকের পরমায়ু দশবৎসর পর্য্যন্ত।

• • •

পৃথিবীতে ২৬,৫১২ খানা বাণীয় পোত এবং ৪,৮৮২ খানা পালপোত আছে।

• • •

স্বামীকে আগুনে ফেলিয়া দিতে যাওয়া হিয়াছিল বলিয়া কার্ডিফের একটি স্ত্রীলোক আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। স্ত্রী-টি রসময়ী বটে! স্বামীকে বোধহয় জ্বালানী কাঠ মনে করিয়াছিল।

• •

## তেজস্বীর তেজ

(রাজ তরঙ্গিণী)

[ শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর ]

ভাদর মেঘ নামেন যখন
অতি গাঁগর তটে
প্রবল বারিধার যেন নাক তেজ,
ছাড়ি দিয়ে যান বটে।

তাহি তেজে ধারা কভু হয় পাছে
তাঁরে ধরে সন্ধান,
দীন দুর্ব্বল জনের মাঝে
নিয়ে তেজ ঢেকে যান।

# স্মৃতি মন্দির

কামনা অনেকক্ষণ বাহিরেই থাকিয়া গেল। দুই হাতে একটা টেবিলের কোণ চাপিয়া ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল, বুঝি চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়ে! বুঝি তাহারই নির্ব্বুদ্ধিতার সাজা দিতে নিজেই সে কাঁদিয়া ফেলে। জীবনে যে কোনদিন কাহাকেও ঘৃণা করে নাই, আপনার অজ্ঞাতে সে যখন তেমনই একটা কাণ্ড করিয়া বসিতে পারে যে তাহার চিরদিনের পথ হইতে সে সুদূর-পথে পা ফেলিয়াছে তখন মনের ভাব এমনই হয়! কামনা কোনমতেই অশান্ত চিত্ত শান্ত করিতে না পারিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। অনেক চিন্তার পর সে পিতার কক্ষেই প্রবেশ করিল।

সুশান্ত ওদিকের চেয়ারে বসিয়া তদগত চিত্তে কি কথা কহিতেছিল, তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়াই হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আমি আসবো!

এই আনন্দধ্বনি যে কাহার উদ্দেশে উচ্চারিত হইল, রাজেশ্বর তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া ঘাড়টি একটু ফিরাইয়া, বলিলেন—আয় কামনা।

কামনা পূর্ব কথাটির অর্থ বুঝিতে পারে নাই, এখনো পারিল না, সে ধীরপদে পিতার কেদারা খানির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইতে সুশান্ত পুনশ্চ প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল—সত্যিই আমার পড়াশুনোর কোন ক্ষতি হয় না, আমি রাত্রে এখানেই আসবো। এ ক'দিনও আসতুম, হঠাৎ বাসার সেই লোকটির হল কলেরা। কি করি, এক বাসায় থাকি, না দেখে ত' পারি নে। আর সবাই কাজে চলে যেত, আমিই থাকতুম তার কাছে। তাই আর এ ক'দিন আসা হয়ে ওঠে নি। এখন থেকে আসবো।

এতগুলা কথা, এতক্ষণ ধরিয়া সে যাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া গেল সে কেবল আপন মনে এই ভাবিতেছিল যে সে ক্ষমা পাইয়াছে, সুশান্ত তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে। অমার্জনীয় অপরাধ ভাবিয়া সে এতক্ষণ এত বেদনা পাইতেছিল সুশান্ত তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত আনন্দে তাহার হৃদয়খানি ভরিয়া গেল। কিন্তু সে ভাবিয়া পাইল না সুশান্ত বিশেষ করিয়া এ-কথাগুলা তাহাকেই বলিতেছে কেন?—এই ভাবিয়া সে বিস্ময় বোধ করিতেছিল, রাজেশ্বর মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—আমিই শান্তকে বলছিলুম, কামনা সেদিন বলছিল, শান্তবাবু রাত্রে এখানেই থাকতে পারেন, অবশ্য যদি ক্ষতি কিছু না হয়! তা ও বল্লে, কিসের ক্ষতি! আর উনি যখন বলছেন, তখন আস্‌বো বৈ কি!

কামনার চক্ষু দু'টি আপনা হ'তেই নত হইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া লজ্জার এমনই এক আড়ষ্টভাব জমিয়া উঠিল যে তখন এই কক্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আপনাকেই অশোভন বলিয়া মনে হইতেছিল। সুশান্তর সর্বাঙ্গ-লিপ্ত দারিদ্রের মধ্যে এমন একটা তেজ ও গর্ব অহরহ দীপ্তি পাইত যে কামনা তাহাকে স্বভাবতই অপরাজেয়ই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। আর এই অপ্রতিহত প্রভাবের জন্যই তাহার চিত্ত বিরোধ-ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই মুহূর্ত্তে সেই লোকটির পরাজয়ের সংবাদ তাহাকে আনন্দ না দিয়া এমনই বিব্রত করিয়া ফেলিল যে সে মুখ তুলিয়া কক্ষের কোনখানটাই চাহিয়া দেখিতে পারিল না।

রাজেশ্বর আপন মনে বলিলেন—আজ ত রবিবার শান্ত, বাসায় তোমার বিশেষ কাজ নেই বোধ করি?

সুশান্ত হাসিয়া বলিল—কেন?

তাহলে আজ এইখানেই খাওয়া দাওয়া কর। বিকেলের দিকে তিনজনে এস্‌প্লানেডে গিয়ে নতুন প্যাটো-মাইমটা দেখে আসা যাবে'খন। ক'দিনই কাগজে বিজ্ঞাপন দেখ্‌ছি, আর দু'হন্টার গ্রে. বেল আমোদও পাওয়া যাবে'খন।

সুশান্ত জানিত না যে এই প্রস্তাবের উত্তর শুনিবার আশায় কামনা-ও তাহার পিতার মতই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। উত্তর দিতে গিয়া দেখিল, এক-

মুহূর্ত থামিয়া বলিল—দুপুরবেলা একবারটার যাবার আমার কথা আছে আর আমি ও-দব থিয়েটার বেশি দে

রাজেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—একদিন···

বাধা দিয়া শান্ত বলিল—একদিনের কথা নয়, কখনই যেতে না—এই ইচ্ছা।···মুখ তুলিতে দেখিল, কামনার মুখখানি প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে, তাহার শুভ্র হাত দু'খানি পিতার স্কন্ধে ন্যস্ত, দৃষ্টি সেইদিকেই।

রাজেশ্বরের মনের ভাব বলা যায়। তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়া বলিলেন—দুপুরবেলা কোথায় যাবে বল্লে?

যাব বাসাতেই। এক বাড়ীতে যাবার কথা আছে। এক ভদ্রলোক তাঁর ছেলের জন্য একটী গার্জেনটুটার খুঁজছেন, আমি দেখা করেছিলুম, আজ যেতে বলেছেন।

রাজেশ্বর সানন্দে কহিলেন—সে ত বেশ ভালই হবে শান্ত। মেসে থাকার চেয়ে কোন এক ভদ্র পরিবারে স্থান পেলে ত ভালই হয়।

হাঁ। আর টাকাও কিছু কিছু পাব বোধ হয়। টাকারও আমার দরকার।

রাজেশ্বর হাসিলেন, বলিলেন—টাকার আবার দরকার হয় না-কি?

শান্তও হাসিল, কহিল—আমার আগে হত না, এখন হয়েছে। আমার, যা মেসে একটী ব্রাহ্মণের ছেলেকে ভিক্ষাপুত্র নেবেন, তার খরচ দরকার। তবে অনেক দূরে যেতে হবে—তাই যা প্রথমটা রাজী হন্ নি, এখন রাজী করতে পেরেছি।

রাজেশ্বর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন—কলকাতায় নয়?

না। এলাহাবাদে। আমি যাকে বোকালুম যে কলকাতাও যা, এলাহাবাদও তাই—এক দিনের পথ দূর বেশী, এই যা।

রাজেশ্বর অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। কে-জানে কেন এই সংবাদ তাঁহার চিত্তকে অপ্রসন্ন করিয়া দিয়াছিল। যেন তাঁহারই একমাত্র পুত্র বিদেশে যাইতেছে, বহুদিনের জন্য বহুদূরের পথ বিদেশে যাইতেছে, এমনই এক চিন্তা অবসাদে তাঁহার অন্তরকে টানিয়া দিতেছিল কিন্তু তাহাকে বাধা দিবার, নিষেধ করিবার তাঁহার অধিকার নাই, একমাত্র পুত্র বটে কিন্তু অবাধ্য পুত্র সে! তুচ্ছ জন আছে সত্য, কিন্তু একান্ত বাধ্য নয়। স্নেহের পিতার স্নেহের অভিমান উথলে হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু যেখানে সে অভিমানের মূল্য নাই, অভিমান প্রকাশে অপমানই ত সার হইবে! কিন্তু নিরুপায়! সর্ব অভিমান দূর করিয়া স্নেহাস্পদের কাছে দীনতা প্রকাশ করিয়া ফেলে, রাজেশ্বর বলিলেন—কলকাতায় চেষ্টা করলে কি···

অনেক চেষ্টা করেছি।

বল ত—আমি তোমার জন্য···

এঁদের আমি কথা দিয়েছি।

আর কেহ কোন কথা কহিল না। রাজেশ্বর বার দুই হাই তুলিয়া আড় মোড়া ভাঙিয়া কন্যার দিকে মুখ করিয়া বলিলেন—চুরুটের কৌটোটা দিয়ে যা না মা!···পিতার কথা শেষ হইবামাত্র কন্যা নিজেই বাহির হইয়া গেল। পিতার লাইব্রেরী ঘরের তাকের উপর সিগার বাক্স রক্ষিত ছিল, কামনা সেটিকে হাতে তুলিয়া লইল কিন্তু তখনি ফিরিয়া আসিতে পারিল না। কামনা সেইখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, একি তাহার দুর্বলতা! এই কয়দিন আগেও যে লোক তাহার অপরিচিত অ-দৃষ্ট ছিল, সামান্য কয়দিনের আলাপের পর সে যখন চলিয়া যাইতে চাহে, কেন তাহাকে সে সানন্দে বিদায় দিতে পারিতেছে না? বিদায়ের সঙ্গে মানব-অন্তরের চির বৈরু কি চিরসাথী? কাহাকেও সে বিদায় দিতে চাহে না? বিদায়ের নামেই তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে!···

দিদিমণি, চুরুটের বাক্সটা···

আমি বাক্সটি নিয়ে যাব্—বলিয়া কামনা এ-ঘরে প্রবেশ করিল। ঠিক তদ্মুহূর্তেই দরজায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—রাত্রে আমি আসব। যে কদিন আমি আছি কলকাতায়, কামনাকে কষ্ট পেতে হবে না!

কামনা! কামনা! এই নাম সে প্রথম উচ্চারণ করিয়াছে। কেমন করিয়া এ নাম সে জানিল, কে তাহাকে এমনই সহজে, অকুণ্ঠকণ্ঠে এনাম উচ্চারণের অধিকার দিল—একথা কামনার মনের কোণেও উদিত

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার লিখিত
অভাগিনীর প্রলাপ
আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।

হয় নাই, তাহার সারা হৃদয়ে সেই নামটাই প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—কামনা! কামনা!

তাহলে আসি!—বলিয়া শান্ত রাজেশ্বরের চরণ স্পর্শ করিয়া উঠিতেই কামনার ঘর ভাসিয়া গেল, সে পিতার পানে চাহিয়া শান্তর উদ্দেশেই বলিল—আজকাল রাত্রে ত জাগতে হয় না বাবা।

রাজেশ্বর কিছুই বুঝিলেন কিনা বলা যায় না, উদাস-কণ্ঠে কহিলেন—না, আমার কাছে থাকবার দরকার হয় না।

মুহূর্ত্ত কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আসিবে কি আসিবে না—এই প্রশ্নটাই সে মীমাংসা করিয়া লইতে চাহিতেছিল, কিন্তু পিতা বা কন্যা আর কেহই কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া সে হতভম্বের মত কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

স্নেহের আকর্ষণ মানুষের হৃদয়ে এতই প্রবল যে এই কয়দিনের পরিচিত স্নেহাস্পদটিই রাজেশ্বরের হৃদয়টিকে এমন করিয়া অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল যে কয়দিনই রাজেশ্বর অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাহার প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন কিন্তু সে যে সেই চলিয়া গিয়াছে আর কোন সংবাদই নাই। সহরে আছে কি সহর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অকস্মাৎ একদিন কলের পরিদর্শন করিতে গিয়া শুনিলেন, সে কলেজেও আসে নাই। রাজেশ্বরের মনে হইল বুঝি অসুখ-বিসুখ হইয়াছে! —স্নেহের এই ধারা!

স্নেহের ঠিকানা জানা ছিল, সেখানে আসিয়া শুনিলেন, তিনচারদিন পূর্ব্বে শান্ত বাসা ত্যাগ করিয়াছে। নূতন বাসার ঠিকানা শুনিলেন, তাঁহার গৃহের অতি সন্নিকটে! রাজেশ্বর সেই পথে গাড়ী ছুটাইয়া দিলেন। সারা পথ এক অজানা উদ্বেগে ও ক্ষোভে মন ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে-ছিল। মুহূর্ত্তে তাঁহার বাড়ীর অত কাছে আসিয়াছে, তবু একবার দেখা করিল না। স্নেহের তৎর্সনা কণ্ঠে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার বাসায় আসিয়া শুনিলেন, সে হঠাৎ কি কাজে দেশে চলিয়া গেছে।

আর দুঃখ রহিল না। দেশে গিয়াছে তাই, নতুবা শান্ত নিশ্চয়ই আসিত—এইরূপ কল্পনা করিতে করিতে গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র কন্যা কহিল—ও বাড়ীটায় কি বাবা?

পিতা প্রশান্তকণ্ঠে কহিলেন—শান্ত বাসা করেছে ঐ খানে!

ঐ বাড়ীতে?—তাহার কণ্ঠ ভেদিয়া যে আনন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হইল পিতার তাহাও অজ্ঞাত রহিল না। বলি-লেন—সে এখানে নেই কামনা। দেশে চলে গেছে!

চলে গেছেন! একবার দেখা না করেই,...

বোধ হয় তেমন কোন বিশেষ...

কন্যা বাধা দিয়া কহিল—সে তুমি যাই বল বাবা, তোমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়া তাঁর খুব উচিত ছিল। তিনি জানেন তুমি তাঁকে কত স্নেহ কর, আর কতদিন দেখা হবে না—

পিতা বলিলেন—না, না, সে এলাহাবাদে যায়নি কামনা, দেশে গেছে। শীঘ্রই বোধ করি আসবে—বাপের লোক বয়ে! এলাহাবাদ যাবই যদি, দেখা না করে কখনই যাবে না।

রাজেশ্বরের এত বড় বিশ্বাসও মিথ্যা হইয়া গেল। একদিন পিতাপুত্রী সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠ হইতে ফিরিয়া দরওয়ানের হাতে এই পত্রীটুকু প্রাপ্ত হইলেন—আমি আজই দেশ হইতে আসিয়াছি, আজই আমরা এলাহাবাদ চলিলাম। দেখা হইল না বলিয়া দুঃখিত আছি। —প্রশান্ত।

পিতা পত্রীটি পাঠ করিয়া কন্যার হাতে দিয়া বলিলেন—যাক্!—ঘরে আসিয়া নিবিষ্টমনে চা পান করিতে বসি-লেন। কন্যা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে আপন কক্ষে ঢুকিয়া স্পষ্টকণ্ঠে দেওয়ালগুলোকেই শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল—মানুষ নয়, মানুষ নয়, মানুষ নয়! একবার দেখা করিয়া যাইতে পারিল না, একটি বিদায় বাণী উচ্চারণ করিয়া গেলে কি এমন ক্ষতি হইত?—বৃথা প্রশ্ন, বৃথা আক্ষেপ! সে তখন বহুদূরে!

পিতার কক্ষে আসিয়া পিতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া বলিল—কেন ভাবছো বাবা? শান্তবাবু কোনদিনই আমাদের কেউ ছিলেন না, আজও নন। আমরা যে পর, তিনিও সেই পর—কেউ কারো জন্যেই ভাববে না!

পিতা একটা তীব্র সত্য অবগত হইয়া কন্যাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—ঠিক কামনা, ঠিক! পর কি কখনও আপনার হয়!—

(ক্রমশঃ)

# রোকশোধ।

( শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। )

## একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

তখনও সূর্য্যাস্তের একটু বিলম্ব ছিল। দূর চক্রবাল-প্রান্তে—নীল আকাশটা নীল সিন্ধুবক্ষে আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিল, সেইখানে বসিয়া রক্তরবি সুনীল বারিরাশিকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া দিতেছিল। সেই সুদূরপ্রান্ত হইতে কতকটা সুবর্ণ-ছটা আসিয়া নির্ব্বাণপ্রায় চিতার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চিতা একবার জ্বলিতেছিল, আবার নিবিতেছিল; নিবিয়া আবার ঝিকি ঝিকি জ্বলিয়া উঠিয়া সংসারের শেষ হাসি তাহার মত অভিনয় করিতেছিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাহার পাদমূল চুম্বন করিয়া যাইতেছিল। অদূরে বসিয়া ভূপতি গলা ছাড়িয়া, তরঙ্গে তরঙ্গে বেদনার করুণ প্রতিধ্বনি তুলিয়া গাহিতেছিল—

"আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে যায় গো!"

চকিত রবিরশ্মি-প্রদীপ্ত তরঙ্গমালার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তারানাথ নির্ব্বাকভাবে বসিয়াছিল। ভূপতি গাহিয়া যাইতেছিল—

"পৃথিবীর কেউ আমে তো যারে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,
কেহ আছে শুধু ভালবাসা-বাসি
দেখা যেতে প্রাণ চায় না!"

"তারানাথ!"

চমকিত দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই তারানাথ যাহা দেখিল, তাহাতে অন্ধকার পথে ছায়াদৃষ্টি দর্শনে শঙ্কিত পথিকের ভায় ভয়ে বিস্ময়ে যেন আঁৎকাইয়া উঠিল। একি, বৃদ্ধ মাতুল, মাতুলানী, আর তাঁহাদের সঙ্গে সেই স্ত্রী—যাহার অনিশ্চিত মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারানাথ তৃপ্তিলাভ করিতেছিল না, নিশ্চিত মৃত্যু সংবাদ পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল, সেই প্রতীতি-যামিনী স্ত্রী—ইহারা এখানে কোথা হইতে আসিল! শুধু তার স্ত্রী বিস্ময় নয়, একটা প্রবল শঙ্কা আসিয়া তারানাথকে যেন অকস্মাৎ করিয়া তুলিল। সে আর তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না, দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া পূর্ব্ববৎই বালুকারাশির উপর নিবদ্ধ করিল।

হাস্য গম্ভীর স্বরে মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের চিন্‌তে পাচ্চো না, তারানাথ?"

তারানাথ উঠিল এবং নত মস্তকেই, ধীরে ধীরে গিয়া মাতুল মাতুলানীর চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিল। মাতুলানী তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া, হর্ষপ্রফুল্লমুখে সস্নেহে তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁরা ছেলে, না ব'লে দুই তায়, একেবারে নিরুদ্দেশ! চাকরী করিস, বারণী করিস, বড়লোক হোস্, বাই হোক্, একখানা চিঠি লিখ্‌তে কি হুকো বুড়ীর খোঁজখবরটা নিতে নাই? তা মামা-বের খোঁজ না নিলি—আমরা তোর কে বল্—কিন্তু ঐ যে আমাদের মেয়েটা—না খাওয়া, না দিয়া যেই দিন যাচ্ছে, তারও তো একটা খোঁজ নিতে হয়!"

তারানাথ সচকিত দৃষ্টিটা একবার স্ত্রীর দিকে নিক্ষেপ করিয়াই অপরাধীর ভায় ম্লানমুখে মস্তক নত করিল। মাতুলানী বলিতে লাগিলেন, "আর ঐ একটা হুকোমুখো বেহায়া—যেতে বলেছি, সেইখানেই ছুটেছে, চিঠি লিখে খোঁজ নেয় নি, হেন জায়গায় নাই, দিল্লী লাহোর অবধি খোঁজ নিয়েছে, আর দুই ঘরের পেছনে বস্‌লেই হয়, দিব্যি লুকিয়ে ব'সে আছিস্, যেন তোর খোঁজ খবর নেবার দুনিয়ায় কেউ নাই।"

মাতুল গম্ভীর ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "তাই কি সহজে খোঁজ পাওয়া যেতো? ভাগ্যে সে দিন বর্দ্ধমান যাবার গাড়ীতে ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হ'লো, তাই কথায় কথায় খোঁজ পাওয়া গেল।"

বলিয়া তিনি ভদ্রলোকটীর উদ্দেশে অদূরে দৃষ্টিপাত করিলেন। তারানাথও তাঁহার সঙ্গে সেই দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, মাতুলের উল্লিখিত ভদ্রলোকটী আর কেহই নহেন, তিনি তারকবাবু। তারানাথকে আপনার দিকে চাহিতে দেখিয়া তারকনাথ সহাস্যমুখে ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইল, এবং তারানাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কি তারানাথ বাবু, আজ আবার উকীল অঘিনীবাবুর চেম্বারে যাবি?"

তারপরে তাহার দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সে দৃষ্টিপাতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া তারকনাথ সহাস্যমুখেই বলিল, "স্বীকার করি, সেদিনের টেলিগ্রামটা না হয় মিথ্যা, কিন্তু আপনার যে স্ত্রী বা আত্মীয়স্বজন কেউ নাই এ কথাটা বোধ হয় একটুও সত্যি নয়।"

তারানাথের চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া তারকনাথের যেন একটু দয়া হইল। সে বিদ্রূপ হইতে বিরত হইয়া সহজ গলাতেই বলিল, "আচ্ছা, প্রলোভনে পড়লে অমনটা হয়েই থাকে। তবে মনে করবেন না আপনার অনিষ্ট কামনায় আমি খুঁজে খুঁজে আপনার আত্মীয়স্বজনদের বার করেছি। সেই শেষ যোকদ্দমার দিনে বর্দ্ধমানে যেতে যেতে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। কথায় কথায় আপনার সম্বন্ধে পরিচয়ই বলিয়ে নিই। তবে তখনও এঁকে আপনার সন্ধান দিই নাই, পরে সন্ধান দেব বলে প্রতিশ্রুত হই। তারপর মামলাটা যখন কেঁচে গেল, তখন আপনাকে সাবধান করবার জন্য আপনার স্ত্রীর নামে 'ইউ টেলিগ্রামটা' আমিই করি, কেন না আপনাকে সে সময় সাবধান করতে পারলে আমার মনে একটা উচ্চ চিত্ত বড়োকর্তার অনুপমার কাছ থেকে সম্পত্তিটা লিখিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু আপনি আমার সে উদ্দেশ্য হতে দিলেন না, অনুপমাকে নিয়ে চলে এলেন। এখন আপনিও বুঝতে পেরেছেন, হাতেও যদি পড়িবার কতকটা টেনে রিচড়ে রাখবো। আপনি চলে আসবার দিন কতক পরেই এঁদের খবর নিয়েছিলাম, আমরা এখানে আসবার সময় একেবারে সুদে নিয়ে এসেছি। আর আমার নামের, ভুল টেলিগ্রাম পেয়েই আপনি আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন বলেই, আমরা আপনাকে তাঁদের কাছে পৌঁছে দিলেম। আমাকে শত্রু ভেবে করবেন না।"

মাতুল মহাশয় কিঞ্চিৎপূর্ব্ব ঘরে বলিলেন, "তুমি আমাদের—বিশেষ ঐ অবিনাশের বোনের যে উপকার করলে বাবা, জীবনে তা ভুলবো না।"

অতঃপর তিনি তারানাথের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবাজি, এখন কি করবে? আমাদের সঙ্গে যাবে, না আমরা কোথাও পালাবো?"

তারানাথের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাতুলানী তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া ক্ষীণ গলায় বলিলেন, "হ্যাঁ, পালাবে বৈকি, কৈ এবার যাও দেখি। আয় তারা!"

তারানাথের হস্ত আকর্ষণ করিতে করিতে তিনি অগ্রসর হইলেন। সে স্নেহের আকর্ষণ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে তারানাথের সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি হইল না। এই মাতুল মাতুলানীর স্নেহ সঙ্গ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সাধ্বী স্ত্রীর ভালবাসায় সন্দিহান হইয়া তারানাথ যে একটা মস্ত ভুল করিয়াছিল, তাহারই মার্জ্জনা ভিক্ষা ছল ছল চোখে মাতুলানীর অনুবর্ত্তী হইল। যাইতে যাইতে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। চিতার শেষ বহ্নিটুকু তখন ধিকিধিকি শেষ আলোক রেখার সহিত বিলীন হইবার উপক্রম করিয়াছে। রক্তরবি রক্তিমছটায় নীল সলিলরাশিকে আলোকিত করিয়া সাগর বক্ষে বাঁপাইয়া পড়িয়াছে। ভূপতি তখনও নির্ব্বাপিত চিতার সম্মুখে বসিয়া, করুণ কণ্ঠে অন্তরের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিয়া গাহিতেছে—

"পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসা-বাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় না!
স্বপন হইতে মায়ার জগতে
কৈ কে তুলে নিতে আয় না!"

(সমাপ্ত)

# দেশ-বিদেশ

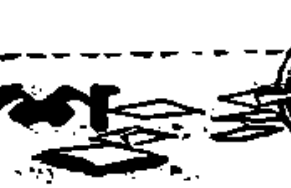

বিলাতী বিজেটার সম্প্রতি বেঙ্গলপুর সাম্রাজ্যিকে অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে বিজেটার অভিনেত্রী ও অভিনয়শিল্পীগণ সাইকিলযোগে ও পদব্রজে বাহির হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা মুরীনাদুন্দরী, গুরুদীন, রেণুবালা ও শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র যে সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা-বিশ্বাসের বিলাতী-সম্প্রদায় আজ দুঃখী বটে কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত বেঙ্গলপুর আজ ইহা আনন্দকর।

শুনা যাইতেছে যে, মৃণালা তাঁহার পাণির সহিত-আর্থিক বাঁধা অভিনয় মোহনরোজাকালী বেশ কতক বিনয়। ঐ বাহিনী সম্প্রতিক ভাবে বিশিষ্টা এবং তিনি কলাপী বেশে, নাটিনয়ন অভিনয় অনেক ভূমিকার অভিনয় করিয়াছেন। মনে হয়, ইংরাজিনির অবসান হইবার পর, মৃণালা কলিকাতা আসিয়া রঙ্গা করিবেন, এবং তাঁহার আসোয়ার হইতে একটু বিলম্ব ঘটিতে পারে।

আজকাল বহিনা বাহিনীর—মেসাইয়ের বিঃ আসোসিয়েটার কন্যা মৃণালী মেরল ইটি বাহিনীর হইয়াছেন। তিনি ইংরেজীই ভূমিকা করিবেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রী শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মৃণালার আগামী বৎসর হইতে অবৈতনিক ভাবেই অধ্যাপনা করিবেন। বাংলার এমন কয়জন আছেন? তাঁর ছাত্রেরা তাঁর সম্বন্ধে কি বলেন?

কর্পোরেশন যে সকল আয়ের অভিনয় করিতেছেন, সেই সকল আয়ের প্রাথমিক সাহায্যী কর্মচারীগণ ধর্ম্মঘটকে আসিয়া চলিতেছেন যে অভিনয় তাঁহাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং অনেককে বরিখাস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, এক ডালেলচক সহরে ৩০০ কর্পোরেশন সাহায্যী কর্মচারীর উপর সহরে পরিচালনা করিবার ভোলিন দেওয়া হইয়াছে।

সুলেন হৈমের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ঘটনার বিবরণপ্রিয় তাঁহাদের অভিযোগের 'অপূর্ব' সূচী প্রতিনিধিদিগের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন। ইহাতে আসাইয়াছেন যে, অভিযোগের অপূর্ব হাজির করিবার সময় তর্ক কার্জন যদি কুশিয়ু বা কিছু কথাবার্ত্তা না বলেন, তাহা হইলে অবস্থা বিশেষরূপ খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে। সুলেন-হৈমের অবস্থা খারাপ দেখিয়া অভিযোগের তাঁহারা সেবাকার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়া এজেন্সের ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রকাশ যে, সুলেন সহর হইতে এক শত মাইল দূরে সৈন্যসংরক্ষণ ফুরিয়াছে। সহরের ইংরেজগণও দূরের আশ্রয়গ্রহণ করিতেছেন।

গত ২৯শে তারিখ রাত্রে কয়েকজন যোদ্ধাসেবক এবং যোদ্ধাসেবক-গণের কার্যকলাপে নাথোর সহরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারের সময় তাঁহারা একটী সভার সভাপতিকে সরকার অভিযুক্তি সভাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

—০—

মিটির ওয়ার প্রকাশ যে, প্রায় ২০ জন যাত্রা ( M. N. A. ) সেক্রেটারি অব ষ্টেটের ইংরাজের যোগ প্রকাশ করিয়া একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন। সেক্রেটারি অব ষ্টেট পিপীলিকার পূর্ণ খুঁজিতেছিল যোগ করি?

আমরা শুনিয়া বিশেষ দুঃখী হইলাম যে, যোগাইয়ের অধ্যাপক এক ডি এস, রামানন সিংহাই ই অন্তরের বিলাতে আসিবেন, তাহা অভিনয়ের বিষয়ক হইয়াছেন। তিনি যত দিন কাজকার্য্য প্রথম করিতে না পারিবেন, তত-দিন তিনি যে প্রবলটি যোগ তাঁহার কাজ চালাইবেন। তিনি যোগ-এক্স-রশ্মি বিশিষ্টিয়াছেন। তিনি রামায়ণ মুখা, ভূমিকম্পের এবং অন্য অনেক বিষয়ে রিপোর্ট দিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার যথেষ্ট সাহস অনেক আলোচনা হইয়াছিল। এখন তিনি ইন্ডিয়া আসোসিয়েশনের অধীনে তাহার মন্তিষ্কের পরিচালনা এবিষয়ে অধিকতর সাহস করা।

বিলাতী ঘর।

পার্থ-এ ডিসেম্বরী যে সভায় শেষ হইয়াছে সেই সভায় 'বিলাতীয়' আমদানী বিষয়।

| | |
|---|---|
| কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান বৎসর | গত বৎসর |
| তৌজী ১৪৬৫২০০০ পঃ | ১৩৯৯২০০০পঃ |
| যোগাই ৪৩৯৯০০০ | ৪৫৪৬০০০ |
| বেচে— | |
| তৌজী ৪৪১৫৭০০ | ২৪১০০০০ |
| যোগাই ১৯৪৩০০০ | ৩৪৪০০০ |
| মাহাজ— | |
| তৌজী ১২৫৪০০০ | ৩১১০০০ |
| যোগাই ৫৪১৩০০০ | ৩৫৩০০০ |

বিলাতী ঘর-তৌজী আমদানী হ্রাসের কারণ কি?

অধ্যাপকদিগের আশীর্ব এবার বেলাসবাহে। শেরোয়ার, ইহে মোটরগাড়ী এবং তৌজা চালকের সদাসর্ব্বদা বেলাসবাসে যাতা-য়াত করিতেছে। আমাদের একটী কথা, তাঁহার বেলাসবার অনাবৃষ্টি এবং সাধন বিজ্ঞানের পক্ষে মূল-কথিয়ার জন্য তাঁহার প্রথম দৃষ্টি এই সব বিষয়ে করা, যা যাঁর মর্ত্তমান-সাহেবের অন্তরে আকর্ষণ করিয়াছেন। আমাদের ভরসা যে, আমীর তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাজকের হাল কাজ কিরূপ চলে দেখিবার জন্য সাধারণ অবসরকারীর অবসরে একটী তৌজা তাঁড়া করিয়া কাজুকে নিয়োজিবেন। তৌজাওয়ালা তিনি যে আমীর তাহা অবিলম্বে, যে উপায়ে সম্ভব ছোটের কাছে ফুলাইয়া দিয়া আসিবে, যা, তৌজা-ওয়ালার সহিত অনেক কথা করিয়া তবে আসি। তাহাতে অন্যান্য বন্দরীর প্রধান পার্থক্য নাইতে যাহা কলাইতে পাইবে তাহাই তাহারা করাইতে পারেন। অবসরে সব দেখিয়া তাহারা তাঁহার আমীর পরিচয় প্রকাশ করেন।

তাঁহাদের ধর্ম্ম করিবার জন্য উর্দ্ধ-আমীন হইয়াছে। এই আইনের সংশোধন প্রস্তাব অনেকেই তুলিয়া দিবেন, কিন্তু সেগুলি ঠিক নাই।

"স্বরাজ" বলে বিজেতের—

চট্টগ্রামে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য মোসাবালী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় মেলাবার্ডগুলি চাঁদা তুলিয়াছেন। অন্য বিভাগের মধ্যে মহাশয় ৫১,০০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন। ইংরেজের তুলনায় ভয় না কি?

কুলপুরী তৈলের আন্দোলনায় করিয়া সরকারের অনুগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহারা। সম্প্রতি কলিকাতা অবাধীপুরে মহারাজ পরিচয় হাসপাতালের এক ব্যক্তির আন্দোলনায় হইয়াছে। পাত্রা মেলে নাইকো ও সৌরভ-আমীন অভাব নাই—সেই জন্যই সংবাদ বিলম্ব।

বাসন্তী—

বাদসা শাহরিয়ার, শহরজাদ ও দুনিয়াজাদ।

আমাদের রচিত আরব্য উপন্যাসের আর একখানি চিত্র।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

অচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

# বাসন্তী

১ম বর্ষ ] ২৭শে মাঘ শনিবার ১৩২৯, ইং ১০ই ফেব্রুয়ারি। [ ২৮শ সংখ্যা

## বাড়ীভাড়া আইন না টিঁকিলে—

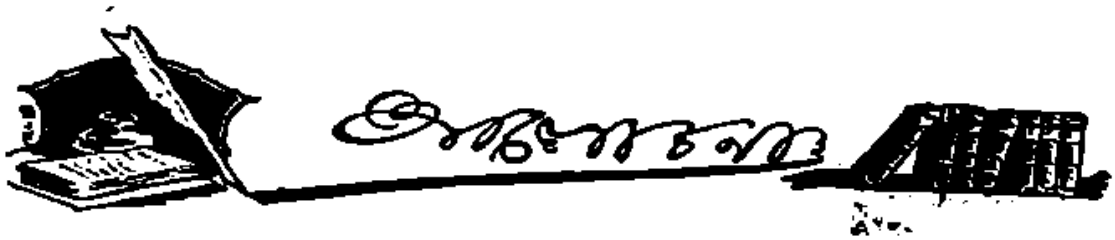


দেশের চারিদিকে অবসাদের গাঢ় ছায়া ঘনিয়া উঠিয়াছিল; প্রাণে জীবনী শক্তির অভাব অনুভূত হইতেছিল, জাতি কর্মপ্রেরণা হারাইতে বসিয়াছিল, ঠিক এমনি সময়ে অক্লান্ত কর্মী মহাপ্রাণ দেশ নেতা ভাগ্যকুলের কারামুক্তি পাইয়া আবার দেশবাসীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। দেশে আজ নেতার অভাব দেশবাসী ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিতেছিল, ভাগ্যকুলের আগমনে সে অভাব দূরীভূত হইল। দেশ আবার নব-বলে জাগিয়া উঠুক, ভাগ্যকুলের নেতৃত্বে আবার দেশবাসী তাহাদের লক্ষ্য পথে দৃঢ়পদে চালিত হৌক, অবসাদ ঝাড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, দলাদলি ভুলিয়া জীবনমন্ত্র সাধনোদ্দেশে ধাবিত হৌক, ইহাই আমাদের কামনা।

• • • •

বোম্বাই কর্পোরেশনে কয়জন মহিলা কমিশনার নির্বাচিত হইয়াছেন। আজ জগতের ইতিহাস খুঁজিলে নারীর এই অগ্রগমনই পরিলক্ষিত হইবে। নারী আজ সর্বাংশে পুরুষের সমকক্ষ হইতে চাহিতেছেন। দেশের কার্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী সর্বত্রই পুরুষের সমান অধিকার পাইতে চাহেন। তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা জয়যুক্ত হৌক!

• • • •

ব্যবসায় নারীরাও আর উদাসীন নাই। তাঁহারাও আজ দিকে দিকে পুরুষের সব অধিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। চারিদিকে আমরা সে আগমন-চিহ্ন দেখিতেছি। জাতির জীবনে ইহা যে কত বড় সম্পদ তাহা অস্বীকার করিবার স্পর্দ্ধা কাহারো নাই। কিন্তু আমাদের নারীরা একি পথ ধরিলেন? তাঁহারা প্রথমেই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইলেন কেন? দেশ আজ আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টায় কত বিকৃত রক্তাক্ত দেহ হইয়াও চেষ্টা ত্যাগ করিতেছেনা, আজ দেশের চারিদিকে স্বাবলম্বনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—সে সময়ে দেশের সমাজের অর্ধ অঙ্গ যদি এমনই ভাবে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া পরের দরজায় হাজির হন্—তবে সন্তান তার মাতৃত্বে বৈ করিবে না! আজ দেশের অন্য পুরুষ এই 'ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও' রবে চীৎকার করিয়া গগন দীর্ণ করিয়া দেশের বর্তমান হীন অবস্থার কারণ হইয়াছে, আবার শক্তিরূপিনী নারী যদি তাহাদেরই মত স্বরাজ-ভিক্ষার আশায় বিদেশী শাসকের দ্বারে ধরণা দিয়া বেড়ান—দেশের কি মঙ্গল যে তদ্দ্বারা সাধিত হইবে, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। যদি সত্য বলিতে হয়, বলিতে হইবে, এ পথ তাঁহাদের পথ নয়। ভিক্ষা অনেক হইয়া গিয়াছে, ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়াইয়া কোন লাভ নাই। পরন্তু অনুগ্রহে ভিক্ষা-পাত্র পূর্ণ করিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া নারী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিলেই দেশের মঙ্গল সম্ভব। গৃহের মতই পুরুষ তাঁহার সহায়তা করিবে, নরনারীর মিলিত চেষ্টায়, ঐকান্তিক যত্নে কার্য-বস্তু আপনিই হাতের কাছে আসিবে। সেদিন নবীন চক্ষে নবীন সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিবে, দেশে নব-বলে বলীয়ান নর-নারীর মুখের উপর স্বর্গের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িবে; কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে দেশের জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

• • • •

বাড়ীভাড়া আইনটির পরিণাম কি হয় জানিবার জন্য সহরবাসী আকুল আগ্রহে অধীর হইয়া রহিয়াছে। সহরের অধিবাসীদের প্রতিনিধিদের কাছে প্রত্যাশা করিবার কিছু নাই, একমাত্র কাউন্সিলের বিচারের উপর সমস্তই নির্ভর করিয়া আছে। সহরবাসী এখন কেবল গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া পাংশু-মলিন মুখে অবস্থান করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট অপক্ষপাত ন্যায় বিচার করিবেন বলিয়াই আশা হয়।

• • • •

শুনিতেছি এখন হইতেই সহরের অনেক বাড়ীওয়ালা তিন বছরের খরিদ্দারের দুরীতে সান দিতেছে। ক'টা মাসের অপেক্ষা বই ত নয়! অনেকে আবার ভাড়াটিয়াদের হুলকায় বা রাজরাজীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধের উত্তরে রে'বাস চেয়াইয়া রাখিয়াছে। শুনিতে পাই, আলিপুর

অঞ্চলের কোন একজন নামজাদা জমিদার বাড়ীভাড়া আইনের পরমায়ু বর্দ্ধিত হইলে লোহার চিৎপুর রোডে অবস্থিত বাজারবিশেষ একটী পল্লীতে সম্বরভূমি করিয়া বেলিঘেমে ভর দেখাইয়াছেন। প্রবলের বিলাসে দুর্ব্বলের অভিযান সে ত শুধুই অশ্রুজল!

• • • •

ঘুম ছাড়িয়া শাখা পত্র লইয়া নাড়া চাড়া করিতেই আমরা, ধরার ভালবাসি, এবং তাহাতেই আমরা মত্ত হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের দেশে ও সমাজে সবই আছে নাই শুধু ঘুম গায়েনের তান ধরিবার লোকটি। কাজের গোড়ায় সেই হারাইয়া আমরা উপরের সৌধ আকাশ প্রমাণ করিতে চাই, তাই তাসের প্রাসাদের মতই সে সৌধ চুরমার হইয়া যায়। আজ দেশের জাতীয় জাগরণের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেখিয়া আমাদের সেই কথাটিই বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে আমরা বোধ হয় ঘুম হারাইয়াছি। তাই শাখা পত্র লইয়া এই নাড়া চাড়াতে লোভে মনকে আঁখি ঠারা যায় বটে—কিন্তু প্রাণের সত্য বস্তুটি তাহাতে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠে।

• • • •

ভারতে নূতন ভাবের জাতীয় জাগরণের প্রবাহ আসিবার পর হইতে ভারত জীবন পথে কতটা অগ্রসর হইয়াছে—তাহা খতাইয়া দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই এক পদও নহে। জাগরণের স্রোতটা আসিয়া মাত্র মরা গাঙ্গের জাতীয় তরণীর গায়ে লাগিয়াছিল। স্রোতের ধাক্কার বেগে জাতি তাহার নিদ্রালস নয়ন মেলিয়া সবে চাহিয়াছিল মাত্র। সম্মুখে পেছনে, উপরে নীচ তাহার মরা গাঙ্গের জমা পেওলা,—যুগ যুগান্তের সঞ্চিত পেওলা নিশ্চলতার উপর এতকাল তাহার রাজত্ব, প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছে সে কি সহজে নিজ আধিপত্য ছাড়িয়া দেয়? সহস্র পাকে সহস্র বন্ধনে আষ্টে পৃষ্ঠে সে মূঢ়ত্ব প্রাণকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে। নিদ্রালস নয়ন মেলিয়া চাহিয়া মুক্তির সন্ধান করিতে লাগিল—কিন্তু কোথায় মুক্তি—কোন দিকে?

কেহই পথ বাৎলাইয়া দিবে বলিয়া সে পথের টানে পরের মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অবসাদে আচ্ছন্ন দেহ মন—নিজের চেষ্টায় সে পাঁক হইতে উঠিয়া পেওলার বন্ধন ছাড়াইয়া সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে সে উৎসাহ তাহার নাই। জাতি ও জাতীয় জীবন এই অবস্থায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়া মুক্তি চাহিতেছে। কে জানে কবে সে এই পঙ্ক ও পেওলার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে!

• • • •

পরের হাতে স্বেচ্ছায় আমরা যাহা তুলিয়া দিয়াছি—তাহার জন্যই না হয় আবেদন নিবেদন, ঝগড়া ঝাঁটি, কোঁদল পর্য্যন্ত করিলাম। কিন্তু যাহা এখনও আমাদের নিজের হাতের ভিতর রহিয়াছে সে গুলির জন্য আমরা কি করিতেছি? নিজেদের সামাজিক পারিবারিক জীবন, নিজেদের শিক্ষা সংস্কার এগুলিও পরে আসিয়া কোন ব্যবস্থা করিয়া না দিলে আমরা তাহার একটা বিধি ব্যবস্থা করিতে পারি না। আমাদের পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনের এই অক্ষমতা হইতেই দেশজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের এই শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে।

• • • •

আজ সহরে পল্লীতে যেখানেই যাইবে দেখিবে সব স্থান ক্ষুধী, লাভ কুণ্ঠিত, অভাবে জর্জ্জরিত। অভাব ক্লিষ্ট প্রাণে স্ফূর্ত্তির তৃপ্তি আসিতে পারে না। আজ দেশে জীবন ও যৌবনের সমস্যা যাহা জাগিয়াছে তাহা শুধু অভাবের তাড়নাই। অভাবের তীব্রতায় দেশ দিনদিন ভাবে কাঁদিয়া মরিতেছে। কাহার কাছে সে অভাবের এ মর্ম্মভেদী জ্বালা জানাইবে। দেশের সকলেই যে অভাবগ্রস্ত। এই অভাবের কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে, কেহ পারিতেছে না। অধিকাংশই লজ্জায় অভাবের তীব্র জ্বালা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। দেশবাসী অভাবে, না খাইয়া না পরিয়া, ব্যাধি পীড়ায় দিন দিন ধ্বংসের মুখে যাইতেছে—অভাবে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে,—কিন্তু দেশের এই অভাব নিবারণের কি কোন পথ নাই—এ অবস্থার কি কোন প্রতিকার নাই?

• • • •

খনি ও জানি কৃষি ও বাণিজ্যে দেশে অর্থাগম হয়। কিন্তু আমাদের দেশ কি কৃষি ও বাণিজ্য সম্পদে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এতই হীন যে এ দেশের অভাব কোন দিনই দূর হইতে পারিবে না! সত্য কথা তাহা নহে। আমাদের

দেশ কৃষি ও বাণিজ্য সম্পদে কোন দেশ অপেক্ষা হীন নহে। অবশ্য চেষ্টা করিলে দেশের কৃষি সম্পদ ও বাণিজ্য সম্পদ যাহাদের হাতে তাহারা উন্নত প্রণালী অবলম্বনে এ সম্পদ আরও শত গুণে বাড়াইয়া তুলিতে পারেন কিন্তু তাহা হইলেও এখনও দেশে এ দুই সম্পদ যে পরিমাণ আছে তাহাতেই তো দেশে এরূপ অভাবের হাহাকার থাকা উচিত নয়। কিন্তু উচিত যাহা নয় তাহাই আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে উচিত বলিয়া চলিতেছে।

• • • •

দেশের কৃষি সম্পদ দেশের লোকের আহার যোগায়। সে সম্পদের কতক অংশ বাণিজ্য সম্পদরূপে পরিণত হইয়া দেশে অর্থাগমের পথ হয়। আমাদের দেশের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের রক্ষক যাহারা তাহারা দেশকে বাঁচাইয়া এই বাণিজ্য নীতি কতটা রক্ষায় রাখিতেছেন তাহাও দেখিবার যোগ্য। আজকাল বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে সকল দেশের যোগ সহজ স্থাপিত হইয়াছে ইহা সত্য কথা, কাহারটকা বা কখনু দীপে যাবার না থাকিলেও তাহা এ দেশবাসীর যোগাইতে হইবে ইহাও সত্য কথা বটে কিন্তু এ দেশবাসীর খাদ্যের অভাব ও আরও সহস্র অভাব যে নিত্য তাহাদের মরণের পথে লইয়া যাইতেছে ইহা দেখিবার লোক কোথায়? কে ইহা দেখে ও ইহার প্রতিবিধান করে?

• • • •

আমাদের দেশের পল্লী গুলি পূর্ব্বে যেমন স্বাস্থ্য ও সুখের স্থান ছিল আজ তাহা তেমনি অশান্তি ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। পল্লী সংস্কার দেশের অতি আবশ্যকীয় কাজ। কিন্তু ইহা যত সোজা ভাবা যায় সত্য তত সোজা নহে। পল্লীকে সেই ভাবে বাসের উপযুক্ত করিলে যাহারা এখনও তথায় আছে তাহারা পল্লীতেই থাকিতে চাহিবে যাহারা পল্লী ছাড়িয়া গিয়াছে তাহারাও আবার পল্লীতেই ফিরিয়া আসিতে চাহিবে। ইহা করিতে হইলে পল্লীতে ভাল শিক্ষা ব্যবস্থা, পথ ঘাট ও সমাজ করিতে হইবে। সমবায় প্রথা চালাইতে হইবে, পল্লীর স্বাস্থ্য উন্নত করিতে হইবে। বিনিময় উন্নত, দেশের কৃষি বিস্তারই পল্লী সংস্কারের এই প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলিতে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন।

অনেক দেশে Department of Agriculture এর নাম পরিবর্ত্তন হইয়া নাম হইয়াছে Department of Rural Economics. এই নাম পরিবর্ত্তনে সে সব দেশে কৃষি-কার্য্য কিছু কম হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। এ সম্বন্ধে বৈদেশিক বিচক্ষণ কৃষি স্বত্ত্ব বলিতেছেন To-day greater and better production. waits on the development of a better system of distribution, and that presents a most complex economic problem'.

• • •

আমাদের দেশের স্বাস্থ্য দিনের দিনই অবনত হইতেছে। ব্যাধি পীড়ার অন্ত নাই দেশে। যে ব্যাধি যেখানে আসিয়া জাঁকিয়া বসে সে ব্যাধি আর দেশ ছাড়া হইয়া কোথাও যাইতে চাহে না। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য বিভাগ রহিয়াছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রীও রহিয়াছেন। আরও ছোট বড় কত কর্ম্মচারী আছেন। তবু ব্যাধি পীড়ার এমন প্রাদুর্ভাব এ দেশে কেন? উত্তরে অনেকে বলিবে সকল সভ্য দেশেই এখন ব্যাধি পীড়া আছে কিন্তু তাহা সত্য নহে। সত্য দেশের একটি সংজ্ঞার মধ্যে এ কথাও আছে যে The development of its sanitary facilities is a pretty accurate index of the civilization of a community'. আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া এরূপ দেশের সমাজকে দোষ দিব না স্বাস্থ্য রক্ষার ভার যে বিভাগের উপর আছে তাহারই দোষ দিব?

• • • •

আমাদের দেশ হইতে বাণিজ্যিক সম্পদ হিসাবে যে সমস্ত কৃষি সম্পদ দেশান্তরে যায় সেই সম্পদ গুলির মধ্যে পাট অন্যতম প্রধান। কিন্তু এই পাটের ব্যবসায় পূর্ণ ভাবে কাহাদের হাতে রহিয়াছে? এক বাংলা দেশে এই পাট লইয়া কোটি কোটি টাকার ব্যবসায় চলিতেছে। প্রধানতঃ এই ব্যবসায় বিদেশীদিগের হাতে। ইহা অবশ্য আমাদের দেশের কৃষাণ,—এই দেশের মাটিতে। নিজ প্রয়োজনে, নিজেদের প্রচুর লাভের আশায় বিদেশীরা বাণিজ্যিক সম্পদ হিসাবে ইহা কিনিয়া লয়। কিন্তু বিচিত্র এই যে যাহাদের পরিশ্রমে ইহা উৎপন্ন হয় তাহারা ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। মূল্য নির্দ্ধারণ করেন

•

যাহারা কিনিবেন তাঁহারাই। সুতরাং পাটের এই ব্যবসায়ে চাষাদের যাহা লাভবান হয় তাহা সহজেই বোঝা যায়। দেশের উন্নতির জন্য দেশের নেতাগণ নানা প্রচেষ্টা করিতেছেন। দেশের দুর্দিনস্থায় এই পাটের ব্যবস্থাটা যদি দেশবাসী নিজেদের হাতে রাখিয়া করিতে পারিত তবে দেশের অর্থাগমের পথ অনেক পরিষ্কার হইতে পারিতখন্ড।

আমরা সকল কাজেই সহজ পথ ধরিতে চাই খাইয়া, বসিয়া, শুইয়া যেমন ভাবে আছি তেমন ভাবে থাকিয়াই আমরা নিজেদের উন্নতি ও মুক্তি কামনা করি। প্রতিদিনে প্রতি অবস্থাতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি তেমন সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে নিজের উন্নতি, সামাজিক উন্নতি ও জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। পথ চলিতে তাহা আমরা সহজ সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে চাই, কোন কার্য্যে নামিয়া তাহার ভিতরে তেমন ভাবে প্রবেশ না করিয়া উপর উপরা পাইয়া বাজী মাৎ করিবার এই চরিত্রগত দুর্বলতা আমাদের মধ্যে ক্রমেই সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে। তেমন সহজ ভাবে যদি প্রার্থিত ধন মিলিত তবে আজ জগতের অতি উন্নত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশসমূহের অধিবাসীরা এতাবে নিজে বহুল বিপদের সম্মুখীন হইয়া মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া তাহা লাভের আশায় ব্যয় করিতে পারিত না। গিরি, মরু, পর্ব্বত বন, উল্লঙ্ঘন করিয়া, ঝঞ্ঝাবায়ু, সাগরের অতল পরশকে উপেক্ষা করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রের ঝন ঝনা, আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নি বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া মরণ বরণের এই যে সাহস ইহার মধ্যে ভুল নাই—এই সাহসের মধ্যেই জাতির প্রাণ স্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়—জাতির যে জীবন আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কাপুরুষে—সহজ পথে চলিবার চেষ্টাতে, জাতির অবসাদের লক্ষণ ক্রমেই বাড়িয়া যায়—দুর্বলতা চারিদিক হইতে তাহাকে পিষিয়া মারিবার জন্য প্রস্তুতভাবে জাঁকড়িয়া ধরে। দুঃখকে বরণ করিবার মধ্যে—সহন ক্ষমতার মধ্যেই জাতির প্রাণ—শক্তির পরিচয়—যাহারা ইহা বরণ করিতে ভীরু তাহাদের মুক্তি এখনও দূরে।

• • • •

ছেলেরা সঙ্ঘ করিয়া আখড়া করিয়া সখের থিয়েটারের আখড়া বসায়। সারাদিনের কর্ম্মশ্রান্ত ক্লান্ত চিত্তে তাহারা আখড়ায় আসিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসি ঠাট্টার গল্প গুজব করে, শিল্প চর্চ্চা করে। একসঙ্গে অবস্থান, একসঙ্গে এক উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করার ফলে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালী আয়ত্ত করিয়া ফেলে। এইখানেই সেই সকল আখড়ার সার্থকতা! কলিকাতা সহরের চোরবাগান পল্লীর ফ্রেণ্ড্ ড্রামাটিক ইউনিয়নের নাম সর্ব্বত্র পরিচিত। সম্প্রতি তাঁহাদের সমিতির ২৫শ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গত সোমবার মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে রাত্রি আটটায় সুধা আমরা সে অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত, বক্তৃতা (ইংরেজী ও বাংলা) ব্যায়ামের আদান-প্রদান—যাহা কিছু দরকার সব হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় মাতৃভাষায় একটি সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন—উপস্থিত জনমণ্ডলী সেটি খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। সভান্তে সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক বঙ্গের জাতীয় মহানাটক "প্রতাপাদিত্যের" অভিনয় হয়। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। আজকাল ভূপেনবাবুর নব-নব নাটক নাটিকার অভিনয় দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, তাঁহার অভিনয় দেখিয়াও আমরা অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। সেদিন সভায় ভূপেনবাবুকে সমিতির পক্ষ হইতে একটী রৌপ্যাধার উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। ভূপেনবাবু এই সমিতির মেরুদণ্ড। তাঁহার যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমের বলেই সমিতির ২৫শ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে—তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে রৌপ্যাধার উপহার দিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন, নিজেরাও সম্মানিত হইয়াছেন।

# অযোগ্যে প্রসাদ

( সংস্কৃত হইতে )

[ শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর ]

ওগো জলধর, বিরহ প্রখর ভাঙা সহা যায় কিন্তু হে হায়,
নিবেদে করিয়া নীরব নত, আবরি নিশীথ গগন রাজে
ভেবেছে মুখরা করিবে তাহায় ঘোনাকির দল করিবে উপহাস:
আমার কাজ বাড়ানো কত। এ ব্যথা প্রবল হৃদয়ে বাজে।

## ব্যাল-পঞ্চানন।

ইনি ধরাপৃষ্ঠ হইতে অশ্লীলতা মোচনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

# সাহিত্যকণা।

[ সুধীবর্গের অবধারণার্থ ]

( শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ সংগৃহীত )

(১) বিপদই চরিত্র গঠন করে।

(২) আলস্যের পরিণাম বুদ্ধিহীনতা।

(৩) আশাহীন লোক পৃথিবীতে জীবন্মৃত।

(৪) স্থিরচিত্ত না হইলে সাফল্য লাভ করা দুরাশা মাত্র।

(৫) জীবনযাত্রার সংগ্রামে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই খাঁটী শিক্ষা।

(৬) পরাজয় ও তাহার পরিণামকে ভয় করিলে সংসার চলা দুষ্কর হইবে।

(৭) আমরা যখনই নিজ-নিজ দুঃখের কথা বলি তখনই সীমার বাঁধ ছাড়াইয়া যাই। অতিরিক্তি না বলিলে বেশ শান্তি পাই না।

(৮) পরচর্চার অপেক্ষা মুখরোচক জিনিষ বিরল।

(৯) রূপ দেখিয়া বিবাহ করার অর্থ দুঃখটাকে সাধরে বরণ করা।

(১০) জাঁকজমকের বিবাহটা কেবল জানি অনেক সময়ে দাম্পত্য জীবনে শান্তি আনিতে পারে নাই।

(১১) পরের রহস্য জানিবার প্রবৃত্তি স্ত্রী-চরিত্রের একটা বিশেষত্ব।

(১২) বুদ্ধিমান্ ও শান্তিপ্রিয় স্বামী ভুলেও স্ত্রীর নিকট অন্য কোন নারীর প্রশংসা করিয়া বিপদ ঘটাইবে না।

---

এবার থেকে ঝুল-চুলকালো সার হবে।

# তোড়া

[ শ্রীশ্রীউমাপ্রসন্ন দে, বি-এ ]

## মেচ্‌বাতির জন্ম

আজকাল বাতি জ্বালানো খুব সোজা। চট্ করে একটা কাঠি হাতে নিয়ে ঘস্ করে ঘষ্‌লেই দিব্যি আলো জ্বলে উঠ্‌বে। কিন্তু সেই সেকালে এই ব্যাপারটা এত সোজা ছিল না। তখন আগুন জ্বালাতে হ'ত চক্‌মকি পাথরে ঘষে ঘষে। এই তো সেদিন হ'ল, মেচবাতির জন্ম। আজ ১১৮ বছর আগে জেন্‌সেন্ সাহেবের মাথায় মেচ্‌বাতি তৈরীর বুদ্ধি প্রথম খেলে। তাও কিন্তু অত সহজে নয়।—মেচবাতির কাঠিটা একটা এসিডের বোতলে ডুবিয়ে নিলে তবে সেটা জ্বলে উঠ্‌ত।

• • •

## দৃষ্টিরেখা

হয়তো তুমি একটা মেয়ালেরা বাড়ীর ভেতর কাজিয়ে আছ। তোমার চোখ হ'তে মেয়ালের ওপর পর্য্যন্ত মনে মনে একটা রেখা এঁকে যদি তা বরাবর বাড়িয়ে দেও, তা' হ'লে দেখ্‌বে যে ঐ বাগের নীচে যে-সব গাছপালা ছিল তা তোমার চোখে পড়্‌বে না—ঐ মেয়ালের আড়ালে পড়ে থাক্‌বে। কাজেই দেখা গেল যে বাতাসের ভিতর দিয়ে আমাদের দৃষ্টি রেখা সাধারণতঃ সোজা চলে যায়; কিন্তু জলের ভিতর কিন্তু তা নয়। তখন যায় এ রেখা একটু নীচদিকে বেঁকে। একটু নীচের জিনিষ ও চোখে পড়ে! জলে আর ওপরে দেখ্‌তে যে একটু তফাৎ হয়, তার স্পষ্ট পরিচয় পাবে যদি জলের ভিতর তোমার বুড়ো আঙুলটা রেখে দাও। আঙুলটা তখন ভারি অদ্ভুত মোটা কিন্তু!

• • •

## ভোজ-বাজি

একটা ভোজ-বাজি দেখেছো? একটা চেপ্টা চীনেমাটীর বাসনের ঠিক মাঝখানে একটা পয়সা রেখে দাও। তারপর দূরে একটা টেবিলের উপর বাসনটী রেখে তুমি আস্তে আস্তে তোমার চোখদুটী নামাতে থাক। চোখ-দুটী যতই নীচে নাম্‌বে, পয়সাটীও ততই আড়ালে যেতে থাক্‌বে। কিন্তু দেখ্‌বে এমন একটা জায়গায় আস্‌বে যখন তোমার চোখ একটু উপরে উঠালেই পয়সাটা নজরে পড়্‌বে—আর না উঠালে পয়সাটা আড়ালেই থাক্‌বে। এখন যদি কেউ ধীরে—অতি ধীরে জল ঢেলে দেয় ঐ বাসনের ভেতর, তা' হ'লে মনে হ'বে যেন পয়সাটা একটু একটু করে' ভেসে উঠ্‌ছে। কেন?—আগেই বলেছি, জলের ভিতর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে দৃষ্টি-রেখা একটু বাঁকা হয়ে যায়—একটু নীচের জিনিষও চোখে আসে। তাই পয়সাটা সেই জলে ডুবে গেল অমনি তা' তোমার চোখে পড়্‌ল।

• • •

## হিমালয়ের হিম

জলের নিয়মই হচ্ছে এই যে সে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌তে চায়। তাই গরম চা একটু সময় রেখে দিলেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা' ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। কিন্তু গরম জলের কেট্‌লি যদি আচ্ছা করে বন্ধ করে রাখো, তা' হ'লে সে তাপটা বেরিয়ে যেতে পার্‌বে না সহজে! চাক্‌নি থাকাতে জলের তাপটা ভিতরে আটকা পড়ে যায়। যেমি পৃথিবীর ভিতর যে তাপ আছে তা সব সময়ই বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বায়ুর আবরণ এসে তাকে চেপে ধরে, বলে "তোমায় যেতে দেব না আমি। পারো যদি আমার ভিতর দিয়ে রাস্তা করে চলে যাও।" যে-সব জায়গা খুব নীচু, সে জায়গায় বায়ু থাকে বেশী পুরু; পাহাড়ের ওপর যতই উঠ্‌বে, বায়ু হ'বে ততই পাত্‌লা। তাই সেই পাত্‌লা বায়ুর ভিতর দিয়ে পথ করে তাপ অনায়াসে পালিয়ে যায়—পাহাড়গুলি ঠাণ্ডাও হ'য়ে যায় তাড়াতাড়ি। হিমালয় এত উঁচু বলেই সেখানে হিম এত বেশী। তা'ছাড়া সূর্য্যেরও কিছু হাত আছে বই কি!

• • •

## মেঘ্‌লা রাতে

পৃথিবী দিনের বেলা সূর্য্যের আলো জমা করে রাখে। তার জোরের ঠাণ্ডা যেখানে সেখানে দেখ্‌তে আগুনের মত গরম হ'য়ে যায়। কিন্তু যেই রাত এল, অমনি তার জমানো তাপ বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে উতলা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু রাতের আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তবেই মুস্কিল! তারী নজরি শালের মতো সে পৃথিবীটাকে ঢেকে রাখে—বায়ুর চেয়েও পুরু এ পরদা ফাঁক করে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না! পৃথিবীর তাপও তাই বেশী কমতে পারে না। তাইতো মেঘ্‌লা রাতে একটু বেশী

# অভাগিনীর প্রলাপ

[ শ্রীহেমন্তকুমার সরকার ]

নিম্নোদ্দেশে :

"স্বপন যেমন আসে গো
এই ঘুমঘোরে ভাসিয়া
যাবিলে কঠিন পাশে গো
অতিশয় ভাল বাসিয়া।"

অকূল সমুদ্র—দিগন্ত বিস্তৃত কুজ্ঝটিকা—চারিদিকে ভীষণ তরল ভঙ্গ—ওরুপেলে আঘাত পেয়ে আমার ক্ষুদ্র তরী খানা ভেঙে গেল। দু এক খানি কাঠের টুক্‌রা ধরে লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে তরঙ্গ আঘাতে আমার শেষ অবলম্বন খানিও কোথায় চলে গেল—সাঁতরাতে সাঁতরাতে অবশ দেহে স্রোতের বেগে ঢেউএর মুখে ভেসে চলেছি—আশ্রয় মনে করে ভীষণ জল জন্তুর দেহ অবলম্বন করেছি—পরে জানতে পেরে হতাশ হয়ে সভয়ে তা ছেড়ে দিয়েছি—অকূল সমুদ্রে নিশা-শেষের ঘোর অন্ধকারে আবার ভেসে চলেছি।

দেহ মন অসাড় হয়ে এসেছে—চেতনা লুপ্তপ্রায়—এমন সময় দাঁড়ের শব্দের সঙ্গে তাল মিশিয়ে যেন কোন এক চির পরিচিতের অস্পষ্ট গীতিধ্বনি কাণের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করল। অতি পরিচিত এ স্বর—তবুও যেন চিন্‌লাম না—দেখতে দেখতে তরী খানি আমার নিকটে এল—মাঝি আমায় কত যত্নে কত আদরে অকূল সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে কোলের উপর আমার মাথাটি রেখে চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করতে লাগল।

চোখ মেলে দেখি, এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যময় দেবমূর্ত্তি—করুণা স্নেহ, পবিত্রতার জ্যোতিতে যেন উদ্ভাসিত। দর্শনমাত্রে হৃদয় পবিত্র হয়ে গেল—অলক্ষিতে সেই দেবতার রাতুল চরণে জীবনও সমর্পিত হল। সে মূর্ত্তি—

"হেরিলে জুড়ায় আঁখি
ভাবিলে অন্তর সুখী
নিখিল জগৎ করে সুখময় ধাম,
সুধা ধারা ঢালে কাণে
প্রাণে প্রাণ ফিরে পাবে—"

কি যেন মোহিনী মাখা—অনুপম ভাব। অকূলের অতলে, সুধা কত বরিষত, বচন অমিয়া তনু যায় যেন মনে হোই, চরণে চরণ ধরি, রোধই পরিহরি গোকুলনাথ।

(২)

উষায়

"তুমি কি মহান্ দেব,
আমি কি মলিন ক্ষুদ্র
আমি পঙ্কিল সলিল বিন্দু
তুমি সুধা সমুদ্র
তবু মোরে ভালবাস,
ডাকিলে হৃদয়ে এস
তাই এত অযোগ্যের লাজ"

উষার স্নিগ্ধ অরুণিমায় পূর্ব্ব গগন রাঙ্গিয়ে উঠেছে—মৃদুমন্দ প্রভাত সমীরণ কুসুমগন্ধীর সুরভি গন্ধ বহন আন্‌ছে—বিহঙ্গের কলকণ্ঠের গীতিধ্বনি তরঙ্গের মৃদু শব্দের সহিত মিশে এক অপূর্ব্ব তান তুলেছে—কুয়াশা কেটে গিয়েছে—আমরা ছুটী প্রাণী তীরে এসে পৌঁছলাম।

কত কথা মনে হতে লাগল—নবীন প্রেমের পঙ্কিল হৃদয় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কতভাবে স্পন্দিত হতে লাগল। এ কি অহেতুকী দয়া! আমি তো তার পদস্পর্শেরও যোগ্য নই। বিদ্যা, বুদ্ধি, ভাব, রূপ, গুণ—সামাজিক উৎকর্ষ, ধনে, মানে—সকল বিষয়েই সে আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে উচ্চ। আমি দরিদ্রের সন্তান—ভাগ্যহীনা, বিদ্যাহীনা, বুদ্ধিহীনা! হায় দুরাশা—এ যে বামনের চাঁদে হাত! সে কি আমায় ভালবাসবে? আমি যদি এ ক্ষুদ্র প্রাণের সব ভালবাসাটুকু সে চরণে অর্ঘ্য দিই—সে কি তা গ্রহণ করবে? আমি কোন্ সাহসে মুখ ফুটে সে কথা বলি। সত সংশয়ে হৃদয় আন্দোলিত,—তবে আমার মত প্রাণীর কি গতি নাই—তবে কি শুধু অন্ধকার দেখতেই ধরাতলে জন্মলাভ—তবে কি প্রেম-স্বর্গের চিরোজ্জ্বল স্থির জ্যোতি আমার মত অভাগিনীর জন্য নয়?

না—সে যদি আমায় ভালই না বাসবে, তবে কেন আমায় বিদায় গ্রহণের সময় সে ছল ছল চোখে প্রশ্নভরে

নিশির মত রহস্যের মত তার তরুণ মুখখানি ভার করে দাঁড়িয়ে ছিল? আর সেই—বিদায় আশিষন—পাহাড়ের নীচে তটিনীর তীরে নিবিড় বটের সাথে কালো ছায়ায় চন্দ্রালোকে সেই আলিঙ্গন—সেই বুকভরা আশিষন—কত কথা—কত বিচ্ছেদ বেদনাই আনিয়ে দিল। দেহ পৃথক হল বটে—কিন্তু যে প্রেমের বন্ধনে প্রাণ—বদ্ধ হল—তার কাছে—সময় ও স্থানের দূরত্ব নাই—সেখানে জরা মৃত্যুর অত্যাচার নাই—সে কেবল অনন্তের অমৃতের এক প্রাণতায় পূর্ণ। মনে হ'ল—

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
সত্যরূপে সত্যবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার!
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি—
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।

* * *

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে নিমেষে
সকল প্রেমের স্মৃতি।

(৩)

## প্রভাত বেলায়

"এক প্রেমে তৃপ্ত হলে জীবনের সব প্রেম তৃষা।"

সে দূরে আছে—কিন্তু কই—মানস চক্ষের আড়ালে তো তার মোহন মূরতি এক মুহূর্তের জন্যও যাচ্ছে না। প্রাণের গভীর বেদনা চোখের কোণে গলে এসে মোটা মোটা হয়ে পড়ে তার সহিত মিলনের অশ্রুত আকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছে। সে মোহনীর প্রথম দর্শনে জীবনের সঞ্চিত মলিনতা নিমেষে কোথায় চলে গিয়েছে—সে মূর্ত্তিকে হৃদয়ের শাশ্বত আসনে বসিয়ে পূজা করেই—আজ সারাক্ষণ সময় কাটুক। সংসারের সুখ দুঃখ, প্রেমভরা আমি এ মহা সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। মনের মাঝে তো খেলা করছে—Beauty is a joy for ever; But this joy will sink the human immortal. (সুন্দর আজ—আনন্দের বেলা বলে—কিন্তু সব আনন্দের মাঝে হৃদয়ের মত-এই শূন্যতা তার অভাব জানিয়ে দিয়ে যায়। তাহলে—আমি সৌন্দর্য্যরাশি নিয়ে কত রঙে কত ভঙ্গে নয়ন সম্মুখে রেখে। যেন—কিন্তু তার সকল উৎসবের মধ্যে—"সে কাছে নাই" এই কথাই কেবল আমায় বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে।

"সে-নাই" এই ভাবনাই যে তাকে আমার কাছে সব সময়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে। স্বপ্নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে কেবল তার অভাবই যে তাকে আমার হৃদয় হতে নড়তে দিচ্ছে না।

তার পত্র—সে যেন আমার নিকট স্বর্গরাজ্যের দূত। কত ব্যাকুলতায় লিখন ফল এই পত্রখানি—কত আশা আকাঙ্ক্ষায় সে পত্রের আবরণ উন্মোচন—কত অশ্রুজলে তার পংক্তিগুলি পাঠে অস্পষ্টতা। না কেঁদে শান্তি নাই—নীরবে নির্জনে কতই কেঁদেছি—সে কান্না বুঝি স্বর্গরাজ্যের শান্তি সংবাদবাহী দূত।

সে এখন কোথায়? সেখানে না এখানে? এই যে এখনো তো তার হাসিমুখ দেখতে পাচ্ছি—পাই দেখছি আমরা শাশ্বত পথের একত্র বহু দুইটি যাত্রী—তবে বিচ্ছেদ কিসের? বিচ্ছেদ ভাবলেই বিচ্ছেদ, ওসব ভুল। তবে মানস চক্ষুতে দেখলেও কি যেন একটা অতৃপ্তি থেকে যায়—তাই ইচ্ছে হয় একবার গিয়ে চর্ম চক্ষুতে দেখে আসি। আর বিলম্ব সইব না—এখনি তার কাছে যাবো—যেপে যেপে পথ চলবো না—সংসারের বাধা লজ্জার আগুন দিয়ে তার কাছে ছুটে গিয়ে প্রাণ শীতল করবো।

আনন্দ, কত আনন্দ—এই তো তার কাছে গিয়েছি—কত অকথিত কথা—কত অশ্রুজল—কত স্নেহপরশ। হায় হায়, এযে শুধুই কল্পনা!

জানিনা সে কেন আমায় এত ভালবাসে? সকলের চেয়ে মৃঢ় সন্তানটির উপর মায়ের যেমন অধিকতম স্নেহ—তেমনি আমার উপর তারো কি তাই? অথবা, সে উদার চরিত্র, সকলকেই ভালবেসেছে, তাই আমাকেও বুঝি বাসে?

তার স্মৃতিখানিই আমার উপাসনা—তার পত্রই আমার ধর্মপুস্তক—সে দেবতার মধুর কথা ও পবিত্র উপদেশ যে আমার জীবনের রাঙ্গা—হায়, পৃথিবীতে যে

তার দানের প্রতিদান দিই নাই—তোমার অভিষেকে সে অশ্রুবিধৌতনীরের কণ শোধ হবে কি? ঐ ক্ষুদ্র জীবনের নৈবেদ্যে দেবতার পূজা হবে কি? প্রাণের বিনিময়ে সে ঋণের কড়ি কিরিয়ে দিতে পারবো কি?

যত প্রেম আছে সব ঢেলে দোবো
তোমা পানে ধেয়ে ধাইতে।
সকলের প্রেমে হবে তার প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে।

---

(৫)

প্রথম মধ্যাহ্নে—

"হুখ কোথা হুই কাছে নিয়ে আমিয়া।
ছেলেবেলাকার দিনের মধ্যে—কত বর্ষ আগার পরের পর আসছে তো গেই—সুখের দিনও সমাগত—কিন্তু অন্তরের ভিতরে ভাবনা যে তাকে ধেরেও ধেতে দিচ্ছে না। মন বলছে থাকো—চিরদিন—ঘুরে যেও না—সারাদিন কাছে কাছে থাকো—যে কটাদিন আছ—যেন এক মুহূর্তও তোমার চোখের আড়াল না করি।" আমার দিবসরজনীর সাধনা সেই ধ্যানমূর্তি আমার চোখের সামনে উপস্থিত—আমার হৃদয়ের কত গভীর—নয়নভরে দেখি—প্রাণভরে এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে ভরি। কত সুখে কত দুখে অজস্র অশ্রুরাশি উথলে উঠছে—হায়, নিষ্ঠুর অশ্রু-ধারা, কেন চোখের উপর এসে আমার প্রিয়তমের সাকাৎ সৌন্দর্য্যকে নিমেষের জন্যও আড়াল করছ? হাঁ, আজ স্থানকাল ভুলতে পেরেছি—আজ দিনও নাই—রাতও নাই—আছে শুধু দুটি প্রাণের অবিশ্রান্ত মিলন সুখ। আমার কত অসম্বলে নিশা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে—তাই আজকের বেলা পারি নি। ভবের আকাশের একেই বুঝি ভালবাসা।

আজ বিশ্বে প্রভাত—কোথা দিয়ে দিনরাতটুকু চলে গেল—তা তো বুঝতেও পারলাম না। এত শীঘ্র কেন কেটে গেল—নিশ্চয়ই সময়ের এ ভুল কি সহজ না? যাও প্রিয়তম, আমাদের প্রেম যেন কর্ত্তব্যের প্রতিপন্থী না হয়—তাহা যেন মেয়েরই আমার না ক'রে থাকে। বিবাহকালে তোমার সেই অনিমেষ চাহনি—সেই বিনয় বেদনেভরা করুণ মূর্ত্তি—আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকবে—তোমাকে সদাই আমার নিকটে ধ'রে রাখবে।

"Beloved, let us love so well,
Our work shall still be better for our love,
And still our love be sweeter for our work."

---

(৬)

পূর্ণ মধ্যাহ্নে—

"সখি, কে বলে পরাণ নাই
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মনপ্রাণ।"

কি যেন এক ভাব সব সময়ে উথলে উঠছে—আমাকে অস্থির করেছে—নিদ্রাতেও বিরাম নাই। অবসরকালে সেই নাম জপ করে কাল কাটাই। আর প্রার্থনা করি—"হে ভগবান, তাকে সোণা করে যে—খাঁটি সোণা করে যে—তোর মত তাকে পূর্ণ করে যে—যদি কিছু অভাব থাকে পূরিয়ে যে—তাহলে আমি ধন্য হব, আমার জীবন সার্থক হবে।"

আমি স্বার্থপরতা চাইনা—অন্ধকারমুক্ততা চাইনা—আমি চাই প্রেম—প্রেম—প্রেম—চাই আপনা-হারা প্রেম। আমি প্রেমের ভিখারী—চাই না ঈশ্বর—চাই না শক্তি—চাই না বেহ—চাই না মুক্তি—চাই কেবল এক বিশ্বব্যাপী অখণ্ড প্রেম—আমাকে প্রেমে ভাসিয়ে দাও। তৃণের মত আমি যেন সেই স্রোতে ভেসে ভেসে অনন্তের দিকে ছুটে যাই। হায়রে কথাই—সার হলো।

মানুষের ভাষা কত ছোটো—কত দরিদ্র। তার মুখখানি যেমন একবারে সমগ্রভাবে ধারণা করতে পারি না—তেমনি তাকে কি নামে ডেকে তৃপ্তি পাবো—তাও ঠিক করতে পারি না। ভাষার রাজ্য কত ছোট—প্রাণ হৃদয়ের রাজ্য কত বড়। মনে হয় আকাশ বুঝি অসীম—কিন্তু কত দূরে সীমা পাই না—আকাশ যেন আগে আগে ছুটে চলে। হৃদয়টাও ঠিক তাই। মনে হয় হৃদয়টা সুন্দর—সসীম—কিন্তু সুন্দর কোথায়? সীমাই বা কোথায়? ভালবাসি, কিন্তু ভালবাসার শেষ তো পাই না। মনে হয় একটী প্রাণীকে ভালবাসবো কিন্তু তা তো পারি না। প্রাণে একটা অতৃপ্ত বাসনা থেকে যায়—সেটা এই—

আরো ভালবাসবো—আরো ভালবাসবো—আরো ভালবাসবো—ভালবাসার শেষ কই? হৃদয়ের সীমা কই? এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর একটা প্রাণীকেও তো কেহ প্রাণপণ আর ভালবাসতে পারা যায় না—হৃদয় বলে—আরো চাই, আরো চাই—ভালবাসার শেষ তো খুঁজে পাই না। একটিকে ভালবাসতে গেলেই তো এই হয়—অনেকের বেলা বা সকলের বেলা কি হয়—তা জানি না। তাই বুঝি প্রেমের ঠাকুর নিমাই কেঁদে কেঁদে কারার বিরাম দেখতে পেলেন না—ভালবেসেও ভালবাসার শেষ দেখতে পেলেন না—প্রাণের দেবতাকে সম্মুখে দেখেও তৃপ্তি মিটল না—কেবল মনে হচ্ছে—কৈ নাই—কৈ নাই। যাকে দেখতে প্রাণ যায় তাকে দেখেও তো প্রাণ তৃপ্ত হয় না—প্রাণ আরো আকুল হয়—বলে, আরো দেখবো। আরো মধুপান করবো। মৌমাছি যখন মধুর উপর বসে—তখন তার প্রাণের দিকেও দৃষ্টি থাকে না—থাকে কেবল একটা অতৃপ্ত বাসনা—নিজের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ ভুলে সে কেবল মধুপানে মাতোয়ারা হয়। শেষে হয় তো মধুপানে তার মৃত্যু হয়—সে আর উঠতে পারে না। মক্ষিকার মত তৃপ্তি কি পাব? যে প্রেমে নিজের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না—যে প্রেমে বাঁচবো কি মরবো সে চিন্তা, সে জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না—যে প্রেমে অতীত, ভবিষ্যতের ভাবনা থাকে না—থাকে কেবল বর্ত্তমানেই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির ভাব—সে প্রেম কি এ জীবনে পাবো? প্রেম কি? প্রেম কাকে বলে জানি না। তবে কেন এ পাগলকারী তৃষ্ণা—কিছুই বুঝি না—জানিও না—প্রাণই জানে, প্রাণই বোঝে।

"জানিয়ে প্রেমের ধর্ম্ম দেখিব কেমনে?"

একটা সংবাদ কেউ প্রাণে চায়—কেন চায় তা আমিও জানি না—আর সেও জানে না—চায়, চায়, এই পর্য্যন্ত। যা—পাখি—তাকেই পাখি ও আনন্দ। ইচ্ছা করে, দুইজনে একটা খুব নির্জ্জন প্রদেশে চলে যাই—যেখানে মানুষের সাড়াশব্দ নাই—নদীতীরে তৃণাচ্ছাদিত আকাশকে ছাদ করে মাঝ আঙ্গিনায় শোয়ব হয়ে দুজনে আঁকিয়া। মাঝে মাঝে দু একটী কথা—কথাই বা কেন? দুই প্রাণ এক হয়ে গেছে—এক স্রোত দিয়ে তাকে ঘিরে চলেছে—মাঝে মাঝে এক একটী তরঙ্গ। দুইজনের দৃষ্টি এক হয়েছে—এক—ঘরে আকাশের পানে চেয়ে আছে—চাঁদের দিকে চেয়ে আছে—তারার দিকে তাকিয়ে আছে—দূরের দিকে চেয়ে আছে—প্রশস্ত সলিলা নদীর দিকে চেয়ে আছে—গাছের দিকে চেয়ে আছে—সবই এক—আর অবশেষে সকল ভিন্নতা এক হয়ে অভিন্নের অনন্ত গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। অস্তিত্বও নাই—আছে কেবল দুটো প্রাণীর একসঙ্গে গড়ে—প্রাণ কোথায়? চিন্তার স্রোত কোথায়? ভাষা কোথায়? কিছুই নাই—সবই অস্তিত্ব বিহীন—সবই অনন্তের মহাগর্ভে ডুবে গেছে।

---

(৬)

"অনন্ত অনন্ত হায় তবুও মোহারই নয়ন নীরে ভিজিল কেন।"

জ্যোৎস্না প্লাবিত নীরব—নিস্তব্ধ অমলবায়ু ছোট ছোট ঢেউ তুলে বেন এদিকে বহিছে—নৌকার উপর তরুণ দেবতার সামনে আমি বসে—চারিদিকে সখা-সখি মিলে আমরা আমাদের প্রেমের বেন অভিষেক—তাই উৎসুক বন্ধুজনের সমাবেশ। অনিমের কোরীরা ছুটতে লাগল—প্রেমের পর্শে নূতন পথিক এ সৃষ্টি প্রাণীকে কেন্দ্র করে কত উৎসব হয়ে গেল। রাত বাড়তে লাগল অম্বরে উঠে এসে নিদ্রাদেবীর শান্তিময় কোলে আমার মিলনের উন্মুক্ত আকাশ—ভাসাভাসা জ্যোৎস্না—কে যেন আমাদের চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিল।

আমির চোখ মুদিত হওয়ার অবসর নাই—আমার সামনে এখন নয়নমোহিনী বসে থাকতে কোন্ লোভে আমি ঘুমতে চাইবে। রসনা নির্ব্বাক হয়ে গেছে—আমি মন তন্ময়—অনিমেষ আঁখি আমার হয়ে গেছে—তার আঁখির চাঁদমাখানো দিকে চেয়ে আছে। তার মুখে প্রেমের কৌশলে বিজলীর মত সে চাঁদমুখে হাসি দেখা দিচ্ছে—যেন বলে দিচ্ছে, যে নির্ব্বোধ, সৌন্দর্য্যের শেষ দেখতে চাওয়া বৃথা চেষ্টা মাত্র! প্রভাতের পাখী তার কাকলী ধ্বনী সবাইকে জানিয়ে দিয়ে চলে গেছে—কিন্তু যে মধুর কাকলী আজ আমার প্রাণের উৎস হতে বার হচ্ছিল—সে আমাকে আমারও অগোচরে কোথা দিয়ে উধাও করে চুপি চুপি চলে গেছে।

—সেই স্বপ্নের যামিনী আজিকার সমাপ্তির স্থল। তার কিছুদিন পরেই আমি একদিন সে ফেলেছিল।

আমাকে কেন্দে সে দূরে ছিল—তাই অভিমান করে চলে গেছলাম। সে কতবার ডেকে ডেকে ফিরে গেল—তবুও আমার গোঁড়া অভিমান ভাঙ্গল না। আবদুল সমস্তরাত ছটফট করে রাত কাটাল—মনে হল সে বুঝি কাছেই আছে—আমার একটু চেতনা এলে বলে দিল—সে নাই। আহা সে কত কষ্ট পেয়েছে। ঝঞ্ঝাবিক্ষিপ্ত গাছ রাত্রের বেগে নাড়া পেয়ে যেমন অশ্রুবিন্দু ঝরণ করে, প্রভাতে বিহঙ্গকাকলীর আমাকে ঘেরে তার কাজলের মত আয়ত চোখ দুটি টস্ টস্ করে অশ্রু ঝরণ করতে লাগল। হায়, হায়, আমি কি নিষ্ঠুরতাই না

লাম—সেতো ফিরেও একবার তাকাল না—কেন আমি আসিনি। সে অতল, অটল—প্রেম যেন নীরব ভাষায় ব্যক্ত করে গিয়েছিল—"ভালবাসাতেই প্রেমিকের অধিকার গ্রহণে নয়—কেন এই প্রশ্নে তথা নাহি অধিকার" জানি না—অতখানি ক্ষমা কত বড় প্রেমে থাকতে পারে!

"যদি কোনদিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে
চির দিবসের যে রাজা আমার
ফিরিয়া যেয়োনা কভু।"

(ক্রমশঃ)

# স্মৃতি চিহ্ন

[ শ্রীগিরিবালা দেবী ]

ভিজা কাপড় ছাড়িয়া দিদিমার ঘরের ঘুষি পরিধান করিয়া 'লুই' গায়ে দিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন হইতেই দিদিমা কহিলেন "যাদু দিয়ে, গালিয়ে গেলেই চলবে না বলছি, আজ এইখানে থেকে ঝিনির হাতের রান্না খেতে হবে।" তিনি সরল সহাস্যমুখে কহিলেন "আচ্ছা তাই হবে দিদিমা। কিন্তু উনি রান্নাও জানেন। আমি ভেবেছিলাম কেবল লেখাপড়াই শিখেছেন।" "ও সব কাজই জানে, তবে আবার উনি বলা কেনরে মলয়? বিদিমা মেয়ে বলে বুঝি সমান দেখাতে হয়।" তিনি নিরুত্তরে আর একটু হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিপ্রহরে বাবা ও মলয়বাবু আহারে বসিয়াছিলেন। দিদিমা কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, খাওয়া প্রায় শেষ হইবার সময় মলয়বাবু কহিলেন "বড় সুন্দর রান্না হয়েছে দিদিমা, অমৃতের মত লাগছে।" "তোর মামুর যে ভাই রান্না করে তা ছিবাসের কাছে শুনেছি।" মাতুলের রান্না খাওয়া সুখে কলির রান্না তো ভাল জান যাদুই বলা।" কহিয়া দিদিমা আমাকে ভাল দিতে আদেশ করিলেন। বাবা কহিলেন "তোমার ঝিনুনীটা যখন তাল রাঁধতে পারে না, তখন দিদির কাছে তাল একটা রান্নাটা যায়। যে রান্না জানে তাকে নিজেও দুবিয়া তোয়ের করা।" তিনি স্মিতমুখে উত্তর দিলেন "অসুবিধা আর কি। আমার আর ছিলাম যার রান্না, তাই-ই সে ভাল করতে পারে না, অন্যে পেলে তার চলবে কেমন করে? গরীব বেচারা যা জানে তাতেই আমার চলে যায়।" পল্লীর মধুরতায় উদারতার পরিচয় পাইয়া আমার অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের সোপানদেশে রহিয়া রহিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল "বড় সুন্দর রান্না হয়েছে, অমৃতের মত।"

( ৪ )

রাত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কুসুমিত পুষ্পোদ্যান, বীণাবনের মর্ম্মরধ্বনি, রবিকরোজ্জ্বল নদী-বক্ষে সেই তরুণ জলদেবতা। কি একটি শব্দে আমার সুখ স্বপ্ন অন্তর্হিত হইল, চাহিয়া দেখি দিদিমার শয্যা শূন্য রহিয়াছে। বাবার গৃহে তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল কিন্তু কি কথা হইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিয়ৎকাল দিদিমার প্রতীক্ষা করিয়া মনে মনে কৌতূহলী হইয়া আমি শয্যাত্যাগ করিলাম। বাবার ঘরের দিকে যাইতেই আমাকে থামিতে হইল। শুনিলাম বাবার সহিত দিদিমা আমার বিবাহের কথাই কহিতেছেন। আমি বারান্দার নিকটে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় নিবিষ্ট মনে শুনিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে বোধহয় অনেক কথাই হইয়া গিয়াছিল, যাহা

শুনিলাম তাহার বর্ষা—কিশোরগঞ্জের নবীন জমিদার আমার পাণিগ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে গিয়া বাবার সহিত আমাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছেন; সুতরাং নূতন করিয়া আর কনে দেখাইবার গোলমাল করিতে হইবে না। তাঁহাদের একটিমাত্র আপত্তি ছিল আমার গায়ের রঙ্গের। পাঁচহাজার টাকার সন্ধান পাইয়া, বাবা তাহাতেও রাজী হইয়াছেন। এখন আপত্তিজনক কিছুই নাই। অনেক অবান্তর কথার পর দিদিমা কহিলেন "ছেলে পাঁচটা পরীক্ষায় পাশ, জমিদারী আছে, বলির সুখেরই হবে, ভগবান ওকে সুখী করলেই আমাদের আনন্দ। কাল সকালেই বিয়ের দিন ঠিক করতে চিঠি লিখে দিয়ো।" আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। বুকের মধ্যে কেমন করিতেছিল,—এক গেলাস শীতল জল পান করিয়া, দিদিমা আসিবার পূর্বেই দেশের নীচে নিজেকে লুকাইয়া ফেলিলাম।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, কিন্তু চোখে আমার ঘুম আসিল না। কত চিন্তা ঝড়বেগে অনুষ্ঠিত হইয়া শাখাপ্রশাখায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনে পড়িল কিশোরগঞ্জের জমিদারের সহিত বাবার আলাপ পরিচয়ের কথা, তাঁহার বেদনাক্ষুব্ধ, ভাবলেশহীন চক্ষের দৃষ্টি, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। তিনি ধনী, লিক্ষিত কিন্তু তাঁহার কথা চিন্তা করিতে গিয়া কোথাকার দেখা, কয়েকজন দেখা আর একজনার রহস্যময় মণ্ডিত মুখখানি, সরল গৌর দেহযষ্টি, ওষ্ঠাধরের হাসির রেখা মনে হয় কেন? অলিক্ষিতভাবে একদিন যাহাকে মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলাম, অবচেতনে সেই কি আমার মুক্ত হৃদয়-আসনে চিরতরে স্থান করিতে উদ্যত হইয়াছে? লোক বিবাহের কথা তুলিয়া, ভাবী স্বামীর রূপ গুণের কথা তুলিয়া তাহার প্রতি মুগ্ধ করিবার জন্য এতদিন যে আকুলতা জানাইত, তবে—তবে কি আমি নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে—মন কহিল, "এটা চিন্তা করছ, যে মুখর তাহাকে সকলেই মুগ্ধ দেখিয়া থাকে। কারো মনস্তত্ত্ব, মনস্তত্ত্বেই ঘুরে, স্পর্শ করে, ইহার নাম অনুরাগ নয়।" মনের সান্ত্বনায় হৃদয় আমার শান্ত হইল না, গীড়িত দলিত অজানিত ব্যথায় বক্ষের মধ্যে বার বার আলোড়িত হইতে লাগিল।

কয়েকদিন পরে কিশোরগঞ্জ হইতে বাবার পত্রোত্তর আসিল; কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া তাঁহারা চিঠি লিখিয়াছেন। বিবাহ কলিকাতা গিয়া দিতে হইবে, পাড়াগাঁয়ে আসিয়া বিবাহ করিতে বর প্রস্তুত নহেন। বেশী বিলম্ব হইলে মা তনিয়া দিদিমা দুঃখ হইলেন, প্রতিবেশিনীরা নিরাশ হইয়া ঘরের দীর্ঘশ্বাসের নিন্দা করিতে লাগিলেন। আমার বিবাহ সম্ভাবনায় আমার দুরাকাঙ্ক্ষে যবনিকা টানিয়া আসিলেন কেন যে, তাহার কারণ আমি নিজেই ভালরূপে অনুভব করিতে পারিলাম না, তাহা অপরে বুঝিবে কি করিয়া?

সেদিন অপরাহ্ণে রাজেশ্বর ঘন পল্লবিত বকুলগাছের তলে শ্যামল তৃণাসনে বসিয়া কত কি ছাই ভস্ম ভাবিতেছিলাম। এই গ্রাম, এই নদী এসব ছাড়িয়া কোথায় যাইতে হইবে ভাবিতেই প্রাণে বেদনার সঞ্চার হইতেছিল। মাত্র দুইটি মাসের জন্য মায়াজালে বন্দী হইয়া, আশা ছিঁড়িয়া অনিদ্দেশের উদ্দেশে যাইবার প্রস্তাবে প্রাণ সাড়া দিতেছিল না।

"অনেকদিনের পর তো আজ দেখতে পেলাম।" এখন একদিনও আপনার দেখা পাই না, দেখি কিন্তু ভাবি, আপনি আসবেন।" চমকিয়া মুখ তুলিতেই দেখিলাম, মলয়বাবু আমার নিকটে দাঁড়াইয়া। আমি আপনার চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলাম তাঁহাকে পদশব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই। তাঁহাকে তুলিবার প্রয়াসে, যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভয়ে আমি তাঁহার বড় সাধের আশ্রমটিতে এ কয়েকদিনের মধ্যে একটিবারও আসি নাই, সেই তাঁহাকে নিকটে পাইয়া অকস্মাৎ হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ বহিয়া গেল। কণ্ঠরুদ্ধ হইল, কথা কহিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে তিনি সহসা আমার শাড়ীখানার প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া সৌৎসাহে কহিলেন "বাঃ বেশ রঙের শাড়ীতে আপনাকে বেশ মানিয়েছে তো! খুসির ঈষৎ রঙের শাড়ী আপনি বেশী পরবেন।" ঐ মিষ্টমুখর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমার হৃদয় আনন্দিত হইয়াছিল কিনা তাহা জানিনা, হৃদয় কিন্তু আনন্দের দীপ্তিতে ভরা হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যমনস্ক ভাবে ঘাসের উপর হইতে ছুটিয়া পালাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু ইহাকে কাব্যে পরিণত করা হইল না। পুতিগন্ধময় নর্দ্দমার ধোলা আরো একটু বাড়াইয়া ছড়াইলে আমি

ওকে অনেক রকম কাজও খুঁজি। লাখি চড়টা খেতে পারো যদি আপনাকে বোঝাই এর চেয়ে সুখের দেখা যাবে।" এ কথার কি উত্তর দিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না, আমি নিতান্ত বিব্রতভাবে হঠাৎ করিয়া ফেলিলাম "আপনাদের আম গাছে খুব বোল ধরেছে।" কি কথার কি উত্তর,—মনে মনে নিজেকে শতবার ধিক্কার দিতে লাগিলাম। "হাঁ, এবার খুব আম হবে। টকো বুলের সঙ্গে আমের মুকুল দিয়ে অম্বল রাঁধলে খেতে বেশ, হয়—আপনি বুঝি তা জানেন না?" বলিতে বলিতে তিনি ঘরের মোটা চাদরখানা একটা পুলিস টহরদার গাছের উপর রাখিয়া মুকুল পাড়িবার জন্য আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি মৌন হইয়া নীচে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মুকুলগুলি কুড়াইতেও তুলিয়া গেলাম। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ওগুলো কুড়িয়ে নিন।" আমার চমক ভাঙ্গিল; আমি কম্পিত হস্তে মুকুল কুড়াইবার পূর্বেই তিনি গাছ হইতে নামিয়া মুকুলগুলি কুড়াইয়া আমার অঞ্চল ভরিয়া দিলেন। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে বশ্যবিষ্টের মত কিছী যন্ত্রিক ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় কানন পরিত্যাগ করিয়া, অন্ধকার-ঘন কক্ষে ঢুকিয়া মুকুলগুলি বক্ষোদেশিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িলাম।

(৫)

মাঘের শেষ। আকাশের, বাতাসে, ধরণীর বুকে বসন্তের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমার কিন্তু আনন্দে মন নাচিয়া উঠে নাই, মনিবেরও যাই, শুধু হবো পুলকোজ্জ্বল আমার বিবাহের মিলন নাই, কলিকাতায় বাসা ভাড়া হইয়াছে, গহনার ফরমাইস দেওয়া হইয়াছে। কোথা হইতে কোন কুটুম্বকে লইয়া যাওয়া হইবে, যাত্রার তারিখ স্থির হইয়া গিয়াছে। আমাদের কলিকাতা যাত্রার দিন আসন্ন প্রায়। কয়েক দিন বাবুর সহিত আমার দেখা হয় নাই, ছোট মিনিক আমার কাছে, কলঘরে প্রবাহিতা তটিনী, দিবানিশি আমার মনের সঙ্গে কথা কহিলেও আমি অভিকষ্টে আমার কোনও ভাবকে সংযত করিয়াছি, কিন্তু পারিয়াছি কি? গ্রাম সম্পর্কে কাকীমা সেদিন বিপ্রহরে আমাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ী হইতে যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন বেলা বেশী ছিল না। পথের ধারে বৈবাদ সমাজের পুষ্করিণীর প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর, তালীবনের উচ্চশীর্ষে, আমলকীর বাগানের সুবর্ণের ন্যায় কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বসন্ত সমাগমে কোকিলের কণ্ঠে সুধার উৎস খুলিয়া গিয়াছিল। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বড় বাবুর পুরাতন ভৃত্য হিরায় তাঁহার ঘরের দ্বারের নিকটে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছে। দিদিমা উঠানে বসি তামাকে ছিলেন। হিরায়ের সহিত ইতি-মধ্যে আমার বেশ আলাপ সালাপ জমিয়াছিল। তাহার আপন ভোলা পরোপকারী বাবাবাবুর সুখ দুঃখের অনেক কাহিনী সে কত সন্ধ্যায় কত মধ্যাহ্নে আমাকে শোনাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। আজ অসময়ে তাহাকে দেখিয়া আমি সভোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম "হিরায় বাবু কেমন এসেচ?" ম্লান মুখে হিরায় কহিল "অনেকক্ষণ হল এসেচি দিদি, তিন দিন হ'ল দাদা বাবুর জ্বর হয়েছে, বাবু বাসী খেতে পারেন না, তাই মার কাছে খইয়ের কথা বলতে এসেচি।" আহা জ্বর হইয়াছে, দেখিবার শুনিবার কেহ নাই, এ-তিন দিন বোধ হয় একেবারেই অনাহারে কাটিয়া গিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে আমি অবসন্নের মত সেই খানে বসিলাম। এমন বোতাটিকে নিকটে পাইয়া হিরায়ের বাক্যের উৎস খুলিয়া গেল। কেমন করিয়া তাহার মাবাপ মারা যায়, বোঠমীর সংসার করিয়া পরদিন রাত জাগিয়া, নিতাইলালের জন্য খুনের সেবা করিয়া জ্বর টানিয়া আনিয়াছেন তাহারই বিস্তারিত বিবরণ জানাইয়া হিরায় সকরুণ স্বরে আপনার দুঃখের গাঁথা আরম্ভ করিল। যাহার জন্য সে সংসারের প্রলো-ভন পরিত্যাগ করিয়া জীবনটা একভাবে কাটাইয়া দিল, সে আজ কাল অত্যন্ত অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। শরীরে যত্ন নাই, সময়ে নাওয়া খাওয়া নাই, কেবল পরের জন্য খাটিয়া মরা, আর পরের ভাবনা। বাবা দিলে হাসিয়া উত্তর দিবে "তোমার ওর কি হিরায়দা?" কারুর কোন কাজ করতে গেলেই আমি মরবো না তাই। মানুষের জীবন কঠিন। এর মধ্যে যতটুকু কাজ করে যাওয়া যায় তাই কি লাভ নয়?" দিদিমা খই বাছিতে বাছিতে কহিলেন "তোমার একটি মুস্কিল হয়েছে হিরায়, দেখে শুনে একটি ভাগর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও, বৌ ঘরে এনেই তোমায় বশে আনে।" এক গাল হাসি হাসিয়া হিরায় উত্তর দিল "ঠিক কথা বলেচেন মা, আমি সবসময়ই এই কথা ভাবি। আপনারা পাঁচজন আছেন,

দেখে শুনে এই দিদির মত একটি লক্ষ্মী মেয়ের সাথে ভালবাসার বিয়ে দিয়ে মেজ, বাবামায়ের স্থিতি দেখে এ মুক্তোর মুক্তোর ঝুড়াক।" বুদ্ধের সরল ইঙ্গিতে আমি লজ্জিত হইয়া উঠিয়া গেলাম। আসিবার সময় দেখিলাম দিদিমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছেন।

কিয়ৎকাল পর বইয়ের ডালা হাতে করিয়া দিদিমা ডাকিলেন "কলি চল মলয়কে মেখে আসিগে।" এতদিন হইয়া আসিতেছি এ পর্যন্ত একদিনো মলয় বাবুর বাড়ী যাই নাই, তাঁহার ফলের বাগানে বায়ু সেবন করিয়াছি, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছে কিন্তু তাঁহার বুকে যাইবার সুযোগ হয় নাই। দিদিমার আহ্বানে আমার হৃদয়টি হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আর কেন, এ ছলার বন্ধন হইতে মুক্তি আজ কর। আমার বিলম্ব দেখিয়া দিদিমা ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া কোমল স্বরে কহিলেন "এখানে দাঁড়িয়ে কি করচিস কলি? মুখ এত শুকনো কেন দিদি, আয় আমার সঙ্গে আয়।"

দিদিমার সহিত মলয় বাবুর বাড়ী গিয়া দেখিলাম খুব বাড়ীখানা নীরব নিস্তব্ধ। বড় বড় থামযুক্ত বারান্দা ও প্রশস্ত কক্ষগুলি অতীত বৈভবের চিত্তে মৌনীভাবান। উঠানে ছোট বড় কয়েকটা ধানের মরাই। পুকুরের পাড়ে, তার সোতার শোভিত পাক সবজির বাগান। গোয়ালে দাঁড়াইয়া কয়েকটা হৃষ্ট পুষ্ট গাভী জাব খাইতেছে। দিদিমের নিকটে শুনিয়াছিলাম এ গাভীর দুধ গরীব দীন দরিদ্র রক্তকাম্বরের রোগের পথ্য। একটি ঘরে কয়েকটা চরকা, দুইখানা তাঁত রহিয়াছে। এখানে অনেকেই তাঁত বোনা, চরকা কাটা শিখিতে আসে।

মলয় বাবুর কক্ষের সম্মুখে গিয়া দিদিমা মিষ্টস্বরে কহিলেন "তুই ঘরে গিয়ে মলয়ের কাছে একটু বসগে কলি, আমি দুধ জ্বাল দিয়ে আনি।" আমি মলয়কুঞ্জ ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইলাম। সে গৃহটী একটা ছোট খাট লাইব্রেরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েকটা বড় বড় আলমারিও সেলফে কত কাব্য, ইতিহাস দর্শন, বিজ্ঞান, নানা ভাষার নানাপ্রকার পুস্তক সজ্জিত রহিয়াছে। এই পুস্তকাবলীর অধিকারীকে একদিন মূর্খ ভাবিয়াছিলাম এ যদি মূর্খ হয় তবে পণ্ডিত কে?

ঘরখানার সমুদয়ই বিশৃঙ্খল, আলনা হইতে কাপড় জামা মেজের লুটাইতেছে। দেয়ালের গায়ে ঝুলিতেছে ছবি বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। বিছানার চাদর খাটের কোণে ঝুলিতেছে। বালিসের অর্দ্ধেক বিছিন্ন। তিনি মূর্ত্তির মতন শয্যায় শুইয়াছিলেন, আমার পদশব্দেই বোধ হয় আয়তন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন "কলি এসেচ? আমার গৃহলক্ষ্মী হতে হয় লক্ষ্মী এসেচ! এস, আমার কাছে এস।" আমার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। অনুমানে বুঝিলাম এ বিষয়ান্ধ অসুস্থ আমিই আজও পান করি নাই, আমার যৌবন আছে। কণকাল পরে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল, চক্ষের দৃষ্টি স্বাভ হইল, তিনি অর্দ্ধোত্থিত হইয়া ঈষৎ সংযত স্বরে কহিলেন "দাঁড়িয়ে রয়েচেন কেন? এসে বসুন, দিদিমা কোথায়?" "দুধ জ্বাল দিতে গেলেন।" কহিয়া আমি তাঁহার বিছানার পাশে বসিলাম। তিনি বিছানার নীচে হইতে কাপড়ে মোড়া একটি বস্তু বাহির করিলেন। কাগজ খুলিতে দেখিলাম একখানি লাল পেড়ে ধবধবে শাড়ী। কয়েক দিন পূর্ব্বের কথা মনে হইল। তিনি শাড়ীখানা আমার হাতে দিয়া অনুনয়ের স্বরে কহিলেন "এখানা আমি আপনার জন্যেই তৈরি করেচি, আমার হাতের কাটা সুতোয়। আপনারা তো শীগ্‌গির চলে যাচ্ছেন, আর হয় তো দেখা হবে না। তাই এদেশের একজন দরিদ্র দেশবাসীর ক্ষুদ্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই শাড়ী খানা আপনাকে দিচ্চি, নেবেন কি?" নেব না, আমি দুই হাতে সেই অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন বক্ষের মধ্যে নিবিড় করিয়া ধরিলাম। আমার অনাহূত অবাধ্য অশ্রুজল আর বাধা মানিল না, কত দিনের কত পুঞ্জীভূত বেদনা জল হইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অকস্মাৎ এ অশ্রুসাগর দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়া কহিলেন "আপনি কাঁদচেন কেন? আমার কথায় কি কোন রকম আঘাত পেয়েছেন? বলুন আমায়, কেন কাঁদচেন?" হায় কি বলিব, বলিবার আমার কি আছে? আমি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিজেকে সম্বরণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকালপর দিদিমা আসিয়া ডাকিলেন, "মলয় তোমার খাবার এনেচি, উঠে খাবি আয় ভাই। ওকি কলি, মুখ ঢেকে অমন হ'য়ে বসে কেন দিদি? তোর মুখেও কথা নেই, কি হয়েছেরে?" "আমি ওকে একখানা কাপড় বুনে দিয়েচি, আমার সেওয়াটা বোধ হয় অন্যায় হয়েছে দিদিমা, তাই উনি—কলি—কাঁদচেন।" "না, মাসী তোমার কিছু অন্যায় হয়নি, আমরাই না জেনে অন্যায় করতে বলেছিলাম।" কহিয়া দিদিমা স্নেহভরে আমার অশ্রুসিক্ত মুখ মুছাইয়া দিলেন। আমার শিথিল হাতখানা তাঁহার হাতের উপর তুলিয়া দিয়া কহিলেন, মলয় ভগবান বলিতে তোর জন্যেই, তৈরি করে দিয়েছিলেন, আমরা তা তো জানিনি ভাই, এখন জানতে পারলাম। কতদূর থেকে তোর কলি তোর কাছেই এসেছে, তুই ওকে গ্রহণ কর। দিদিমা কোথায়, হরিপদকে ডেকে আনত।" রোগযন্ত্রণার মধ্যেও দেখি তিনি আনন্দ উদ্ভাসিত মুখে দিদিমাকে প্রণাম করিলেন। আমি প্রণাম করিতে পারিলাম না, নত হইতে গিয়া সেই স্নেহময়ী রুগ্নশয্যার পুণ্য পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম।

# পতি-দেবতা

[ শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় ]

( ১ )

নিত্য নিত্য যেখানে সেখানে যাওয়া অনিলার কোন সাধ্যসাধনা না পাইয়া ললিতা আবার বলিল,—অনিলা, বেরিয়ে যেছিস্ বুঝি?

অনিলা সন্ধ্যা-প্রদীপটি তুলসীতলায় নামাইয়া যুক্তকরে দাঁড়াইয়াছিল ভগবানের কাছে প্রণাম করিতে কিন্তু প্রার্থনা করিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইল না। অথচ তাহাদের নিত্য-সঙ্কট। মরণকামনা তাহাদের নিত্য ওঠাবসা সকলেই যখন একে একে বিদায় লইয়াছে, তখন আর কাহার জন্য কি প্রার্থনা করিবে? বিনোদিনীর বুকের তল হইতে একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাসের সাথে চোখের পাতা ছল ছল করিয়া উঠিল।

অনিলা বাহিরে চলিয়া গেছে বুঝিয়া, ললিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখের দৃষ্টি আজিকাল যেন একটু ঝাপসা হইয়া গেছে, তাই অনিলা কখন্ যে ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছিল, দেখিতে পায় নাই। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হইবার একটু কারণও ছিল। বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ এই পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবনের হিসাব খতাইয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়, শুধু আঘাত এবং নিষ্ঠুর কান্না দিয়া ললিতার নারী জীবনটা তৈরী হইয়া আছে। স্বামী যেদিন হইতে তাহাকে এই পল্লী-কুটীরে সামান্য একটা মাসোহারা দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া, নিজে একটা বেশ্যার উপযুক্ত হইয়া কলিকাতার রাস্তায় হাসে বার করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাহার কান্না বন্ধ হইয়াছে, আর সে চোখের জলের খরচাও হয় নাই। একটা মেয়ে ছিল,—মরি অনিলাকে রাখিয়া সে আজ প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে চিকিৎসা অভাবে মরিয়া গেছে। একটা ছেলে ছিল, সে বাকিত পিতার কাছে কলিকাতায়। আজ তিন মাস হইল, সেও তাহার এক বাঈজী-বন্ধু সৌদামিনীর সঙ্গে সেখান হইতে সরিয়া আসিয়াছে, সে-ও তার দুখিনী মায়ের মায়া কাটাইয়া দিদির কাছেই চলিয়া গেছে। ললিতার কলিকাতা নিবাসিনী সখী যশোদা কবিরাজ মহাশয়কে দিয়া একখানি পোষ্টকার্ডের লিখে এই সংবাদটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মরিবার সময় ছেলেটাকে একবার চোখের দেখা দেখিবারও অদৃষ্টে তাহার নাই। ইহার পরেও যে সে মরি-মরি চোখের দৃষ্টিটুকু হারাইয়া বাঁচিয়া আছে, ইহাই তাহার চরম দুর্ভাগ্য!...

কন্যার মৃত্যুর পর নিজের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ললিতা অনিলার বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু বুলিনের মেয়ে বলিয়া শ্বশুরবাড়ীর সুখ তাহাকে জীবনে কোনদিনই দেখিতে হয় নাই। অনিলাকে আইবুড় রাখার পূর্ব্বেই কৌলিন্যাভিমানী তাহার প্রৌঢ় স্বামী দেবতা আরও তিনটি অনাথার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাদের জাতি রক্ষা করিয়াছিল। অনিলা জানিত, নিতান্তই বুলিন কন্যার স্বামীভাগ্য ইহা অপেক্ষা আর বেশী কিছু হইতে পারে না, তাই কোনরকমে নিজের বুকের আগুন বুকেই চাপিয়া রাখিয়া, তাহার আশ্রয়দাত্রী সর্ব্বংসহা এই বৃদ্ধা মাতামহীর সেবা যত্ন করিয়াই দিনগুলা পার করিতেছিল।

একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুর পরেও, ললিতার বৃদ্ধ স্বামী রামসুন্দরবাবু কেমন করিয়া যে সেই কন্যা ও বনিতাকে লইয়া কলিকাতার সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে ছিলেন, এইটাই তাহার সব চেয়ে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইত। মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আইবুড়কেও একটিবারের জন্য চোখে দেখিতে পাইলেও হয়ত ললিতার সব-খোরাকের দুঃখ কতক পরিমাণে কমিতে পারিত, কিন্তু আজ তিন মাসের মধ্যে তাহার দেখা পাওয়া দূরের কথা, গত একমাস তাহার মাসোহারার দশটি টাকাও বন্ধ হইয়া গেছে।

বৃদ্ধা মাতামহীর নিষেধ সত্ত্বেও অনিলা ভয়ে ভয়ে তাহার কলিকাতা প্রবাসী মাতামহের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছিল। চিঠির জবাবের প্রত্যাশা সে করে নাই, তথাপি উত্তরে যে দুটি কথা লিখিয়া আসিল, তাহা তাহাদের একেবারে অপ্রত্যাশিত। তিনি লিখিলেন, একটু বেশী শীত পড়িলেই পৌষ মাসের মধ্যে তিনি একবার আসিবেন।

পৌষের প্রথম হইতেই ললিতা তাহার স্বামীর আগমন

প্রতীক্ষা করিতেছিল। শীত একটু বেশী পড়িলেই তিনি আসিবেন লিখিয়াছেন, কাজেই প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনিলাকে প্রশ্ন করিত, এবারে কিন্তু বেশী শীত পড়েছে, নয় অনিলা?...

অনিলা বলিত, হ্যাঁ, এইবার বাবু আসবেন বোধহয়।

তাহাদের এই বিদেশী বাস্তুনীটির সাথে ললিতার অনেক কথাই হইত। শীতের দিন-আড়াই পড়ন্ত বেলার উনানে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া থাকিত। অনিলা তাহার মৃতা মাতা ও মামার বাড়ীকাহিনী রূপকথার মত শুনিয়া যাইত; বলিতে বলিতে নিমিষার, ঝাপ্‌সা চোখে অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিলে, সে নিজেও খানিক কাঁদিত, আবার তাহাকে সান্ত্বনা দিত।

এতদিনের পর তাহার নিষ্ঠুর স্বামী করুণা করিয়া তাহার নিকট আসিলে, ললিতা যে তাহাকে কি বলিবে, প্রত্যহই একটির পর একটি করিয়া কথা সাজাইয়া সেগুলি ঠিক করিয়া লইত—আবার ভুলিয়া যাইত, আবার ঠিক করিত।

অনিলাকে বলিত, তুই তাঁকে কিছু বলতে পারবি না অনিলা?

জানি না পারব কি না, তাঁকে দেখ্‌লেই আমার কেমন যেন আমার ভয় পায়।

একান্ত আপনজনের নিকট হইতে স্নেহ-ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কত বড় দুর্ভোগ, তাহা সে নিজে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিত এবং তাঁহার সহিত কথা বলিতে অনিলার যে ভয় হইবে, ইহা তো অস্বাভাবিক নয়। তাই ললিতা এজন্যের উত্তরে কিছুই বলিতে পারিত না,—কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অন্য কথা পাড়িত।

একখানা কাপড় লইয়া কথা উঠিল। ললিতা বলিল, জানিস্ অনিলা, এ কাপড়খানি তোর দাদার। তার বয়স যখন বারো বছর; তখন এই কাপড়খানি তার বাবা এনে দিয়েছিল। শুধু এইটি ছাড়া তার চিহ্ন আমার কাছে আর কিছু নেই।

হারানো ছেলেবেলের পূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত জিনিষগুলি যেদিনই অনিলা হাতে করিত, আর অনিলাকে কত কালের কত পুরাতন কাহিনী শুনাইত। এমনি করিয়া দুই নারী ইহাদের দিনগুলা কোনরকমে পার হইতেছিল।

সেদিন ললিতা বলিল, চল্ অনিলা, আমরা কাশী চলে যাই।

অনিলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সেই ভাল দিদিমা।

ললিতার চোখদুইটা জলে ভরিয়া আসিয়াছিল।... সে আজ বহুদিনের কথা,—বধূবেশে যখন সে এই অভিভাবকহীন সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তার কত না আনন্দ! তারপর একটি ছেলে ও মেয়ের মা হইয়া ভবিষ্যতের কত কত কল্পনাই সে করিয়াছিল। একদিন সংসারে যখন অভাব অনাটন ছিল, তখনও সে ছিল সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, আর আজ তার স্বামীর অগাধ ঐশ্বর্য্য, এখন সে কি না সর্ব্বহারা কাঙালিনীর মত স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাস করিবার সঙ্কল্প করিতেছে!

ধরা-ধরা গলায় সে আবার বলিল, কিন্তু অনিলা, আমাদের খাবার সংস্থান কি করে' হবে?

অনিলা বলিল, সে জন্যে ভাবনা কি দিদিমা, আমার যে ক'টা গয়না আছে, তাতে তো একটা বছর চলে যাবে। তারপর কত বড় লোক আছে সেখানে,—কারও বাড়ীতে রান্না করেও কি তোমাকে দু মুঠো খাওয়াতে পারব না?... খুব পারব দিদিমা!

ললিতা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বুকের বেদনা চাপিয়া চুপ হইয়া বসিয়া রহিল। হায় রে অদৃষ্ট! যাহার গায়ে একটু আঁচড় লাগিলে বুক ব্যথা করে, আজ তাহাকে পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিতে দিয়ে সে কোন্ প্রাণে?...

(২)

সুদীর্ঘ চারটি মাস পরে, একদা পৌষ-প্রাতে অমলেন্দু বাবু করুণা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন, পুরু লোকাকুরা পত্নী ললিতাকে সান্ত্বনা দিবার তরে। একদিন পরে স্বামী আসিয়াছেন শুনিয়া ললিতার মনে হইতেছিল, তাঁহার পায়ের তলায় নিজের মাথাটা রাখিয়া চুমায় চুমায় ভরিয়া ফেলে। কিন্তু সে মনের মরণেও চুমত আজ আর তাহার অধিকার নাই।...ওগো দেবতা চুমায়, কৃপা করিয়া যদি এ অভাগিনীর চরণধূলি দিবার সান্ত্বনা লইয়া আসিলে, তারও কিছু দামে আসিতে না কেন?... আজ আর আমার চোখে ঘুম নাই, তুমি আমায় দিয়া দিয়া প্রবঞ্চনা করিতেছ কি না কেমন করিয়া জানিব?...

বারান্দার বাহিরে যে জাইটালাইটুকু ছিল, সেইখানেই একটা আসন পাতিয়া অনিলা তাহার নবাগত ঠাকুরদাদার আহারের স্থান করিয়া দিয়াছিল। খাইতে বসিয়া শ্যামসুন্দরবাবু বলিলেন, তোর বিধিমাকে একবার ডাক্ তো অনিলা!

ললিতা এখনও পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা করে নাই, কেমন করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে?

অনিলা ঘরে আসিয়া বলিল, বিধিমা, চল ডাকচেন তোমায়।

ললিতার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—ওঁর খাওয়া হোক্, তারপর যাব। এখুনি কাছে গিয়েই হয় তো হাউ মাউ করে, ছেয়ে ফেল্‌ব অনিলা, তার খাওয়া হবে না।

...আহারাদির পর শ্যামসুন্দর বাবু বলিয়াছিলেন। ললিতা ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল। সে মনে করিয়াছিল, চোখের জলে হয়ত' তাহার বুক ভাসিয়া যাইবে, কিন্তু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জলও গড়াইয়া আসিল না, মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।—সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না,—তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িল। চোখদুইটা তখন তাহার অসম্ভব রকম জ্বালা করিতেছিল।

কত কথা সে বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু এ সময় একটাও মনে পড়িল না। কহিতে না পারার যে দুঃসহ বেদনা, সেটাকেও সে বুকের নীচে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। বলিল, ছেলেটাকে কোথা রেখে এলে গো—

এইবার চোখের ধারা বহিয়া আসিল।

শ্যামসুন্দরবাবু বুঝাইতেছিলেন, কি করবে বল,—অমন কত লোকের ছেলে মারা যায়। মহেশপুরের রাজার একটি সন্তান, যুবরাজ,—সেও সেদিন মারা গেল।...এমনি সব অনেক রাজা মহারাজার সন্তানের মৃত্যুর কথা বলিয়া তিনি এই অশিক্ষিতা নারীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ললিতা বলিল,—ওগো, ছেলেটাকে অমন করে না খেয়ে ফেল্‌লেই হতো। সে তার দুখিনী মায়ের কাছে কেন থাকতো যে! তাকে সে রাক্ষসীর কাছে কেন নিয়ে গেলে তুমি?

তাহার সপত্নী রঙ্গিণী বারবনিতার বিরুদ্ধে কোনদিনই এমন কথা ললিতার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, কিন্তু আজ এই সন্তানহারা জননীর কলিজা ছিঁড়িয়া যে দুর্ব্বাক্য বাহির হইল, তাহাই শুনিয়া শ্যামসুন্দরবাবু একটু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, ছিঃ! অমন কথা বলো না ললিতা, সে তাকে মায়ের মতই সেবা করেছিল।

ললিতা আর স্থির থাকিতে পারিল না, কহিল,—তুমি তোমার বুকে হাত দিয়ে সত্যি কথা বল দেখি, ছেলেটা কি মরবার সময় একটিবারও তার এই কাঙ্গালিনী মাকে দেখতে চায় নি?—নিশ্চয় চেয়েছিল, তবু তুমি আমায় খবর দাও নি। এমনি নিষ্ঠুর তুমি!... থাক্, তোমার কাছে আমি অনেক সুখভোগ করেছি, আর চাই না। আমাকে বিদায় দাও, আমি অনিলাকে নিয়ে কাশী যাব।

শ্যামসুন্দরবাবু কহিলেন, কাশী?...কেন কাশী যাবে কেন?...তা...যদি একান্তই যাবার ইচ্ছা হয়ে থাকে আমি সব বন্দোবস্ত করে' দিতে পারি, তবে কি না...আমার বিবেচনায়,...ভাখ, লোকে বল্‌বে কি?

ললিতা আবার কথা কহিল, বলিল,—হাঁ, তা তো জানি। ওই লোকে যদি কিছু না বল্‌তো, তাহ'লে তুমি হয়ত 'তাকে' ছেড়ে চার মাস কেন,—চার বছর পরেও একটিবারের তরে আমায় দেখা দিতে আস্‌তে না।... ওই লোকই তো হয়েছে যত নষ্টের মূল।...না, না, লোকে কিছু বল্‌বে না গো,—আমি তোমার দুটি পায়ে ধরি, আমায় অনুমতি দাও, আমি কাশী যাব। বলিয়াই ললিতা স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া পা দুইটা বুকে জড়াইয়া ধরিতেই অজস্রধারে চোখের জল গড়াইয়া আসিল।

শ্যামসুন্দরবাবু পকেট হইতে মনিব্যাগ খুলিয়া একখানা একশ' টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে গেলেন, ললিতা তখনও পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, বলিল, অনিলার হাতে দিও।...বুঝেছি, যা হারিয়েছি, তার দাম দিতে আসছ, আমি ও চাইনা—

ললিতা একটু থামিয়া আবার বলিল, আমি চলে গেলে, তাকে নিয়ে সুখে বাস করো।

শ্যামসুন্দর বাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়া কাহার কথা ভাবিতেছিলেন, বলিলেন,—কি?

আমি তারই কথা বল্‌ছিলুম, যাকে পেয়ে তুমি

সমাইকে ছেড়েছে,—নিজের ছেলেটাকেও খুন করলে!...

শ্যামসুন্দর বাবুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ঘোরে ঘোরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, বেশ করেছি—বেশ করেছি—তুমি অসতী,—কুল কলঙ্কিনী!

সজোরে গায়ের ধাক্কা দিয়েই, বৃদ্ধিশক্তি হীনা ললিতা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। পাশের কেওয়ালে ভর করিয়া মাথার আঘাত লাগিতেই একেবারে মাটিতে পড়িয়া গিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।...স্বামী তখন ক্রুদ্ধার শব্দে ঘর কাঁপাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন। সদরে উপর একখানা ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, শ্যামসুন্দরবাবু তাহাতে চড়িয়া বসিয়া, কোচম্যানকে হুকুম করিলেন, হাঁকাও!

গাড়ী চলিয়া গেল।

(৩)

অনিলা অন্তঃপুরে মাতামহাশয়ের অন্ন পান করিতেছিল। তাঁহাকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দিদিমা খাটের নীচে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। কপালে রক্তের ধারা গড়াইয়া নিম্নস্থ অন্ধ চক্ষুদুইটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে! ডাকিল,—দিদিমা!...মা!

ললিতা ব্যথিত দুঃস্বরে কহিল, এখনও বেঁচে আছি। তুমি যাও, আমাদের কালী, মামার সঙ্গে, দিদিমার ঠিক করে নাও, অনুমতি পেয়েছি দিদি।

সন্ধ্যায়, অনেই একটু অন্ধকার হইলে, সরলার সংগোপনে অনিলার হাত ধরিয়া ললিতা শ্বশুরের গৃহ দিনের স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়া, ষ্টেশনের পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ছাড়া হইবে।

দিন পনর পরে দেখা গেল, একখানা মোটর আসিয়া সেই বাড়ীর সুমুখে দাঁড়াইল। মোটর হইতে শ্যামসুন্দর বাবু এবং তাঁহার রক্ষিতা বারবনিতা নামিলেন।

পাড়ার দু'একজন ইতর ভদ্র আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেই কহিলেন,—কলকাতার বাড়ীখানা বিক্রি করে' দিয়ে এলুম। ওঁর health একটু খারাপ হয়েছে, তাই ডাক্তারের advice, পাড়া গাঁয়ে Change হলে ভাল হয়, তাই—

ইহার পূর্ব্বেই তিনি সকলকে পরিচয় দিয়াছিলেন, নবাগতা রমণী তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী।

শ্যামসুন্দর বাবুর জন্ম ছিল ব্রাহ্মণকুলে, কিন্তু দেখা গেল, ইহার পল্লী সমাজ যে সমাজে কোন কথাই উত্থাপন করিল না। তিনি মনে-মনে জানিতেন, অর্থবানের নামে বিদ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাহাকে জাতিচ্যুত করিবার মত সঙ্কীর্ণ মন লইয়া পল্লীবাসী হিন্দুগণ সমাজ গঠন করে না।

# প্রকৃতি ও মানব

[ শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায় ]

বিহগ, প্রবনে ঢালে, সুধা সবাকার
সুরভি, চন্দনে বিশে সুরভির রাশ,
মোহন সুরভি-স্নিগ্ধ, করিছে বাতাস,
নিমেষে হরণ করি' পরাণ সবার।
বিশ্ব ভরে' সবা ভরে, মোহন আলোকে
জগত জীবন দাতা—দীপ্তিময় রবি;
শান্ত রাতে নিশাকর প্রসন্নতা ছবি,
সবাকার হিয়াভরে, বিপুল পুলকে।
বারিধি নিমেষে নাশি, বারি করে দান
সস্য করে ধরা দান, ফেলে সবি' কত।
প্রকৃতিতে এই ধারা বহে অবিরত—
আত্ম বলিদানে করে অন্যজনে ত্রাণ
সর্ব্বকালে সর্ব্বকালে স্বার্থহীন ধরা
মানব একাকী শুধু হীন স্বার্থে ভরা।

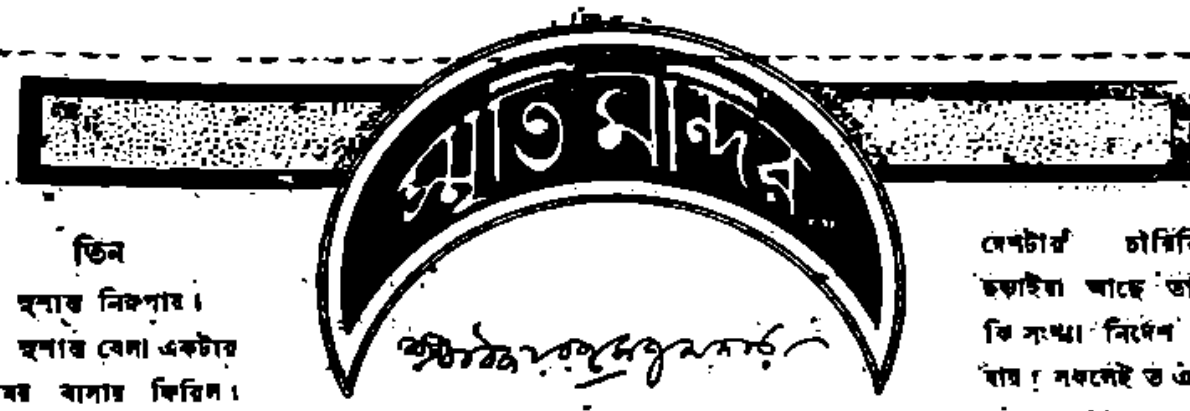


তিন

সুশান্ত নিরুপায়।

সুশান্ত বেলা একটায় সমর বাসায় ফিরিল। ঠাকুর ইতিপূর্বেই দিনের মত কার্য্য শেষ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, কাজে কাজেই সেদিন অন্নদেবতা আর সুশান্তর উদরে প্রবেশলাভ করিতে পারিলেন না। সুশান্ত বালতী কয়েক জল মাথায় ঢালিয়া সামান্য দুই চারি পয়সার মিষ্টান্ন জলযোগ করিয়া, ঘরে আসিয়া জামার পকেট হইতে নোট বহিটি বাহির করিয়া চৌকীতে বসিল। খান কতক সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ, একটি পি-এম বাবুড়ীর সরস্বতী মার্কা কালীর দোয়াত, গোটা দুই মযূরপুচ্ছের কলম ও খানকতক মোটা সরু বহি, খবরের কাগজ ছড়ান ছিল, সুশান্ত নোটবহি খুলিয়া অদ্যকার ষ্টেটসম্যান-খানি কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন কয়টি বাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রান্ত ক্লান্ত মুখটি তাহার অতিশয় ম্লান হইয়া উঠিল। আজিকার বিজ্ঞাপনের যে কয়টি সে তুলিয়া আনিয়াছে, তাহার কোনটিরই নাম ধাম পায় নাই, পোষ্টবক্স নম্বর দেওয়া আছে, সেই নম্বর উল্লেখ করিয়াই আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে। এই বক্স নম্বরের উপর সুশান্তর এতটুকু আস্থা ছিল না। সে অনেকের মুখেই শুনিয়াছে, ওর সবগুলিই ফাঁকা আওয়াজ। বিজ্ঞাপনাদিকা দেখাইবার জন্যই ও-গুলি মুদ্রিত হইয়া থাকে, উহার মূলে সত্য কার কোন ঠিকানা নাই। শান্ত ইহা বিশ্বাস করিত না, ষ্টেটসম্যানের মত একখানা সুপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সংবাদপত্র এইরূপ মিথ্যাড়ম্বর দেখাইবে ইহা সে বিশ্বাস করিত না। এতদিন সে বক্স নম্বর অথবা ঠিকানা—সর্ব্বত্রই নির্বিচারে আবেদন পত্র পাঠাইয়া আসিয়াছে, আজ প্রান্ত চিত্তে বসিয়া ভাবিতেছিল, সত্যই কি ওগুলির মূলে কোন সত্য নাই? এতদিন এত চিঠি পাঠানো গেল, একখানারও কেন উত্তর আসিল না? তখনি মনে হইল, এত বড় বাংলা দেশটায় সেই ত একা কর্ম্মপ্রার্থী নয়। কত শত, কত সহস্র, কত লক্ষ বেকার যে এই অভাগা দেশটার চারিদিকে ছড়াইয়া আছে তাহার কি সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়! সকলেই ত এমনি আবেদন পাঠাইতেছে, দু চারশোর মধ্যে একজন মাত্র নির্ব্বাচিত হইবে, বাকী সকলকে ত নিরাশ হইতে হইবে! সে হয়ত সেই নৈরাশ্যপীড়িত দুর্ভাগাদেরই একজন! এই ঘরটিতে বসিয়া অভুক্ত থাকিয়া সে যে কথা ভাবিতেছে এখনি হয়ত কত অন্নহীন বস্ত্রহীন অভাগা নিজের নিজের ঘরে বসিয়া হা হুতাশ করিতেছে—তাহার ঠিক কি!

কিন্তু এমন করিয়া আর কদিন চলে? দুই মাসের উপর রিট-রেন্ট (ঘর ভাড়া) বাকী পড়িয়াছে. বেকার বলিয়া সহবাসীগণ অনুগ্রহ করিয়া তাগাদা করেন নাই, কিন্তু কতদিন তাঁহারা আর তাহার ভার বহন করিতে পারিবেন? আর তাহারও ত একটা চক্ষু লজ্জা আছে! পরিধের বস্ত্রগুলির অবস্থা ক্রমেই জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, দুই একখানি ছাড়া সকলগুলিই অব্যবহার্য্য, কিম্বা নিজ্জনে বাসাতেই পরা চলিতে পারে। যে কয়টি টাকা সঙ্গে ছিল তাহাদ্বারা দুই মাসের খাই-খরচ চলিয়াছে, এমাসে মোটের উপর তিনটি টাকা তহবিলে মজুত, ইহার মধ্যে যদি কাজ কর্ম না জুটে, মাসকাবারে 'খাই-খরচ' দিতেও অক্ষম হইয়া পড়িবে। এই তিনটি টাকা কতদিন আর? কখানা আবেদন পত্রই বা পাঠানো চলে? তিনটি রজত মুদ্রা শেষ হইলে—তখন সে করিবে কি?

সে যেন পন্থাপারে একটা বিজন স্থানে বসিয়া ভাগ্যালোচনা করিতেছিল। আকাশে প্রলয়-লক্ষণ দেখা গিয়াছে, নদীর জল সে গর্জ্জনে সাড়া দিতে ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছে, আকাশ যেন গম্ভীর কৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন, নদীর বুকও তদ্রোহদ্বিক গম্ভীর কৃষ্ণবর্ণ, মাঝে মাঝে দুয়েরই বুকের উপর দিয়া দুইচারিটা আগুনের রেখা ছুটা ছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। এপার জনশূন্য, কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র নাই, পরপারে আশা হয় মানুষ আছে, আশ্রয় আছে কিন্তু নদী অতিক্রম

করা যাবের অতীত, কল্পনার বহির্ভূত। সে যেন ভবিষ্যৎ ছিল কোথায় একটা সেতু আছে, তাহারই উপর দিয়া লোকে পারাপার করিয়া থাকে কিন্তু কোথায় সেতু। কোথায় ওরে, কোথায় সেতু! সে যে কোথায় কিছুই দেখিতেছে না! তাহার আগে পাশে, সামনে পিছনে যে সেই নিস্তব্ধ জলধি। মাথার উপরে সেই প্রলয়ের আকাশ। আর কোথাও যে কিছু নাই, কেহ নাই!

আজ কামনাকে দেখিয়াছে বলিয়া নয়, আজ বহুদিন পরে, বহুদিনের গাঢ় সুপ্তিভঙ্গে রাজেশ্বর তাহার মনোরাজ্যে বড় তীব্র ভেঙে ছুটিয়া উঠিয়াছেন। আজ বড় উজল হইয়া, বড় মধুর হইয়া তাঁহার সেই হারানীত মুখখানি ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে; আজ বড় বেশী করিয়া, হৃদয়ের সব ক'টি তারে আঘাত করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহার, আত্মীয়বৎ আচরণ আসিয়া উঠিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মনে হইতেছে, আজ রাজেশ্বর কলিকাতায় থাকিলে তাহাকে এত অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না! একদিন তাঁহার কোন সাহায্যেই মৃণালের কোনো কাজে লাগে নাই, আজ মনে হইল, কত বড় প্রয়োজন আজ সাধিত হইতে পারিত!

মানুষের চিন্তাতেই সুখ চিন্তাতেই দুঃখ! মানুষ চিন্তারাজ্যে স্বর্গ হাতে পায়, চিন্তার ক্ষণৎ আবার তাহাকে দুঃখ সাগরেও নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই যে কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার সামনে এক ভোজবাজির কোন্ রাজ্যের দুস্তর বারিধি প্রলয় গর্জন করিতেছিল, মাথার উপরে ক্রীড়ণ মূর্তি ধরিয়া আকাশ তাহার বুকের পরে নামিয়া আসিতেছিল—রাজেশ্বরের স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্তি মনে পড়িতেই চিন্তারাজ্যে যেন স্বর্গ স্থজিত হইতে লাগিল। কে জানিত যে সেই ক'দিনের পাওয়া লোকটির অভাব আজ এমন করিয়া তাহাকে আঘাতিত করিবে? কে জানিত যে তাঁহার চিন্তাও হৃদয়ে মনে পুলক-প্রবাহ ছুটাইবে!

আজ সে কামনাকে দেখিয়াছে, আজ সে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে সেই পিতার পত্নী আজো তাহাকে তেমনি স্নেহ করে, তাহার কাছে তেমনি আত্মীয়বৎ আচরণ পাইয়া আসিয়াছে, কামনা তাহার দুঃখ আপন দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—এ'ও নিজেই সে দেখিয়া আসিয়াছিল, তবুও—তবুও মনে হইতেছিল, বুঝি সেটা সত্য নয়! যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা মিথ্যা, যাহা সে স্বকর্ণে শুনিয়া আসিয়াছে, তাহাও সত্য নয়! [illegible] ছুটে শুনিয়াছে, কোথাকার দেখা, ক'দিনের আলাপ, একটা বীজ দুঃখী [illegible] ধরিয়া অযাচিত সহানুভূতি স্বরূপ করিয়া আসিয়াছে। কে বলে শুনিয়াছে যে তাহারই দুঃখের [illegible] তাহার মুখ পাণ্ডুর, হৃদয় মলিন হইয়া যায়? আর কেহ না দেখুক, সাক্ষ্য দেখিয়াছে, মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়, সত্যই দেখিয়াছে, সত্যই শুনিয়াছে।

এত মধুর চিন্তা! কি মধুর সে স্বপ্ন! এত দুঃখ, দৈন্য, বিকলতা হাহাকার তার মাঝে এ কি মাধুরী মৃণালকে আবিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল যে কিছুক্ষণের জন্য সে ভুলিয়া গেল যে তাহার দুনিয়ার সম্বল মাত্র তিনটি টাকা! যে সে আজ সারাদিন নিরাহারে আছে! যে তাহার পরিধেয় বস্ত্র নাই! তাহার মনে রহিল না যে পাঁচটার পূর্বেই সবগুলি দরখাস্ত লিখিয়া তাকঘরে টিকিট কিনিয়া ছাড়িয়া আসিতে হইবে নচেৎ দিনটাই তাহার মাটী হইয়া যাইবে, আর একটি দিন নষ্ট হওয়া যে তার কাছে কি নাই, কতখানি নষ্ট—তাহা সেই জানে! তবুও সাজ ভুলিল। অনাহার ভুলিল, বস্ত্রাভাব ভুলিল, ভবিষ্যৎ ভুলিল, বালিশটার উপরে মাথা দিয়া চিৎ হইয়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িল।

সকলের পক্ষে হয়ত বোঝা সহজ হইবে না যে এমন আত্মহারা লোক হয় কি করিয়া? অনেকে হয়ত বলিবেন যে এমন আপনা ভোলা লোকের সংসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দুরাশা! এ সকল মন্তব্যে কথা কহিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের বুঝাইতে পারিব না যে এমন একটা সময় মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে আসে, যখন মানুষ আপনার সুখ দুঃখ ভুলিয়া, আপনায় ভুলিয়া, পরকে লইয়াই ডুবিয়া যায়! বর্ষার নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন আকাশেও কখন কখন সূর্যরশ্মি খেলিয়া বেড়ায়। কেবলমাত্র দুনিয়ার ব্যক্তিই মেঘ ও রৌদ্রের সে বিচিত্র লীলা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে সেই ভাগ্যবান যে একদিনও একটি বারের তরেও পরের চিন্তায় এমন হইয়া গিয়াছে। সুধাও তেমন করিয়াই তার সর্বজ্বালা, সর্বদুঃখ ভুলিয়াছিল। আর যেন ভুলিয়াছিল, কিসে ভুলিয়াছিল তিনিই কেবল অনুভব করিতে পারিবেন যাঁহার দুঃখ অন্য নিদার মধ্যেও

এমনই জ্যোৎস্না রাত হইয়াছে, তাঁহার ব্যথা বেদনা এমন করিয়াই অপরে অনুভব করিয়াছে। দুঃখীর এ যে কত বড় সান্ত্বনা, দুঃখের কতে এ-যে কি অব্যর্থ প্রলেপ একমাত্র হৃদয়বানই তাহা বুঝিবেন।

বাসায় কয়েকটি কলেজের ছেলে বাস করিত। কলেজ অন্তে বিয়াট্ সলয়ব করিয়া বাসায় ফিরিতেই শান্তর চিন্তার স্বর্ণজালখানি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসিল—কত বাজল বীরেন বাবু?

বীরেন বাবু দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের মুদ্রাদোষের বিস্তারিত বর্ণনা সহপাঠিগণের সমক্ষে করিতেছিলেন, হাতের আস্তিন তুলিয়া, ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—পৌণে চারটে শান্তবাবু!

শান্ত ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিজ্ঞাপন নির্ব্বাচনে মন দিল। ইচ্ছা, সর্ব্বাপেক্ষা বেটি আবশ্যকীয় মনে হইবে সেইটিই আজ লিখিয়া পাঠানো, বাকীগুলি রাত্রে লিখিয়া রাখিবে। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়াও কোনটিই তাহার পছন্দ হইল না। সবগুলিতেই যেন একটি একটি বাধা আছে। কেহ হয়ত গ্রাজুয়েট চায়, কিন্তু অঙ্কের জ্ঞান প্রচুর হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়াছেন। কেহ হয়ত যুবক চাহেন না, কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির সহিত সঙ্গীত পারদর্শিতা চাহেন, যাঁহার অঙ্ক কোনো কোই কিনারা নাই, তিনি এতই অল্প বেতন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে তাহাতে একটি মানুষের জীবিকাই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তাহার ত আবার মা আছেন!

বাহিতে বাহিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সেজন্যই সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া বসে। কেন—জানে না, স্থানটি তাহার বড় ভাল লাগে। জলের উপরে ছোট ছোট পাখীগুলিতে দল সবেগে ঘুরিয়া বেড়ায়, রেলিঙের ধারে ধারে বায়ুকামীগণ হন হন শব্দে ঘুরিয়া বেড়ায়, অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের হাস্য কলরব স্থানটিকে এমন সজীব প্রাণময় করিয়া রাখে যে শান্ত এখানে আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

আজও গলি-পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া হেদুয়ার দিকেই চলিতেছিল, পথে হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধুও কর্ম্মের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, চাকরীর বাজার খারাপ দেখিয়া যাহা হউক তাঁহাকে ছোট খাট একটা ব্যবসা করিতে হইবে! কি করিবেন, বসিয়া থাকাও ত সোজা পায় না।

শান্ত বলিল—কিসের ব্যবসা অজিত?

এই একটা দোকান টোকান কিছু যা-হয় করি ভাই! নইলে আর চলে না! চাকরীর অবস্থা ত দেখছ—নেওয়া চুলোয় যাক্, ব্যাটারা লোক তাড়াতেই ব্যস্ত, কি-বল!

এসকল বিষয়ে শান্তর অবশ্যই একমত ছিল, কেবল বন্ধুবরের দুঃখের কারণ সে বুঝিল না, বলিল—ভাই, স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করবে তাতে তুমি দুঃখিত?

অজিত হাসিয়া বলিল—দুঃখিত কি সাধে হই দাদা! ঘরথেকে টাকা বের করে—বুঝলে না?

শান্ত হাসিল, সোনাদী ..

ও সব সেন্টিমেন্ট ছাড়! সোনাদী যদি, তুমি যেন···

ভাই, দশটা টাকা আজ পাই যদি, কালই কিন্তু ছিপি করতে বার হই।

হাঁ-হাঁ, ও সব আমার জানা আছে। যেমন সব কলেজ ষ্টুডেন্টস্ খবরের কাগজের হকার হয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন···

শান্ত সহাস্যে কহিল—পাগল! দেশের মুখোজ্জ্বল করবে তারা, দেখেছ? পিঠে বুটের ছাপ নেই, মাথায় সোনাদীর ধূলা নেই, মুখে কালী নেই তারা করবে মুখোজ্জ্বল, তুমিও যেমন—হোঃ!

যা—যাক্! তারপর...

...হেদুয়ার বায়ু-তাড়িত বারিবক্ষের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শান্ত ভাবিতেছিল, রাজেশ্বর বাবু আজ যদি সহরে থাকিতেন, নিশ্চয়ই সে গোটাকত টাকা ধার লইয়া যা-হয় একটা কাজে লাগিয়া পড়িত। দেশের মুখোজ্জ্বল না করুক, আপনার পেটের জ্বালা মিটাইতে পারিত!

ক'দিন এই চিন্তাতেই কাটিল, চিন্তার গতি যে পরিমাণে ছোটে, দুনিয়ার কোন কাজই তত দ্রুত বেগে চলে না। কাজেই চিন্তা আরম্ভ করিবার সময়েও শান্ত ঠিক যেখানটিতে দাঁড়াইয়া, যেমন ছিল, চিন্তার শেষে যখন সে আপনার দিকে চাহিল, দেখিল ঠিক সেইখানেই আছে। এক পা'ও এদিক ওদিক হয় নাই। সে-যে নিরুপায়, সেই নিরুপায়ই আছে।

ক্রমশঃ

# দেশ-বিদেশ

১০ জন কারাবাস উপরি আইনের কর্মী যেন যেন ঘাটের মধ্যাহ্ন এবং প্রবর্তক শ্রীযুক্ত অরবিন্দের প্রবর্তী সময়ের আলিপুর জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। আলিপুর জেলের ডাক্তার মিঃ টেলরের যত্নবাদের কারামুক্তির সময় তাঁহার প্রতি খুবই ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা খুব খাওয়া এখন ভালই। এইবার সরীন ডিটি জেলের ৪৬৮ ডিসেম্বর অবস্থায় মুক্তিত হইলেন।

—০—

লাহোর সহরে প্রতিমূর্তির চতুর্দিকে পুলিসের টহল বসিয়াছে। গত মঙ্গলবার হইতে পুলিস অবৈতনিকভাবে প্রতিমূর্তি পাহারা দিতেছে।

—০—

লাহোরের মিউনিসিপাল কমিটি আবার সরকার প্রতিমূর্তির কি ব্যবস্থা করা যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বসিয়াছেন। লালা হীরানন্দ যার প্রস্তাব করেন, প্রতিমূর্তিটির উহা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, প্রতিমূর্তি সেইরূপ প্রতিবাদ উঠিয়াছে। আপত্তিকর কিছু হইয়াছে প্রতিমূর্তি, কর্তাদের সেই থাকুক, কিন্তু উহার চারিদিকে আরও পুলিস রাখা হউক। এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা হইবে, হইবার কথা আছে।

—০—

পাঠক একজনেরই নাম প্রকাশ যে, ইনকাম ট্যাক্সের মোকদ্দমায় একজন ইউরোপীয় বিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার ১৮৯ সাল হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত পূর্বে হইয়াছিল। তাহার পরে তাহার আয়কর ও আয়কারী মহাশয় কুমারের সাথে ৫০ হাজার টাকার দাবী করিয়া এক নালিশ রুজু করিয়াছেন।

—০—

গত সোমবারের ষ্টার্টারের খবরে প্রকাশ যে, সুরেন্দ্র ইয়োরোপীয়ান বিবাদ। কলকাতা অভিনিধি কলকাতা এবং লর্ড কার্জন সুদূর পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিদায়-ভোজন এবং অর্থ বৈদেশিক বিষয়ে পরিচালন উপলক্ষে তাহার প্রতি ইউরোপীয় সভা হইয়া গিয়াছে।

—০—

কানাল পাশা স্বাধী সহরে পক্ষ অবরোধে আছেন, তুর্কী সৈন্য ইংরেজকে ওর করে রাখে। ইংরেজ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, অবরুদ্ধ তাঁর সেনাদের তুর্কী-শিবিরে আসিবে। আসিবার পরে পরিস্থিতি ঠিক, তবে সবাই তাঁহার যে, তাহা হইলে প্রতিমূর্তির মহিমার আরও কিছু তুর্কিরে পারিবেন।

—০—

অনুত মিত্র।—গত ১৯১৯ সালে অরবিন্দ বিরোধী শ্রীপূর্ণিমা বসুর স্ত্রী একটি নালিশ রুজু করেন। নালিশটির মর্ম্ম এই: ৮ই ফাল্গুন, ৮টি হাত, চারিখানা পাশ্ব দুইটি সিল মিল। তুলিবার পর এই অনুত মিত্র মাত্র ১৩।১৪ মিনিটকাল বাঁচিয়া ছিল।

—০—

বিলাতী মদ।—গত বর্ষে (১৯২১) এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর এই ছয় মাসে বাংলা-সরকার ৪৯,৯১,৮৭১ টাকার বিলাতী মদ আমদানী করিয়াছিলেন। এই বৎসর এই ছয় মাসে ৫৪,৬৬,৫৮৮ টাকার মদ আসিয়াছে। বড় বাড়িয়াছে।

—০—

দেশলাই।—১৯২০ সালে এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর এই ছয় মাসে ১,১৯৮৮৭৩৯ টাকার দেশলাই আমিয়াছিল, ৭৮০১১ টাকার আরও এই বৎসর ঐ সময় আমদানী হইয়াছে ৯৯৫৫১ টাকার। কতক কমে।

—০—

বই পাঠক এবং বইবিক্রয় খুব সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। উটকাম, গোয়েন্দা, ডাকাতি, অভিনয়, প্রেমের কাহিনী ও রোমান্সের ছোটখাট সব সময়েই পড়িতে চড়িয়া আছে। তাহারা লোক তুলি ও চালাইতেছে। এইরূপ তুলির আঘাতে অনেকে হত এবং অনেক আহত হইয়াছে। মেদিনীপুরে এই বৎসরের প্রথমে তুলির আঘাতে মৃত্যু ঘটিয়াছে। অনেক জায়গায় চোর ডাকাতদের পড়ন চলিয়াছে।

—০—

কলকাতা ডাকে যে ডাকাতির আরম্ভ-আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অনেক হইয়াছে। তাহারা নূতন নূতন আরও কৌশল আবিষ্কার করিতেছে। কিন্তু তাহারা চুপচাপ বসিয়া আছে, কোনরূপে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছে না। কিন্তু তাহারা যে ডেলিভিরিবাবদ একেবারে বাধা হইয়া গিয়া আছে তাহার কোনরূপ আভাস দিতেছে।

—০—

নবযৌবন লাভ।—ডাঃ ষ্টাইনাচ সম্প্রতি লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে বৃদ্ধ যে বৃদ্ধাবস্থা আসে তাহা হইতে পারে অল্প-বয়সে। যদি একেবারেই অকর্মণ্য হইয়া গিয়া থাকে, তবে ও চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। তিনি আরও বলেন যে, চিকিৎসক বিশিষ্ট হইয়া প্রায় বৃদ্ধি বয়স হইতে এই প্রক্রিয়ায় চিকিৎসার পরীক্ষা করিতেছেন। পুরুষ ও নারী উভয় ইহার পরীক্ষা করিয়া ফল হইয়াছে। তাহার ৭ বৎসর হইল ইংরেজের উপর এই চিকিৎসা করিয়াছেন, এবং সে চেষ্টাতেই সফলতা লাভ করিয়াছেন। এখানে পুরুষের এই পরিবর্তন ইংরেজের উপর রাজকীয় চিকিৎসা প্রবীণ করিতেছেন। ইহাতে পুরুষেরা আর হয়। প্রথমতঃ পেশীর প্রথম স্নায়ুবিক ও অন্যান্য পরিবর্তন ও পুরুষ বিকার হয়। এই চিকিৎসার ফল প্রায় তিনের ৫-২৫ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পুরুষের জীবনের কৈশোর বয়ঃ পরিবর্তের পূর্বে এই চিকিৎসার ব্যবহারের লাভ করিয়াছেন।

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

# বাসন্তী

১ম বর্ষ ] ৫ই ফাল্গুন শনিবার ১৩২৯, ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারি। [ ২৯শ সংখ্যা

এইবার জিতায় ঝুলি ইঁহারা ভাগ করিলেন, লইলেন—ইঁহারা।

( শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল )

বসন্ত জাগরণের ঋতু। শীতঋতুতে বহুজীবের জীবন ব্যাপার যেন স্তম্ভিত হইয়া থাকে। কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত অনেক জন্তু, শীত ঋতুটা আমরা অবস্থাভেদে কাটাইয়া দেয়। শরিসৃপেরা বিশেষভাবে এই নিয়মের অধীন হয়। রুসিয়াদেশের Pskov অঞ্চলে শীতকালে মানুষ ও দিন রাত ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়। কখন কখন তাহাদিগকে খাওয়াইবার নিমিত্ত পালা করিয়া কেহ-মানুষ কেহ-ঘুমায়। যে-সকল জীব যে দেশে শীত-কাল সুদীর্ঘ হইয়া থাকে তাহারা বসন্তের প্রথমেই জাগিয়া উঠে। মানুষেরাও এই ঋতুকে অনেকে যেন নবজীবন লাভ করে। বহুকাল এতদেশে শীত ঋতুরই আধিপত্য ছিল; অন্য ঋতুই ছিল না। আমরাও মৃতবৎ পড়িয়াছিলাম। আমাদিগের কর্ণে বাসন্তী কথাটী কে শুনাইল? যিনি শুনাইলেন তিনি ধন্য। আমরা কি নবজীবন লাভ করিতেছি? আমাদিগের দেহে কি নবপল্লব উৎগত হইতেছে? কোন কোন সরিসৃপের ন্যায় আমরা কি পুরাতন দেহ-ত্বক্ ফেলিয়া দিয়া নূতন দেহাবরণ লাভ করিতেছি? মানুষ নবজীবন লাভ করে নূতন সাধনা দ্বারা। আমাদিগের সে সাধনার চিহ্ন কোথায়? সাধনার প্রথম কথা শুদ্ধকরণ। শুদ্ধির আজ অবিচারণীয়। আমাদিগের যে বিচার বিতর্ক দ্বৈধ ইতস্ততঃ ঘুচাইতেছে না; আমাদিগের যে সংকল্পের দৃঢ়তা দিন দিনই টলিয়া যাইতেছে; আমরা যে কথায় কথায় শুদ্ধত্যাগ করিতেছি। আমরা সাধনা করিব কেমন করিয়া? আমাদিগের যুগ—যুগ—সঞ্চিত মলিনতা অন্তঃসঞ্চোষকে বিধৌত করাই সাধনার প্রধান অঙ্গ। দীনভাবে এ সাধনার সূত্রপাত করিতে হয়। এক্ষেত্রে দম্ভ, আত্মশ্লাঘা-স্পৃহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আমরা যে তাহা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আমরা দুঃখের সাধনা করিব কেমন করিয়া? দুঃখের সাধনাই সুখের সিদ্ধি; আমরা এ মন্ত্র সর্ব্বথাই ভুলিয়া যাইতেছি। ব্যক্তির যেমন চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে সাধনার সিদ্ধিলাভ অসম্ভব, জাতিরও তেমনই চিত্তশুদ্ধি হওয়া চাই। তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম করা চাই। কর্ম্ম বাক্য নহে। আমরা জাতির চিত্তশুদ্ধি করিবার কি অনুষ্ঠান করিয়াছি? দিনের পর দিন সমগ্র জাতিটা মূঢ় সংকল্প লইয়া এমন কি কর্ম্ম করিতেছে, যাহাতে জাতির চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে? পারিলে তাহাই সাধনা হইত। কিন্তু আমরা যে অন্ধ যন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি। সে যন্ত্র ত্যাগ করিতে পারিলাম কৈ? জাতির অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম সকল—যথা, বস্ত্র-বিস্তার—বস্ত্রমুদ্রিতে আপনার ছাপ্পর করিতে পারিলাম কৈ? এসকলের নিমিত্ত অন্যের বিজ্ঞানে থাকিতে যে চিত্তশুদ্ধির আশা নাই। চিত্ত-শুদ্ধির অভাবে সাধনাও হয় না, সিদ্ধি লাভও হয় না। যদি দিনের পর দিন,মাসের পর মাস,বর্ষের পর বর্ষ ব্যাপিয়া মূঢ় সংকল্প করিয়া একনিষ্ঠভাবে আপনার অন্ন আপনি রাখিতে পারিতাম, শুধু—"চাষের মালিক" না হইয়া "গ্রাসের মালিকও' হইতে পারিতাম; যদি আপনার বস্ত্র আপনি প্রস্তুত করিয়া পরিতে পারিতাম; যদি আমাদিগের স্বত্ব আমরাই ন্যায় বিচারে বিটাইতে পারিতাম; যদি বুদ্ধি প্রলোভনের মহামোহকর ব্যসন সকল হইতে আত্মরক্ষা করিতে জানিতাম তবে নির্ম্মল সংকল্পের, একনিষ্ঠ মূঢ়তার এবং চিত্তশুদ্ধির পরিচয় দিয়া জগতের সমক্ষে শুদ্ধকরণের সার্থকতা দেখাইয়া দিতে পারিতাম। বর্ত্তমান কালেও অন্তর সংস্কার আয়োজন ইঙ্গিত মাত্র এ জাতীয় সাধক সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিতেছে। কিন্তু সে-সাধক তন্ত্রের সাধক একনিষ্ঠ সাধক আজিও সিদ্ধিলাভ করিতেছে। আফ্রিকা, ইউরোপ; ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। আমরা সেই জন্যই গাইয়াছিলাম। কিন্তু আমরা যে তন্ময়তা আনিতে পারি না; আমরা যে একনিষ্ঠা বুঝি না। আমাদিগের কর্ণে বাসন্তীধ্বনি, আমাদিগের নেত্রপথে বাসন্তীর নাগর্ভ পত্র; আমাদিগের হৃদয়ে বাসন্তীর নিগূঢ় মর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিবে কি? আমাদিগের নব আগরণ সত্য হইবে কি? বিধাতা বাসন্তীর বাসন্তী নাম সার্থক করুন।

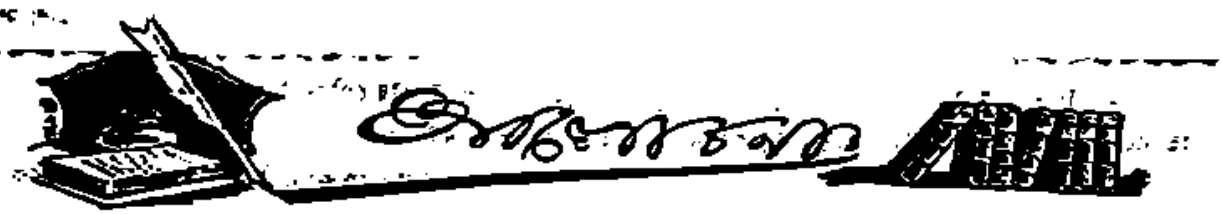


দেশের নানা আলোচনার যোগ্য বিষয় গুলির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধীয় আলোচনাও একটি প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের রাজনীতিক অর্থনীতিক সামাজিক ও সাময়িক সর্ব্বপ্রকার উন্নতিই দেশের শিক্ষা বিভাগের মারফতেই হইয়া থাকে। দেশের কর্ম্মক্ষমতা ও কর্ম্মযোগ্যতা শিক্ষার বিধানেই আনিয়া দেয়। শিক্ষার জীবন পথে চলিবার সামর্থ আনিয়া দেয় এ দেশের বিচার বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ ও কার্য্যকরী করে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশের শিক্ষা বিধান ও শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের সেরূপ মঙ্গলজনক কোন কার্য্য করিতে পারে নাই। দেশে বিশ্ববিদ্যালয় চালিত শিক্ষার ব্যয় ভার দিন দিন নানা প্রকারে যেমন বর্দ্ধিত হইতেছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত সন্তানেরা তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া তাহাদের জীবন পথে চলিবার অযোগ্যতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। নিরবলম্ব, নিষ্ক্রিয় ভাবে তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। তাহারা স্বপ্নরাজ্যের একটা নিছক কল্পনার সীমারেখা হইতে বাহিরের বাস্তব ক্ষেত্রে পড়িয়া হাহাকার করিয়া মরিতেছে। শিক্ষার এই রূপে দেশবাসী বরাবর অতৃপ্ত থাকিলেও একরূপ দেশবাসী দ্বারা চালিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার এ ত্রুটী সংশোধনে আজ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র মনোযোগ দেখান নাই। জনমতকে পদদলিত করিয়া তাঁহারা আপন প্রভুত্ব ও খেয়াল বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন।

• • • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশীয় প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া লইলেও ইহা জনমত ও দেশের জনসাধারণ যাহাদের সূক্ষ্ম সন্তানের প্রদত্ত বৃত্তিতে ইহা পুষ্ট তাহাদের উপর অথবা অসীমিত কর স্থাপনে কোনরূপ আজও প্রয়োগ করে নাই। নানা প্রকারের আবেদনাদি করিয়া ইহা শিক্ষার্থীদের অর্থ শোষণ করিয়া নিজস্ব খেয়াল বজায় রাখিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার অর্থের ঘাটতি মিটাইবার জন্য যে সমস্ত ম্যাট্রিক, আই-এ প্রভৃতির উপর অতিমাত্রায় কি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন দেশের জন সাধারণ ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বেচ্ছাচার ও জনমতের প্রতি অপরিসীম উপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের পর্য্যন্ত চোখে বাজিয়াছিল এবং পরিশেষে গবর্ণমেণ্টের আদেশেই স্বেচ্ছাচারী বিশ্ববিদ্যালয়কে জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

• • • •

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এতকাল পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধন ভার গ্রহণ করিতেছেন সুখের বিষয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক শোচনীয় অবস্থা, ইহার সেনেট সভার দৌর্ব্বল্য, একের অতি আধিপত্য প্রভৃতি কারণে ইহা জন সাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছে। অর্থের হিসাব নাই, কি ভাবে ব্যয় হইবে তাহার স্থিরতা নাই পূর্ব্ব হইতে যিনি যত পারিল ভাঙ্গিয়া ব্যয় করিয়া পরে অর্থাভাবে হা হুতাশ—এতবড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূলে এরূপ গণ্ডগোল বাঞ্ছনীয় নহে।

• • • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বেচ্ছাচারে আজ তাহার অর্থভাণ্ড ও খ্যাতির ভাণ্ড শূন্য করিয়া নিম্নে দৈন্যের ভারে অবনত এবং ইহার ভবিষ্যৎকেও ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুরবস্থা ও অব্যবস্থা অপনোদনের ভার যাহার উপর পড়িবে তাঁহার উপর একটা বিরাট কার্য্যভার ন্যস্ত হইবে সন্দেহ নাই।

• • • •

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার সততা নাই—ইহাতে ছাত্রদের মন পরাঙ্মুখ। যাহার যে স্থান অধিকার করা উচিত নয় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সে স্থান অধিকার করিতেছে। একাধিকারের অতি প্রভাবে ক্ষমতাশালীর আত্মীয় পরিজনের এখানে অপ্রতিহত প্রভাব। ইহা লইয়া ভারতীয় ও বৈদেশিক নানা প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রেও বহু বার প্রতিবাদ আলোচনা হইয়া গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণের বিশ্বাস হারাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিধান ও ব্যবস্থার আমূল সংশোধন একান্তই অপরিহার্য্য।

• • • •

ইংলণ্ডের শিক্ষা সচিব রাইট অনারেবল মিষ্টার এচ-এল-হিলারের প্রয়ত্নে ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় শিক্ষাসচিবেরাও এ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শোচনীয় অবস্থা আজ এমন ভাবে হইতে পারিত না যদি শিক্ষা সচিব বা গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাহ্ণেই ইহার সংস্কার বিধানে মনোযোগী হইতেন। ১৯১৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর তহবিল অতিমাত্রায় ঘাটতি পড়িয়া আসিতেছে। শিক্ষার্থীদের প্রতি জুলুম কর নানাভাবে চলিতেছে—সেই সময়ে ৺মতিলাল ঘোষ অমৃত বাজার পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আরওয়াব সম্বন্ধে প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছিলেন—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো তাহার নিজের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেনই নাই—গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন নাই। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থা, পক্ষপাত, অত্যাচার, লইয়া প্রসিদ্ধ ইংরাজী মাসিকপত্র মডার্ণরিভিউ ও বাংলা প্রবাসী প্রভৃতিতে বহু আলোচনা হইয়াছে কিন্তু ফল কিছু হয় নাই।

• • • •

দেশের জনসাধারণ এক-রাজ স্বেচ্ছাচরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া নিরাশ হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় ও জনসাধারণের এই আন্দোলনে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই, কারণ উপরের গবর্ণমেণ্ট যখন নীরব তখন জনসাধারণকে আর ভয় কি। তাহারা তো ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে বাধ্য—ভাত কাপড় না হইলে যেমন চলে না দেশ-চলিত শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও তেমনি চলে না এই যখন দেশীয়দিগের ধারণা তখন করভার যতই বাড়ান যাক্ না কেন তাহাতে আর ক্ষতি কি? এই মতানুসারে স্বেচ্ছাচারী বিশ্ববিদ্যালয় নিজ স্বেচ্ছাচারী খেয়ালে নিশ্চিন্ত হইয়া এক-রাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আজ প্রকাশ্যভাবে দেশ সভা ও পরোক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টকে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া স্বীয় স্বেচ্ছাচারী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের জনসাধারণের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন দেশের স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় গৌরব শিক্ষা বন্ধির সহায়তার কবলিত হয়—জনমত এ বিষয়ে জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য কর। এতদিনে স্বেচ্ছাচারী এক-রাজের জনমতকে মনে পড়িয়াছে ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলোর হিসাবে।

• • • •

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার তাহার পৌষ গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের পরিবারসহ উপবাসী থাকিয়াও স্বাধীনতা বজায় রাখিবার কথা বলিতেছেন। শোনা যায় প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ বিশ্বাস করে যে গগনচারী নন্দনের পাখীরা স্বর্গের সুধাপান করিয়া প্রাণ ধারণ করে কিন্তু স্বাধীনতার উপরে আদিষ্ট পৌষ গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ কি বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিবেন!

•

ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় ভারত গবর্ণমেণ্ট, বাংলা গবর্ণমেণ্ট সব ভুলিয়া সেনেটরদের স্বাধীনতার স্তুতি গাহিতে বলিয়াছেন 'Freedom first, freedom second, freedom always' আর কিছুতেই নাকি ইহার সন্ধি দিবে না। উত্তম কথা—স্বাধীনতা এমন কথা—কে ইহার বিরুদ্ধে কহিবে? কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয়-ভাবে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছিল তখন জাতীয়ভাবে ভরপুর ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় কোন জাতীয় ভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গর্ভে নিমজ্জিত ছিলেন? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি ইনি কি উক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন দেশবাসী তাহা এখনও বিস্মৃত হয় নাই।

• • • •

আজ যিনি ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বাংলা গবর্ণমেণ্টকে ভুলিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন ১৯২২ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে তিনি প্রকাশ্যে কি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা কি উল্লাসের মুখে বিস্মৃত হইয়াছেন? বক্তৃতাটি এই 'I recall with pleasure the day • • • when I was *invited by Lord Minto* to undertake • • • the reconstruction of the University, • • • What is uppermost in my mind • • • is our keen regret that we shall no longer enjoy the advantage of the wise and far—

•

sighted *guidance* of your Excellency (Lord Ronaldshay). লর্ড মিণ্টো ভারতের ও লর্ড রোণাল্ডসে বাঙ্গলার ভাগ্য বিধাতা ছিলেন—আমাই কলেজস্কোয়ারের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রীর এ ভাবে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে তুলিয়ার বুক্তি দেওয়া কি সঙ্গত?

* * * *

কংগ্রেসের শিক্ষা-মন্ত্রী ইচ্ছা করিলে দেশ হিতকর অনেক কার্য্যই করিতে পারেন। এ বিষয়ে আজাদ বলিতেছেন "শিক্ষা মন্ত্রী ইচ্ছা করিলে কংগ্রেসের যে Constructive Programme বা গঠন মূলক কাজ তা সহজেই করতে পারেন। যথা, তিনি নিয়ম করতে পারেন যে প্রত্যেক প্রাথমিক, মধ্য ইংরেজী ও হাইস্কুলে চরকা কাটা শিক্ষার অঙ্গ হবে। তাঁর এক সার্কুলারে লক্ষ লক্ষ চরকা গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকেও চলতে পারে। নন্-কো-অপারেটারেরা সহস্র চেষ্টায় এ বিষয়ে যা না করতে পারেন তিনি একাই তা করতে পারেন। ছুঁৎমার্গ বা untouchability মন্ত্রী ইচ্ছা করলে অনেক নিরাকরণ করতে পারেন। ছুঁৎমার্গ একটা সংস্কার ব্যতিত আর কিছুই নয়। সংস্কার দূর করতে হলে শিক্ষা চাই। যদি শিক্ষা মন্ত্রী পাঠশাল ও স্কুলের লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে ছুঁৎমার্গ যে মস্ত ভা দেখাবার ব্যবস্থা করেন, তা হলে বোধহয় পাঁচ বৎসরে তিনি যা করতে পারবেন অন্যে তা বিশ বছরেও পারবে না। Excise যে সকল প্রদেশে মন্ত্রী বা মেম্বরের হাতে তত্তৎপ্রদেশেও সহজে মদ্যপানাদির ব্যবস্থা তুলে দেওয়া যায়।

* *

## সুলেন কনফারেন্সে তুর্ক প্রতিনিধিবর্গ।

(চশমাটা বাম হইতে গণিলে) রেসিদ সাবরুৎ বে, হুলুসি বে, রেফেত বে, কেমালের ইস্তাম্বুল পাশা, হেকি বে, ফেরিদ বে, হোকুমার বে, মুসিয়ে বে। (তুর্কের প্রধান প্রতিনিধি ইস্মেত পাশা বাম হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তির চতুর্থ জন।)

চারিদিকে নানা অভাব, খাইবার পরিবার অভাব, শিক্ষার অভাব আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে ক্রমশঃ অক্ষম ও অযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গলার এই অভাব সম্বন্ধে বাঙ্গলার কবী লিখিতেছেন 'আমরা বুঝি সত্য কোন পথে, আমরা জানি ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কোন দিকে—কিন্তু আমরা এমনই সংসার পাশে আবদ্ধ যে কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা একেবারে পঙ্গু বাস্তবিক এই বেকার সমস্যা দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী যুবক আজকাল এম-এ পাশ না করিলে যেরূপ নিরাশ হইয়া পড়ে এম-এ পাশ করিলে তদপেক্ষা অধিক নিরাশ ও নিঃসহায়

হইয়া পড়ে। জনসাধারণ অপেক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। গরীব লোকেরা তবু কথিত 'ছোটলোকেরা—মজুর, মাঝিরা বা কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে—কিন্তু বাঙ্গালী বাবু তাহা পারে না। আমরা মস্তিষ্ক চালনা শিখিয়াছি—কিন্তু তার সঙ্গে হাত চালনা শিখি নাই। ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে কিন্তু হাতের উপর আমাদের বিশ্বাস নাই।'

• • • •

'ঘরে যার অন্ন নাই কিম্বা পরিবার প্রতিপালনের জন্য যাকে ইংরেজের চাকরী হইতে হয়—ইচ্ছা থাকিলেও তাহার পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করা সম্ভবপর নয়। আজ যদি বাঙ্গালী চাকরীগত প্রাণ না হইয়া ব্যবসায়ী হইত তবে নিঃসন্দেহ এই স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী অধিক কাজ করিতে পারিত এবং অধিক ফলও পাইত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইবার আজ সুযোগ হাতে হাতে বুঝিতেছে যে চাকরীতে ইংরেজের গোলামী না ছাড়িতে পারিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান করা অসম্ভব।'

• • • •

দেশের চারিদিকে আজ নানা মতের নানা কথা লইয়া কথা কাটা-কাটি ও আলোচনা যতটা হইতেছে প্রকৃত কার্য্য সে ভাবের কিছুই হইতেছে না। ভারতের রাজনৈতিক আকাশ হইতে মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উৎসাহ ও জাতি গঠনের উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্রগুলির উৎসাহ স্রোতেও ভাঁটা পড়িয়াছে। কর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া কর্ম্ম পথ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়াতেই জাতীয় নেতার যোগ্যতার প্রমাণ। এ প্রমাণ দিয়া আজ ভারতের কোন নেতার অবলম্বিত পন্থায় পাইতেছি না।

• • • •

গত বৎসর এই সময় হইতেই সমগ্র বাংলার জলাভাব লইয়া দারুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল। সম্প্রতি বৎসর বৎসরই বাংলা দেশে তীব্রতর জলকষ্ট হইতেছে। অপরাপর জীবন ধারণের উপযোগী জিনিসের অভাব তো আমাদের দেশে রহিয়াই আছে তাহার উপর জল, বায়ু, আলো যাহা মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য তাহারও যদি অভাব ঘটে তবে তো একেবারে সোনায় সোহাগা। নদী-মাতৃক, স্বর্ণশ্যামা বাংলার অধিকাংশ নদ নদীই এখন ভরিয়া উঠিয়াছে। খাল বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতি বাহিয়া মজিয়া যাইতেছে। প্রাচীন কালের মত জলাশয় স্থাপনে দেশের অবস্থাপন্ন লোক আর এখন আগ্রহান্বিত নহেন। জলাভাবের সময় বাংলার পল্লিগুলি ও মফস্বল সহরগুলির অবস্থা দেখিলে সকলেই শিহরিয়া উঠিবেন। কোন কোন পল্লীতে দু'তিন মাইল ব্যবধান স্থান হইতে জল আনিতে হয়। পানীয় জলের অভাবেই এই সময় বঙ্গে নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। গত বৎসর এই জলাভাবের সময় নানা আলোচনার মধ্যে স্থানীয় ভবন হইতেও ইহার আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু অভাব মিটাইবার জন্য কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা সাধারণ বোধ হয় কোনদিনই বুঝিতে পারিবে না। আর এ দেশে যখন জলাভাবের পর জীবণ বন্যা আসিয়া সব ভাসাইয়া দিয়া একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া যায় তখন ইহা লইয়া আর স্বাস্থ্য বিভাগের মাথা ঘামাইবার আবশ্যক কি!

• • • •

বোম্বাই বিভাগের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে চার জন মহিলা দাঁড়াইয়াছিলেন শ্রীযুতা সরোজিনী নাইডুও ইহাদের মধ্যে একজন। ইহারা সকলেই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাংলার মহিলা সমাজের মধ্যেও এই সব অধিকার লাভের ইচ্ছা জাগিয়াছে। নারীরা এই সমস্ত বিভাগে গেলে নারীদের অভাব অভিযোগের অনেক প্রতিকার হইতে পারে। আমরা বাংলার মহিলা সমাজের সাফল্য কামনা করি।

• • • •

লুসেন বৈঠকের খবর ফটোগ্রাফের মারফৎ নিত্য নূতন রকম আসিতেছে। ইহা হইতে আমাদের কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কখনো তুর্কেরা বৈদেশিকদের সব দাবী মানিয়া লইতেছেন কখনও বা বাঁকিয়া চলিতেছেন। শেষ সঠিক খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত নিখুঁট প্রাচ্য সমস্যার কিরূপ সমাধান হইবে তাহা জানিবার উপায় আমাদের নাই।

•

# বিদেশের স্মৃতি

## ভ্রমণকারীর ডায়েরী

[ শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল ]

১৭ই ডিসেম্বর—আজ আমার রওনা হইবার দিন। সকাল হইতেই মনটা যেন একটু কেমন বোধ হইতেছে। মেয়েটী অসুস্থ, গৃহিণীর শরীরও ভাল নয়। সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণের সংকল্প করিয়াছি। দীর্ঘ দেড়মাস বাহিরে থাকিব—কত কি হইতে পারে। এই বাণিজ্য ব্যপদেশে ভ্রমণে যদি কোন ফল লাভ না হয় তাহা হইলে অনর্থক অর্থদণ্ড। শারীরিক কষ্ট কি বিপদের সম্ভাবনা ত আছেই। ৫০০০ মাইলের উপর একেবারে একা ইণ্টার বা থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ, কত স্থানে একেবারে অপরিচিতের মত নামিতে হইবে।

জিনিষ পত্র গুছাইতে বেলা বাড়িয়া গেল। আজ আমার বিদায় দিনে গৃহিণী স্বয়ং বহু যত্নে রাঁধিয়াছিলেন। কত দিন অন্তরে এরূপ আহার হইবে না বিবেচনা করিয়া পরিতোষ করিয়া ভোজন করিলাম। আফিসে বাহির হইব এমন সময় মাতাঠাকুরাণীর এক পত্র পাইলাম। ১৭ই ডিসেম্বর মহা গ্রহণ হইবে এই গুরুতর শুনিয়া তিনি চিন্তিতা হইয়া, আমাকে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন—মায়ের প্রাণ! আফিসে যাইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া লিখিলাম যে ওটী গ্রহণ মাত্র, তবের কোন কারণ নাই, আমি ১৮ই ডিসেম্বর টেলিগ্রাফ করিয়া আবার মঙ্গল সংবাদ তাঁহাকে জানাইব।

কাজ কর্ম্ম সারিয়া বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আহারাদি করিয়া পরিজনাদির নিকট বিদায় লইয়া টিকা গাড়ীতে জিনিষ পত্র সহকারে উঠিয়া বসিলাম। কলিকাতা শ্রীমান—চন্দ্র আমাকে উঠাইয়া দিতে সঙ্গে চলিল। সঙ্গে একটী ৩০ ইঞ্চি চামড়ার ট্রাঙ্কে পরিধেয় বস্ত্রাদি একটী হোল্ডঅলে বিছানা পত্র একটী টিফিন বাসকেটে আহারের সরঞ্জাম অপেক্ষা ছুতার ব্রাস, আরশী চিরুণী মাখার জিবার তৈল সাবান ইত্যাদিই বেশী। আর সাথের সাথী একখানি Newmans' Indian Bradshaw পূর্ব্বেই একটী tour programme প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহাতে কোন তারিখে কোথায় উপস্থিত হইব কতক্ষণ তথায় থাকিব ও চিঠিপত্র লিখিবার ঠিকানা ইত্যাদির একটী আনুমানিক কর্দ্দ দেওয়া ছিল। তাহার একখানি সঙ্গে রাখিলাম আর একখানি নন্দন বাবুতে থাকিল।

European Compartment এ উঠিতে হইবে সুতরাং একেবারে খাঁটী সাহেব সাজিতে হইল—কেবল

মুখেও হাতে এক কের কলি কিরাইয়া লইলেই আর কিছু বাকী থাকিত না। তারা টিকেট কিনিয়া আনিলেন। লগেজ বাবুর নিকট ২।১ বার "সাবু" শব্দ শুনিয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু পুরী-প্যাসেঞ্জারের প্লাটফর্মে ঢুকিতে পারিলাম না—সাহেব হইয়াও না। বাধ্য হইয়া সেই জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল প্রাক্‌টিস্ করিতে হইল। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে চলিত বলা যায় না। হঠাৎ আর একটী বন্ধু সাহেবের ( আমারই মত খাঁটী ) সহিত দেখা হইল। তিনি প্রথমশ্রেণীর যাত্রী তাঁহারই সহিত "কীটো পি সুবস সংখ্যা" হইয়া প্লাটফর্মে প্রবেশ লাভ করিলাম।

আমার নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিয়া বসিয়া রহিলাম। পদপালের মত লোক স্রোত আসিয়া আশে পাশে সমস্ত কামরা ভরিয়া ফেলিল কিন্তু "একেশ্বর ভীম সেন সমরেতে রহে"—European Compartment এ আমি একা। বিছানা পাতিয়া লইয়া বসিলাম।

রায়রাঙ্গোলা ষ্টেশনে একটী লোক হঠাৎ প্লাটফর্মের বিপরীত দিকের দরজা দিয়া কামরায় ঢুকিয়া পড়িল! তাকাইয়া দেখি একটী প্রকৃত খাঁটী কিরিঙ্গি ছোকরা! ( সভ্যতার খাতিরে বলিতে হয় যে তাহার তুলনায় আমি ও ইহুদী) সে আমাকে তার জাতভাই বিবেচনায় বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া দিল। সে সাঁতরাগাছীতে থাকে, রেলে কাজ করে, এখন বাসায় ফিরিতেছে। আমি প্লাটফর্মের দিকে তাকাইয়াছিলাম ট্রেণ ছাড়িয়া দিতেই মুখ ফিরাইবা-মাত্র সে বলিয়া উঠিল যে, সে আমাকে চেনে। ও হরি! বলে কি? একটু পরেই বুঝিলাম সে আমাকে ডাক্তার সাব্যস্ত করিয়াছে। স্বীকার করিতে হইল যে আমি ডাক্তারিও করিয়া থাকি? "I saw you often in our School and hospital" বাঁচা গেল—চিনতে পারে নাই। সে "Good night" বলিয়া সাঁতরাগাছীতে নামিয়া গেল! আমি শুইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। ইউরোপীয়ান্ হইবার সুরুতেই এই বিপদ, না জানি পরে কি হইবে। ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

খড়গপুর ষ্টেশনে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বেঙ্গল নাগপুর লাইনের এ একটী বড় জংশন এবং এখানে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ প্রভৃতি থাকায় বহু সাহেবও কিরিঙ্গির আবাস। জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখি যে বহু লোক ছুটা ছুটি করিতেছে একেবারে স্থানাভাব। আমি কিন্তু একা! কেহ "বেড়া ডাঙ্গা" কেহ উদিকে উদিকে বলিয়া চেঁচাইতেছে। দেখিলাম আমিও নিরাপদ নই। অবশ্য জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া "ইচার নেহি আয় ইয়ে সাব লোক্‌কা ওয়াস্তে" বলিয়া বিকৃত কণ্ঠে চেঁচাইয়া দুর্গ-দ্বার রক্ষা করিতে পারিতাম কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া কোন লজ্জায় তাহা করি! বিশেষ মনে এও হইতেছিল যে ২।১ জন লোক উঠিয়া না হয় একটু স্থান করিয়া লউক। সুতরাং Non intervention policy অবলম্বন করিয়া রাগ্‌খানা ভাল করিয়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। একটী ভদ্রলোক আসিয়া উঠিলেন পরক্ষণেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন—আমার ছাটটী বাহিরেই ছিল! আমি সেই একেশ্বরই রহিলাম।

## অপূর্ব্ব সহানুভূতি

কিরূপে পৃথিবীতে শান্তি রক্ষিত হইবে তাহারই উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। যথা—

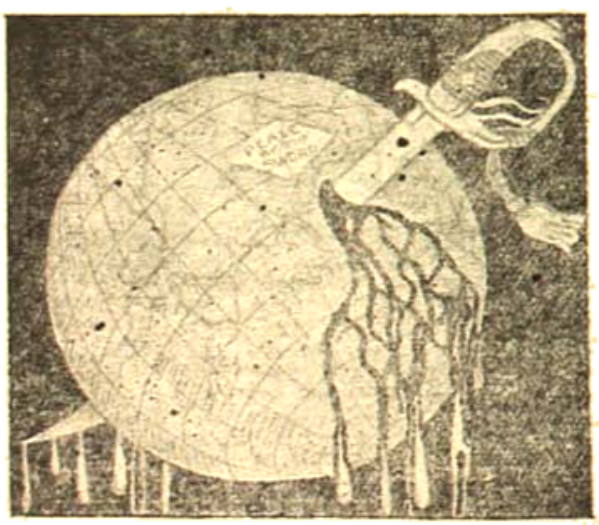

শান্তির মূর্ত্ত রূপ।

L' Asino ( Rome )

আমেরিকা। বুক ফেটে যাচ্ছে দুখরা জার্ম্মেনী, তোমায় রেখে বুক ফেটে জল বেরিয়ে পড়ছে, কিন্তু কি করব বল, জল বেরিয়ে গেলেও শান্তি হয় না, সেবার পয়সা চাই, জলের চেয়েও সেটা বড় জিনিস আর দামী জিনিষ।

Kladderadatsch. ( Berlin )

# অভাগিনীর প্রলাপ

[ শ্রীহেমন্তকুমার সরকার ]

( পূর্বানুবৃত্তি )

## ( ৭ ) মধ্যাহ্ন শেষে

"হৃদয়ে বাসিতে পারে এত ভালবাসা"

সাধনের সেইকটা দিন—সেই নির্জন প্রান্তরে নির্জন গৃহে কেবল আমরা কটি প্রাণীই ছিলাম। পাখীর কলতান পাখীর কুহুম সুবাস, আর আমাদের উন্মাদময় প্রাণের উল্লাসগীতি! আহা, সেদিন তো আর ফিরে আসবে না। আমরা দুজনে দুটি পাখীর মত আমাদের নিজের রচা জীবন আকাশে উড়ে বেড়াতাম। আমাদের কথার আর শেষ ছিল না। দিনের পর রাত—রাতের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল—তবুও সেই অফুরন্ত বাক্যবিনিময়—তথা প্রাণবিনিময়ের শেষ আর হল না। একদিন আমার নদীতীর হতে ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল—সে আমার ব্যাকুল প্রতীক্ষায় অন্নগ্রহণ করতেও ভুলে গিয়েছিল—আমাকে আসতে দেখে ছুটে গিয়ে কোমল দুখর বাহুদুখানি প্রসারিয়ে আমায় আলিঙ্গন করে টেনে আনল। আমার কত স্নেহে ভৎর্সনা—আমি কিন্তু কেবল নীরবে জানিয়ে দিলাম "তুমি মহাজন যে কর ভৎর্সন, সুধাসম লাগে মোর"—ভৎর্সনায় চটি নাই তাই কত রাগ, কত অভিমান। হায় প্রেমের রাজ্যের এসব কথা যে জানে সেই বোঝে!

## ( ৮ ) পূর্ব অপরাহ্ণে

যাহার লাগি গুরুজনে মনরাজ, দুজনে কিরে নাহি কেনা

সন্ন্যাসী সমীপে ইষ্টসিদ্ধির জন্য দুজনে কতদিনই না বসে থেকেছি—অনাহারে, অনিয়মে শরীর ক্ষীণ হয়ে গেছে। তাঁর রমণীয় মধুর মূর্তি রৌদ্রের তাপে মলিন হয়ে গেছে। আকাশকে ছাদ করে, বৃক্ষতলকে শয্যা করে যে সন্ন্যাসী তরুণ যৌবনে সংসারের সব বাঁধন কাটিয়ে এসেছিল—সেও মুগ্ধ হয়ে প'ড়ল—কিছু পরে মায়াপাশে বদ্ধ হওয়ার ভয়ে সে বেচারাকে স্থানান্তরে প্রস্থান করতে হ'ল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কত বিরক্ত হয়ে আমার হৃদয়েশকে কত গঞ্জনা দিতে লাগল। তার কোমল প্রাণ কিন্তু সব আঘাত সয়ে নিজের লক্ষ্য অভিমুখেই ছুটতে থাকলো!

আমি দূর বিদেশে রবকে গেলাম—তার শরীর খারাপ বলে তাকে যেতে দিইনি—কিছুদিন না যেতেই তার অভাব আমার হৃদয়টাকে শূন্য করে দিল। আমার পত্রে ইঙ্গিতমাত্র পেয়ে সে নিজের শরীরের কথা না ভেবে একবারে অজস্র ক্লেশ দুশ্চিন্তা আমার নিকটে সেবার জন্য এসে উপস্থিত হল। পাগল সে বুঝে নাই—কোন্ অপাত্রে সে তার এই স্বর্গের সুধারাশি ঢালছে। হীন-হীনের দুঃখ ভাবনাই যার তপস্যা ছিল—সে যে আমার মত অভাগিনীর পায়ে শুশ্রূষা করতে আসবে—ও আর বিচিত্রতা কি? বিদেশে সেই অপরিচিতস্থলে অজ্ঞাত অপূর্ব মিলন কোন্ দেবতার অনুগ্রহে হয়েছিল তা বলিতে পারি না সে মিলনে আমি যে নবজীবনলাভে সমর্থ হয়েছিলাম তা কিন্তু সেই পুণ্য মুহূর্তকে আমার নিকট চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

## ( ৯ ) অপরাহ্ণে

"আমি মরমের ব্যথা অন্তরের কথা কিছুই নাহি কব"

প্রকৃতি বড় নির্দয়া—তার আদেশের অবাধ্য হয়ে পরিত্রাণ কোথায়? আমার সোণার পুতুলিকে সে শয্যাশায়ী করল—জীবন ভবিষ্যতে হয়ত এমন আমার কত দিন সঙ্গে রইল। তার নিষ্ঠুর গুরুজনের আদেশে কাছে থাকা আমার ভাগ্যে বড় বেশী ঘটল না—সে দুবেলা দুখানি পত্রে জানাতো কেমন আছে। মাঝে মাঝে রোগক্লিষ্ট সেই মুখখানি দেখতে পেতাম। প্রাণটাই জানে বিদায়ের মুহূর্তে কি যাতনা হত—যতক্ষণ দেখা যায় তার পলকবিহীন চোখদুটি সজলভাবে আমার বহির্গমনের পথের দিকে চেয়ে থেকো—আমি দূরে গেলে হৃদয়ের দীর্ঘনিশ্বাস, ও তপ্ত অশ্রুজল রোগ যন্ত্রণায় আরো বাড়িয়েই তুলতো। হায় নিষ্ঠুর সংসার! আমাদের বেদনা তুমি কি বুঝবে—জগতে এ দুর্ভাগ্য যেন কারো না হয়—রোগশয্যায় প্রিয়তম কাতরপ্রাণে শায়িত—আর তুমি কাছে যেতেও অধিকারী নও—এর চেয়ে কঠিন শাস্তি প্রেমিকের কাছে আর কি আছে? প্রিয়তমের সেবা

শুশ্রূষা করে বশ হতে দেখায় না—ম'রলেও আমার এ দুঃখ ঘুচবে না।

সে সেরে উঠলো তো আমি পড়লাম। রোগবিধ্বস্ত দেহখানি নিয়ে সে যখন প্রাণ দিয়ে আমার সেবায় রত হল। আমি যাই নাই—সে যাবে না। প্রেমের অন্ধতা তার পেটের ক্ষুধা—চোখের ঘুম পর্য্যন্ত কোথায় দূর করে দিয়েছিল। কত জোর করলাম তবে সে গেল, আমাকে মরণের মুখ থেকে সে শুশ্রূষাগুণে ফিরিয়ে আনলো—যে একদিন দর্শন দিয়ে আমাকে আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছিল, আজ দৈহিক মৃত্যুকেও নিজ অসীম প্রেমে জয় করে আমায় একবারে সে কিনে নিল। আমার হিসাব-ভোলা পাগলকে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কত তিরস্কার, গঞ্জনা দিয়েছে—কিন্তু পার্থিব জীবনের সকল লোভনীয় সফলতা অম্লানবদনে অগ্রাহ্য করে—এই ক্ষুদ্র জীবনকে বাঁচাবার জন্য সব সমর্পণ করেছে। জানিনা কোন পুণ্যের বলে এমন দেবতার দর্শন জীবনে মিলেছিল।

"কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ কত আশা
কত স্নেহ ভালবাসা
সে নয়ন কোণে রয়।"

---

( ১০ )

"যদু সঞ্চিত পাপ পুণ্য
আমি সকলি করেছি শূন্য
তুমি পূর্ণ করিয়া হৃদি দিবে
তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো।"

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের যা কিছু ছিল—এখন তা তো নিবেদন করা হয়ে গেছে। তার কিছু চাওয়ার অভ্র নাই—আমি দীনহীনা, তার মত রাজাকে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে প্রেমাঞ্জ ভিন্ন আর কি উপহার দিতে পারি? তার দেওয়ার অভ্র নাই—কিন্তু বড় দোষ—আমি যে তাকে আর কিছু দিতে পারি না—আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি তারই পূজার আসন।

"প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তাহারে সাধ ছিল মনে
ভিখারী আমার ভিখারী!
হায়, পলকে সকলি সঁপেছি চরণে!
আর তো কিছুই নাই!
হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই!
ওগো, কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই?"

( ১১ ) সারংশ

"সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম
তোমার চরণখানি।"

সংসারের মলিন চোখে আমার হৃদয়ের উপাসনা সইল না—যারা একদিন ভালবাসার অতিরেকে এই প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল—আজ তাদের চোখই প্রথমে টাটাল। এত ভালবাসা তাদের সহ্য হল না। সঙ্কীর্ণ মানব হৃদয় ঈর্ষ্যা বহ্নিতে দগ্ধ হতে লাগল—সে দহনজ্বালা নানা কলঙ্ক ঘোষণার আহুতিতে পরিতৃপ্ত লাভ করল। আমার মুখেই আমার নিন্দা শুনলে ক্রোধে অভিমানে যার চোখ দিয়ে জল ঝরতো আজ তার প্রিয়তম সম্বন্ধের উপর কলঙ্কের ছাপ তারই প্রিয়জন কর্তৃক প্রদত্ত হল। হায়, মানব হৃদয় কত নীচ, কত ক্ষুদ্র—নরকের কীট তৎক্ষণেই নীচ মানবের ক্ষুধা প্রশমিত হয়!

নিন্দা তার শতমুখী জিহ্বা বিস্তৃত করে প্রেমের অকলঙ্কিত শুভ্রনামে কালিমালেপনে ব্যাপৃত হল; ক্রোধে, ঘৃণায় মন বিরক্ত হয়ে গেল, কিন্তু আশা এই ছিল, সময় বড় ভারবান্ বিচারক—সোণায় কালো রঙ মাখালে সে লোহা হয়ে যাবে না—বেশ সূর্য্যকে ঢাকতে পারবে না—তাস্করের পূর্ণশক্তি প্রকাশ পাবেই পাবে।

তার সেই কথা কয়টি আজ বার বার মনে পড়ে:—

"If I had loved thee for thy colour rare,
O beloved fair,
My love might cease to be, or had I sought thee for thy virtuous youth and tender yearning speech,
Thy swift compassion and deliberate truth,
O heart of ruth

Time might pursue, might reach
But I have loved thee for thyself indeed"

করে না কলঙ্কে ভয় হাবভাব নাহি জানে,
মান করি কাঁদি যবে মুখটি তুলিয়া চুমে;
তোরা যত মিলি গালি
সে কাছে টানিল খালি,
তোদের এ ফুলটায় চরণে ধরিল প্রেমে।

---

( ১২ )

"কেন সুখ দিতে বিধি প্রেম নিধি গড়িল
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল

হিয়া মরমি পরাণ পোড়ানি কি দিলে হইবে ভাল।"

হৃদয়ের মূক বেদনা বুকে গুমরে উঠ্‌ছে—নিশীথে নিদ্রাঘোরে মনে হত বুঝি সে আমার বুকের জ্বালা জুড়তে ছুটে এসেছে—অর্দ্ধচেতন অবস্থায় তার মধুর সান্ত্বনাবাণী কাণে এসে যেন পৌঁছুত—হৃদয়ের সব জ্বালা জুড়িয়ে যেত। সেই চাঁদ মুখের মৃদু হাসি—সেই ফুল্ল ফুলের মত মৃদুশক্তির আড়ালে হাসি—আমার গভীর অবসাদ দূর করে, আমার হৃদয়াকাশে ক্ষণেকের জন্ত বেদনা মেঘের কোলে আনন্দ বিদ্যুতের সৃষ্টি করত। কিন্তু চেতনা পেয়ে হয়তো দেখতাম, সবই অলীক স্বপন মাত্র!

আবার অন্তদিন হয়তো আমার সান্ত্বনা দিতে সত্যই সে এসেছে—প্রবঞ্চিত মন কিছুতে বিশ্বাস করতে চায় নি—স্পর্শ ক'রে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়েছে, শরীরী তাকে পেয়েছি—তবুও মনে হয়েছে না এও বুঝি স্বপন। এত সুখ কি আমার পোড়া ভাগ্যে ঘটবে—এ দুঃখ-হিয়া শীতল করতে সে দেবতা কি আসবে—জেগে উঠে কত পরীক্ষা ক'রে দেখেছি—তাও বিশ্বাস হয় নি—নয়নের বারিধারা হর্ষে বিষাদে উছ্‌লে উঠেছে—হয়তো দেখে দেখেছি সে নিজের কোলে আমায় নিয়ে কত যত্নে শুশ্রূষা করছে। আমার জীবনদেবতার ক্রোড়ে সত্য সত্যই আমি আছি—হায়, বজ্রবেদনার বিনিময়েও সে সুখটুকু পেলে প্রাণ যেন কত তৃপ্ত হয়!

সে আমার নিকট যেন একটা মরীচী স্বপ্নের মত ছিল—আমাকে প্রাণ দিতে সে দেবদূত স্বর্গ হতে যেন কিছুদিনের জন্ত মর্ত্যে নেমে এসেছিল। তার সমস্তই সবই যেন আমার নিকট মস্ত একটা অবাস্তবের রহস্তে ঘেরা ছিল। আমার মূক হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি আপনি গিয়ে সে চরণে লুটিয়ে পড়ে সার্থকতা লাভ করতো। দেবতার পবিত্রতা, শিশুর সরলতা, মায়ের স্নেহশীলতা সখার সহায়তা—সে অন্তরে অন্তরে ছিল—তার জন্তে হাত পেতে চাইতে হত না, সে মন্দাকিনী ধারা আপনিই শতমুখে প্রবাহিত হয়ে আমার ক্ষুদ্র জীবনের যত কিছু তাপ, মলিনতা সব ধুয়ে মুছে দিত। হায়, সে সুখের স্মৃতি মাত্রই সার হল!

"জীবন এমন জন কে আগে জানিত রে
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে।"

( ১৩ ) নিশায়

চক্রবাক ও চক্রবাকী

"আজি যে করিব প্রেম, মনে ভাবি অনুপম
বিচ্ছেদ অনলে ক্রমে কালি হবে অশ্রুজল।"
"স্বপনেতে শুধু দেখা পাই বলে মরণে রেখেছি লুকায়ে।"

আজ সে কোন্ সুদূরে চলে গিয়েছে! সে মধুর মিলনের আশা আজ সুদূর পরাহত।

ও গো কভু সুখের কভু দুখের ঘোরে
মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে
তুমি আমায় ভালবেসেছ
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ।

---

অহমিহ দ্বিতবানপি তাবকঃ
সোঽপি তব্ব বসন্নপি মামকঃ
ন তদু সদম এব তু সদমঃ
হৃদয় সদম এব তু সদমঃ!

---

সখি কে বলে পিরীতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিনু
কাঁদিয়া জনম গেল।

---

সুখের লাগিয়ে এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

---

হিয়া ধকধকি পরাণ পোড়ানি
কি দিলে হইবে ভাল!

---

যে মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরালে গেলে পলকে প্রলয় জ্ঞান হ'ত, আজ তার সহিত চিরবিরহেই সে প্রেমের অবসান। বিরহের বেদনাময় তপস্যাই বুঝি প্রেমিকযুগলের পুনর্মিলনের পথ সুখের পুষ্পে আবৃত করে দেয়—বহু দিন বঞ্চিত অন্তরের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষায় চরম পরিতৃপ্তিকে পূর্ণতা দেয়।

এই ভাল কাজ নাই
যা পেয়েছি থাক তাই
চাহি না মিলন।
এমনি প্রেমের গানে
এমনি তোমার ধ্যানে
কাটিবে জীবন॥
অপ্রত্যাশী অনুরাগ
নিষ্কাম এ প্রেমযাগ
এ নহে মোহের তৃষা
এ নহে স্বপন।
এ যে শুধু আপনারে
সর্ব্ব সমর্পণ॥

"বুঝিতে পারি না বুঝাতে পারি না,
কহিতে পারি না কথা;
চোখে জাগে শুধু ছবিখানি তোর
হিয়ে জাগে শুধু ব্যথা।
ছবির আড়ালে রূপের আড়ালে
তোমারে হারায়ে যাই;
কাছে যত দিন ছিলে তত দিন
তোমায় দেখা না পাই।
কাছে যত দিন ছিলি তত দিন
কতটুকু তোরে পাই?
তোমার রূপের আড়ালে হে সখা
তোমারে হারায়ে যাই!
দূরে কত দূরে আছ তুমি আমি
হেরায় আমি যে একা,—
তবু তোর সাথে বিরহের মাঝে
শত বার করি দেখা।
পিরীতি তোমার মুরতি ধরিয়া
আরতি করিছে মোরে;
রস অনুরাগ অতনু গন্ধে
হৃদয় উঠিছে ভরে।"

---

## জ্ঞানীর মন।

( যোগবাশিষ্ঠ )

[ শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। ]

ভেদ করিবে বৃহৎ পাথর,
নাই সে শক্তি শরের ঠাঁই।
বিপদ ঘনাক,—জ্ঞানীর মনে
বিন্দুমাত্র ভয় ত নাই।

# তোড়া

[ শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা বি-এ ]

**অচ্ছেদ্য কলার**ঃ—সম্প্রতি এরকম রবার বাহির হইয়াছে, দেখিতে বেশ শক্ত, টানিলে লম্বাও হয় খুব। তবে তেমন শক্ত হয় নাই বলিয়া থালা, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ তৈয়ারী করা যাইতেছে না। আশা হয় শীঘ্রই শক্ত, শক্ত রবারের জিনিষ পত্র বাজারে দেখা দিবে।

**ফোঁড়া দিয়া বীজ বপন**ঃ—ইটল্যাণ্ডের এক গ্রামে অদ্ভুত উপায়ে শস্য উৎপাদন করা হইয়াছে। খুব খাড়া একটা টিলার উপরে কোন রকমেই বীজ বপন করা যাইতেছিল না, অথচ জায়গাটির মালিক সেখানে শস্য না জন্মাইয়া ছাড়িবার পাত্র নন্। তিনি খুরিয়া কিরিয়া দুইটী পুরান কামান যোগাড় করিলেন। ছোট ছোট টিনের কৌটার ভিতরে নানাপ্রকার গাছের বীজ ভরিয়া, ভাল করিয়া মুখ আঁটিয়া লইয়া কামানের মুখে পুরিয়া দিলেন। বারুদ ভরিয়া কামান দাগিতেই কৌটাগুলি ছুটিয়া যাইয়া টিলাটার গায়ে ধাক্কা লাগিল সঙ্গে সঙ্গে বীজও ছড়াইয়া পড়িল। এই ভাবে এক কি দুই বৎসরের মধ্যে নানাপ্রকার শস্য, গাছ গাছড়া ইত্যাদি জন্মিয়া পতিত জমিটাকে এখন কাজে আনিয়াছে।

**শঙ্খাকৃতি দ্বীপ**—নিউজীল্যাণ্ডের উত্তর দিকে একটি জায়গা আছে ভৌগোলিকেরা নাম রাখিয়াছেন "ঘেত দ্বীপ"। যাহারা কিছুদিনের জন্য এখানে কাজ কর্ম করিতে আসে তাহারা কেহ বলে নরক কেহ বলে শঙ্খদ্বীপ। এই দ্বীপটির ভিতর একটি পাহাড় আছে ৮০০ ফুট উঁচু। এই পাহাড়টাই একটা শঙ্খের খনি। দ্বীপটির ভিতরে ৬০ বিঘা জমি লইয়া ১০ হাত গভীর একটি হ্রদ। জলের ভিতর রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ এত বেশী যে সব সময়ই ফুটন্ত জলের মত টগবগ করিতেছে। একটি গহ্বরের মধ্য হইতে সব সময়েই ধূম বাহির হইতেছে। ধূমের গন্ধে ১৫ মাইলের মধ্যে লোক যে টিকিতে পারে না। এক সময়ে শঙ্খ তোলা কালে যখন সাহেবরা একদিক হইতে খনিতে আসে তখন তুর্কি মজুরেরা খনির অন্যান্য জিনিষ পত্র ও যন্ত্রপাতি লইয়া আসে।

**ব্যাধির আবিষ্কার**—আমেরিকার এক ডাক্তার Dr. W. H. Fitzerald বলেন যে ছোটখাট ব্যথা আমরা ওষুধ বিষুধ না খাইয়াই সারাইতে পারি। শিরা উপশিরার একপ্রান্তে ব্যথা হইলে অন্যপ্রান্তে চাপ দিলেই সারিয়া যায়। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে নীচেকার ঠোঁটের একটি শিরার উপর চাপ দিয়া রোগীর শরীরে সূঁচ ফুটাইয়া দেওয়াতেও রোগী কোন ব্যথা পায় নাই। তাঁর মতে শরীরের কোন জায়গায় ব্যথা হইলে সেই জায়গার উপরে কি নীচেকার অংশে চিকিৎসার কাঁটা দিয়া চাপ দিয়া দেখিবে। এই ভাবে দু চার জায়গায় চাপ দিলে এমন একটা জায়গা পাওয়া যায়, যে জায়গায় একটু বেশী জোরে চাপ দিলে আরাম বোধ হয়। সেই জায়গায় রবারের পট্টি বাঁধিয়া রাখিলে ব্যথা সারিয়া যায়। এইভাবে দাঁতের ব্যথায় আঙ্গুলের গাঁ, মাথাব্যথা হইলে তালু, চোখ ব্যথা করিলে দুহাতের প্রথম আঙ্গুল দুইটির গাঁট চাপিয়া ধরিলে অনেক আরাম পাওয়া যায়।

**নূতন আবিষ্কার**—কানাডা নিবাসী গ্রাণ্ডেট নামক বৈজ্ঞানিক একটী নূতন তারা আবিষ্কার করিয়াছেন। সূর্য্যের চেয়ে ইহা ১৩০ গুণ বড়, আর পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্বের পরিমাণ ৪২ হইতে ৪৬ কোটী মাইলের মধ্যে।

বিলাতের এক ফার্ম একটী নকল ঘোড়া তৈরী করিয়াছে। এই কলের ঘোড়া ঘণ্টায় ৬ মাইল পর্য্যন্ত চলিতে পারে। আসল ঘোড়ার আর এই নকল ঘোড়ার তেমন কোন প্রভেদ নাই; তবে একটার খায় দায় আপন ইচ্ছায় চলে ফেরে আর একটার খাবার দাবার ভাবনা নাই আর পরের ইচ্ছা ছাড়া নিজের গায়ের উপরকার মাছিটাকে তাড়াবারও শক্তি নাই। এই যা!

**রক্তের সম্বন্ধোন্নয়ন**—আমাদের দেহের ভিতর এমন কতকগুলি গ্লাণ্ড ( gland ) আছে যাহা আমাদের ব্যথা রক্ষার সহায়তা করে। আবার ইহার মধ্যে এমন একটি গ্লাণ্ডের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে রস বাহির হইয়া আমাদের জরা ও বার্দ্ধক্যের সুযোগ করিয়া দেয়। বিলাতের এক ডাক্তার ইহার খোঁজ

পাইয়া অনেক বৃদ্ধের গ্ল্যাণ্ডটী কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সেই জায়গায় একটি জোয়ান বানরের গ্ল্যাণ্ড লাগাইয়া দিয়া আশ্চর্য্য রকম ফল পাইয়াছেন। লণ্ডনের এক বৃদ্ধ মিঃ সিমাটেভের উপর এই চিকিৎসা প্রয়োগ করা হইয়াছিল। বৃদ্ধের বয়স ৭৬ বৎসর। প্যারীর এক ডাক্তার ইহার গ্ল্যাণ্ডটী কাটিয়া ফেলিয়া একটি বানরের গ্ল্যাণ্ড জোড়া লাগাইয়া দেন। বৃদ্ধটী ক্রমেই জোয়ান হইতে আরম্ভ করে। চিকিৎসার পূর্ব্বে কোথায় বসিয়া বিমান ছাড়া ইহার বাহির হইয়া চলাফেরা করার তেমন শক্তি বা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এখন তিনি সচ্ছন্দে ৭।৮ মাইল হাঁটিতে পারেন। চুল পড়িয়া গিয়া টাক হইয়াছিল। এখন আবার টাক ঢুকিয়া চুল বাহির হইতেছে। মোটকথা তাহাকে দেখিলে এখন আর বৃদ্ধ বলা চলে না। আমাদের দেশের অনেক চেয়েও তিনি শক্তিশালী ও কর্ম্মঠ।

Dr Coureb Burchardi আজকাল লণ্ডনে চিকিৎসা করিতেছেন। এই চিকিৎসা সফল করিবার জন্য তিনি প্রায় ২০ বছর ধরিয়া নানা রকম জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন যে একটি গ্ল্যাণ্ডের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ কোন গ্ল্যাণ্ড জোড়া লাগাইবার দরকার নাই শুধু অপেক্ষা গ্ল্যাণ্ডটী ফেলিয়া দিলেই চলিবে এবং তার জায়গায় শরীরের অন্য একটা গ্ল্যাণ্ডকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। জর্ম্মাণ সম্রাট কাইজারকে তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের কিছু পূর্ব্বেই এই চিকিৎসা করা হইয়াছে। এই চিকিৎসায় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদেরও যৌবনশ্রী ফিরিয়া আসিতেছে। X' Ray দিয়া তাহাদের চিকিৎসা হইতেছে। চিকিৎসার ৪।৫ দিন পর হইতেই তাহাদের আবার তাজা গাঢ় জোড়া লাগিয়া নিটোল হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তির পুনর্জ্জীবন লাভ কি এমনি একটা কিছু ছিল?

**স্বাস্থ্যের অমঙ্গল**—১৯০৯ সালে একটি বালিকার মৃতদেহে এক প্রকার তরল পদার্থ প্রবেশ করাইয়া দেখা গিয়াছে যে অন্য পর্য্যন্ত বালিকাটির অন্য প্রত্যঙ্গের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বুদাপেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোলম্যান ভি. টেলিয়েন নিকুঞ্জি এই আশ্চর্য্য তরল পদার্থের আবিষ্কর্ত্তা। তিনি বলেন যে এই পদার্থ মৃত দেহে প্রবেশ করাইতে পারিলে সেটি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে। মিশরের মমির কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। আজকালও মিশরের স্থানে স্থানে নূতন নূতন মমি আবিষ্কার হইতেছে। মমীর দেহ প্রায় অবিকৃত অবস্থায়ই থাকে। অধ্যাপকের এই প্রক্রিয়া করিতে প্রায় সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হয়।

**আন্দাজ দেখা, হাতে শোনা**—আমেরিকার Chicago Medical Society একটী ১৭ বছরের বালিকাকে নিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। বালিকাটী অন্ধ, কানেও শোনেনা। কিন্তু না দেখিয়া বা না শুনিয়া সে সব জিনিসের রং ও শব্দ বলিয়া দিতে পারে। একখানা ছবি দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ছবিটী কিসের। সে গুঁকিয়া বলিয়া দিয়াছিল ছবিটী একটী স্ত্রীলোক ও দুইটী পুরুষের। একটী টাই হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল টাইটী কি রংএর। সে ঠিক বলিয়াছিল যে টাইটী লাল, নীল ও বাদামী রংএর। এইভাবে কোন্ জিনিষে কি রকম শব্দ হয় তাহা সে আঙ্গুল দিয়া ছুঁইয়া ঠিকঠাক বলিয়া দেয়।

**বঙ্গে সতীদাহ**—গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে দেখা যায় ১৮১৫—১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার হিন্দু স্ত্রী মৃত স্বামীর সহিত চিতানলে দগ্ধ হইয়াছে। নিম্নে একটা তালিকা দেওয়া হইল :—

| | |
|---|---|
| ১৮১৫ | ৩১৮ |
| ১৮১৬ | ৪৪২ |
| ১৮১৭ | ৭০৭ |
| ১৮১৮ | ৮৩৯ |
| ১৮১৯ | ৬৪০ |
| ১৮২০ | ৪৩৯ |
| ১৮২১ | ৬৪৩ |
| ১৮২২ | ৫১৩ |
| ১৮২৩ | ৫৭৫ |
| | ৫৩৪০ |

৪৷৷ বিনামূল্যে লক্ষ্টেসহিত ফটো ফটো এনলার্জ ফিনিসিং কলিকাতা ও মফঃস্বলের যে কোন ষ্টুডিও হইতে ফটো এনলার্জ করিয়া আনিলে ফটো ফ্রেম ও ফটো ফিনিসিং বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ফটো ফ্রেম ও ফটো ফিনিসিং সেকার ৩৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

# স্মৃতি মন্দির

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এতখানি বয়স পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিবার শিক্ষা তাহাকে কেহ দেয় নাই, কেমন করিয়া এতবড় বিশ্বজগতে আপনার এতটুকু স্থান করিয়া লইতে হয় সে শিক্ষা কাহারও কাছে পায় নাই, অতি শিশুকালে যেমন সে পরের মুখের পানে চাহিয়া পরমত আহারে কাল কাটাইয়াছে, আজও, এতকাল পরেও, এতখানি জীবনাতিবাহিত করিবার পরেও, সে পরনির্ভরতা তাহার ঘুচিল না। এতখানি বয়সের বাঙ্গালী যুবকের সম্মুখে কোন পথটাই মুক্ত নাই, অতীতে, বহুবর্ষপূর্ব্বেও যেমন সমস্তই রুদ্ধ ছিল, আজও ঠিক তেমনই আছে, একটী দরজাও মুক্ত হয় নাই। তবু সে অশিক্ষিত নহে, যে শিক্ষার প্রতিযোগিতায় দেশ ভরিয়া আছে, সে শিক্ষা হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই। যতখানি পারিয়াছে, সাধ্যে কুলাইয়াছে, গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজিকার এই দুর্দ্দিনে, এই আলোকশূন্য সংসারারণ্যের পথে সে জানা-লোক তাহাকে কোন পথই দেখাইয়া দিতে পারিল না। জানি না, আমাদের জন্মগত সংস্কার কি-না, যে-একটী পথ এই বয়সের বাঙ্গালীর ছেলের সামনে মুক্ত বলিয়া মনে হয়, সে পথ যে কি তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না কিন্তু সে-পথই বা মুক্ত কোথায়? হয়ত চেষ্টার ত্রুটী করে নাই, তাহার শেষ অর্থটিও সে ঐ আবেদন-নিবেদনেই ব্যয় করিয়াছে কিন্তু কৈ, কোন ফলই ত সে পাইল না। পরেও—পাইবে কি-না কে জানে! না পাওয়া আশ্চর্য্য নয়। তাহার বাসায় বাবু যে দুই-চারিজন আছেন তাঁহাদের মুখে যা শুনিয়াছে, তাহাতে ত কোন আশাই তাহার হয় না। তবুও সে সকল দুরাশার মধ্যে ক্ষীণ একটী আশার স্মৃতি বুকের মধ্যে জাগাইয়া বসিয়াছিল, প্রত্যাখান করিয়াছে জানিয়াও অপ্রত্যাশিত সাহায্য হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে—জানিয়াও আশা ছিল এই অশান্তির, এই দুর্ভোগের কাল বুঝি সত্যই ফুরাইয়াছে, সত্যই বুঝি ভগবানই তাঁহার অপার অসীম করুণার একবিন্দু কাননার হাত দিয়া তাহারই উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছেন! বুঝি তাহার দুঃখনিশাবসানের কাল আসিয়াছে।

কিন্তু তিন চারদিন কাটিয়া গেল, কোন সংবাদই আসিল না। যখন পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া সব পথ দৃষ্টির সম্মুখে একাকার হইয়া যায় তখন মানুষ কি ভাবে, কি করে বলিয়া বোঝান সম্ভব নয়। বুঝাইবার চেষ্টাও আমি করিব না। কেবল বলিয়া দিতেছি তখন সে সমস্ত অতীত জীবনটাকে ধিক্কার দেয়, অতীতের সমস্ত কাজকে অভিসম্পাত করে, কৃত-অকৃত সমস্ত ঘটনাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া আপনা-আপনি অনুশোচনায় মরিয়া যায়! জীবন তখন তার কাছে এক নিষ্ফল ক্রন্দন-দম হইয়া যায়; জীবনের কোন অংশটাকেই আর সে দেবতার দান বলিয়া নিতে পারে না, এত বড় বোঝা নামাইয়া জীবনের সহিত নিঃসম্পর্ক হইতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়।

আজ মনে পড়িতে তাহার আত্মগ্লানিতে মরিতে ইচ্ছা হয় সে কেন সেদিন কাননার সঙ্গে অমন চাতুরী খেলিয়াছিল। মনে হয় আজ যদি সেই অপরাধেই কেহ তাহাকে তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিত, তবেই সে মুক্তি পাইত, তবেই তাহার গ্লানি বিদূরিত হইত, তবেই সে শান্তি পাইতে পারিত!

অথচ কেন যে মিথ্যাচরণটা করিয়াছিল আজ পর্য্যন্ত নিজেই সে বুঝে নাই। বাসা ছাড়িবার অভিপ্রায় তাহার ছিল, সেই সঙ্গে ইহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না যে দুই চারিদিন বা এক সপ্তাহের মধ্যে বাসা ত্যাগের সম্ভাবনা অতি অল্প, তবু যে কেন কাননাকে এই বাসার খবর পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছিল তাহা সে আজও জানে না! আর কেনই বা সে কর্ম্মের সন্ধানে গিয়া, অমন এক হিতৈষিনীর হিতাকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া পৌরুষত্ব

দেখাইবার সুযোগ তাহার চারিদিকে বাস্তবিক তাহার তাহার বুদ্ধির অগোচর! আজ একটা কারণও সে খুঁজিয়া পায় না। কতবার মনে হয়, কারণ ছিল কিন্তু সে কি কারণ?—সে ত কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছে না! কিন্তু এই বা কিরূপে সম্ভব যে জীবন যাহাদের স্নেহের জাল জালে জড়িত হইয়া আছে, যাহাদের স্মরণমাত্রে হৃদয় অনুতপ্তরসিক্ত হইয়া যায়, তাহারই সম্মুখে অকারণে সে এমন একটা মিথ্যাচরণ করিয়া ফেলিল!

ভুল কি আত্মগ্লানি! কামনা যদি তাহার সেই বাসা পরিবর্ত্তন কল্পনা করিয়াই মাতুলের অভিমত জানাইতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে কি তাহার সমুচিত শাস্তি হয় না? তবেই কি কুতকর্ম্মের ফলভোগ তাহার পুণ্যাত্মার হয় না?

সারারাত্রি জাগিয়া সুশান্ত ইহাই স্থির করিল, আর এখানে থাকিতে হইবে! অনেক বিরুদ্ধ যুক্তিতর্কের পর সে যখন শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া, নিদ্রার উপাসনা করিতেছিল তখন পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা জানিয়াও শয্যা ত্যাগের ইচ্ছা হইল না। জাগরণ-ক্লান্ত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিতে সে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল। এবং নিদ্রাভিভূত হইতেও বড় বিলম্ব হইল না।

ঘুম যখন ভাঙ্গিল, বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মেসের বাসা প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিয়াছে, দ্বার খুলিয়া সুশান্ত বাসার অবস্থা দেখিয়া আবার ঘরে আসিয়া বসিল। সারারাত জাগিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া যেটিকে সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এখন দেখিল তাহার সাধনপথে অনেক বাধা বিঘ্ন বর্ত্তমান। রাত্রের অন্ধকারেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্, সেগুলা রাত্রে সে ভাবে নাই। এখন দিবালোকে সেগুলি সমস্তই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সংখ্যাও তাহারা গেল। মনে হইল, হয়ত তাহার পুনর্গমনে কামনা বিরক্ত হইয়া পড়িবে। কামনা হয়ত মাতুলকে বলিয়াছিল, মাতুল তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, যোগ্যতর ব্যক্তি হয়ত পাইয়াছেন, এখন অবস্থায় সে যদি কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আবার কামনার কাছে যায়, কামনা যে বিরক্ত হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুশান্ত বাইবে না, কামনাকে বিরক্ত দেখিতে পারিবে না।

মানবচিত্তের একি মোহ, কে জানে। জান সেই, জানুক, সেও, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সেও জানে, হৃদয়ের ইষ্ট দেবতার তিন অক্ষরের একটি নাম বহুজনের হৃদয় পীড়িত, দাহ, হৃদয় মথিয়া মধু বিলাইয়া দেওয়াইতে লাগিল! কতদিন, কত কাল, কত যুগ ধরিয়া সে যেন এই নামের মধুই পান করিয়াছে, করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে!

আজ বড় বেশী করিয়া মনে হইতেছিল কামনার সেই স্নেহপূর্ণ কথাগুলি। অক্ষরগুলি সেই মধুর হৃদয়ের মধুতে ভিজিয়া, কামনার কণ্ঠের মধুতে মধুময় হইয়া আসিয়াছিল। মনে হয় যেন তার মধ্যে সে আশাতীত, কল্পনাতীত কতই পাইয়াছে,—মুমূর্ষু ধরিয়া মানুষের যাহা ধ্যান জ্ঞান, চিন্তা কল্পনা, কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদে অযাচিতরূপে সেই মনোমুগ্ধা নায়িকাই তাহার হাতের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, মূঢ় সে, দুর্ভাগা সে, হেলায় হারাইয়াছে, অযত্নে খোয়াইয়া ফেলিয়াছে। সে-যে কত ক্ষতি তাহার হইয়া গিয়াছে, অজ্ঞাতে কি অমূল্য সম্পদই হারাইয়াছে, যখন সে বুঝিতে পারিল সেই মুহূর্ত্তে তাহার মুখের সমস্ত রক্ত হু হু করিয়া সেই যে নামিয়া গেল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাহার মুখের বিবর্ণতা ঘুচিল না। পাংশু পাণ্ডুর মুখে অতীতের উজ্জ্বল ছবিটার দিকে চাহিয়া মূঢ়ের মত বসিয়া রহিল।

অথচ সে কি বস্তু? কি পাইয়াছিল আর কি-বা হারাইল, বারবার এ প্রশ্ন সে আপনাকেই করিল কিন্তু উত্তর তাহার মনে বা মুখে কোথায় যেন দিল না। সে কথা যদি বা মনের কোণে উদয় হয়, প্রত্যয় দিতে সাহস হয় না! সে-যে কত বড় অসম্ভব চিন্তা, বিকৃত মস্তিষ্কের ভ্রান্ত পরিকল্পনা মনে পড়িতেই মনই তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল।

হায়রে! সে কথা ভাবা কি সহজ? গরীবের ছেলের পক্ষে সে-যে যোড়রোগেরও বেশী? তার চেয়ে অসম্ভব আর কি হইতে পারে? কিন্তু মন বোঝে না কেন? মন যেন তাহাকে ভালবাসা বলিয়াই আগ্রহে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিতে চায়। তাহার সমস্ত কল্পনা, সুখ-দুঃখের সব চিন্তা যেন সেই কথাটার উপরই বিশ্রাম করিতেছিল।

মনে হয় ভালোবাসা। মন সে চিন্তাতেও সুখ পায়, হৃদয় সে কল্পনাতেও শত বাহু তুলিয়া নৃত্য করে কিন্তু সুশান্ত যে পারে না। যত ভাবে দরিদ্রের প্রতি ধনীর

সহজ সহানুভূতি, মানুষের প্রতি মানুষের সমবেদনা, তা ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু মন যে সে কথা বিশ্বাস করে না। আঁধার বিজন পথে এক তীব্র আলোর রেখা দেখিয়া সেই দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। বহুদিন আঁধারে ঘুরিয়া যে নয়ন মন তাহার হতাশায় ভরিয়া গিয়াছিল, আলোকের সন্ধান পাইবামাত্র এমনই উদ্দাম-বেগে তাহার গতি বৃদ্ধি পাইল যে সে গতি রোধ করে কাহার সাধ্য?

হায় ভালবাসা! সংসারার্ণবে বিচরণ করিতে তোমার শক্তির তুলনা নাই!

ঠাকুর আসিয়া জানাইল, সুশান্তর আহার শেষ হইলে সে অবসর পায়—সুশান্ত উঠিয়া পড়িল। মনে করে, চৌবাচ্চার জলে ভাসিয়া উঠে সেই একখানি মুখ, যে মুখ সে জাগিয়াও স্বপ্ন দেখিতেছে; আহার করিতে বসিল, মনে হইল ঠিক তাহার পাতের সামনে কে যেন নিবিষ্ট মনে বসিয়া আছে, সে-যেন তেমনি আগ্রহভরা স্নেহময় দৃষ্টি, কোমল কণ্ঠস্বর লইয়া আসিতেছে!—বিড়ালটা মাছখানা তুলিবার উদ্দেশেই মুখটা বাড়াইয়াছিল, সুশান্ত কল্পনার প্রিয়তমাকে দেখিতে মুখ তুলিতেই 'ম্যাও' শব্দে বিরক্তি জানাইয়া মার্জার কক্ষত্যাগ করিল।

সুশান্ত বড় বিপদেই পড়িয়া গিয়াছিল। এই অজ্ঞাত সুখ চিন্তার কবল হইতে কিছুতেই সে পরিত্রাণ পাইল না; তাহার সর্বেন্দ্রিয় সেই নাম উচ্চারণ করিয়া কিরিতে লাগিল, হৃদয়ের সব ক'টি তারে তারই পুলকরাগিণী ধ্বনিত হইতে লাগিল। সুশান্ত যখন কোনমতেই নিস্তার পাইল না, তখন দু'চোখ বুজিয়া, একখানিমাত্র কাপড় সম্বল করিয়া অনিল বাবুকে দেশের ঠিকানায় চিঠিপত্র পাঠাইবার উপদেশ দিয়া বাসা ত্যাগ করিল।

অনিল জিজ্ঞাসিল—হঠাৎ?

কি-জানি! মা'র কথা মনেপড়ে গেল ভাই। একবার দেখে আসি।

অনিলবাবু তাহার অর্থকৃচ্ছতার সংবাদ রাখিতেন, বলিলেন—মিছামিছি খরচপত্র করে যাওয়া

সুশান্ত বলিল—মা যে? সে কি মিছামিছি হবার যো আছে ভাই? আর কাজকর্মও নেই, বসে বসে দুশ্চিন্তায় লাভ কি?

( ক্রমশঃ )

## অজ্ঞাত

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

( ১ )

কি যেন ছিল মোর,
কি যেন হারিয়েছে;
কে যেন এসেছিল,
কি যেন কেড়ে নেছে।

( ২ )

কি যেন কি স্বপন—
কখন ভেঙে গেছে;
কি যেন পড়ে মনে,
কে যেন ব্যথা দেছে।

( ৩ )

কে যেন গেঁথে মালা—
কে যেন ছিঁড়িয়াছে;
কি যেন কাছে এসে—
আবার দূরে গেছে।

( ৪ )

কি যেন স্মৃতি—
মনের মিশিয়াছে;
কি যেন, কি যে আলো—
কখন মিশে গেছে।

( ৫ )

কি যেন মধু গান—
এখনো কানে বাজে;
কে যেন, কি স্মৃতিতে—
জীবন ভ'রে রেছে।

( ৬ )

কে যেন দেখা দিয়ে—
আবার লুকিয়েছে;
কে যেন কথা কহে,
কি যেন বুঝিনে যে।

( ৭ )

কি যেন ছিল মোর,
কি যেন হারিয়েছে;
কে যেন এসেছিল,
কি যেন কেড়ে নেছে।

# প্রেমিক নাদির

[ শ্রীজানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ]

নাদির শাহ্ যখন পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রাজ্যের চারিদিকে বিপদ। তুর্ক, কশিয়ান, আফগানেরা চারিদিক হইতে রাজ্য আক্রমণ করিতেছিল। অন্তর্বিপ্লব, রাজদ্রোহ চারিদিকে বিরাজমান। ভাগ্যবান তুর্ক যুবক নাদির নিজ অমানুষিক ক্ষমতা ও সাহস প্রভাবেই ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে শাহ্ উপাধি গ্রহণ করিয়া পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চারিদিকের বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করিয়া নিজের অধীনস্থ সৈন্যদের সহায়তায় অল্প সময়ের মধ্যেই নাদির প্রদেশের মধ্যে ভীতি স্বরূপ হইয়া দাঁড়ান। অপরাজেয় সম্রাট নাদির গৌরব ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া মোগল সম্রাটকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজ্যজয়েই নাদিরের আনন্দ। রাজ্য জয় করিয়া তাহা নিজ শাসনে রাখা নাদির পছন্দ করিতেন না। নিজ ক্ষমতা দেখাইয়া শত্রুকে পরাভূত করিয়া বশে আনাতেই নাদিরের আনন্দ। রাজ্যের পর রাজ্য এইভাবে জয় করিয়া পরাজিত রাজার নিকট হইতে অপরিমিত মূল্য ব্যয় গ্রহণ করিয়া নাদির আবার তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া অপর কোন রাজ্যজয়ের মতলব করিতেন।

ভারত সম্রাটকে পরাভূত করিয়া নাদির শাহ তাঁহার দুইজন প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁ ও আলি আকবরের সহিত পরামর্শ করিতেছেন এমন সময় একজন সৈনিক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল মোগল সম্রাট কতকগুলি হাতি, ঘোড়া, পঞ্চাশজন দাস বালক এবং অনেকগুলি সুন্দরী রমণী সম্রাটের জন্য উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন। সংবাদ শুনিয়াই নাদির উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এই উপঢৌকনের প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন। কিন্তু তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল—এই অন্ধকারে সবগুলির পরিদর্শনের পর আর হাতি ঘোড়া প্রভৃতি দেখা সম্ভব নয়—তাই শাহ মনে করিলেন সেগুলি পরদিন প্রভাতে দেখিবেন। কিন্তু ভারতের সুন্দরীদের তখনি দেখিবার জন্য চিত্ত তাঁহার ব্যাকুল হইল। ভারত সুন্দরীদের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি তিনি অনেক শুনিয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহাদের দেখা হয় নাই।

অপর একটা তাঁবুর ভিতরে সুন্দরীদের আনিয়া রাখা হইয়াছিল। সম্রাট তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ভারত সুন্দরীদের যে বর্ণনা তিনি শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। সুন্দরীরা সারি সারি করিয়া দাঁড় করান হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একটী তন্বী কিশোরী রত্নটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুন্দরী কৃশাঙ্গী, অঙ্গের বরণ তার দুধে আলতায় মেশান। সম্রাট সুন্দরীর পানে চাহিলে সুন্দরী তাহার দৃষ্টির তীব্রতায় লজ্জাইলেন।

শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে এ সুন্দরী?'

সম্রাটের হারেমের প্রধান রক্ষক বলিলেন—'এ এক রাজপুতের মেয়ে সম্রাট!'

সুন্দরী বলিলেন 'মেয়ে নই—আমি সলিমের স্ত্রী।'

অপরাজেয় সম্রাট নাদির শাহের কাছে সত্য হইলেও এ উদ্ধতা যেমন সুন্দরীর উচিত নহে। একজন সভাসদ সুন্দরীকে আক্রমণ করিতে আগাইয়া গিয়া আবার ফিরে হটিলেন। রাজপুতসুন্দরী সীতারা তাঁহার বক্ষবাস হইতে একখানা ছোরা বাহির করিয়া ধরিয়াছিলেন—সুন্দরীকে তাঁহারা দেখাইতেছিল।

নাদির হাসিলেন। সুন্দরীকে বলিলেন—'দেখি ছোরা আমার হাত।'

মুহূর্ত্তের জন্য সুন্দরী ইতস্তত: করিল—কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যমাত্র। নাদিরের স্বরে আদেশ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সুন্দরীর হাতের ছোরা নিজ বসন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সম্রাট আর একটীও কথা না বলিয়া বন্দিনী মহাল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁবুতে পৌঁছিয়া শাহ বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন। সীতারার কথা তিনি ভুলিতে পারিলেন না, বার বার তাহার কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। জীবনে এ পর্য্যন্ত বহু সুন্দরীকে তিনি দু'দিনের জন্য ভালবাসিয়াছেন কিন্তু তুলনায় তাহাদের সকলের চেয়েই সীতারাকে তাহার মনে লাগিল। এত সুন্দরী—অথচ এমন অপূর্ব্ব সাহস! জীবনের মমতা এর একটুও নাই। এ সুন্দরীকে ছাড়িলে চলিবে না—ইহাকে পাইতেই হইবে—এই মুহূর্ত্তেই! শাহের আদেশ হইল—সুন্দরীকে এখনি তাঁহার সম্মুখে আনিতে হইবে।

ভীতা, উৎকণ্ঠিতা ভাবে সীতারা শাহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কে জানে কি হইবে—কি আছে ভাগ্যে তাহার! শাহের আদেশে মৃত্যুদণ্ডও হইতে পারে তাহার। জীবনে এ পর্য্যন্ত সীতারা কোনদিন সুখের মুখ দেখিতে পায় নাই। দুঃখিনী সে—আজীবন তাহার দুঃখেই গিয়াছে। আজ একজন মানুষের মত মানুষ সে দেখিয়াছে। এমন মানুষের ভালবাসার অধিকারিণী হওয়ার মত কোন গুণ নাই তার—তবে জীবনভর এমন মানুষের সেবা করিবার অধিকার পাওয়াও সৌভাগ্যের কথা।

নারীর মনের ভাব কি করিয়া নাদির বুঝিতে পারিলেন। এপর্য্যন্ত যত নারীকে নাদির প্রেম জ্ঞাপন করিতে গিয়াছেন তাহারা তাঁহার কাছে শুধু অনুগ্রহই চাহিয়াছে। এতো শাহের কাছে অনুগ্রহ কিছু চাহিতেছে না। চাহিতেছে শুধু একটু নিঃশঙ্ক আশ্রয়—! নাদির শাহ নারীকে অভয় দিয়া সান্ত্বনার বাণীতে তাহার ব্যথিত জীবনের কাহিনী শুনিতে চাহিলেন।

জীবন কথার প্রকাশ পাইল—সীতারারও মোগলদের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। হিন্দু পিতামাতার গৃহে তাহার জন্ম, বাল্যকালেই সে বন্দিনী হয়—পরে একজন মোগল যোদ্ধার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। পরে যোদ্ধা স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতে সে স্বামীর ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। পরে তার নিজ দেশীয় এক সম্রাট-বহির্বীর আশ্রয় সে পায় সেই আশ্রয় হইতেই আজ সে শাহের সম্মুখে আসিয়াছেন।

নারীর মুখে তার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া নাদির কণকাল নীরব রহিলেন। পরে নাদির কথা কহিলেন। প্রথম প্রণয় মুগ্ধ নব দম্পতীর আলাপনের মত সে মধুর আলাপন। বিজয়ী সম্রাট নাদির আজ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব সুন্দরীরাণী সীতারার চরণকমলে অর্পণ করিতে চাহিতেছেন! মুহূর্ত্তপূর্ব্বেও যে নারী পরানুগ্রহের কাঙ্গালিনী ছিল আজ জগতের যে কোন সম্রাট সেই নারীর কাছে অনুগ্রহের ভিখারী হইতে পারে। শাহ নাদির সুন্দরী সীতারাকে উঠাইয়া পাশে বসাইলেন! সেই-কোমল প্রেমার্দ্র স্বরে নাদির সীতারাকে বলিলেন 'আজ থেকে সুন্দরী তুমি আমার অন্তঃপুরী হলে।'

সম্রাটের আদেশে তখনি পুরোহিত এলেন। ধর্ম্মমতে বিবাহ হইয়া গেল। জগতের বিখ্যাত যোদ্ধার ধর্ম্মপত্নী হইয়া সীতারা মণি মাণিক্য আদি আভরণে সজ্জিতা হইলেন।

বিশ্বজয়ী বীর যোদ্ধা নাদিরের বিবাহের সংবাদ দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কত জন সীতারার এই সৌভাগ্যে পুলকিত হইয়া তাহার কৃপা মাত্র অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইল। কত জন সীতারার এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। সীতারা ছিল বীর শান্ত—কাহারও উপর বড় মুখে কথা বা প্রভুত্বকারী করিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু তাঁর এই নম্র স্বভাবের জন্যই হারেমে তাঁহার শত্রুও জুটিয়া গেল অনেক। সিরাজী নামে নাদিরের একজন পূর্ব্ব প্রণয়িনী সীতারার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন, সিরাজী আবার ছিলেন মন্ত্রী আলি আকবরের ভগিনী। সুতরাং সীতারার পক্ষে এই নারীর শত্রুতাচরণ উপেক্ষার বিষয় নহে।

সীতারা কিন্তু এ সব শত্রুতাচরণ অবহেলা উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতেন। কি ছিল তাঁর কি পাইয়াছেন তিনি। ধন রত্ন বিলাস ব্যসন কিছুই অনন্ত নহে—আজ যে ভালবাসা যে প্রেমের অধিশ্বরী হইয়াছেন তিনি, ইহা যে তাহার স্বপ্নেরও অগোচর এ যে অপূর্ব্ব!

দিল্লী যাইবার পূর্ব্বে সম্রাট তাহার উষ্ণীষ হইতে একটি বহুমূল্য হীরক খুলিয়া সীতারার করে দিয়া বলিলেন বিপদে আপদে যেখানেই হোক এখানি দেখিলেই আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ মিলবে।'

সীতারা আনন্দে পুলকে প্রিয়তমের দান গ্রহণ করিলেন। দিল্লী যাইতে সমস্ত পথ সীতারা নাদির শাহের পাশে পাশে চলিলেন। যে দিল্লী হইতে তিনি কাঙ্গালিনী অবস্থায় গিয়াছিলেন আজ সেই দিল্লীতেই তিনি বিজয়িনী সাম্রাজ্ঞীর বেশে প্রবেশ করিতেছেন। পরদিন মোগল সাম্রাজ্ঞী—সীতারার পূর্ব্ব প্রভুপত্নী—সীতারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দিল্লী নগরী যাহাতে ধ্বংস না হয় সে বিষয়ে নাদির শাহকে অনুরোধ করিতে বলিলেন। প্রভুপত্নী সাম্রাজ্ঞীর অনুরোধে সীতারা সম্মত হইলেন।

নগরে বিদ্রোহ—নাদির শাহের সঙ্গে সীতারার কদিন দেখা নাই। সম্রাট পত্নীর অনুরোধ—সীতারার স্বামীর সঙ্গে দেখা করাই চাই। সীতারা হীরক পাঠাই-

সেন। সীতারা স্বামীকে হত্যার আদেশ রদ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নির্দয় হত্যাকাণ্ড সমভাবেই চলিতে লাগিল। তবে কি সীতারার প্রার্থনা বিফল হইল? তবে কি শাহকে তিনি অন্যায় অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন? তবে কি এ অনুরোধ করিবার অধিকার নাই?

সত্য কথা—নাদিরের ছলনাকথা সীতারা জানিতে পারেন নাই। সীতারার কথা নাদিরের মনে প্রতিক্ষণে বাজিয়াছে—নাদিরের রক্ত পিপাসা কম দেখিয়া যোদ্ধারা বিস্মিত হইয়াছে। জয় সমাপন করিয়া নাদির অমূল্য রত্ন কোহি-নূর মস্তকে ধারণ করিয়া সীতারার পানে অশ্বারোহণে উত্তর মুখে চলিয়াছেন। নূতন দেশে নব আশা উৎসাহ লইয়া সীতারা চলিয়াছেন, নূতন জীবনে বিপদের ভীতিও তাহার কম নহে। কিন্তু যাহাকে সীতারা ভাল বাসিয়াছেন তিনিও যে তাহাকে প্রাণ দিয়াই ভালবাসেন, তবে আর তাহার শঙ্কা কিসের!

বহুদূর অতিক্রম করিয়া সিন্ধু নদের তীরে সম্রাটের শিবির স্থাপন হইল। গ্রীষ্মকাল—সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত শাহ সন্ধ্যার পরেই বিশ্রামাগারে উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সীতারার নিদ্রা আসিল না, সীতারা বসিয়া বসিয়া তাহার অতীত ও বর্ত্তমানের জীবন কাহিনী ভাবিতেছিলেন। জীবন শ্রীহীন—বাহিরে একটি পাতা নড়ার শব্দও নাই। হঠাৎ সীতারার মনে হইল বাহিরে যেন কিসের শব্দ হইতেছে। কি যেন নড়িতেছে। সীতারা তাঁবুর দ্বার একটু মুক্ত করিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। বাহিরে অন্ধকার—কিছুক্ষণ সীতারা কিছুই দেখিতে পাইলেন না—পরে দেখিলেন—কাহারা যেন তাঁবুর দিকে হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতেছে। তরবারীর উজ্জ্বল অংশও অন্ধকারে জ্বলিতেছিল। সীতারার মনে বিপদশঙ্কা জাগিয়া উঠিল, তিনি ধীরে ধীরে নাদিরের পাশে আসিয়া তাঁহাকে জাগাইলেন। নাদির উঠিয়া বিদ্রোহীদের চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন ও সীতারাকে তাঁহার জীবন রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

হীরাটে যুবরাজ রেজা খাঁ—নাদিরের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী—শাহকে অভিনন্দন করিবার জন্য আসিলেন। সীতারা নাদিরের কাছে পূর্ব্বেই পুত্রের গুণ ও সাহসের কথা শুনিয়াছিলেন, তাই বীর পুত্র দর্শনের ইচ্ছা তাহার মনেও কম ছিল না। রেজাখাঁও পিতার মতই সাহসী ও নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। পিতা পুত্রের এই মিলন পরম সুখের হইত যদি না ইহার মধ্যে একটা অবিশ্বাসের ভাব আসিত। পুত্র রেজা খাঁ ছিলেন সাহসের মত মানুষ—স্বাধীনচেতা, সাহসী, আত্ম-বিশ্বাসী। নাদির তাই পুত্রকে ভয় করিতেন। পুত্র রেজা খাঁ অতিশয় জনপ্রিয়। রাজ্যের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে ভক্তি করে। শাহ প্রজাসাধারণের নিকট হইতে পাইতেন শুধু ভীতি বিমিশ্রিত সম্মান। তাই পুত্রের উপর ঈর্ষা হওয়া তাঁহার স্বাভাবিক।

পুত্র রেজাখাঁও পিতার অবর্ত্তমানে এতদিন ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। পিতার আগমনে তাঁহার ক্ষমতার সঙ্কোচ হওয়ায় মনে একটু বিক্ষোভ হওয়া তাঁর স্বাভাবিক। এতদিন নিজের আদেশই ছিল তাঁর অলঙ্ঘনীয়—আজ আবার তাঁর উপরেও আদেশ দিবার লোক আসিয়াছে। এতদিন তাঁর হুকুমই লোকে পালন করিত—আজ তাঁহাকেই আবার উপরের হুকুম পালন করিতে হইবে। পিতার মনে পুত্রের উপর সন্দেহ—পুত্রের মনেও পিতার উপর এই ভাব। ক্ষমতার এমনি মোহ!

সীতারা দেখিলেন কি তুচ্ছ বিষয় লইয়া পিতা পুত্রের এই মনোভাব। এ বিবাদে পুত্র-স্নেহ, পিতৃ-ভক্তি উভয়ের উপরই নিরর্থক আঘাত করিতেছে। পিতা পুত্র দু'জনেই ইহাতে ব্যথিত—তাই সীতারা পিতা পুত্রের মধ্যে মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নাদির মনে করিলেন সীতারা পক্ষপাতীত্ব করিতেছেন। নাদির চাহিতেন তিনি যাহা করিবেন তাহাতেই সীতারা পূর্ণ অনুমোদন করিবেন। নাদির সীতারার ব্যবহারে একটু ব্যথিতই হইলেন।

এদিকে সিরাজী নাদিরের এই মনোভাব দেখিয়া, তাহার নিজের প্রাণ গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি যুবরাজের সঙ্গে ঘনতা করিয়া তাঁহার মনের কথা বাহির করিয়া তাহা আবার নাদিরের কাছে বলিতে লাগিলেন। এই ভাবে সিরাজি নাদিরের অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্যও হইলেন। ক্রমে নাদিরের মন

সীতারার দিক্ হইতে ফিরিয়া আবার সিরাজীর দিকে যাইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে একদিন কে আবার নাদিরশাহের উপর এক গোলা ছুঁড়িল। গোলা লাগিলে শাহের তখনি মৃত্যু হইত। একটি গোলা ছুঁড়িলেই সীতারা শাহের পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আবরিত করিলেন। রাজ্যের চারিদিকে আবার বিদ্রোহ—সম্রাটের জীবন নাশের কল্পনা। সম্রাট ঘোষণা করিলেন যেমন করিয়াই হউক বিদ্রোহকারীদের ধরিতে হইবে। সিরাজী শাহের বিশ্বস্ত সহচরীরূপে বিদ্রোহকারীদের ধরিবার জন্য তাহার পাশে দাঁড়াইলেন। মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া সিরাজী প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে যুবরাজ রেজাখাঁই এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। সম্রাটকে গুলিও নাকি ছুঁড়িয়াছিলেন যুবরাজেরই এক ভৃত্য।

হায়রে হইল নিজের পুত্র তো! কি করিয়া বিশ্বাস করা যায় যে সে পিতার জীবন নাশের জন্য দাঁড়াইবে? ইহা কি সম্ভব?

না—না—এ সম্ভব নয়। কিন্তু যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ হইয়াছে এ তো অবিশ্বাসও করিবার উপায় নাই। যুবরাজের পিতাকে হত্যা করিবার কারণের মধ্যে রাজ্য লোভ তো আছেই—সকলের উপরে তাঁহার রাণীকে অধিকার। এ কথা—এ চিন্তাও নাদির শাহের অসহ্য বোধ হইতেছিল।

এক দিকে পুত্রস্নেহ—অপর দিকে অপরিসীম ক্রোধ। কি দণ্ড দিবেন তিনি পুত্রকে—চরম দণ্ড—মৃত্যু দণ্ড! কিন্তু সে কি সম্ভব—পুত্রকে কি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়? এর চেয়ে যে—যে কোন দণ্ডও ভাল। শাহ মনে করিতে লাগিলেন, যুবরাজকে অন্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল—দৃষ্টিহীন হইলে আর তাহার কোন ক্ষমতা থাকিবেনা। এ যে মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও ভীষণ দণ্ড! কিন্তু সম্রাট ভাবিলেন ইহাতে বিদ্রোহী-পুত্রের প্রতি তাঁহার দয়া প্রদর্শনই হইবে।

এদিকে সিরাজীর এখন ভাল সময় পড়িয়াছে। সিরাজী অল্পেই সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইতেছেন। একদিন সিরাজী মহা দুঃখিতভাবে যুবরাজ রেজাখাঁর মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। অনেক দুঃখের কথা কহিয়া সিরাজী বলিলেন আর তাঁহার ক্ষমতা থাকিলে যুবরাজের জন্য তিনি সব করিতে পারিতেন—কিন্তু সে ক্ষমতা তাঁহার নাই—তবে শাহের মনোভাব যুবরাজের প্রতি পরিবর্তন করাইতে এখন পারেন একমাত্র সীতারা—। সীতারার কথায় যুবরাজের মাতার মনে ক্ষীণ আশার জ্যোতি দেখা দিল। যুবরাজের মাতা শাহকে অনুরোধ করিবার জন্য সীতারাকে গিয়া ধরিলেন।

সীতারা যুবরাজের মাতার কথায় সম্মতি জানাইলেন। কিন্তু এ অনুরোধ করিতে গিয়া তিনি শাহের কাছে কি ফল লাভ করিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। একদিকে বন্দিত পুত্রের জীবন ভীত মাতার আকুলতা—কাতর অনুরোধ—আর একদিকে সম্রাটের প্রিয়তমের ভালবাসা হারাইবার ভয়। একদিকে কর্ত্তব্য একদিকে নিজ সুখ। সীতারা কর্ত্তব্যকেই শ্রেয় জ্ঞান করিলেন।

শঙ্কিত চিত্তে সীতারা সম্রাটের কাছে গেলেন। সম্রাট তখন একাকী বসিয়াছিলেন। তাহার মুখমণ্ডল স্থির গম্ভীর! সম্রাট অত্যন্ত চিন্তাকুল। সম্রাট সীতারার আবেদন শুনিলেন তাঁহার মুখ আরও গম্ভীর হইল—চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইল। তবে কি তাঁহার প্রাণের সীতারাও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতেছেন! এই সময়ে হঠাৎ সিরাজীর কথা শাহের মনে জাগিল। সীতারা—এ নারী কেন পরের ছেলের জন্য তাহার নিকট অনুরোধ করিতে আসিতেছে। এই কি তবে রেজা খাঁর উপর ইহার ভালবাসার টান। তবে কি সীতারা অবিশ্বাসী! সম্রাট নাদির শাহ ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া অভাগিনী সীতারার মস্তকে তরবারীর আঘাত করিলেন। এক আঘাতেই অসহায়া নারী সম্রাটের পদতলে প্রাণহারার মত হইয়া পড়িলেন।

সহস্র সমর বিজয়ী সম্রাট জীবনে বহু রক্তের খেলা দেখিয়াছেন। নর শোনিত পাতেই ছিল তাঁহার আনন্দ! কিন্তু আজ মহকের মত-শুভ্র কপোল হইতে রাঙ্গা রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিয়া সম্রাট যেন কেমন হতভম্ব হইয়া গেলেন। কি করিলেন তিনি—তবে কি এমন ভালবাসার ধনকে তিনি হত্যা করিলেন? নিশ্চয় সম্রাটের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল—সম্রাট অবসন্ন হইয়া শয্যায় এলাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে সম্রাটের হারেম রক্ষক সীতারাকে লইয়া

হেকিমের কাছে গিয়া ওষধের তাঁহার জ্ঞান আনিলেন। সীতারার মধুর স্বভাবের জন্য এই বোদ্ধা প্রহরীও তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। হারেম রক্ষক সীতারাকে বহুদূরে এক আর্মেনী পরিবারের নিকট রাখিয়াছিল। সম্রাটের ক্রোধের উপশম হইলে তবে আবার তাঁহাকে সম্রাট সকাশে উপস্থিত করিবে।

কবে—কবে সম্রাট সত্য কথা বুঝিবেন কবে সীতারার উপর তাঁহার ক্রোধের উপশম হইবে তিনি শুধু সেই চিন্তাই করিতেছিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—কিন্তু রাজধানী হইতে হুলস্থাপ আর আসে না। সম্রাট নাদির শাহের বিজয় লক্ষ্মী কবেই যেন তাঁহার উপর অপ্রসন্ন হইতেছিলেন। বিরাট, বিতীর্ণ বিশ্বজোড়া রাজ্য—একজনে কতদিক দেখিবেন, দেশের পর দেশ তাঁহার হাতছাড়া হইতেছিল। সম্রাটের অতি ক্রোধের জন্য সভাসদদের জীবনও নিরাপদ ছিল না।

সীতারার কিন্তু সম্রাট অন্ত প্রাণ! কিন্তু সম্রাট কি আজও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসেন! তিনি তো তাঁহাকে মৃতা বলিয়াই জানেন—নিজ হাতে তিনি তাঁহাকে বধ করিয়াছেন—নহিলে কি এমন ভুলিয়া তিনি থাকিতে পারেন?

দেখিতে দেখিতে তিনটি দীর্ঘ বৎসর চলিয়া গেল। সীতারা একবার এই সময় শুনিলেন সম্রাট নাদির শাহ যেখানে তিনি আছেন সেই পথেই তাঁহার বিজয়ী বাহিনী লইয়া চলিয়াছেন। সীতারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ছুটিয়া গিয়া সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সীতারা ছিলেন সম্রাটের স্বপ্নের ছবি—ধ্যানের ছবি। সম্রাট কি তাঁহাকে ভুলিতে পারেন? সম্রাট নাদির তাঁহার হৃদয় রাণীকে আজও ভুলিয়া রহিলেন। তাঁহারা প্রাণ আবার জোড়া লাগিল—আর তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয় নাই।

কিন্তু এ মিলন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। এক রাত্রে কোন বিদ্রোহীরা সম্রাটকে হত্যা করিয়া গেল। রক্ষীরা আসিয়া দেখিল সম্রাটের বীর বক্ষের উপর ফুলের মত কোমল সুন্দরী সীতারা পড়িয়া আছেন তিনিও মৃত। জগতের অতি বিখ্যাত নির্মম যোদ্ধা বীরও ভালবাসিতে জানিতেন—যমন যোদ্ধাকেও ফুলের মত সুন্দরী প্রাণ দিয়া পূজা করিয়া গিয়াছেন।

---

## প্রেম

[ শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ]

যেথায় কেবল কলকোলাহল—ভুল হলাহল
জাগিয়া উঠে,—
ভালবাসা সেথা কেমনে ফুটে?
সে যে অমরার মধুময় দান—যদি ভগবান্
করুণা করে,
নিতে হবে তারে ভকতি ভরে!
নিশিদিন যার নীরবতামর পবিত্র হৃদয়—
আলোকময়,
যেন তারে প্রেম আপনি ধরা।
যাচ যদি সেই অমরার ধন ঢালো সাদা মন
তাহারি সাথি,—
মুখফুটে সে যে তবে গো আসি!

---

বাল বিধবা। সে দিন বাগবাজারে বালিকা বধূবধূর একটা হিসাব দিয়াছি। আজ বালবিধবার একটা হিসাব দাখিল করিতেছি। একমাত্র কলিকাতা সহরে ১৮২৫৬টি বালবিধবা আছে। ইহার মধ্যে এক এবং চার বৎসর বয়সের ২৩৯৬টি ও দশ হইতে পঞ্চদশবর্ষ বয়স্কা ১৪১৩৯টি বালিকা বিধবা আছে। ইহাদের অনেককেই হয়ত একাদশীর নিরম্বু উপবাস করিতে হয়, হয়ত অনেকেই স্বামান্নাভাবে অতি সামান্য সাজসজ্জাটুকু হইতেও অন্তরঞ্জিত হইয়াছে। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে কাহার পাপে এতগুলি কচিপ্রাণ এই নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে? তাহাদের জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত পাপরাশি অথবা দেশের, সমাজের আচারের বৈগুণ্য?

• • •

বিধবা-বিবাহ। নাম্নোহে বিধবাদের দুঃখ দুর্দ্দশা নিরাকরণার্থে বিধবা-বিবাহ-সহায়ক নামে একটি সভা গঠিত হইয়াছিল। গত বারের এই সভার উদ্যোগে ৬৮টি বিধবার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। তবু ভাল, ৬৮টি প্রাণও যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইল! আমাদের বাংলা দেশে কোন সভাও নাই, কোন বালাইও নাই—আমরা স্বরাজ স্বরাজ করিয়া মরিতেছি, স্বরাজ নহিলে আমাদের উদ্ধারের আর উপায় হইতেছে না, নিদ্রা আসিতেছে না, "দেশের," "জাতিরক্ষার" শ্মশানমুখ চেয়ে বুক ফাটিয়া যাইতেছে কিন্তু ঘরে ঘরে এই যে কচি কচি মুখগুলি, বুকগুলি মরমে মরিয়া আধমরা হইয়া রহিয়াছে তাহাকে বাঁচাইবার সময় আমাদের হয় নাই। ঘরে ঘরে এ-যে কি সর্ব্বনাশ, ভাবিতে পরাণ পলিয়া যায়।

• • •

বিলাতী বস্ত্র। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে ১৯৯৬৩৫৩৩৲ টাকার বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরের ঐ সময়ের হিসাবে দেখিবার সে সময় ইহাপেক্ষা অনেক কম টাকার বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছিল। নানা কারণে চরকা আমাদের গৃহলক্ষ্মীর পরিণত হইয়াছে, দিনের দিন আমাদের শ্রীঅঙ্গে যে আবার বিলাতী কাপড় উঠিতেছে তাহা এই হিসাব দেখিয়াই বুঝা যায়। হায় রে অভাগা দেশ। একি সূক্ষ্ম-বসনপ্রীতি। অন্তঃসারশূন্য এতই তোর বিলাস মোহ!

• • • •

সহরের নালা। আমরীয় ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির রিপোর্টে দেখিতেছি ৯৮বর্ষব্যাপী সহরের নিম্নমের নালার জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। আমার যে শৈশবে শৈশবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এত টাকার নুন খাইয়া—নুন যেসব্যক্তির যদি খরা যায়—দেশের উপকার না করিয়াছেন, এমন মনে করা অত্যন্ত অ-সমীচিন।

• • • •

আর একটি নমুনা। রিপ্রেঞ্চ কমিটির নাম নিশ্চই কেহ বিস্মৃত হন নাই। এখনও অনেক বাবু তাঁরা ঐ নাম শুনিলে ঠক্ ঠক্ কাঁপেন। বর্ত্তমান ব্যয়সংকোচ কমিটির জন্য সর্ব্বসমেতকে ১৫ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে খবর রাখেন? তাঁহারা দুই কোটি টাকা ব্যয় হ্রাসের মতলব বাৎলাইতে ১৩৭৪১৲ টাকা খরচ করাইয়াছেন। আবার একটা কেলাড কমিটি বসিল, দেখা যাক্ ইহার জন্য কত ব্যয় হয়? আর এক কথা আমরা বলি কি একালে হাজার খানেক কমিটি বসাইয়া কমিটি-নাজেহাল করিয়া তাহাদের একটা হেস্ত নেস্ত করিয়া ফেলিলে কেমন হয়? দেশের লোকও একটা সোয়াস্তি দেখিতে পায়, কাহার কাহার রায়চক্রবর্ত্তী হওয়ারও তাহাতে হয়, আর তাহাদের সম্বন্ধে অনেকেরই মাথা খাওয়াইয়া মাথার অসুখের সৃষ্টি করিতে হয় না।

• • • •

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। নিউইয়র্কের ইণ্টারনেশনাল মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে দুইটি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দিয়া ভারতীয় নারীগণের পরমোপকার করিবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হোক্। আমরা স্বরাজের জন্য ব্যস্ত আছি—ততদিন আমাদের যা কিছু দরকার আর পাঁচজনে করিয়া দিক্—বুঝি আছি। আর পরে করিয়া কর্ম্মির দিলে স্বরাজ হলটা গিলিতে কোনরূপ কষ্ট না হওয়ারই সম্ভাবনা।

• • • •

শুভা ধরন। কলিকাতা সহরবাসি! আনন্দে জয়ধ্বনি করুন। শুভাবিল পাশ হইয়া গিয়াছে। সহর শুভাহারা হইয়া গেল। আর ভয় নাই, নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে করিয়া বিদ্বেষে নিদ্রা দিন, শুভা-নাই, শুভা নাই। তবে এক ভাবনা আছে, শুভা গেলে পুলিশ প্রভুরা কি করিবেন? দেশে দিন দান-চালের আরও খুলিবেন না তাঁহারাই Vacancy (শূন্যস্থান) পূর্ণ করিবেন? দিন কতক না গেলে বলা যাইতেছে না, তবে যদি সত্যকথা বলিতে হয় ত বলি, পুলিশ থাকিতে শুভা গেল আর মহিলা একই কথা।

• • •

# দেশ-বিদেশ

হায়দ্রাবাদ, ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের সংবাদ যে, একজন হিন্দু ভদ্রলোক মিঃ বুলাকদাস কোঠারির মাতৃদেবী তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে ৫০০০০৲ টাকা এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম পৌঁছিয়াছেন। চট্টগ্রামের পৌরসভা অধিবাসীরা এক মানপত্রে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র এবর্ণমেন্ট হাউসে লেডি হ্যারিস কর্তৃক বঙ্গীয় মহিলাদের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। এবর্ণমেন্ট মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে যেরূপ দান করিয়াছেন তাহা অতি উত্তম এবং বৃত্তিদান দ্বারা এবর্ণমেন্ট ১ সপ্তাহকাল স্থায়ী হইবে।

ভারত সচিবের ইন্ডিয়ানাইজেশন কমিটির সিভিল সার্ভিসের বাধা ও বেসামরিক বিভাগে অনুন্নতসম্প্রদায় বিষয়ে এক রিপোর্ট রচিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাহা প্রকাশও করিবেন। এ কমিশনের কোন সার্থকতা নাই। তাই ভারতীয় মুসলমান সভার ইহার তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল।

লীগ অব নেশনস্ কাউন্সিলের প্রস্তাব অনুসারে লন্ডনের অস্ত্র-পরিমিতি এসেম্বলী যোগদান দিয়া যে ৩য় বৈঠক ২৯শে তারিখে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ৭ই মার্চ পর্যন্ত চলিবে। এই প্রস্তাবে এসেম্বলীর সভাপতি ও ৩য় কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং বর্তমানে তাহার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন, তাহা উঠাইয়া লইবার জন্য এবং এক মাসের মধ্যে বর্তমানেটকে এই বিষয়ে উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

সম্প্রতি বাঙ্গালোরের এক সংবাদে প্রকাশ, ছোট ছোট মার্কা মেয়েদের পায়ে কাটা পিছনে যে, ইংলিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অনারেরী সেক্রেটারী এবং "ঐ মার্কা" পদের সম্পাদিকা মারগারেট ই কলিনকে টেম্পারেন্স অকলের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হইবে। তাঁহার মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ এই প্রথম।

গত মঙ্গলের ধর্মঘটে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় ধর্মঘটীদের দাবিসমূহ গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তিকল্পে তাঁহাদিগকে ঐ দাবিসমূহ সম্বন্ধে পত্র লেখা হইয়াছে। মেয়র ম্যাকডোনেল আহিনের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। মেয়র ম্যাকডোনেলই বিশ্বস্ত সূত্রে মুক্তি পাইয়াছেন।

পত্রের বিশ্বস্ত সংবাদে আর মেল: বিমানটিকে মেরুদণ্ড প্রদেশের পার্শ্বে ঐস্ মেয়র ম্যাকডোনেলী এবং আরও দুইজনকে তাড়াতাড়ি প্রেরণ করা হইয়াছে।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ব্রাজিল সেনেটের মিঃ ভেলোজো যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে ডি-ভেলেরা জানাইয়াছেন, ইংলেন্ডের যদি সমস্ত ঋণের, যে ঋণের কিছু অংশ ব্রাজিল সোনা-রূপায় অথবা মিউচ্যুয়ে যে পরিমাণ ছোট ছিল, তাহাদিগে সেই পরিমাণ হইলে, তবে হইলে ঐরূপ ছোট প্রস্তাবের প্রস্তাবে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতে পারি। যদি ইংলেন্ডের ইহাতে সম্মত থাকেন, তবে আর আইরিসদের বন্ধিত আইরিসদের দিয়ে আইরিসদের বন্ধিত ইংলেন্ডের সংবাদ ঘটিয়া কাজে থাকে না।

যুবরাজ অলবার্ট কালে পার্লামেন্টের যৌথসভায় পুনরায় অধিবেশন হয়। সম্রাট তাঁহার উদ্বোধন অভিভাষণে বলেন, তাঁহার সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ফরাসী বেলজিয়ামদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের ভাষ্যের সহযোগ করা অধিকার পারেন নাই, তবে বিশ্বাস করা যাইতে অন্যবিধা বুদ্ধি না পায় তাঁহারা সেইভাবে কাজ করিতেছেন; তিনি বলেন, আমি আশা করি, ফ্রুর গবর্ণমেন্ট সন্তিমনে কাজ করিবেন—প্রাচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠায়। এক ভয় অধিক ফ্রুর রাজ্যের তিনি প্রতিষ্ঠিত-অধিকার ভয় অনেক ক্ষেত্রে করে যে ভুবনে আসিয়াছে, ফ্রুর তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। ব্রিটিশ জাতির ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে আর্কিনজের সহিত যে নিষ্পত্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, সেজন্য সম্রাট আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে ব্রিটিশ জাতি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবেই। বেকার সমস্যা অতি গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে মন্ত্রীদের অধিকতর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সম্প্রতি অধিবাসিদের বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাতে আশার উদ্রেক হইয়াছে। সম্রাট আশা করেন যে, এদিকে ক্রমশঃ উন্নতিসাধিত হইতে থাকিবে এবং সাম্রাজ্যের সকলের সমুদয় সহযোগিতায় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি পাইবে।

ঘরি আইন।—গত মঙ্গলবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘরি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্যকারী এতদ্বিষয়ে মিঃ মোদী এইরূপ বিধি অধিকে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন যে ঘরিবিক্রয়ের সময়ের কম পক্ষে এক অধিকের ইহা দেখান আইনে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ কোনবিধি তাহাদিগকে ১১ ঘন্টার বেশী খাটান হইবে না, এইরূপ বিধি করা উচিত। অধিকাংশের মতে তাঁহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। মিঃ মোদী প্রস্তাব করেন কোন প্রবর্তিনীকে ৩ ঘন্টার বেশী অধিকার কর্ম করিতে দেওয়া হইবে না। আবার ঘন্টা ১ ঘন্টা সময় দেওয়া উচিত। এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইয়াছে। মিঃ মিত্র প্রস্তাব করেন যে মালকদিগকে ঘরির উপরে কর্ম করিতে অনুমতি দেওয়া হউক। এ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। শ্রীযুক্তকিশোরে ঘরির কাজে নিযুক্ত করা হইবে-না মিঃ অধিকারী এইরূপ এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরিশেষে সব হইতে বলা হয় যে, গবর্ণমেন্ট ঐ এক বিষয়ের তদন্ত করিয়া দেখিবেন। পরিশেষে মাননীয় মিঃ এম্ বি. নারকর এক প্রস্তাব করেন, যাহাতে না, এইরূপ যে বিধান হয়ে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হউক। এক সভা ইহাতে আপত্তি করায় এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

অতঃপর ঘরি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। (সম্মিলনী)

খবর পাওয়া গেছে যে, মোজাম্বিক বাসক যে অঞ্চলে আক্রমণ করে ছাইল ও ইংরেজিদের, আক্রমণকারীরা তাহাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে। আক্রমণকারীরা ভারতীয় বলিয়া মনে হয়।

ইংরেজদের বন্ধুত্ব আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের উপর নির্ভরশীল এক গবর্ণমেন্ট একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন। কমিটিতে কর্মচারীদের ও বে-সরকারী অনেকজন ইঞ্জিনীয়ারের স্থান দেওয়া হয়। তাঁহারা বেতনভোগী থাকেন, তাহা নহে।

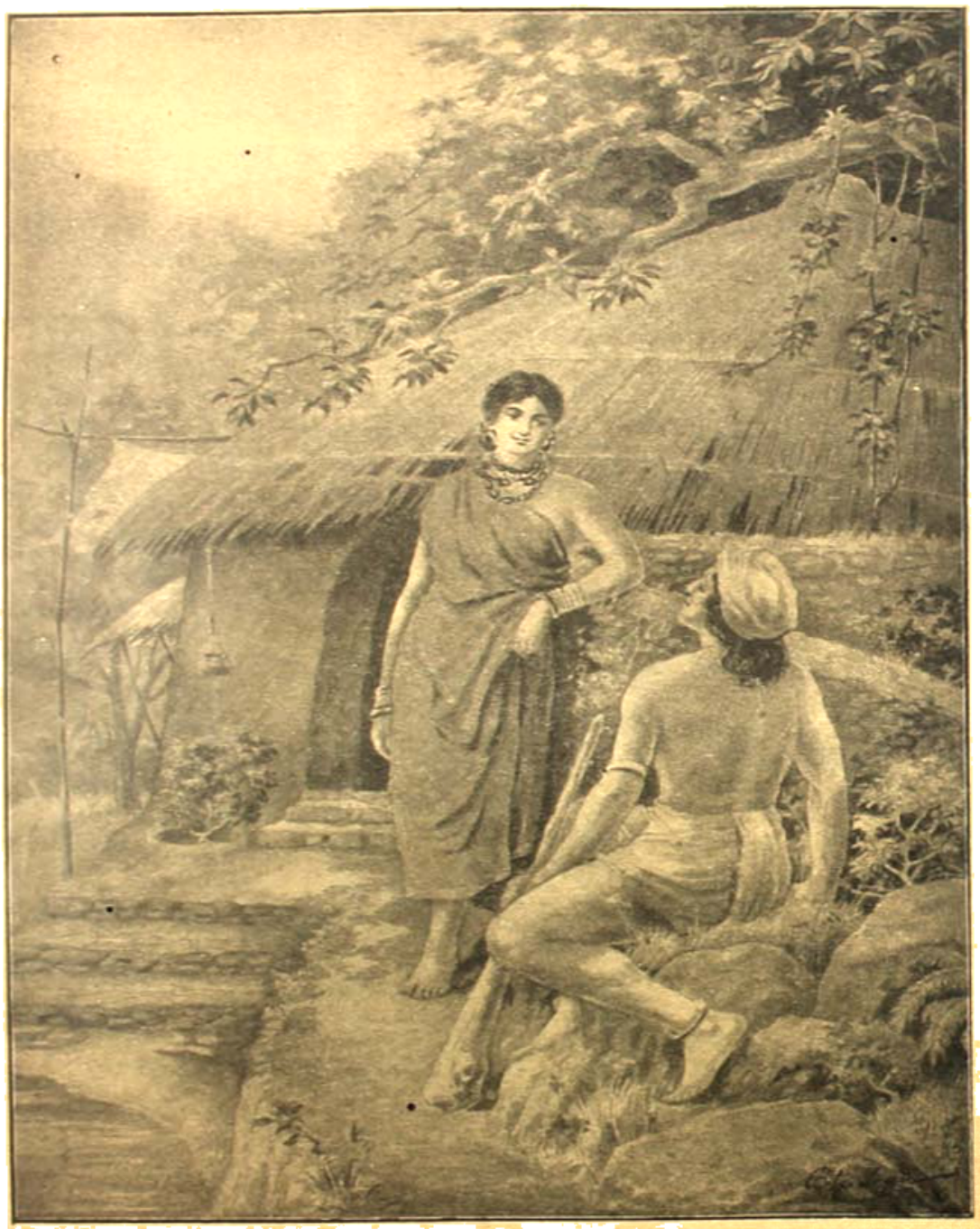

জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য করি কও
আমার পাপের ভাগী হও কি-না হও।
• • • • •
বিধাতা করেছে মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভারী
অন্য পাপ দিতে পারি এই পাপ নারী।

——রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

১ম বর্ষ ] ১২ই ফাল্গুন শনিবার ১৩২৯, ইং ২৪ই ফেব্রুয়ারি। [ ৩০শ সংখ্যা

বাঘ ও মেয়ে।

# আলোচনা।

দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে যতদিন মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন দেশ এক ভাবে চলিতেছিল। দেশের জনমত বলিয়া একটা জিনিস গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। মহাত্মা গান্ধীর লক্ষ্য ছিল স্বরাজ—এবং সে স্বরাজ আপনাদিগের কর্ম্মক্ষমতা ও সাধনা দ্বারাই গঠন করিতে হইবে এই ছিল তাঁহার প্রভাব। দেশের লোকমত ও কর্ম্মক্ষেত্রও সেইভাবেই গড়িয়া উঠিতেছিল। তারপর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে মহাত্মার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আজ সব যেন ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। আজ কেহ 'মাছ' বা জনসঙ্ঘ লইয়া দল গড়িতেছেন, কেহ বা মধ্যবিত্তদের লইয়া দল গঠিতেছেন, কেহ বা ধনী ও আমলা-শ্রেণীদের লইয়াই দল করিতেছেন। মহাত্মার কর্ম্ম তালিকায়, দেশ সাধন-ব্রতে এত বিভিন্ন দলের সমাবেশ ও এত মতবাদের প্রাধান্য ছিল না। আজ কোন কোন দল বলিতেছে আমরা অসহযোগ মানি না, অহিংসা মানি না—আরও কত কি হয়তো মানেন না—কিন্তু এই সব না মানিবার পূর্ব্বে বুঝিতে হয় আমরা তবে কি মানিব? অসহযোগ, অহিংসা প্রভৃতি নিজেদের গঠন কার্য্যেরই সহায়ক। মহাত্মা যে ভাবে কর্ম্মধারার নির্দ্দেশ করিতেন যে ভাবে সমগ্র দেশ ও জাতির প্রাণের ভিতরে তাঁহার কথা প্রবেশ করিত এই সব বিভিন্ন দলের নেতাদের কাহারও কথা জাতির প্রাণের ভিতরে এতটুকুও পৌঁছিতেছে কি?

• • • •

আমাদের দেশের অবস্থা আজ যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া আমরা যেরূপ ভাবে দিন দিন ধ্বংসের মুখে গিয়া পড়িতেছি—তাহাতে এই শোচনীয় মরণোন্মুখ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার যে কি উপায় তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার লোকের অভাবে, সুযোগ্য নেতার অভাবেই দেশ যেন আরও ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে। জাতি আজ মুক্তি চাহিতেছে—জীবনে গতি চাহিতেছে—কিন্তু কে আজ পথ নির্দ্দেশ করিবে।

• • • •

এ দেশের জনসাধারণ পুলিশকে বিশ্বাস করে না, পুলিশকে তাহারা বিশেষ ভয় করে। এ দেশের ছোট বড় সকল পুলিশ কর্ম্মচারীই এক একজন নবাব। সৌজন্য ও ভদ্রতা তাহাদের মোটেই নাই। তাহারা কর্কশ, কঠোর ও রূঢ়ভাষী। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিতে ইহারা জানেন না, সাধারণের সঙ্গে সদয় ব্যবহার ইহারা করেন না। এ দেশের পুলিশ মনে করে তাহারাই দেশের লোকের প্রভু—দেশের লোক তাহাদের ভৃত্য। অথচ পুলিশই যে দেশের লোকের ভৃত্য ও কর্ম্মচারী এ কথা তাহারা হাতে প্রচুর ক্ষমতা পাইয়া সব সময়ই বিস্মৃত হইয়া যান। পুলিশের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা থাকাতেই সেই ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ তাহারা পায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও বহু পূর্ব্বে পুলিশের এইরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রভাবই ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ উপর-ওয়ালার তাড়নে তাঁহারা এখন যথেষ্ট ভদ্র ও সংযত হইয়াছে। এখন পাশ্চাত্য দেশে পুলিশ জনসাধারণের বন্ধু ও ভৃত্য। পাশ্চাত্য দেশে উপরওয়ালার চাপে, দেশের চলিত শাসন প্রভাবে এবং মানুষের সহজ জ্ঞানে পুলিশ বিভাগের যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে আমাদের দেশে তাহা আজ পর্য্যন্তও আসে নাই। পুলিশের ছোট বড় কেহ অন্যায় করিলে পুলিশের কর্ত্তারা সেই অন্যায়ের পোষকতাই করিয়া থাকেন—তাহাদের ভদ্র সংযত হইয়া জনসাধারণের বন্ধু ভাবে চলিবার উপদেশ তাহাদের দেওয়া হয় না। এই সব কারণেই আমাদের দেশের পুলিশ বিভাগ ভদ্র জনসাধারণের সাহায্যে যেমন মজবুত, কর্ম্মদক্ষ তেমন নহে। যাহাদের রক্ষার ভার তাহাদের হাতে ন্যস্ত তাহারা মনে করে ইহাদের আপদ বালাই হিসাবে ও ইহারা দূর হইয়া গেলেই যেন বাঁচে।

• • • •

বিহার উড়িষ্যা বিভাগের পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল মিষ্টার সোরেন সম্প্রতি পুলিশ বিভাগের এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি দেখাইয়া একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতায় পুলিশদের তিনি সব সময় মনে রাখিতে বলিয়াছেন যে তাহারা সাধারণের ভৃত্য—প্রভু নয়। এই নীতি অনুসারেই তিনি পুলিশদের চলিবার উপদেশ দিয়াছেন। এ উপদেশ খুব ভাল—এবং পুলিশ যদি মিঃ সোরেনের এই উপদেশ অনুসারে চলে তবে নিশ্চয়ই ইহা আদর্শ বিভাগে পরিণত হইতে পারে কিন্তু অতি ক্ষমতার সুব্যবহার ও, সুপ্রয়োগ যতদিন ইহারা না করিতে শিখিবে ও পারিবে ততদিন কোনরূপ উন্নতির আশা সম্ভব কি?

• • • •

দেশে জাতীয় ভাবে এপর্য্যন্ত যতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইয়াছে তাহার মধ্যে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মুসলমান সকল ছাত্রই অধ্যয়ন করিতেছে। এই কলেজের প্রাণ-স্বরূপ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত খাজা সাহেব কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া এ দেশে আসিয়া ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া ইনি ছয় মাস্ সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উপাধি বিতরণী সভায় বাংলা দেশের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই সভায় ছাত্রবৃন্দ ভারতীয় জাতীয়তার সমর্থন করিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য বা সাম্প্রদায়িকতা নাই।

• • • •

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে ভোটের অধিকার লইয়া সেদিন বাংলা কৌন্সিলে বেশ তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। সকল দেশই যখন নারীর অগ্রগমনে পক্ষপাতী এমন কি ভারতেরই বিভিন্ন প্রদেশ যখন নারীদের এ অধিকার প্রাপ্ত বিবেচনায় দিয়াছে এ সময় বাংলাদেশের বিপক্ষবাদীদের নারী উন্নতি সভায় পঠিত হওয়ার প্রস্তাবগুলি বাস্তবিকই হাস্যাস্পদ। কৌন্সিলে ৩৩ জন সমস্ত নারীদের পক্ষে ৩৩ জন বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, অবশেষে বিদেশী প্রেসিডেন্টের ভোটের বলেই বাংলার নারী সমাজ এ অধিকার পাইয়াছেন। আমাদের দুর্ব্বলতাও লজ্জার আর কত পরিচয় দিতে হইবে।

• • • •

অনেক সময়ের ইহার বিপক্ষের যুক্তিগুলি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। অনেকে বলিয়াছিলেন মেয়েরা এ অধিকার পাইলে তাহাদের সন্তান পালন ও রন্ধন প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে বাধা পড়িবে। কেহ বলেন পর্দ্দার মহিলা ক্ষুণ্ণ হইবে। ইত্যাদি। বাংলা দেশের মেয়েরা আবার তাঁহাদের পক্ষে যদি পুরুষদের অকর্ম্মণ্যতার নজীর দেখাইতে থাকেন তবে এই সব উন্নতিশীল পুরুষ প্রভুদের উপায় কি হইবে!

• • • •

দেশের লোকে স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করিতে চাহিলে দেশের রক্ষাভারও তাহাদের গ্রহণ করিতে হয়। ভারতবাসী স্বায়ত্বশাসন পাইবে, অথচ ভারত রক্ষা করিবে বৃটিশ সৈন্যদল বরাবর ইহা সম্ভবপর কথা নহে। ভারতবাসীরা দেশরক্ষার জন্য সৈনিক হইবার অধিকার চাহিতেছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইহা লইয়া সম্প্রতি নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। এই সব প্রস্তাবের ফলে এবার ভারতের অর্থসচিব বলিয়াছেন যে ভারতীয় আটটি সৈন্যদল ভারতীয় সেনানী দ্বারা পরিচালিত হইবে। ভারতে এখন একদল বুদ্ধি দল পদাতিক ও একদল অশ্বারোহী আছে। এই সব দলই বৃটিশ সেনানী পরিচালিত। এ অবস্থায় মাত্র আটটী দল ভারতীয়দের দ্বারে পরিচালিত হইবে ইহাতে দেশবাসী বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তবে এ বিভাগে ভারতীয় গণ যোগ্যতার পরিচয় দিলে তাহারা আরও দাবী করিতে পারিবে।

• • • •

ভারতীয়দিগের এ বিভাগে প্রবেশ নানা কারণে সময় প্রয়োজন। ভারত শাসন ব্যাপারে ব্যয়ভার যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার অধিকাংশই বৃটিশ সৈন্য ও সেনানী পোষণের জন্য। ভারতীয়েরা এই বিভাগে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। দেশের ব্যয়ভার অনেক কমিয়া যাইবে। দেশ জোর গলায় তখন বলিতে পারিবে আমরা স্বায়ত্বশাসনের যোগ্য হইয়াছি।

• • • •

ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে সর্ব্বাগ্রে জাতি গঠন বিভাগের ব্যয়ই হ্রাস করিতে হইবে। উত্তম কথা। সব কাজেই আমরা শুনি শান্তি ও শৃঙ্খলা সর্ব্বাগ্রে। সুতরাং এ গুলিকে বজায় রাখিবার জন্য যদি জাতি একেবারে নিপাতও হইয়া যায় তাহাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু জাতির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি যদি বজায় না থাকে—যদি জাতি দিনের দিন অশিক্ষা ও অভাবের তাড়নায় মরণের মুখে আসিয়া পৌঁছে তবে আর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা চলিবে কাহার উপর? একটা কথা আছে সময়ে


**বাসন্তীর বসন্তোৎসব।**

বাসন্তীর বসন্তোৎসব-সংখ্যা একটা দেখ্‌বার জিনিষ হবে; একটা পড়বার জিনিষ হবে। ছবিতে, ছড়াতে, গল্পেতে, ব্যঙ্গ-চিত্রে ভরপুর থাকিবে। ২৬শে ফাল্গুন শনিবার—এই শোভন সংস্করণ বাহির হইবে।

সবই হয়। আজ নানা দিকে যেরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে অচিরেও নিস্তার নাই। আপনাদের কার্য্যভার যাইতেছে তাহাতে হয়তো শীঘ্রই ঘুমন্ত নির্য্যাতিত তাহারা আপনারা লইতে প্রস্তুত হইবে।"

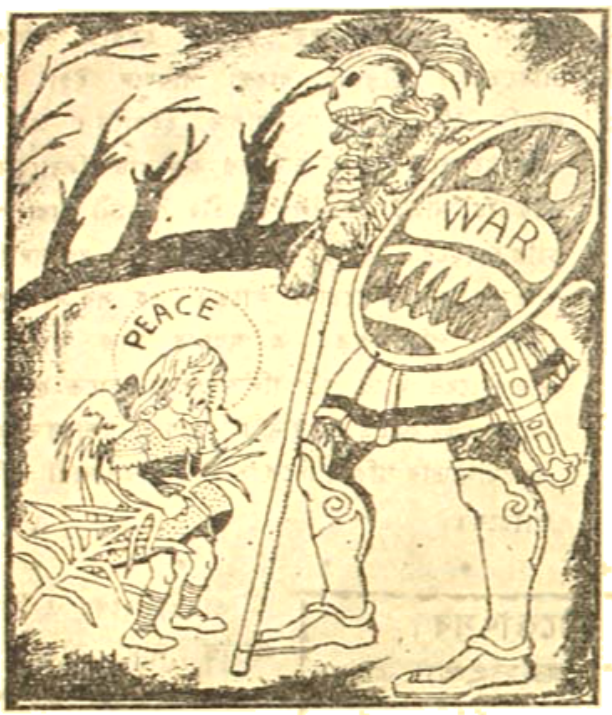


## কে থাকিবে ?

সংগ্রাম। কি হে ছোকরা কাঁদ কেন ?

শান্তি। পৃথিবীটা কি ভয়ঙ্কর ! আগে জানলে কি আমি এখানে.....

সংগ্রাম। কিন্তু ভয় নেই ছোকরা, তোমাকে এখানে থেকে কষ্ট পেতে হবে না, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

—Nebelspalter ( Zurich )

## বাংলার সাধনা ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

দেশবাসী আজ জীবন পথে চলিতে নানাদিকে পঙ্গুই হইয়া পড়িয়াছে। তাই দেশের এমন দুর্গতি, তাই জাতীয় জীবনের এমন হীন অবস্থা, এত দুর্গতি। সেদিন আজীবন সাধক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন 'সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই, এই কথাই আজ আমি বাঙ্গালী যুবককে বড় আশা করে বলতে এসেছি। আজ এই জীবন সন্ধ্যায় জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখেছি ওই একটা পরম সত্য—সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই।'...বাঙ্গালী আজ্ঞান হয়ে চলেছে স্বীকার করি—তবু আজ একবার বাঙ্গালী যুবককে কঠোর আত্মপরীক্ষা করে দেখতে হবে, তার চরিত্রের গলদ কোথায়; অন্তরের কোন ব্যাধাটা তার চলার পথে পদে পদে আগলে দাঁড়িয়েছে। গলাকরণে তার স্থান খুঁজিয়ে রাখলে দুর্গ প্রাচীরও সহজেই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। চাকরি অভাব ঘোচে না; অভাবকে সকল সময়েই মোচন করতে হয়;—আর তার জন্যে চাই কঠোর আত্মপরীক্ষা আর তীব্র বেগবতী ইচ্ছাশক্তি।'

বাংলাদেশে সহস্র সহস্র যুবক বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছে—শিক্ষা লাভ করিতেছে। কিন্তু এ শিক্ষার ফলে তাহারা মানুষ হইতেছে কি ? আচার্য্য বলিতেছেন 'বাঙ্গালা দেশে ঐ একই ধন্দা কেরাণী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকীল। আর সেই গলাধঃকরণ, উদ্গীরণ, পরীক্ষা পাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, তারপর মা সরস্বতীর সঙ্গে সেলাম আলেকোম্।'...কিন্তু সবাই যাঁরা ঐ চাকরীর খানিতে আর সরার অন্নের কথা হচ্ছে 'মা আমার ঘুরাবি কত—কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ?

'কি মুক্তকেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চাকরীর দিকে ঝোঁক পড়েছিল। সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্র হতে আরম্ভ করে সকলেই আজ চাকরীর উমেদার। হিন্দু

কলেজের ছেলেরা যারা মাইকেল, রাজনারায়ণের সমপাঠী তারা গ্রাজুয়েট হলেই প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়েই তাঁদের ডেকে বড় বড় চাকরী দিতেন। এই সময় থেকে যতিগতি যে চাকরীর দিকে ঝোঁক সে আর ফিরলো না। বাঙ্গালার মনে ইংরেজ বাণিজ্যের সিন্দুক বোঝাই হল, আর বাঙ্গালার গোপালেরা সাত্ত্বিকভাবে ভিক্ষা লাভের সাধনা করতে লাগলেন। সাধনা ভিক্ষা, তার সিদ্ধি—চাকরী!

চাকরীর এই মোহে পড়িয়া বাঙ্গালী জাতি জীবনে কত হীন ও অপদস্থ হইয়াছে, তাহাদের তথা কথিত শিক্ষা ও ভিক্ষার জীবনে যে কোন মূল্যই নাই ইহাই দেখাইতে গিয়া আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র বলিতেছেন কিলক্যাল কমিশনে তার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, বনস্তার বিরলা প্রভৃতি বসলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে তাঁদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্যালেণ্ডারে যাঁদের নাম (Golden Medalist) স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবক তো ঐ অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের আলোচনায় আহূত হলেন না?

আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন জাতি বলে গর্ব্ব করে থাকি আর ইউরোপীয়দের জড়বাদী বলে গালি দেই। কিন্তু জড়বাদী ওরাই আমাদের দেশের স্থানে স্থানে নানা কুষ্ঠাশ্রম, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে ৭২ টি কুষ্ঠাশ্রম আছে, তন্মধ্যে বেণ্টিঙ্কনাথ বহু কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি ছাড়া আর সবই তো ওদের। আর্ত্তকে কেউ কোলে তুলে নিচ্ছে আর কেউ বা বলছে ওকে ছুঁয়ো না। বাস্তবিক কি বৈচিত্র্য ওদের জীবনে! জানবার, বুঝবার, জানাবার কি দুর্নিবার চেষ্টা। কেউ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ, কেউ বা বৎসরের পর বৎসর চেষ্টা করছেন, তার আয়োজনই বা কত; কেউ বা আফ্রিকা মহাদেশের কিলমেনজেরো পর্ব্বতের চির-তুষারাচ্ছন্ন চূড়ায় কোন চির-নূতনকে দেখবার প্রয়াস করছেন। উচ্চশিক্ষিতদের স্থান রোধ করে কেউ বা প্রাণ হারাচ্ছে—তবু ক্ষান্ত নেই। "যন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই সঙ্কল্পিত প্রয়োগের প্রাকৃতিক অরুণ জানবার জন্য ফ্রাঙ্কলিন, জানস্টন্, জাকসটন প্রমুখ অনেকেই কত অসাধ্য না সাধন করেছেন। মানুষের যা সাধ্য তা এরা করবে আবার মানুষের যা অসাধ্য তাও এরা করবে। কি বিপুল দুর্দ্দান্ত জীবন!

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিতেছেন 'নিস্বার্থ সাধনাই সকলে মুক্ত হয়। যেখানে স্বার্থপরতা সেইখানেই সঙ্কোচ—স্বার্থপর ক্রোড়পতির কেউ সংবাদ লয় না। কিন্তু তাঁর অর্থ যখন জনহিতের জন্য ব্যয় হয়, তখন তিনি হন শ্রেষ্ঠ ও মান্য।...আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থপরতার প্রভাবে। তাই বিজ্ঞানের ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা হটে গিয়ে পিছনে পড়ে গেছি, সর্ব্বনাশকারী পরাধীনতা আমাদের নষ্ট করছে।'

'আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা আমাদিগকে যন্ত্রাঘাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে চেষ্টিত করে। তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা। অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, অর্থ সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা প্রভৃতি নানা সমস্যার পঙ্কে আমরা সব রকমে মাটি হয়ে যেতে বসেছি। এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে লেগে পড়ে থেকে এক একটী সমস্যার মীমাংসা করতে না পারলে আমাদের আর বাঁচবার আশা নাই।'

কাজ করবার আগে অথবা কাজ আরম্ভ করেই তার ফলটা আমরা তখনি চাই। আচার্য্য বলিতেছেন 'আর একটা কথা। আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে চেষ্টা মাত্রেই অথবা কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই সকল কঠিন সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে তা কখাই নয়। সুতরাং কাজ আরম্ভ করেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, প্রয়াস সাধ্য সকল কার্য্যেই করার আনন্দটাই মূখ্য। পাওয়ার আনন্দ নয়; খুঁজবার যেমন অন্বেষণেই আমোদ, তেমনি প্রকৃতির গূঢ় রহস্য যাঁরা উদ্ঘাটন করেন তাদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ। আজ আমাদের তাই এই প্রচেষ্টার আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"...এই ত প্রাণবন্তের লক্ষণ; বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে নয় অন্বেষণ বা সাধনা একই কথা।'

'আর এক প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষীর কথা বলে আমার কথা শেষ করি; তিনিও দারিদ্র্যব্রতধারী তিনি মহা সাধক মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী আজ বিশ্ব বিশ্রুত। কিন্তু একদিনেই কি তাঁর নাম সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে, পূর্ব্বে কতবার জেলে গেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, দেশের কাজ পর্য্যন্ত করেছেন। তাই ত তিনি আজ জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার করতে

পেয়েছেন। আজ অন্ততঃ ২৭।২৮ বৎসর যাবৎ তিনি নিগৃহীত ভারতবাসীর নেতা—যেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন সেইখানেই মহাত্মা গান্ধী, তাই আজ তাঁর নামে ধ্বনিত জনসঙ্ঘের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে—আশায় উৎফুল্ল হয়।'

আচার্য্যের বিশ্বাস বাঙ্গালী দ্বারাই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে। কিন্তু বাঙ্গালীকে সেই গৌরবের স্থান অধিকার করিতে হইলে 'বাঙ্গালীর জীবনে চাই সাধনা—ভিল ভিল করে আত্মদান। বাঙ্গালী আজ স্থির প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে, ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে দেশে পড়ে থাকলে ভারতের দিবারাত্র দুর্দ্দশা ঘুচবেই।' আচার্য্য আশা করিতেছেন বিধাতার ইঙ্গিত—বাঙ্গালীর সাধনা ভারতে সিদ্ধি আনয়ন করিবে।

## পুনর্গঠন ?

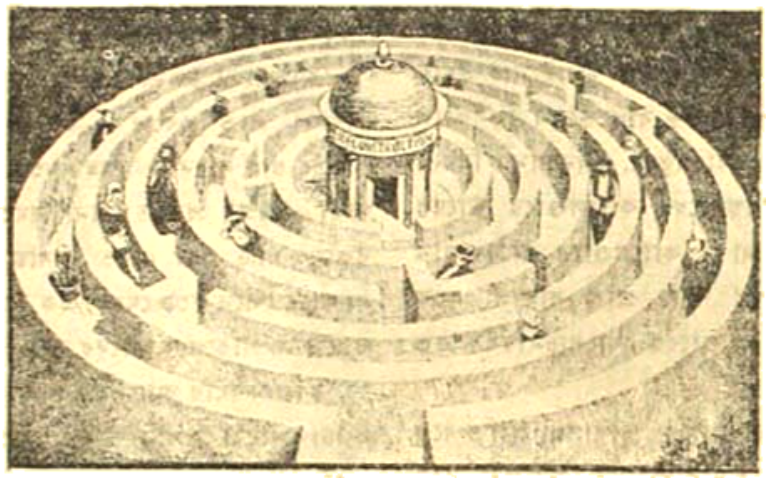

কেমন করিয়া ইয়োরোপের সব-জাতি মিলিয়া মিশিয়া পুনর্গঠন করিবে তাহাই দেখান হইতেছে। (পাঠক বিস্তর বুদ্ধি করিয়া দেখিবেন)। The Bollatin (Sydney N.S.W).

## সাচ্চা কথা

### সুধীবর্গের অবধানার্থ

[ শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ]

(১) দুর্ব্বলতা সকলের মধ্যেই আছে, তবে বিশেষত্ব এই যে, মূর্খের দুর্ব্বলতা কেবল সে নিজে ছাড়া আর সকলেই দেখিতে পায় এবং জ্ঞানীর দুর্ব্বলতা কেবল সে নিজেই দেখে, অপরে দেখিবার সুযোগ পায় না।

(২) জাড়াকরা ধর্ম্মপ্রচারকের অযাচিত উপদেশ, আর পেটেন্ট ঔষধের প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন একই শ্রেণীর।

(৩) মানুষ অনেকের সাথেই প্রবঞ্চনা করে কিন্তু সে নিজের সহিত যতটা প্রবঞ্চনা করে, এত প্রবঞ্চনা যোগ্যতর সে কাহারও সাথেই করে না।

(৪) সহজেই যাহা বিশ্বাস করা যায় তাহা যদি কেহ শপথ করিয়া বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে,সে হয়ত তোমাকে প্রতারণা করিতেছে।

(৫) বিনয় ও লজ্জা এক নয়। বিনয়ী হওয়া ভাল কিন্তু লাজুক হওয়া ভাল নয়। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ হইলেও পুরুষের পক্ষে উহা উন্নতির ঘোর প্রতিবন্ধক।

(৬) পরশ্রীকাতরতা অনেক পুরুষের মধ্যেই আছে কিন্তু স্ত্রীলোক এবিষয়ে সকলকে টেক্কা দিয়া গিয়াছে।

(৭) দেশ যখন বীরত্বের পূজা করে তখন মনে করিতে হইবে যে, জাতি বীর্য্যবান্ হইয়াছে।

(৮) বন্ধু হিসাবে ভালবাসাটা অনেক সময়েই টিঁকিতে চায় না কিন্তু মানুষ হিসাবে যদি সকলকে ভালবাসিতে চেষ্টা কর, দেখিবে ঐ প্রীতি বন্ধন দিন দিন দৃঢ় হইয়া তোমার চরিত্রকেও দৃঢ় করিয়াছে।

## নারীর পছন্দ

বিলেতী বড় বড় ঘরের নরনারীরা কি পছন্দ করেন না করেন তাঁহাদের নিজের কথাতে তা প্রকাশ করা কিছুদিন পূর্বে খুব চলিত ছিল। রাজমাতা আলেকজান্দ্রা যখন প্রিন্সেস অব ওয়েলস ছিলেন। তখন তিনি কি কি পছন্দ করতেন তা তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি থেকে আমরা উদ্ধৃত করলেম।

আপনার প্রিয় বর্ণ—ধান।
আপনার প্রিয় আমোদ—অশ্বারোহণ।
আপনার প্রিয় দৃশ্য—শিয়ানো বাদন।
আপনার প্রিয় ফুল ও পুষ্প—নীল—ভুলোনা।
কোথায় থাকতে ভাল লাগে—গ্রেটবৃটেন।
প্রিয় গদ্য প্রণেতা—চার্লস্ ডিকেন্স।
প্রিয় কবি—সেকসপিয়র।
প্রিয় চিত্রকর—রবেন্স।
প্রিয় রাজা—রাজা Cœur de Lion
প্রিয় রাণী—আমার রাণীমা।
প্রিয় আদর্শ পুরুষ—মার্লবোরো।
প্রিয় খাদ্য—ইংরেজদের পুডিং।
কোন নাম প্রিয়—এডোয়ার্ড।
আপনার জীবনের আকাঙ্ক্ষা কি—
অপরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা।

## ডিকেন্সের জনপ্রিয়তা

ঔপন্যাসিক হিসাবে চার্লস ডিকেন্সের নাম জগদ্বিখ্যাত। প্রথম উপন্যাস প্রকাশ হবার পর থেকেই ডিকেন্স অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সাধারণের আগ্রহের জন্য ডিকেন্স তাঁর রচিত উপন্যাস প্রকাশ্য স্থানে পাঠ করতেন। ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পাঠ শোনবার জন্য এত লোক সমাগম হোত যে থিয়েটারে কোন ভাল নাটকের অভিনয় দেখতেও এত লোকের ভিড় হয় না। নিউ য়র্কে তো ঔপন্যাসিক এ সম্মান পেয়েছিলেনই তা ছাড়া আমেরিকার ও তাঁর উপন্যাস পাঠ শোনবার জন্য এই রকম ভিড়ই হোত। সেই তুষার শীতের মধ্যেও লোকে টিকিট ঘরের সম্মুখে মাদুর পেতে বসে থাকত। খাবারওয়ালা সেইখানেই তাদের খাবার কিরি করে যেত। একদিনের জন্যও তাঁর উপন্যাস পাঠ শোনবার জন্য লোকের ভিড় কমে যায়নি। তাঁর খ্যাতিতে আমেরিকার ফট, খ্যাকায়ের নাম একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ডিকেন্সের মৃত্যু হলে ইংরেজরা এবং ইংরেজী ভাষা যারা জানেন তাঁরা সকলেই মহা দুঃখিত হয়েছিলেন। যাঁরে-দিকেরা যারা সে সময় লণ্ডনে ছিলেন তাঁরা বলেন ইংরেজদের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল যেন তারা মস্ত বড় একটা যুদ্ধে হেরে গেছে।

• • •

## গেটের সাটিফিকেট

অমর কবি গেটে সাংসারিক বিষয়েও যোগ্যতর অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁর পাচিকাকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় সাংসারিক সব বিষয়েই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সার্টিফিকেটখানি এই। 'সালটি হোয়ের দু'বৎসর আমার কাছে কাজ করেছে। সে রান্না রান্না এক রকম মন্দ করে না—সময় সময় কথাবার্ত্তাও ভদ্রলোকের মতই শোনে। কিন্তু সম্প্রতি সে যে মেজাজের পরিচয় দিচ্ছে তাতে আর তাকে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। সে তার নিজের ইচ্ছামত রান্না করে,—কোন কিছু বলতে গেলে তার প্রতিবাদ করে, অত্যন্ত অবাধ্য এবং ঝগড়াটে।

'অত্যন্ত অস্থির এবং ঝগড়াটে স্বভাব তার—সব সময়েই সে আর আর দাসদাসীদের সঙ্গে ঝগড়া করে। এর উপর তার আরো গুণ আছে। সে লুকিয়ে অপরের কথাবার্ত্তা শুনতেও ভালবাসে।'

• •

## রাজার শিক্ষক

রাজার ছেলেদের ভবিষ্যতে যারা রাজা হবে তাদের শিক্ষক হওয়া যেমন সম্মানের তেমনি তাতে বিপদ ও অনেক। রাজার ছেলেদের ভয় দেখিয়ে যার ঘর করে শিক্ষা দেওয়া সে অসম্ভব। তাদের খেয়াল মত চলে যে শিক্ষক তাদের শিক্ষা দিতে পারেন তারই গণ্ডগণ্ডা বেশী। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই যখন যুবরাজ ছিলেন তখন তার শিক্ষক তাকে যে ভাবে পড়াতেন সে পড়ানোর রীতি সত্যই আমোদজনক। আমরা নীচে তার দু'একটি নমুনা দিলাম।

স্পেন দেশের ম্যাপের উপর আঙুল রেখে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন 'যুবরাজ বলবেন কি আমার এটা কোন দেশ?'

যুবরাজ উত্তর করলেন 'ফ্রান্স'। শিক্ষক উত্তর করলেন 'সত্যি কথা—তবে এ জায়গায় স্পেনের অধি-

বাসীরা বাস করে। কয়াসীরা একটু উত্তর দিকে বাস করে।

শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুবরাজ নিয়োর বিষয় কি জানেন বলুবেন কি?'

যুবরাজ চুপ করে রইলেন কিছুই বললেন না।

রাজভক্ত শিক্ষক রাজা ছাত্রকে নীরব দেখে বললেন 'উত্তম—এ সম্রাটের কথা যত না বলা যায় ততই ভাল।'

## দাম্পত্য সম্বন্ধ

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বাড়াতে হলে সন্তান জনন নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা, শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ হওয়া উচিত। নারীদেরই ইহা জানা বিশেষভাবে দরকার। তাহাদের বোঝা দরকার যে ইহাই স্বাধীনতা ও মানসিক উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ। অনিচ্ছাকৃত গর্ভের ভয় যতদিন নারীদের থাকবে ততদিন তারা প্রকৃত উন্নতি কিছু করতে পারবেন না।

বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভাববিনিময় একটা বোঝাপড়া হতে অন্ততঃ দু' তিন বৎসর সময় দরকার হয়। এই সময়ে ছেলেপিলে হলে আর সেটি হতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর বন্ধন দৃঢ় না হতেই যদি আরও একটা নূতন বন্ধন তাদের মধ্যে এসে পড়ে তবে জীবনে তা আনন্দের কারণ না হয়ে বরঞ্চ ভার হয়েই দাঁড়ায়। এই সময়ে ছেলেপেলে হলে মায়ও স্বাস্থ্য যায় ছেলে-পিলেরাও যতটা যত্ন আদর পাওয়া উচিত তা পায় না। এতে নিজেদের উপরও কর্ত্তব্যপালন হয় না। ভবিষ্যৎ জাতির উপরও কর্ত্তব্য করা হয় না। দুপ্রজনন ও জনন নিয়ন্ত্রিত করবার উদ্যোগী প্রসিদ্ধ লেখিকা মার্গারেট সাঙ্গারের এই মত।

# ধনবতী মহিলা

(শ্রীমতী খুরসিদ জাঁহা বেগম)

ধনবতী মহিলা সমাজ প্রবন্ধে বাসন্তীতে পশ্চাত্য জগতের যে সমস্ত ধনবতী মহিলা দিগের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশ ধনবতী মহিলাই আমেরিকার। বাস্তবিকই আমেরিকার মত ধনশালী দেশ জগতে এখন বিরল। পিতা মাতার মৃত্যুর পর বহু আমেরিকান যুবতীরাই অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া অপর দেশের যুবকদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হন। এবং এইভাবে তাঁহারা আমেরিকার ধনসম্পত্তি বিদেশে লইয়া যান।

আমেরিকার বহু ধনবতী কুমারী ইওরোপের অন্যান্য প্রদেশের সম্রান্তবংশের সন্তানদের বিবাহ করিতে গিয়া আমেরিকার বহু অর্থ ভিন্ন প্রদেশীয় স্বামীর ঘরে লইয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী গ্রীন্ প্রভৃতি ধনবতী মহিলা দেশের অর্থ এই ভাবে অন্যদেশে চলিয়া যাওয়াতে এই প্রকার বিবাহে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়াছেন। আমেরিকার কোন রাজনীতিজ্ঞ এই প্রকার বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য খুব বেশীরকম কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু চারিদিক হইতে প্রতিবাদ ও চাঁচায় এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমেরিকার কুমারী কুমারী যাহারা ভিন্ন দেশে বর খুঁজে করিয়া পর-দেশের গৃহিণী হইয়াছেন এ পর্য্যন্ত তাহারা মাতৃভূমি আমেরিকা হইতে প্রায় ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড লইয়া গিয়াছেন। যে সকল আমেরিকান কুমারী খুব বেশী অর্থ লইয়া স্বামীর ঘরে গিয়াছেন নিম্নে তাহাদের যৌতুকের পরিমান দেওয়া গেল।

ডাচেস অব মারলবারো বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী ভ্যাণ্ডরবিল্ট বিবাহ সময়ে যৌতুক লইয়াছিলেন ২,০০০,০০০ পাউণ্ড। ডাচেস অব রকসবার্গ বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী গোলেট ইনি-ও স্বামীর সংসারে ঐ পরিমান যৌতুক লইয়াছিলেন। ম্যাকেঞ্জারের ভিউকের মাতা বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী আস্না (yznaga) ২০০,০০০, পাউণ্ড যৌতুক লইয়াছিলেন। ম্যাকেঞ্জারের ডাচেস বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী মিসারম্যান বিবাহের সময় যৌতুক লইয়াছেন ৪০০,০০০ পাউণ্ড। ষ্ট্রাফোর্ডের কাউণ্টেস মাতা বিবাহের পূর্ব্বে শ্রীমতী ব্লাগডেন ছিলেন স্বামীর সংসারে যৌতুক লইয়াছিলেন ২০০,০০০ পাউণ্ড। কুমারী মার্টিন বিবাহ করিয়া ব্রেডেনের কাউণ্টেস হইয়া স্বামীর সংসারে ৪০০,০০০ পাউণ্ড যৌতুক স্বরূপ লইয়াছেন। কুমারী ব্রাসার্ট বিবাহ করিয়া ব্রিলেস কলোনা হইয়া ৪০০,০০০ যৌতুক পান। কুমারী সোল্ড কাউণ্টেস কাষ্টিলেন হইয়া ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড যৌতুক পান। ব্রিলেস ডাবকিন্ বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী হাটিগডন ছিলেন ইনি যৌতুক পান ৪০০,০০০ পাউণ্ড। কুমারী হাসীন বিবাহের পর ব্রিলেস মেটেরিক্স ৪০০,০০০ পাউণ্ড যৌতুক লাভ করেন।

# পৌষ-পার্ব্বন

[ শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় ]

এক

কয়লাকুঠীর পৌষ-পার্ব্বন। তিনদিন ধরিয়া সাঁওতাল কুলিদের 'বাঁধনা' উৎসব চলিতেছিল।.....

প্রবাদ আছে, এইদিন দামোদর নদীতে স্নান করিলে নাকি তাহাদের সমস্ত পাপক্ষয় হয়; তাই গত রাত্রে যাহারা দামোদরে গিয়াছিল, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে স্নান করিয়া এতক্ষণে 'সিরিং' গাহিতে গাহিতে তাহারা ফিরিয়া আসিল। যাহারা দামোদরে যায় নাই, তাহারা খাদ্-পুষ্করের ঠাণ্ডাজলে স্নান করিয়া উঠানে বসিয়া মদ খাওয়া সুরু করিয়াছিল। ঘুরে চার নম্বর কুলি খাওড়ার কোড়া কুলিগুলা, মেয়েদের হাত ধরাধরি করিয়া মাদল বাজাইয়া গান গাহিতেছিল।—

—যোব্ ভোলা ভোলানাথ,
সব কাজেই কয়ে' বলে ভুল রে—
সব কাজেই কয়ে' বসে ভুল!
সঙ্গে আছে বড়ার মাথা,
বাঘ ছালের আসন পাতা,
কানে গোঁজা ধুতুরারি ফুল গো—
(ও তার) কানে গোঁজা ধুতুরারি ফুল!
নেশা খেয়ে আঁখি ঢুলু ঢুলু গো—
নেশা খেয়ে আঁখি ঢুলু ঢুলু!

সাঁওতাল কুলিদের বাগান-বাওড়ার পাশে একঘর বাউরী বাস করিত। সেখানে থাকিত লখাই, তার স্ত্রী আমোদী, আর একটা কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে—লোটনী। একটা ছেলে ছিল, সেও আবার গত বৎসর কয়লাখাদে কাজ করিতে গিয়া মরিয়াছে। লখাই ভাবিয়াছিল, লোটনীর সঙ্গে তার ছেলেটার বিবাহ দিয়া তাহারা চার-জনে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবে, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। ছেলেটা মরিবার পর হইতে তাহাদের সংসারের অবস্থাও বেশ একটু অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছিল। লখাই দিনরাত মনের দুঃখেই থাকে; কাজে 'টালোয়ানী' করিয়া যাহা রোজগার করে, তাহাতে কোনরকমে তাহাদের দিন চলিয়া যায়।

লোটনী কাল হইতে সাঁওতালদের 'বাঁদনা পরব' দেখিবার জন্য ব্যানার্জ্জি সাহেবের কুলিবাওড়ায় চলিয়া গেছে। ছেলেটা যখন বাঁচিয়াছিল, আমোদী তখন এই পৌষ-সংক্রান্তির মকর উৎসবে কতই না কৃত্তি করিয়াছে, এখন আর সে-সবে তাহার মনও নাই, অধিকন্তু কয়েক-দিন ধরিয়া লখাইএর জ্বর আসিতেছিল, বলিয়া সে ঘরের বাহির হইতেও পায় নাই। সকালে উঠিয়া মনে করিয়া-ছিল, উনানে একথালা ভাত ফুটাইয়া লইয়া সন্ধ্যেবেলার সাথ, আজ একটু আমোদ আহ্লাদ করিবে। তাই সাঁওতালদের গান শুনিতে শুনিতে কয়লার আগুন ধরাইয়া ঘরের ভিতর চাল আনিতে যাইবে, এমন সময় দেখিল, জ্বরের তাড়নায় লখাই বেহুঁস্ হইয়া পড়িয়া আছে এবং বিছানার উপরেই খানিকটা স্থানে বমি করিয়া রাখিয়াছে।.....আমোদী তাড়াতাড়ি বিছানাটা পরিষ্কার করিয়া, স্বামীকে একটু সরাইয়া দিয়া বলিল,—এই! ওইদিকে সরে' শু।

লখাই একবার আঃ বলিয়া পাশ ফিরিল।

আমোদী চীৎকার করিয়া বলিল,—ই এক জ্বালা হলো দেখ্‌ছি। তুই এবারে মরে' গেলেই খালাস্ পাই আমি।.....আর সে লুটনী হারামজাদীও তেম্‌নি। কাল থেকে গেলি, এখনও ফির্‌বার নাম নাই।..... আসুক একবার, দেখাচ্ছি মজা।

আমোদীর চোখ মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, লোটনীকে পাইলে সে হয়ত খুন করিয়া ফেলিবে।

হাড়িতে চাল আনিতে গিয়া দেখিল, চাল নাই।... ক'দিনই বা থাকিবে? চারদিন লখাই কাজ করিতে যায় নাই, তাহার উপর একজনের রোজগারে দু'জন বসিয়া বসিয়া খাইতেছে।

আমোদী বাহিরে আসিয়া দেখিল, সাঁওতাল, কোড়া, ইত্যাদি তাহার প্রতিবেশীগণ আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে, মদ খাইতেছে, নাচিতেছে এবং গান গাহিতেছে। তাহার নিকট এ-সব বিষের মত মনে হইতেছিল।...

আমোদী ধীরে ধীরে কুঠির ডাক্তারখানায় গিয়া

মনিবাবুর নিকট হইতে আমার জন্য একখানি 'রেকমাণ্ড' চাহিয়া আনিল,—একদিনেই ভাল করে' দিতে হবেক্ ডাক্তারবাবু, তুর্ পায়ে পড়্ছি ডাক্তার, ভাল ওষুধ দিস্।

ঔষধ লইয়া আমোদী ঘরে ফিরিতেছিল, পথে মনে পড়িল, স্বামী না হয় আজ কিছু খাইবে না, কিন্তু তাহার নিজের পেটটা তো কোন রকমে ভরাইতে হইবে! আবার সে মোটনী হরোয়ানী যদি আসিয়া হাজির হয়, তাহাকেও দিতে চড়্কাইবার ভার যে তাহারই উপর!..... কি করিবে সে? আজ এই পরবের দিনে কাহার কাছে গিয়া হাত পাতিবে? আর হাত পাতিলেই যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ভাবনা ছিল কি?

বাবুদের সরকারী বাসায় নফর বলিয়া বহুকালের এক চাকর ছিল। সে তাহাকে চিনিত। আমোদী তাহার কাছে গিয়া নিতান্ত ভিখারিণীর মতই কহিল, নফর ভাই, আমাকে আধসেরখানেক চাল দিতে পারিস্?

কুঠির ম্যানেজারবাবু স্বয়ং ঘরের মেঝের উপর একটা 'ইজি চেয়ারে' হেলান্ দিয়া শুইয়াছিলেন। তিনি বোধহয় কথাটা শুনিতে পাইয়াছিলেন, কহিলেন,—নরো, ও কি বল্ছে রে?

—আধসেরটাক্ চাল চাইছে।

কুঠির হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা স্বয়ং ম্যানেজারবাবু চোখের সুমুখে বসিয়া রহিয়াছে, অথচ মাগী কি না তাহাকে কিছু না বলিয়া ভৃত্যের নিকট চাহিতে গেল! তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—খবরদার্ নরো, আমার হুকুম ভিন্ন কাউকে এক ছটাক চাল দাওয়া কস্মিন্ কালেও পাবি না। এটা দানছত্র পেয়ে গেচিস্ বুঝি? বেরো! সধা হারামজাদা তো আজ পাচদিন বাবের পাশ ঘেঁসে নি আর, সেদিন ওই মুটনী হারামজাদীকে বল্লুম, আমার বাসায় এঁটো বাসনকাটা মেজে দিয়ে যা, তা আর মেওয়া হলো না। আজ কিনা এসেছেন চাল চাইতে,—এঁ্যা!

তিনি দাঁতমুখ খিঁচাইয়া আরও কত কি বলিতে যাইতেছিলেন। অভিমানে আমোদীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল। গরীব হইলেও সে এমন করিয়া কোনদিন কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসে নাই। আজ নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহাকে আসিতে হইয়াছিল। সে কোন কথার প্রতিবাদ না করিয়া লজ্জায় অবনত হইয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ঘরে আসিয়া দেখিল, সধাই বিকারের ঘোরে, যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছে আর আপন মনে কত কি বলিয়া যাইতেছে।

সিঁদি হইতে একটা ভাঙা পিতলের বাটিতে একবার ঔষধ ঢালিয়া, আমোদী তাহার মুখে দিতেই ঔষধটা চোয়াল বাহিয়া গড়াইয়া আসিল, পেট পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না।

আমোদী ভাবিল, একবার ডাক্তারবাবুকে দেখাইলে ভাল হয়।

ডাক্তারবাবু 'থার্মোমিটার' লইয়া অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময় আমোদী আসিয়া বলিল, একবার যেতে হবেক্ ডাক্তারবাবু।

বসন্ত ডাক্তার নিজের কাজ সারিয়া মাতলা খাজাঞ্চীর আরও দুইটা রোগী দেখিয়া অপরাহ্ণ বেলায় যখন আমোদীর ঘরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আমোদী সধাইয়ের জীবনের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, বিছানার পাশে বসিয়া বসিয়া উন্মাদিনীর মত কাঁদিতেছে। ডাক্তার দেখিল, তাহার শ্বাস উঠিতেছে এবং শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় গোঙানী সুরু করিয়াছে। সে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই, সধাইএর গোঙানী বন্ধ হইয়া গেল। বারকতক ডাক্তার এবং আমোদীর দিকে তাকাইতেই তাহার নিষ্প্রভ চোখের কোণ বহিয়া দর দর করিয়া দুইটা অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিল এবং পরক্ষণেই বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল।.....

আমোদী নিরুপায় ভাবিয়া ডাক্তারবাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিয়া উঠিল, আমি কি কর্ব বাবু, আমার যে আর কেউ নাই নিজের বল্তে।

এই নিরুপায় দুখিয়নীর কাতর ক্রন্দন শুনিয়া ডাক্তারের চোখদুটীও জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। পরলোকের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কয়েকজন বৌড়া ও লোকজনকে খুঁজিতে বলা হইল, কিন্তু আজ উৎসবের দিন তাহারা কেহই যাইতে রাজী হইল না। অবশেষে বসন্ত বাবু নিজে বাইসাইকেল্ লইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে চারজন মুটেমজুর যোগাড় করিয়া সধাইএর সৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

আমোদী তাহাদের সঙ্গে নিজেও একবার শ্মশানে

যাইতে চাহিল কিন্তু ডাক্তারবাবু তাহাকে যাইতে দিল না।

আমোদী নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

## দুই

রাত্রিটা কোনরকমে কাটিয়া গেল বটে কিন্তু সমস্তদিন কিছু না খাইয়া তাহার আর উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। ঘরে এক মুঠা চাল নাই,—কি করিবে? স্বামী কখন সে কোন দিনই করে নাই। সে যদিও বা কাজ করিতে চাহিয়াছে, তথাপি তাহাকে কোনদিন কাজ করিতে দেয় নাই।

ঘরে একটা উনান আর একটা সিদ্ধলের কাঁড়া বাটি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, বাসনটা বিনোদ মহাজনের দোকানে আট আনায় বন্ধক রাখিয়া আমোদী চার আনার চা'ল কিনিয়া। বাকী চার পয়সা বিনোদ তাহার আগেকার পাওনা বলিয়া কাটিয়া লইল।

আগুনের তাহার না হয় একটা পেট-পুরেলা চলিতে পারে, কিন্তু লোটনী আসিলে তো চলিবে না! তাহাকে ছাড়িয়াও তো সে থাকিতে পারিবে না,—আহা, সে তার মা-বাপ জানে না; তোমার হয়ত এতদিন না খাইয়াই মরিয়া যাইত। যে তাহাকে নিজের মেয়ের মত এত বড়টি করিয়া তুলিয়াছে! যাহার স্নেহ দিয়া যাহাকে ভালোবাসিয়াছে, তাহাকে কি ছাড়িতে পারিবে সে!

সন্ধ্যার সময় বাকী একপোয়া চা'ল উনানে চড়াইয়া দিয়া আমোদী কাঁদিতেছিল আর ভাবিতেছিল, যে স্বামীকে সে চিরকাল গালাগালি দিয়া মেরে নাই, এমন কি মরণের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যাহাকে 'মরিয়া যা' অভিসম্পাত করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আজ তাহাকে যে এমন করিয়া পরের কাছে মাথা নোয়াইয়া এতখানি আত্মহত্যা দিতে পারে, সে-কথা তো সে আগে একটি দিনের জন্যও ভাবিতে পারে নাই।

ভাতগুলা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় দেখিল, দুয়ারে বড় একটা কেতের গাই দিয়া আসু-আসু অন্ধকারে গা ঢাকিয়া হাসিতে হাসিতে দেখিয়া ছুটিয়া লোটনী সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

তাহাকে হাসিতে দেখিয়া আমোদীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। রাগে অধৈর্য্য হইয়া উঠানের উপর হইতে একটা বড় কলার ডেলা তুলিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল,—ঘর ঢুকতে হবেক্ নাই হারমিজাদী,—বেরো বল্‌ছি।

বাড়ীতে ঢুকিবার পূর্ব্বেই লোটনী এমন অভ্যর্থনা পাইবে, সে আশা করে নাই। কলার চাঙড়াটা তাহার বুকের উপর এমন জোরে আসিয়া লাগিল, যে সে 'উঃ মা গো' বলিয়া, বুকে হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। আমোদী আবার আর একটা ডালা কাঠ লইয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

উনান হইতে ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া অনেকটা মালসাভাত ভাঙ্গ ঢালিয়া, সেই একপোয়া চালের ভাত, দুই ভাগ করিয়া ডাকিল,—লোটন্!

আমোদী ভাবিয়াছিল, লোটনী হয়ত' অন্ধকারে ঘরের পাশেই কোথাও লুকাইয়া আছে, খাইবার সময় ডাকিলে নিজে হইতেই আসিবে। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া ভাবিল' মার খাইয়া হয়ত অভিমান হইয়াছে তাই সাড়া দিল না।

কেরোসিনের ডিবেটা হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের চারিপাশে ভাল করিয়া দেখিল, আশ-পাশটা ভাল করিয়া সন্ধান করিল, কোথাও লোটনীকে দেখিতে পাইল না। তিন চার বার তাহার নাম করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, কোন উত্তর পাইল না।

অবশেষে ঘরে ফিরিয়াই যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে হইতেছিল, নিজের মাথাটা পাথরের উপর ঠুকিয়া ভাঙিয়া ফেলে। লোটনীকে খুঁজিতে যাইবার সময় এমনি অন্যমনস্ক হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল যে, ঘরে ভাত রহিয়াছে, অথচ শিকলটা টানিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া যায় নাই। দেখিল, ইহারই মধ্যে সাঁওতালের একটা কালো কুকুর কোন্ সময় ঘরে ঢুকিয়া পাতা দুইটা একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়া মুখ চাটিতে চাটিতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

—'ওমা, এই রাক্ষুসে' বলিয়া সে পো—বলিয়া হাতের অসম্পূর্ণ সম্বোধনটা তাহার দিকে ছুড়িয়া দিয়াই, ডিবের সমস্ত কেরোসিনটুকু উঠানে পড়িয়া গেল করিয়া

আসিয়া উঠিল। হুকুরটা কাঁই কাঁই করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

আমোদী অন্ধকারেই হাঁড়ি হইতে ছুটা বাটিতে কয়েক বাটি জল ঢালিয়া পেটের জ্বালায় চক্ চক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়া জড়সড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

## তিন

পরদিন প্রভাতে আমোদী কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল। বাবুদের চাকর বক্ সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে আমোদীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—এই! লোটনী কোথা, আমোদী!

—কেনে?

—আজ থেকে সে আমাদের বাসায় বামন মাজা-কাজ করবেক্ বলেছে।

আমোদী একটা ঢোঁক্ গিলিয়া বলিল, কখন্ বলেক্?

—কা'ল সন্ধ্যাবেলায় বলে, এলো যে!...পাঠাই দিস্ তাকে,—ভাত দিব।

আমোদী জিজ্ঞাসা করিল আমি গেলে হবেক্ নাই রে, নয়?

—তবে তুই-ই যাস্, বলিয়া বক চলিয়া গেল।

—এদিকে সারারাত্রি উপবাস করিয়া, এক্ চৌধুরীর একটা তুলি বাগড়ায় আট্চালায় লোটনী কোন রকমে শীতের রাত্রিটা কাটাইয়া পরদিন ভাবিতেছিল, সে ঘরে ফিরিয়া যাইবে, কি যাইবে না। অবশেষে যাওয়াই স্থির করিয়া এদিক ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় সে তাহাদের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, বাহির হইতে শিকলটা বন্ধ রহিয়াছে। রোদের দিকে পিঠ করিয়া উঠানে একবার বসিল; ভাবিল, আমোদী হয়ত কোথাও বেড়াইতে গেছে, আর নখাই হয়ত, টব্ গাড়ী ঠেলিতেছে। বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। ক্ষুধায় তখন তাহার পেটটা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল। তাহার মনে পড়িল, বামন মাজা চাকরীর কথা।

বাবুদের বাসার ভাঙা প্রাচীরের পাশে উঁকি মারিয়া দরজার কাছে গিয়া ছয়ুকেই দেখিল, আমোদী হেঁটমুখে বসিয়া বসিয়া এঁটো বাসন মাজিতেছে! তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া লোটনী বাড়ী ফিরিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, আমোদী যে তাহাকে কয়না ছুড়িয়া মারিয়াছে এবং রাত্রে খাইতে দেয় নাই এ কথা তাহার বাবাকে জানাইয়া আসে।

নখাই বাবের মুখ হইতে ছেলে পর্য্যন্ত ট্রাম-লাইনের উপর কয়না বোঝাই টবগাড়ী ঠেলিত। এখন সে যে টব গাড়ী ঠেলে না এবং এই ঢালোয়ামী কাজে চিরদিনের মত ইস্তফা দিয়া কোথায় চলিয়া গেছে, সে খবর সে জানিত না। একটা নিম গাছের নীচে দাঁড়াইয়া লোটনী দেখিল, চার পাঁচ বার ঘুরিয়া ফিরিয়া টবগাড়ী গুলা পার হইয়া গেল, তবু নখাইএর দেখা মিলিল না। সে অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদেরই প্রতিবেশী এক সাঁওতালকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা কোথা, কালিন্দী?

—বাহারে! তুই ছিলি কোথা? পরশু তোর বাবা মরেছে, সে খবর জানিস্ না?

লোটনী স্তব্ধ এবং বিস্ময়াহত হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, কি বলি? কে মরেছে?

—তুর বাবা, নখাই।

লোটনী যে গাছটার নীচে দাঁড়াইয়াছিল, সেই গাছটার গায়ে হেলান্ দিয়া দাঁড়াইল।

তাহারা গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে চলিয়া গেল।

লোটনী একটু পরে ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। কোথায় যাইতেছে নিজেই জানে না। তবু চলিল। তিন নম্বর বাবের আগুনের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে বড় রাস্তায় গিয়া উঠিল।

বরাবর আপন মনে মাঠে মাঠে রাস্তা চলিতে চলিতে বেলা পড়িয়া আসিল। ক্রমে প্রান্তরের উপর অন্ধকার নামিল, তবু তাহার চলার শেষ নাই। অবশেষে যখন অন্ধকারে আর পথ চিনিতে পারা গেল না তখন সে দেখিল, ঝামুড়িয়া হাটের নিকট পৌঁছিয়াছে। হাটের ফেরত কুলি-কামিনগুলা তখন পথের উপর দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। হাটের কয়েকটা দোকানে মিট্ মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। পথের পাশেই কয়েকটা ইট্-পাতা উনানের মত যোঁয়ায় আচ্ছন্ন অন্ধকারে দেখা যাইতেছিল এবং পথযাত্রীর কোলাহল ভেদ করিয়া ঝামুড়িয়া বাবের ইঞ্জিনটার সাঁই সাঁই বড় বড় শব্দ কাণে আসিয়া বাজিতেছিল।

লোটনীর হঠাৎ মনে পড়িল, গুরু সাহেবের মেলা দেখিতে গিয়া গত কল্য একটা বাউরী ছোক্‌রা তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়াছিল,—সিকিটা এখনও ঁাচলে বাঁধা রহিয়াছে, অথচ এতক্ষণ মনে পড়ে নাই। ভাবিল, হাটে কিছু কিনিয়া খাইবে। দোকান খুঁজিতে গিয়া হঠাৎ দেখিল, এক মহের দোকান। এখানে সেখানে কয়েকজন মাতাল টলিয়া টলিয়া ঘুরিতেছে, কত কি বলিতেছে! দোকানের ভিতর একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছিল,—হুমুখে একটা ছোট জানালার ভিতর দিয়া দোকানী মদ দিতেছে।...লোটনী ধীরে ধীরে সিকিটা সেইদিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—মদ চার আনার।

চার আনার মদ লইয়া লোটনী চক্‌ চক্‌ করিয়া এক নিশ্বাসে খাইয়া ফেলিল। গত রাত্রি হইতে পেটে কিছু পড়ে নাই। নেশা ধরিতে দেরী হইল না।...শীতের বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া আসিতেছিল। লোটনী টলিতে টলিতে একটা গাছের নীচে আসিয়া ধোঁচই খাইয়া পড়িয়া গেল। আঃ মাগো'—বলিয়াই সেইখানেই ঘুমিয়া পড়িল। তখন তাহার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না।

...পাশেই একটা মাতালের আড্ডা হইতে হারমো-নিয়মের পেঁপো শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। এক-জন মাতাল চীৎকার করিয়া গাহিতেছিল,—

—'ওমা তারা, তুল যে মা, তুল দিয়ে খাব।'

...এদিকে ঠিক এই সময়ে জোড়াসাঁকো কুঠিতে ম্যানে-জারবাবু নফরকে খবর দিতেছিলেন,—হারামজাদা বেটা পাখী, আমাদের আড্ড-জন্ম আর মাথলি না দেখ্‌ছি। এই আমোদী হারামজাদীর স্বামী লখা বাউরী মারা গেছে, এখনও তিন দিন পেরোয় নি, তার ভিটি অশৌচ, আর তুই কিনা তাকেই ডেকে আন্‌লি এঁটো বাসন মাজতে, হারামজাদা!...কাল থেকে খবরদার তাকে বাসন ছুঁতে দিস্‌নে।

নফর হাতজোড় করিয়া বলিল, আমি জান্‌তুম না হুজুর!

---

## সন্ধ্যায়

[ শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায় ]

মৌন হ'ল, দিবসের সর্ব্ব কোলাহল,
ক্ষীণ হ'য়ে আসে ধীরে, রবির কিরণ,
দিবসের কর্ম্ম সব, হ'ল সমাপন;
ম্লান হ'ল, দিবালোক; প্রখর উজ্জ্বল।
সমীর, বহিল মৃদু, শান্ত সুশীতল,—
নীড়ে ফিরে, পাখী করি' মধুর কূজন;
কর্ম্ম আছে, সবাকার, ক্লান্ত দেহ মন,—
সন্ধ্যা; আসে, বিতরিতে, শান্তি সুবিমল।
অস্ফুট আলোক, মিশ্ধ— সন্ধ্যা রাগভরা,
নব বধূ দৃষ্টি সম,—সুন্দর আকাশ,
অস্তরবি আলোমাখা,—সর্ব্ব দুখ হরা
আনে প্রাণে কত শান্তি, সুখের আভাষ।
জ্বলে দীপ, প্রতি গেহে, সন্ধ্য, কত বাজে!
এই শান্তি, আসে, যেন, জীবনের মাঝে!

---

## ধর্ম্ম

( রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব )

[ শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ]

নদ ছুটে যা' এলোমেলো,
লক্ষ্য তাদের একটি ঠাঁই;
পথ যত মিশ্‌চে এসে
একটি বড় সহর গায়;
নদীগুলি সাগর পানে
ছুটচে নিতি সবাই জানে,
ধর্ম্ম নিয়ে বিরোধ কিসের?
মিলায় যে সব তাঁহার পায়।

---

৪৷৷০ বিনামূল্যে লকেটসহিত ফটো
ফটো এনলার্জ্জিং ফ্রেমসহ ১৯×১০
ফটো সম্বন্ধীয় সিকি মূল্য পঠান
কলিকাতা ফটো সাপ্লাই ষ্টোর্স
১৩৬নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

# বিদেশের স্মৃতি

[ শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল ]

৩রা ডিসেম্বর—ভোরবেলা নিরাকরে ঘেরি ষ্টেশন একটী ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছে—ষ্টেশনটির নাম "ষ্টাওন" এখন একেবারে প্রস্তুত হয় নাই। সকলে গাড়ীর কয়খানি বুকিং অফিস রথন করিতেছে।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বিছানা বাঁধিয়া ফেলিলাম। উঠিয়া প্রবেশে আসিয়া পড়িয়াছি। লোকগুলি উঠিয়া কিছু খেপেছি খাইয়া বাহিরে গেছে। সেই ঘনিষ্ঠক স্বল্প-ছায়ায়া প্রান্তর চক্রবাল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। সেই ছোট ঝাউগুলি যেমনই তরুলতায় আচ্ছাদিত। অদূরে কেয়াফুলের গাছ জঙ্গলের মত হইয়া রহিয়াছে।

এখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। ট্রেনে "ব্রেক্ফাষ্ট" এ চা ছিল এবং কিছু সুচি ও সন্দেশ ও ছিল। জলযোগ করিতে করিতে ট্রেন "বণ্ড" ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। ট্রেন হইতে ধূমায়মান চা বাটীতে ঢালিয়া আরাম করিয়া পান করিতেই দেখি প্লাটফর্ম হইতে কতকগুলি লোক তাকাইয়া দেখিতেছে ও ফিস্‌ফাস সাহেব আমরীর এই চা পানের ব্যবস্থার তারিফ করিতেছে। এই ৩।০ টাকার জাপানী সিপিটি কত প্রয়োজনীয় তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ইহাকে ভাল করিয়া ধুইয়া রাখিতেছি অমনি কড়মড় শব্দে চমকিয়া উঠিলাম—সম্ভবতঃ ঠাণ্ডা জল হঠাৎ ঢালিয়া দেওয়াতে সিপিটি ফাটিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাজার প্রায়ন্তেই আমার সাধের সিপি বিসর্জন দিলেন। মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলাম যে উহার আর প্রয়োজন হইবে না। স্কিকেসমেকিংএ সাহেব আমরী সর্ব্বত্রই চা পাইব।

ষ্টেশনে বসিয়া এই শস্যশ্যামলা ভূমির শোভা দেখিতে দেখিতে কেবলই মনে হইতে লাগিল :—

"হায় মাতঃ বঙ্গভূমি বিবরে তনয়
কেন তব করিল বিধি কঠিন তেমায়

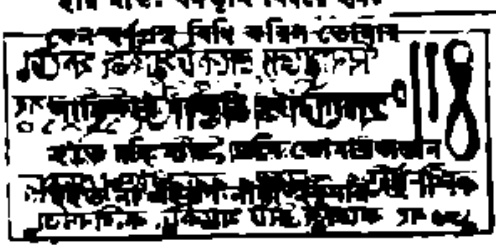

"হলধিজয়" ষ্টেশনে ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইয়া আছি। একটী ভদ্রলোক আমার কামরার দিকে আসিতেছিলেন কিন্তু আমি খুব ঘুমিয়াছি দেখিয়া তিনি আর চলিলেন না কামরার উঠিয়া পড়িলেন। ইনি ইংরাজ-বেশ। গায়ের পোষাকেও তেমনি এক ভদ্র ঘরানার প্রমাণ পাইলাম। যেখানে সেখানে পাশের প্রথানী কিরূপ লোক হওয়া উচিত বলিয়া টাইমটেবেল দেখিতেছি ইহার মুখ ঘুমিয়াই দেখিতেছি দিকে কিছুক্ষণ গাড়ীর চলা যাইতেছে। ট্রেন "ষ্টাওনের" ষ্টেশনে দাঁড়াইতেই ইনি মাজাই সার; পরে অনেক দূর একটু নাবিয়া পায়চারী করিয়া লইলেন। একটা কালোহেলে "গ্রেহাউণ্ড" জাতিয় কুকুর সঙ্গে ছিল, তাহার গলার চেন খুলিয়া দেওয়া হইল। কুকুর ছুটিয়া আসিয়া আমার জানালার কাছে দাঁড়াইয়া অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিল। আর একটী উলঙ্গ ছেলে উঁকিঝুঁকি দিয়া এক দৃষ্টে ভাবে "বাবু—উ, বাবু উ" বলিয়া ভিক্ষার জন্য কাঁদিতেছে দেখিলাম সে "সাহেব" ও "বাবু"র পার্থক্য এখনও বুঝে নাই সুতরাং ঐ ভুলটুকু আর ভাঙ্গিয়া দিলাম না। কিন্তু এ কি বিপদ! আমনিই ঐ ছেলেটীর আরও কতকগুলি আসিয়া উপস্থিত হইয়া টাইমটেবেলে মনোনিবেশ করিতে দিল না।

ট্রেন প্রায় ১৮ ঘণ্টা লেট হইয়াছে। এই হতভাগা গাড়ী থামিলে সবে চলিতে চায়না আবার থামেও সব জায়গাতেই। —এদেশে উপেক্ষা বেশ ইহারা বাঙ্গালীর মত আলসপরায়ণ-মন্থর নয় গাড়ী যেমন যেন হইবেই বা কেন, বাল্যকাল হইতেই যে আসিতেছে। ৫৩ মিনিটে ট্রেন অন্তত গ্রোনিঙ্গেন ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল সোপানে আসিয়া আমার বন্ধুর সঙ্গে চাপা যাইবে। আধাআধির মধ্যেই আমরা হতভাগা হইয়া পড়িতেছি।

অনেকগুলি ষ্টেশন পেরিয়ে আসিতেছি। কোনটার কিছু আলিস দেখা যাইতেছে। প্রত্যেক ষ্টেশনের মূর্তি কতকের অনুরূপ হইতেছে। "ষ্টাওনের" ষ্টেশন পাহাড়ের অতি নিকট। সুন্দর আবদ্ধ একটী গ্রামের পাশ দিয়া ট্রেন চলিতেছে। কয়েকটী মেয়ে খেতে দাঁড়াইয়া নিশানের

টানিতেছে। আমাদের দেশে এটী অস্বাভাবিক—কিন্তু এ বাঙ্গালা নয় উড়ের দেশ। আর একটী ষ্টেশন ঝুঁকা দিয়া ধানের ক্ষেতের উপর দি যেন ঝাঁপিয়া যাইতেছে! একটী ছোট ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ১টী উড়িয়া যুবক কথা বলিতেছেন—এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। উড়িষ্যাতে বাঙ্গালীতে কথা বুঝা যায়, কিন্তু উড়িয়ে উড়িয়ে বোধহয় 'ফুল পরিমাণ।' প্রতি ষ্টেশনেই ভিখারীর উপদ্রব। দেশের অবস্থা কিরূপ সহজেই বুঝা যায়। এই একটী ষ্টেশনে দাঁড়াইতেছে—বোধহয় ১০টায় পূর্ব্বে কলিকাতা পৌঁছিতে পারিবে।

১০টা বাজিতে ১০ মিনিট পূর্ব্বে ট্রেণ কলিকাতা পৌঁছিল। ষ্টেশনে কোন কুলীর সন্ধান না পাইয়া বাঙ্গালীতি অবলম্বন করিয়া মালপত্র প্লাটফর্ম্মে নামাইয়া টিকেট কলেক্টারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলাম "Can I get a cooly here?" আমি কি একজন কুলী পাইতে পারি না Yes sir বলিয়াই তিনি চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিতে লাগিলেন—১ মিনিটের মধ্যে এক উড়িয়া যুবক আসিয়া মালপত্র একটী গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া গেলি। রথখানির অবস্থা দেখিয়া তাহাকে মালগাড়ীতে পরিণত করিয়া আনি পত্রকে যখনই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। মুটের মাথায় প্রায় তিন মাইল যাইয়া "শালখা" নদীর খেয়াঘাটে উঠিয়াই সহর আরম্ভ। সহরটী বৃহদায়তন পল্লী। একেবারে জাকবাংলোতে গিয়া উপস্থিত হইলাম—উদ্দেশ্য ভুলে যাইব। 'চাপরাসী' সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। পরের বাড়ীই মুল। একটী পরিচিত মিশনারীর কতকগুলি বালককে পড়াইতেছেন দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি সুপ্রসন্নে উঠিয়া আমাকে নমস্কার করিলেন, বালকও সমস্ত ছেলে একসঙ্গে উঠিয়া তাঁহার অনুকরণে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম "হেডমাষ্টার কোথায়?" সসম্ভ্রমে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের ঘর দেখাইয়া দিলেন। দেখি অন্ধুবয়স্ক বলিয়া পরীক্ষার কাগজ দেখিতেছেন। ঘরে প্রবেশমাত্র ৩।৪টী শিক্ষক সসম্ভ্রমে উঠিয়া অভ্যর্থনি প্রদর্শন করিয়া নমস্কার। আমাকে দেখিয়া বসিতে আসনপ্রদান করিলেন। বলিলেন যে তিনি একটী স্কুল পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু চালক বোধহয় আমাকে পুলিশ সাহেব বিবেচনা করিয়া কোন বাক্যব্যয় করিতে সাহসী হয় নাই। পুলিশ সাহেব ঐ গাড়ীতেই আসিয়াছেন। তিনি লোক দিয়া আমাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিলেন। স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ হইল।

## জানা দরকার

[শ্রীপঞ্চানন রক্ষিত]

যাদেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ফিমুমিন ধরিয়া রেখেই ডাক্তার ক্লিনিটের আশ্রয় লন, যাদেরিয়া ক্রমশঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে থাকে। তাঁহাকে আরও বেশী কাল কুইনিন সেবন করিতে হইবে—প্রত্যহ সকালে ও বিকালে শীতাধিক্য সময়ে স্নান আবশ্যক আর তৃষ্ণার্ত্ত হইলে ফুটন্ত জল ব্যবহার করিতে হইবে। স্নান সম্ভবপর করা চলে—তবে গরম জলে। নিয়মিতরূপে এইগুলি পালন করিলে পুনরায় ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইতে হয় না। বিষটি পরীক্ষিত।

পথে-ঘাটে আহার করা উচিত নহে। ইহাতে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা আছে। জাপানে এই প্রবাদ যে, পেটুকেরা মহাপাপী।

বসন্তকালের প্রারম্ভেই এক তোলা পরিমাণ নিমপাতা বাটা এক সপ্তাহ খাইলে বসন্ত প্রভৃতি রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

নব বসন্তে
[গ্রীষ্মকালে উপযোগী হিসে, পাউডার, ক্রীম ও লশন প্রভৃতি আমাদের অ্যাইডিয়া সো ব্রাণ্ডের সেন্টসমূহ এবং মেসিম প্রভৃতি—চন্দন, বকুল, বাসন্তী ও অডোলেট সাবান ব্যবহার করুন।
ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী
৩৪।১এ বেনেটোলা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪২৬

# পাঁচ মিশেলী

(শ্রীঅমলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)

## মাছি কত বেগে উড়ে।

মাছি সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ৪ ফুট উড়িয়া যাইতে পারে। পাখী কিম্বা অন্য কোন পক্ষ অনুসরণ করিলে মাছি আত্মরক্ষার্থ উড়িবার বেগ ৩০ হইতে ৩৪ ফুট পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারে। সাধারণ—অবস্থায় ঘণ্টায় ৩ মাইলের উপর ও আত্মরক্ষার সময় ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে—মাছি উড়িতে পারে।

## ১৫ ফুট লম্বা পেন্সিল।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পেন্সিল ডারহাম সহরের শিল্পপ্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। এই পেন্সিলটী ১৫ ফুট লম্বা ও ১১ ইঞ্চি মোটা ছিল। উহা দেড় ইঞ্চি মোটা শিষ এই পেন্সিলটীতে ব্যবহার করা হইয়াছিল। এই রাক্ষুসে পেন্সিলটীকে একজন ভদ্রলোক আড়াই শত পাউণ্ড দিয়া কিনিয়া লইয়াছেন। ভদ্রলোকের আস্পর্দ্ধাটা কি-রকম, কে জানে?

## পার্লামেণ্টের ভূত।

বিলাতে পার্লামেণ্টের হাউস অব্ কমন্স গৃহে মধ্যে মধ্যে নামজাদা ভূতের উপস্থিতির কথা শোনা যায়। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের রাজত্ব কালে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে রাজাকে হত্যা করিবার জন্য "গানপাউডার প্লট" নামে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল তাহাতে লিপ্ত বলিয়া গাই ফক্স (Guy Fawkes) ও অন্যান্য অনেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। তদবধি হাউস অব্ কমন্সের সেক্রেটরদের অনেকেই মধ্যে মধ্যে গাই-ফক্সের প্রেতমূর্ত্তিকে পার্লামেণ্ট গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে সেণ্টষ্টিফেনের (St. Stephen) প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব বড়ই অমঙ্গল সূচক বলিয়া মনে করা হইত, যখনই এই প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তৎপরেই রাজবংশের উচ্চপদস্থ কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। প্রিন্স কনসর্ট, রাজকুমারী এলিস, ডিউক অব্ ক্লারেন্স ও সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অনেকেই এই প্রেতমূর্ত্তিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রত্যেক বারেই মূলের ১৩ ই তারিখে ও রাত্রি ১ টার সময় এই প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল।

হাউস অব্ কমন্সের ভূতপূর্ব্ব স্পীকার বেলিংহামের (Bellingham) প্রেতাত্মাকে যেখানে তিনি পার্লিভালকে হত্যা করিয়াছিলেন তথায় মধ্যে মধ্যে বিচরণ করিতে অনেকেই দেখিয়াছিলেন।

পার্লামেণ্টের অপর একটী নামজাদা ভূতের কথা বলিয়া ভূতের কাহিনী শেষ করা যাক। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রিতে শাদা গাউন পরিহিত একটী প্রেতাত্মাকে পার্লামেণ্টের বাহিরাঙ্গনে বিচরণ করিতে অনেকে দেখিয়াছিলেন এই প্রেতাত্মাটীর একটী বিশেষত্ব ছিল যে অন্তর্ধান করিবার সময় এক বিকট চীৎকার করিয়া সে অদৃশ্য হইত।

---

মেরুপ্রদেশে বাতাস এত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ যে তত্রত্য অধিবাসীদের মধ্যে কোন প্রকার কঠিন হৃদরোগের (Heart Disease) কথা শোনা যায় না।

---

আমেরীতে আজকাল এক অভিনব উপায়ে কাঠ রং করা হয়। আমেরীর ফ্রেমটেন সহরের একজন ইঞ্জিনিয়ার কাঠ রং করিবার এই নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ১ পাউণ্ডের রং ভাগের ১ ভাগ পরিষ্কার এ্যানিলিন রং (aniline) দুইগ্যালন পাউণ্ড জলে গুলিয়া একটী কাঠের গুড়ির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া (By injecting process) দিয়া দেখাইয়াছেন যে সমস্ত কাঠ এ্যানিলিন রংয়ে পরিণত হইয়াছে।

---

মরক্কো দেশের আইন অনুসারে সেখানকার অবিবাহিত মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজকর্ম, রান্না ও সেলাইয়ে দক্ষতা দেখাইতে না পারিলে বিবাহযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমাদের দেশে আইন নয়, তবে বিধি এককালে ছিল বটে এখন এ-সকল বিষয়ে দক্ষতার বিশেষ মূল্য নাই।

# পরিত্যক্তা

[ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ]

রাজা তৃতীয় জর্জ  হানা লাইটফুট।

ইংলণ্ডের সম্রাট তৃতীয় জর্জ তখন যুবরাজ। একদিন থিয়েটারে যেতে তিনি দেখতে পেলেন পথের পাশে এক কাপড়ওয়ালার দোকানের জানালার পাশে বসে এক অপরূপ সুন্দরী কিশোরী। চোখ দুটি তার নীল সাগরের মত নীল রহস্যমণ্ডিত, ভ্রূ দুটি ধনুকের মত বাঁকা, ঠোঁট দু'খানি আঙুরের মত রসে ভরা। যুবরাজ সুন্দরী কিশোরীকে দেখলেন, প্রাণভরে দেখলেন। সে রাত্রে থিয়েটার দেখা আর তাঁর হোল না—কারও সঙ্গে কোন কথাও বললেন না। একবার শুধু একজন পারিষদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন পথ মলের পাশের দোকানের সুন্দরীটি কে?

প্রথম দর্শনেই যে ভালবাসা হয় একথা কেউ বিশ্বাস করেন কেউবা একথা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যুবরাজ ও হানা লাইটফুটের বেলায় তাই ঘটেছিল। যুবরাজ তখন কিশোর বয়স্ক। ইহার পিতামহ দ্বিতীয় জর্জের কোর্টের নীতি ও আব-হাওয়া যদিও অত্যন্ত দূষিত ছিল কিন্তু সে দোষ যুবরাজের চরিত্রে স্পর্শ করে নাই। যুবরাজের চরিত্র তখনও বেশ ভালই ছিল।

যুবরাজ পলমলের পাশের দোকানের সুমুখ দিয়ে ঘোরা-ঘুরি করতে লাগলেন। এ প্রথম শিকারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন পরে সাহস একটু বাড়লে একাই ঘুরতে আরম্ভ করলেন। সাধারণ প্রেমিকের মত একবার শুধু প্রেমিকাকে চোখের দেখা দেখে দিন রাত তার ধ্যান করেই প্রথমে তিনি তৃপ্ত হতে লাগলেন। পরেএকদিন তিনি সাহস করে কাপড় ওয়ালার দোকানে কি দেখতে প্রবেশ করলেন।

আজকালকার দিনে রাজারা যে কোন দোকানে ঢুকে এমনি করে জিনিস দেখতে বা কিনতে পারেন তাতে কোন কথা হয় না কিন্তু তখনকার দিনকাল ছিল ভিন্ন রকমের। হানা ছিলেন যুবরাজের চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় কিন্তু যুবরাজের চেহারাও ছিল পরম সুন্দর। জাঁক জমকের পোষাক পরে পাশে তরবারী ঝুলিয়ে যখন তিনি চলতেন বয়সের অনুপাতে তাঁকে বড়ই বোধ হোত। স্বপ্নে এমনি রাজপুত্রকেই সুন্দরীরা কামনা করে থাকেন। রাজকুমার দোকানে ঢুকে সুন্দরী হানাকে দেখলেন হানাও বোধ হয় যুবরাজের পানে বিদ্যুৎ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। দৃষ্টি বিনিময় তাদের হয়ে গেল, কিন্তু কথার বিনিময় প্রাণের ভাষার বিনিময় সেদিন বোধ হয় আর হয় নাই।

দিন যায়—যুবরাজ আর এভাবে থাকতে পারেন না। তাঁর মনের ইচ্ছা সুন্দরী হানাকে জানাবার জন্য একজন লোক চাই। অবশেষে যুবরাজ তাঁর মায়ের সঙ্গিনী এলিজাবেথ চাডলেকে এই কার্য্যের জন্য স্থির করলেন। তিনি সব শুনে হেসে যুবরাজকে সাহায্য করবেন স্বীকার করলেন। এলিজাবেথ ছিলেন চতুরা রমণী, তিনি দেখলেন এই সুযোগে যুবরাজের কাছ থেকে অনেক অর্থ পাওয়া যেতে পারে। যুবরাজকে এ কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন বলাতে যুবরাজ তাকে যথেষ্টাতিরিক্ত অর্থ দিতে লাগলেন।

এলিজাবেথ কথামত প্রেমিক প্রেমিকার মিলন ঘটিয়ে দিলেন। নাইটস্ ব্রিজে হানার এক বুড়োর বাড়ী ছিল। সেই খানেই গোপনে তাদের দেখা শুনা চলতে লাগল।

কিন্তু রাজকুমারের এ ভাবের প্রণয় ব্যাপার অল্পদিনের মধ্যেই বাইরে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। শুনতে শুনতে কুমারের

মাও এ কথা শুনলেন। যুবরাজের মাতা তাঁর গৃহ শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন এ প্রেম যদিও যৌবনের একটা উন্মাদনা ছাড়া আর কিছুই নয় তবুও এ ব্যাপার আর বেশী দূর গড়াতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁরা দু'জনেও এ ব্যাপারে এলিজাবেথ চাচীদের সাহায্য চাইলেন।

যুবরাজের মার কাছ থেকে প্রচুর টাকা পেয়ে এলিজাবেথ তাঁকেও কথা দিলেন যে এ প্রেম ব্যাপার তিনি ভেঙ্গে দেবেন। এদিকে যুবরাজও এলিজাবেথকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করছিলেন, চতুরা নারী দু'দিক থেকেই যেন টাকা পেতে লাগলেন। দু'দিক থেকে টাকা খেয়েও এলিজাবেথ যুবরাজের কোন বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন না কারণ একদিন যুবরাজই রাজা হবেন সুতরাং তাঁর অপ্রীতিভাজন হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম নয়।

এলিজাবেথ যুবরাজের মাকে বুঝালেন যে সুন্দরী হ্যানার একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই এ সব গোলমাল চুকে যাবে, যুবরাজও তাহলে ওদিকে আর ঘেঁসবেন না। তিনি হ্যানার আত্মীয় স্বজনকেও সেইভাবে বুঝালেন। এ্যাম্বার্ড নামক একজন লোকের সঙ্গে হ্যানার বিয়ে স্থির হয়ে গেল। এ লোকটিও হ্যানার চেয়ে বয়সে ছোট—কিন্তু প্রচুর যৌতুক ও হ্যানার সৌন্দর্যে সে তাকে বিয়ে করতে স্বীকার করল। রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও মানী পুরুষ প্রধানকে যে নারী ভালবেসেছেন তেমনি পুরুষের কাছ থেকে যে নারী প্রাণ-ঢালা ভালবাসা পেয়েছেন তাঁর কি আর অন্য কাউকে মনে ধরে? হ্যানা মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন—যদি—যদি এ সময় তাঁর ধর্ম তাঁকে রক্ষা করেন!- কিন্তু হায় নারীর কি ক্ষমতা? বিবাহের দিন প্রাতঃকালে তিনি যেন অন্যভূমিতে আছেন এইভাবে বিবাহ সভায় গেলেন। নীল নয়ন দুটি আজ বিষাদে ভরা—ঠোঁট দু'খানি বিবর্ণ রক্ত লেশহীন।

বরের হাত ধরে কনে-বরে বাজ-বোরের কাছে এসেছেন এমন সময় প্রকাণ্ড চার ঘোড়ার একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল ও কেউ কিছু দেখবার আগেই কনেকে কোলে কোরে কে সেই গাড়ীর ভেতর তুলে নিল। বর হা করে গীর্জার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে রইল। কনেকে নিয়ে গাড়ী ছুটে চলে গেল।

পরিচিত মধুর স্বর—যে স্বর শোনবার আশায় হ্যানা ভগবানকে কাতরকণ্ঠে ডাকছিলেন কানের কাছে হ্যানা সেই মধুর স্বর শুনতে পেলেন 'হ্যানা—হ্যানা—প্রিয়তমে আমার—চোখ মেল।' হ্যানা বুঝতে পারলেন যে তিনি তাঁর প্রিয়তম অর্জের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হয়েছেন।

এ ব্যাপার এক এলিজাবেথ তিনি আর কেউ জানতেন না। এলিজাবেথ এইভাবে দুই কূলই বজায় রাখলেন। যুবরাজের মাকে খুশী করবার জন্য হ্যানার বিয়ে দিলেন, আবার যুবরাজকে খুশী করবার জন্য বিয়ের কনে হরণ করলেন।

এদিকে বর কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। তখনো সে বিয়ের যৌতুক পত্র কিছু পায় নাই। সে এক ঘোড়ার চড়ে গাড়ীর পিছু নিল। কিছুদূরে গিয়ে সে শুনলে রাস্তায় লোকজন সব গাড়ী দেখছে আর বলছে 'ঐ যুবরাজ,—যুবরাজ যাচ্ছেন—' শব্দ শুনে বর হতভম্ব হয়ে গেছে এমন সময় গাড়ী মোড় ঘুরে এক ফটকের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

পরে বরকে সকলে আশ্বাস দিয়ে বললে 'বিয়ে হলেও তোমার নিজঘরই বরাবর থাকতে হোত—কারণ সত্যি বর—যুবরাজ অর্জই। তবে যুবরাজ কনে হরণ করে একটা নাটকীয় ব্যাপার করেছেন বটে।'

যুবরাজ হ্যানাকে নিয়ে কোথায় রাখলেন তা ঠিক জানা যায় না তবে রিচমণ্ডের পাশেই কোথাও রেখেছিলেন। যুবরাজ নিজঘরে বিয়ে করলেও হ্যানাকে এখন সত্যি বিয়ে করতে ইচ্ছুক হলেন কিন্তু যুবরাজ এখনও নাবালক তাই বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হ্যানা যুবরাজের সঙ্গে প্রণয়ে তার ভালবাসায় কিছুদিন পরম সুখে কাল কাটালেন। সময়ে বিয়ে হবে, হ্যানা রাজরাণী হবেন এ আশা ও বিশ্বাস তাঁর প্রাণে বরাবরই ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখে হ্যানা ও যুবরাজের বিবাহ সম্পন্ন হয়। সোমারসেট হাউসে আজও এই বিবাহের দলিল আছে কিন্তু তা সাধারণকে দেখতে দেওয়া হয় না।

অর্জ হ্যানাকে সত্যই ভালবাসতেন কিন্তু বিবাহের পর বৎসরেই অর্জ রাজা হলেন। দম্পতির যৌবনের সুখও তখন থেকেই আরম্ভ হোল। আজ রাজা হয়ে, দেখতে পেলেন তিনি কত কর্তব্য তাঁর সম্মুখে। রাজনীতি ও দেশ সর্বাগ্রে, আর কর্তব্য ও প্রেমে তাই সংঘর্ষ আরম্ভ হোল। তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে লাগলেন যে এসব রোমান্টিক প্রেম রাজা রাজড়ার জন্য নয়—মন্ত্রীরাও মত প্রকাশ করলেন এ বিয়ে বিয়েই নয়। হ্যানার গর্ভে অর্জের ঔরসে তিনটি সন্তান হয়েছিল এই অবস্থাই অর্জ হ্যানাকে ত্যাগ করে মেকলেনবার্গ-ষ্ট্রেলিজের রাজকুমারী সার্লোটকে বিয়ে করে বসলেন!

অর্জ পরে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকে বলেন যে নারী তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তাঁর উপর অন্যায় করাতে এবং সর্বক্ষণ তারই কথা ভাবাতেই অর্জ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

রাজা হইয়া স্বয়ং রাজা হইয়া রাজনীতিক কারণে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর পূর্ব্ব প্রেমিকাকে ভোলেন নাই। স্বামী পরিত্যক্তা অভাগিনী হ্যানা লাইটহাউস ছাড়া কাউকে না দুখে নিজে ভাগ্যহীনা বলে লজ্জায় ঘরের মধ্যে রইলেন।

তাঁর চিঠিপত্র কিছু নাই। তাই স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তা জানবার কোন উপায় নাই। তবে তাঁর উইলে তাঁর মনোগত রয়েছে 'হ্যানা রেজিনা'—অর্থাৎ রাজী হ্যানা। এই থেকেই তাঁর মনের ভাব বোঝা যায়।

---

# প্রণয় লিপি

[ শ্রীপ্রভাবতী দেবী ]

( ১ )

নাথ—সেই যে সেদিন বিদায় লইয়া দূরে গেলে চ'লে,
আঁচলের কোণে অশ্রু মুছায়ে মোরে একাকিনী ফেলে;
এর মাঝে কই? খবর একটা দিতেও নাইকি স্বামী?
তোমারি বিহনে আঁধার হয়ের কি নিয়ে রহিব আমি?

চিঠি লিখো—প্রিয়তম,—

রয়েছি যে তব লিপি-সুধা আশে আমি চাতকিনী সম।

( ২ )

জানালার পাশে ব'সে থাকি রোজ পিয়নের পথ চেয়ে,
দুরু দুরু বুকে, ছল ছল চোখে, আশা ভরা হৃদি নিয়ে:
পিয়ন আসিয়া ফেরে দ্বারে দ্বারে, লইয়া চিঠির ভার,
আমাদের শুধু বাড়ীর দুয়ারে থামেনা একটী বার।

হতাশায়—প্রিয়তম,—

নিশ্বাস ফেলিয়া চ'লে পড়ি আমি বিছানার কোণে সব।

( ৩ )

ব'লেছিলে মোরে প্রথমে, লিখিতে, ফেলে রেখে সব কাজ,
কতদিন তোমা' লিখিতে বলেছি বাধা দেছে গোড়া লাজ;
লিখিতে পারিনি, যা লিখেছি ছিঁড়ে ফেলিয়াছি খান্ খান্;
তাই কিগো এই, শাস্তি আমার? তাই কি এ অভিমান?

চিঠি লিখো—প্রিয়তম,—

দোষ হ'য়ে থাকে পায়ে ধরি, মোরে এমনের মত ক্ষম।

( ৪ )

সই এসে মোরে দেখায় যেদিন তাহার স্বামীর লিপি,
বুকটা আমার নীরব ব্যথায় উঠে ধন ধন কাঁপি'
মনে হয় যেন পৃথিবীর মাঝে আমি শুধু হতভাগী,
জোড়হাত ক'রে, দেবতার দ্বারে বরায় মরণ মাগি'।

চিঠি লিখো—প্রিয়তম,—

রয়েছি যে তব লিপি সুধা আশে আমি চাতকিনী সম।

---

## উপযুক্ত উত্তর

শিক্ষক—'মধু' আর 'মাধবে' প্রভেদ কি?

ছাত্র—মধু আমাদের চাকরের নাম, মাধব আমাদের জামাইবাবু।

## প্রতিবন্ধকতা

স্ত্রী (অভিমানভরে)—আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, না হলে আমি নিশ্চয়ই নদীতে ডুবে মরব।

স্বামী—মর না—দেখি সাহস কত।

স্ত্রী—উঁহু, বল্লেই হল। ঘরের বার হই কি করে? যে বৃষ্টি পড়ছে, এখুনি যে কাপড় জামা সব ভিজে যাবে।

## উপায় অন্বেষণ

রামবাবু—মেসটা একেবারে ডুবে গেল—কি করে বাঁচাই বলুন তো?

শ্যামবাবু—আগে জাল ফেলে তবে তাদের তুলুন, তারপর নল দিয়ে ২।১ বার হাঁচি বেরুবাতে চেষ্টা করুন। শুনেছি, হাঁচি হলেই না কি মৃতবৎ লোক বাঁচে।

## সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যায়াম

নির্ম্মল—আচ্ছা সুশীলবাবু, আপনার মতে কোন ব্যায়াম সর্ব্বোৎকৃষ্ট?

সুশীল—কেন, নাইকের বিজ্ঞাপনে দেখ। হাত, পা, মুখ, তিনটাই কেমন চমৎকার একসঙ্গে কাজ করে।

# স্মৃতি মন্দির

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

## চার

মাতুলের ঐকান্তিক স্নেহ ভালবাসা সত্ত্বেও কেন যে পিতার অনুপস্থিতিটা কয়দিন হইতে অভাবের একটা তীব্র বেদনার সহিত তাহার হৃদয়কন্দরে বাজিতেছিল, তাহার কোন কারণই কামনা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। পিতা স্বাস্থ্যান্বেষণে গিয়াছেন, প্রতিবেলেই তাঁহার কুশলসংবাদ আসিয়া থাকে, প্রতিবারই পত্রে তিনি কামনার মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, কামনা যদি আর কিছুদিন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকে, তবে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থতা অর্জন করিয়া প্রত্যাগমন করেন। কামনা প্রতিবার স্বেচ্ছায় সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছে, আজ পিতার পত্রের উত্তর দিতে গিয়া সে বিষম বিপদে পড়িয়া গেল। আজ প্রাণ ধরিয়া কিছুতেই লিখিতে পারিল না যে "না বাবা, আপনি তাড়াতাড়ি করিয়া আসিবার চেষ্টা করিবেন না। বেশ সারিয়া, তবে আসিবার কথা লিখিবেন, নইলে আমি বড়ই রাগ করিব।" আজ মনে হইল, পিতাকে এই মুহূর্তে এখনি তাহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, পিতা ভিন্ন একটী দণ্ডও তাহার চলিতেছে না, স্নেহের ক্ষুধা—সর্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া পিতার দিকে হাঁ করিয়া আছে—পিতাকে কাছে না পাইলে, এই দু'টি বাহুর বেষ্টনে ধরিতে না পারিলে কিছুতেই তাহার আশা পূর্ণ হইতেছিল না।

রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেছে, কামনা ঘাটের পার্শ্বে ছোট টেবিলটায় বসিয়া পত্র লিখিতেছিল, হঠাৎ সবটাই তাহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বেহুরো বোধ হইতে লাগিল,—যতখানি লিখিয়াছিল, এক স্থির দৃষ্টিতে সেটুকু পড়িয়া ফেলিয়া সে চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। আবার কলম তুলিয়া লইল, কাগজের উপর ধরিল, কিন্তু রচনা আসিল না। কি লিখিবে তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

অদূরে ঘাটের উপর মামাতো বোন মুকুল অকাতরে নিদ্রিতা। মুকুলের উজল মেঘখানি বেষ্টন করিয়া এক-খানি অতি সূক্ষ্ম জরিপাড় চাদর পড়িয়া আছে, তাহারই জরিগুলা বিদ্যুতালোকে ঈষৎ জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, কামনা অনেকক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অন্যদিন মুকুল যে যতক্ষণ না শয্যা গ্রহণ করে, ততক্ষণ শয্যায় আসে না। দু'জনে একই সঙ্গে শোয় এবং গল্প করিতে করিতে যখন দু'জনেই ঘুমাইয়া পড়ে, তখন কে আগে ঘুমাইয়াছে বা কে পরে ঘুমাইয়াছে তাহা লইয়া পরের দিন কোন অভিযোগ বা তর্ক-বিতর্ক কাহারো থাকে না। আজ আহারাদির পরই মুকুল শয্যা গ্রহণ করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, তবুও কামনা কোন অনুযোগ করিল না, তাহাকে ডাকা দিল না, কেশাকর্ষণ করিল না, সন্তর্পণ-পদে যানকক্ষ হইতে জল আনিয়া তাহার চোখের পাতায় ঢালিল না, আপন মনে পত্র লিখিতে বসিয়াগিয়াছিল। এখন মুকুলের সর্বশোভান্বিত নিদ্র দেহের দিকে চাহিয়া ভাবিল—মুকুল কি সুখী!

এ কথাটা মনে পড়িতেই মুকুলের আজিকার পরিপূর্ণ সুখতৃপ্তির কারণও তাহার মনে পড়িয়া গেল। আজ ডক্টর ত্রিকেনাস বিমলেন্দু লাহিড়ী আসিয়াছিলেন। কেহই কোন কথা না বলিয়া দিলেও মুকুলের সহিত ডক্টর লাহিড়ীর নিকট ও মধুরতার ভাবটা কামনা ঠিকই ধরিয়াছিল। পাকাপাকি কোন কথা আজ পর্যন্ত হয় নাই, হইবার বিশেষ বিলম্বও নাই, রাত্রে ভোজন কক্ষে সে মাতামহীর মুখে একথাও শুনিতে পাইল। মুকুল যখন কার্শিয়ঙে পড়িত, তখন হইতেই না-কি ত্রিকেনাস লাহিড়ীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই পরিচয় এখন একটা মধুর ও পবিত্র সম্পর্কে পর্যবসিত হইবার আকার ধারণ করিয়াছে।

ডক্টর লাহিড়ী ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে কর্ম লইয়া মেসপট গিয়াছিলেন, সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার

ছয় মাস ছুটি আছে, এই ছয় মাস পরে তাহাকেই কোন একস্থানে তাঁহাকে সৈন্য বিভাগের ডাক্তারীতে নিযুক্ত হইতে হইবে, তাহার পূর্বেই যাহাতে তাহার কর্ম নিষ্পন্ন হয়, কামনার মনে হইল, তার মাতুলানী তোজনে বসিয়া তাহার মাতুল মহাশয়কে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। আহারান্তে মুকুলের বাহু টিপিয়া ধরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—সত্যি মুকুল? এতটুকু এক প্রশ্নে মুকুল রাঙা হইয়া, হাসিয়া আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, জবাব দিতে পারে নাই? প্রশ্ন যে করিয়াছিল, তারও আর কিছু উত্তরের আবশ্যকও ছিল না—সবই সে জানিতে পারিয়াছিল। তারপরই মুকুল আসিয়া শয্যা গ্রহণ করে, কয় মিনিট পরে কামনা আসিয়া দেখিল, মুকুল ঘুমাইয়া গেছে।

অল্প কয় মুহূর্তের জন্য একটা বিরুদ্ধভাব তাহার মনের মধ্যে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল; মনে হইতেছিল, শেষে অজ্ঞান বিয়ান! কেন? দেখে কি স্বজাতির, স্বধর্মের লোক ছিল না? হইতে পারেন, ক্রিশ্চেনস্ গাহিড়ী মস্ত ডাক্তার, গবর্ণমেণ্টের বড় চাকুরে, অগুণ্ডল কিন্তু ক্রীশ্চান ত! বড় ডাক্তার কি বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে নাই, না, বড় চাকুরেরই অভাব আছে? তবে কি এ নূতনত্ব প্রীতি? বাবা বলিতেন, সের হুধকে ঘরে করেই জীবনটা কাটাল! বাবার কথা ত মিথ্যা হইতে পারে না! মাতুল মহাশয় নিশ্চয়ই সবাইকে একটা নূতনত্ব যৌতুক দিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টায় আছেন! ছিঃ ছিঃ দিন দিন আমাদের—যেন কি হইতেছে!...এ সংবাদটিও আজই পিতাকে পত্রে জানাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল কিন্তু পত্র লিখিবার মুহূর্তেই তাহার মনে পড়িয়া গেল, পিতার সেই কথাগুলি, কামনা আপনাকে সংযত করিয়া ফেলিয়াছিল।

অধ্যাপকেরা প্রায়ই বলিতেন, আপনার কাজের সমালোচনার বেলা ফুরিয়েই কোরো, পরের কাজের সমালোচনা নাই বা করলে মা।—মনে পড়িতেই কামনা স্থির করিয়া ফেলে, আলোচনা ত করিবেই না, পরন্তু সংবাদও সে দিবে না। যাহাদের কথা, তাঁহাদের সংবাদ, তাঁহারাই দিবেন, তার কি।

মুকুলের দিকে চাহিতে চাহিতে সর্ববিক্ষুব্ধতা দূর হইয়া গেল। পুরুষের মিলনই যে বিবাহ, জাতি-ধর্ম, বর্ণ, এ সবের সহিত আসল মিলনের যে কোন সম্পর্ক নাই, ইহাও সে একাধিকবার শুনিয়াছে। বিবাহের উদ্দেশ্য ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার মধ্যই বিবাহের মন্ত্র হওয়া উচিত, লোকাচার, জাতি-ধর্ম অবান্তর মাত্র।

মনে হইল, মুকুল আজ কত সুখী। কতদিন পরে আজ সে তার প্রিয়তমের দর্শন পাইয়াছে, কতদিন, কত দিন পরে তাহার কথা শুনিয়াছে, সুখী হইবে না! আজ কি মুকুলের আর কোন কথা মনে আছে? আজ কি এতটুকু দুঃখ ও আছে? আজ এক-সুখ নদীর সুখ-তরঙ্গগুলি ছুটিয়া আসিয়া তাহার হৃদয়তট ধুইয়া মুছিয়া চলিয়া গিয়াছে, বেলার ছড়াইয়া আছে—সুখের, শান্তির একটি শুভ্র অখণ্ড স্তর! তাহারই পরে মাথা রাখিয়া মুকুল অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। কোথায় হয়ত স্বপ্নে কোন্ অজানা রাজ্যের সোণার ছবি, সোণার রঙ ধরিয়া তাহার মনে সোণা ছড়াইতেছে কি না! কে জানে তার অন্তর মধ্যে পুলকের বাঁশীটি মৃদু মধুর ধ্বনি ছড়াইতেছে কি-না! কামনার মনে হইতেছিল, মুকুলের চেয়ে আজ জগতে কোথায় কেহ সুখী নাই!

মানব-প্রকৃতির চিরন্তনধারা এই, মানুষ যখন পরকে সুখী দেখে, অন্যের সুখানুভূতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায়, তখন তাহার নিজের দুঃখের অপরিসীম ভারে সে পীড়িত অবনত হইয়া পড়ে। তুলনায় তাহার দুঃখ যে কত বেশী, কত গভীর—তাহা আর সে নিরূপণ করিতে পারে না। ইহাও আবার মানুষেরই প্রকৃতিগত স্বভাব, মানুষ আপনার দুঃখের চিন্তায় কি কথায় কিছুতেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, সীমা লঙ্ঘন তাহাকে করিতেই হয়। মুকুলের সুখের ছবি কল্পনা করিতে করিতে নিজের দুঃখের ভার এতই অবহ হইয়া পড়িল যে আর সে কোন মতেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। তখনি লেখনী তুলিয়া লইল। দুই চারি ছত্রে হৃদয়ের ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করিয়া পত্রের উপসংহার করিল এইরূপ যে—

বাবা আর যে আমি তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না। তোমার শরীর এখনও বেশ সুস্থ হয় নাই জানি, তবুও লিখিতেছি, আর যে আমি থাকিতে পারি না বাবা-আমার!...

চিঠি লিখিয়া খামে-এ চাপিয়া খামে ঠিকানা লিখিল। সময়ে তাঁজ করিয়া চিঠিখানা মুড়িয়া, মানককে গিয়া মুখে,

হাতে জল দিয়া ঘরে আসিয়া দুইটা নামাইয়া দিয়া, শয্যা প্রবেশ করিল।

কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম আসিল না, আসিল কেবল চিন্তার রাশি, মনের পাতায় আঁকিয়া বসিল। জীবনে যে অভাব কোনদিনই সে বুঝিতে পারে নাই, যাহার অভাব মুহূর্ত্তে তাহার এতটুকু চিহ্নও কোথায় রাখিয়া যায় নাই আজ অকস্মাৎ, অন্ধকারে সেই অভাবটাই এমন তীব্র মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল যে কয়মুহূর্ত্ত সেইদিকে চাহিতে চাহিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। জন্মাবধি সে মাতৃহারা, কোনদিনই সে জননীকে দেখে নাই, তাঁহার কথাও শুনে নাই আর সেজন্য কোনদিনই তার কোন অভাবই ছিল না, আজ হঠাৎ সেই দুঃখটাই প্রবল হইয়া উঠিল। আজ মনে হইল, পৃথিবীতে সেই সবার চেয়ে অভাগা যে মা দেখে নাই, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কাহারো নাই যে জীবনে কোনদিনই মায়ের স্নেহ, মায়ের ভালবাসা পায় নাই! তার চেয়ে দুঃখের জীবন আর কার আছে?

যে মা'কে সে চোখে দেখে নাই, যে মাতৃ-স্তনের কোন আস্বাদই সে জীবনে পায় নাই মনে হইল সেইটা না পাইয়াই তাহার এত দুর্দ্দশা! পিতার বুকভরা ভালবাসা সে পাইয়াছে, পিতা তাহাকে সে অভাব জানিতেও দেন নাই, সদাই গোপন করিয়াছেন, মায়ের স্নেহের মতই স্নেহ তিনিও করিয়াছেন, এতদিন কামনা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে মা থাকিলে আর বেশী কিছু সে পাইত, তার পিতার চেয়ে বেশী দিবার ক্ষমতা আর কাহারো ছিল বা থাকিতে পারিত, আজ মনে হইল ভুল, ভুল সব ভুল! মায়ের স্নেহের পরিবর্ত্ত নাই, সে অভাব আর কিছুতে মিটিতে পারে না। তা যদি মিটিত, তবে সৃষ্টির আদিকাল হইতে কবির কাব্যে, চিত্রকরের চিত্রে, গায়কের সঙ্গীতে, মা'র স্নেহ শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া থাকিত না! মা! এক-অক্ষরের এই ত একটি শব্দ কিন্তু উচ্চারণ করিতে সমস্ত স্নেহটাই যেন সঞ্জীব হইয়া উঠে! মা! বলিতে বুক ভরিয়া যায়! তবুও সে দেখে নাই, শুনে নাই, চিনে নাই—আজ মনে হয় দেখিয়াছে, প্রাণ ভরিয়া, হৃদয় খুলিয়া দেখিয়াছে। দেখিয়াছে বলিয়াই ত সে অভাব এখন এমন তীব্র এমন তীক্ষ্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে!

মা'র কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কথা মনে পড়িয়া গেল; যিনি একটি দিনের তরে কি এক মুহূর্ত্তের তরেও সে অভাব তাহাকে জানিতে দেন নাই; যিনি বুক দিয়া তাহাকে ভালবাসিতেন, প্রাণ দিয়া তাহাকে যত্ন করিতেন, একদণ্ড চোখের আড় করিলে—মনদিন যাঁহার সম্মুখে তখনাচ্ছন্ন হইয়া যাইত—সেই স্নেহময় পিতার কথা। কামনার দুইচক্ষু ভরিয়া গেল! এমন জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতে লাগিল যে তাহারই ভয় হইল বুঝিবা সেই শব্দে ঘুমন্ত আসিয়া উঠে! কামনা বালিশটায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল; পড়িয়া আপনাকেই প্রশ্ন করিল, কে বলে তাহার মা নাই? তার যে পিতামাতা একদেহে বর্ত্তমান! তাঁহার ত ভিন্ন আত্মা ভিন্ন দেহ নাই! তাঁহারা যে এক, দেহহীন! শুধু পিতা হইলে কি এত ভালবাসিতে পারিতেন; মা এত স্নেহ করিতে পারিতেন—তিনি যে বাপ-মা একাধারে! বাপের আদর, মায়ের স্নেহ সবই যে একই হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়া কামনার জীবন ভরপুর করিয়া তুলিয়াছে। দুঃখ তার তবে না এমনটি হইয়াছে!

কামনার মনে হইল সে যেন ডাকিতেছে—বাবা! বাবা! বাবা আমার!

কে যেন অন্তহীন; সীমাহীন সাগর পারে থাকিয়া তাহারই উত্তর দিতেছে—মা! মা-আমার! কামনা আমার!

—সে যে পিতার, আর কারো নয়। তার পিতার পূর্ণ মুহূর্ত্তের ব্যবধান নাই, সমুদ্র অবরোধ তুচ্ছ করিয়া তাহারই উদ্দেশে তাহারই কাণে আসিয়া ঢুকিতেছে! সেই স্নেহ-কণ্ঠ, সেই আনন্দরাগরঞ্জিত চির পরিচিত, চির প্রিয় কণ্ঠস্বর!

কামনা আবার ডাকিল—বাবা! বাবা!

সাগর তরঙ্গ বহিয়া আসিয়াছিল—মা! মা! মা!

কামনা নিবিড় মুহূর্ত্তের স্নেহ বেদনা ভরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

# কর্মবীর সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র বসু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে কটক সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় জানকী নাথ বসু বাহাদুর কটকের একজন উকীল ছিলেন। ইঁহাদের আদি নিবাস কলিকাতার দক্ষিণে ২৪ পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। সুভাষচন্দ্রের মাতারা প্রায় সকলেই বিলাতে শিক্ষিত এবং উচ্চ আদর্শ পরায়ণ। মাতা অতিশয় নিষ্ঠাবতী ও ধর্মপরায়ণা।

ছেলেবেলায় সুভাষচন্দ্রকে কটকের ইউরোপীয় ইস্কুলে পড়িতে দেওয়া হয়। তৎপরে ১১ বৎসর বয়সে তিনি কটক কলে-জিয়েট ইস্কুলে ভর্ত্তি হন। এখানে আসিয়া সুভাষচন্দ্র প্রথম স্বাধীন ভাবে শিক্ষা করেন। কিন্তু তখনও তাঁহাকে ইউরোপীয় পরিচ্ছদে ইস্কুল আসিতে দেখা যাইত। প্রতিভাবান্ ও সুদর্শন সুভাষচন্দ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পূর্ব্বে স্বজন বন্ধুর সংস্পর্শে আসিয়া সুভাষচন্দ্রের জীবনে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। ধর্ম্ম পথে ও স্বদেশ সেবার মন্ত্র এই সময় হইতে তাঁহার চিত্তের অন্তরায় হয়। পড়াশুনায় মনঃসংযোগ করিলেও তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। প্রথম বৎসরের শেষভাগে ১৯১৬ সালে তিনি এক বন্ধুর সহিত হিমালয়ে সন্ন্যাসীর খোঁজে পলাইয়া যান। সেখান হইতে হতাশ হইয়া ফিরিবার পথে কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশানুসারে আবার বাড়ী ফিরিয়া আসেন। বেণীমাধবের অত্যাচারে সুভাষচন্দ্র বহুদিন চাইবাসের অরে পথ্যাগত থাকেন। কোনও ক্রমে আই-এ পরীক্ষায় ৭ম স্থান অধিকার করিয়া পাস করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়িতে পড়িতে অধ্যাপক ও-টেনকে প্রহার করার অভিযোগে কলেজ হইতে একবারে বিতাড়িত হন। কটকের বাড়ীতে ২ বৎসর একরূপ অন্তরীণ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পড়িবার অনুমতি পান এবং ১৯১৭ সালে স্কটিশচার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে তিনি Indian defence Force এ যোগ দেন। ১৯১৯ সালে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সম্মানের সহিত দর্শনশাস্ত্রে উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Experimental Psychology ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। ঐ সালের অক্টোবর মাসে I, C. S. পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪র্থ স্থান লাভ করিয়া বিহারে গেছে পান। ১৯২১ সালের জুনমাসে কেম্ব্রিজের বি, এ, উপাধি গ্রহণ করিয়া I. C. S. আই, সি, এস্, ছাড়িয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাহায্যে কলিকাতা বিদ্যাপীঠের ভার গ্রহণ করেন। সুভাষবাবু বঙ্গীয় জাতীয় সমিতির প্রচার পরিষদের সম্পাদকের কাজ অতি দক্ষতার সহিত চালান। তিনি গত দুই বৎসরই নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংঘটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে তলাটিয়ার আন্দোলনের সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন এবং ২ মাস বিচারাধীন থাকার পর ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন। ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে মুক্তি পাইয়া কিছুদিন পরে উত্তরবঙ্গ বন্যা সমিতির সম্পাদকরূপে সাম্যাহারে যথেষ্ট কাজ করেন। ডিসেম্বর মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত দৈনিক "বাঙ্গালার কথা" র সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। এখন তিনি উক্ত কার্য্য ব্যতীত, আর একখানি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক ইংরাজী কাগজের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই ত্যাগী সৌম্যমূর্ত্তি কর্ম্মবীরকে ভগবান দীর্ঘজীবী করুন।

---

## তৎস্বরূপ

( চীনা কবি হুকং হইতে )

[ শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর ]

চক্ষু মেলিয়া যাহা হেরে বরাবর
প্রতিরূপ তাহা, নহে ঠিক প্রতিমাটি,
ধ্যানের মাঝারে যাহার অস্তিত্বের
স্বরূপ তাহার তাহারই আমিও খাঁটী।

বিশ্বটি তথা প্রতিরূপ অনুরূপে
স্বরূপ ছায়াই সত্যের শুধু তুলি,
যেখানের পথে আসে সে যে চুপে চুপে
রুদ্ধ যখন ইন্দ্রিয় দ্বারগুলি।

গত পরশ্ব রাত্রে বাবস্থাপক সভায় বাঙ্গালার বর্ত্তমান বৎসরের আয় ব্যয়ের বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজস্ব সচিব ইহাই প্রথম বজেট। বজেটে ঘাটতি পড়িয়াছে ৩ লক্ষ টাকা। রাজস্ব সচিব বলিয়াছেন, এ বৎসর আর কোনও টেক্স ধার্য্যকরার প্রয়োজন হইবে না। এবং তিনি আশা করেন এই ঘাটতির সোধাইয়া যাইবে। বজেটে ঘাটতি পড়িবে না-জানে করিয়াই গত বৎসর আয়োজন ও ট্রান্সফার হোমের দুইয়াছিল। কিন্তু এই দুইটি বরেণ্য কোনটি হইতেই গত বৎসরে আশানুরূপ অর্থ পাওয়া যায় নাই। ট্রান্সফার ও বজেটে উল্লিখিত টাকা অপেক্ষা ৭৫,০০০৲ টাকাই কম আদায় হইয়াছে। রাজস্ব সচিব স্বীয় অনু-সন্ধান বুদ্ধিটির প্রভাব তাঁহার বজেটে উল্লেখ করেন নাই। যে প্রস্তাব অনুযায়ী কোন কোন বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ হইলে, বজেটের ঘাটতি সোধরাইতেও পারে। রাজস্ব সচিব এই কথাও বলিয়াছেন যে, ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি বসিবার পূর্ব্বেই সরকার কতকগুলি বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছেন, তাহার ফলেও কতকগুলি ব্যয় কমিয়াছে। যাহাই হউক, ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির প্রস্তাবের কতকটা গ্রহণ করিতে পারিলে এবং ট্রান্সফারের আশানুরূপ টাকা হাতে পাইলে, রাজস্ব মন্ত্রী বর্ত্তমান বৎসরে ঘাটতিটা কতকটা টানিয়া হয়ত করিয়াই ফেলিতে করিতে পারিবেন, কতকগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও কতকটা বেশী টাকা খরচ করিতে পারিবেন। বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা ক্রমে ভাল হইবে আমরা [illegible] করি। এই প্রসঙ্গেও আমরা বাঙ্গালা প্রদেশের উপর আরও বজেটের অতিরিক্তের কথা উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্গালার রাজস্ব সচিবের বাটতির বজেট তৈরী করিতে হইত না। বজেট সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিবার ইচ্ছা রহিল। (সমাজ)

—০—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা কর্পোরেশনে মহিলাদিগকে ভোট প্রদানের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব বহু বাদ বিসম্বাদের পর গৃহীত হইয়াছে।

—০—

আইরিশ রিপাব্লিকান দলের নেতা মাকস্থইনীকে হাজির দেওয়া হইয়াছে। তিনি পুনরায় রিপাব্লিকান দলে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

—০—

ডাক্তার নেতা বাবু সৌরীন্দ্রের এই ফলে মুক্তি লাভের কথা আছে। কিন্তু তাহা ফেলে অবস্থান করে 'সুং ঐ আভার' প্রদিকার আরও এক-বৎসরের জন্যে তাঁহাকে বন্দিত করা হইয়াছে।

—০—

শ্রীলের মহারাজ এখন বিপ্লববাদীদের হস্তে বন্দী। তাঁহাকে রাজ-বাড়ীর বাহির যাইতে দেওয়া হয় না, এমন কি তাঁহার চিঠিপত্রও পুলিস পড়া হয় না। এ বিষয়ে কিন্তু বিশেষ বিলম্ব করে তিনি ব্রিটিশ পরি-পুত্রের নিকট আবেদনও পাঠাইয়াছেন।

—০—

সৈন্যদলের ৮ আটটী মুটিং ব্রাঞ্চের সৈন্যাধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে স্থির হইয়াছে।

—০—

ডাক্তারের বদর ইসলের পার্শ্ব অন্যান্য উপনিবেশ হইতে এক সহযোগী মুখে বাহা করিয়াছেন। সেখানে ভারতবাসীগণ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, সভি সম্বন্ধে একটী বিষয়ে তিনি এতোদার এসেম্বলীর অধিবেশনের আগে কি কি মতই তাঁহারা সভি করিতে পারেন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য তিনি ভারতবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটী বৈঠক বসাইবার অনুরোধ করিবেন।

—০—

গত পরিবার বৈকালে ডালহৌসী ইন্ষ্টীটিউটে পরলোকগত রাজাবাদুর পাল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষে শোক প্রকাশার্থে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাতে বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমানের মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি, মিঃ এইচ, ই, ক্লার্ক, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয়ার্জ্জি, কবীর রাধাচরণের বিবিধ সদ্গুণের কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন এবং তাঁর রাধাচরণের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, মিঃ জোন্স, অধ্যাপক এন্, সি মুখার্জ্জি, মিঃ কেলুসন্ প্রভৃতি সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয় এবং মহারাজা কবীন্দ্রের সভী, রাধাবাবু মিঃ কেলুসী ও আরও কয়েকজনকে লইয়া এই উদ্দেশ্যে একটী কমিটি গঠিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

—০—

আরও তিন একটা সিনেমা হইবার আশা হইয়াছে। কলহীনদের অনেকেই আয় সমর্পণ করিয়াছেন। কলহীনদের নেতাগণি শিরাজ রাজাবিয়াদের যে, তিনিও আয়-সমর্পণ করিবেন। তবে তিনি তাঁহার লোকজনদের মনে আনিতে পারিতেছেন না। ঔরঙ্গবিদ হইতে ৭০ জন কলহীনী আয়সমর্পণ করিয়াছে। দেখা যাক্ দেশটা কি হয়?

—০—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা :—আগামী ৫ই মার্চ্চ হইতে ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাকী তুলেনাপরীক্ষা হইবে। ১১ই মার্চ্চ হইতে ১৯এ এপ্রিল পর্য্যন্ত আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষা হইবে এবং বি এ ও বি এস-সি পরীক্ষা ৮ই মার্চ্চ হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত হইয়া পুনরায় ১৮এ মার্চ্চ হইতে ১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত হইবে।

—০—

বাবু পীরুন :—ক্লাসাইভ্রিক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের একজন কেরাণী পাঁচ ও পুরস্কার পাইয়া ধরা পড়িয়াছিলেন। পুরস্কারের নাম ১৯, তিনি নগদ। শাস্তিটার পীরুনে ছয়ের আরও বোধ হওয়াতে গত ৩০শে জানুয়ারী ফেরোসিনের আদালে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। (সমাজ)

—০—

গত ২৩শে ডিসেম্বরের 'মুক্তকণ্ঠ' 'আর যায় কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করায় মুক্তকণ্ঠ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র কাঞ্জিলাল রায়চৌধুরীর অভি-যোগে আদালত ফৌজদারি আইনের ১২৪ (ক) ধারামতে তিন শ্রেণিমেজী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মুখোপাধ্যায় এজলাসে অভিযুক্ত হন। আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

—০—

এলাহাবাদের মিউনিসিপালিটী স্থির করিয়াছেন যে, হাকিম আবদুল বারী এবং কেশবদেব এলাহাবাদে পদার্পণ করিলে তাঁহাদিগকে মিউনিসিপালিটীর তরফ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হইবে।

—০—

পার্লামেন্টের কমন্স সভায় স্যার পার্সি সিটসন যুক্তপ্রদেশের রাজ-নীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ঐ প্রশ্নের উত্তরে আণ্ডার সেক্রেটারী বলেন, সমস্ত প্রদেশের আবহা বিবেচনা করে, এরূপ অবস্থায় রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে বিবেচনার ভার প্রাদে-শিক গবর্ণমেণ্টের হাতেই থাকা উচিত। যুক্ত প্রদেশের রাজনীতিক বন্দীদের এই মুক্তির ফল কি দাঁড়ায় তাহা না জানা পর্য্যন্ত, তাঁহাদিগকে ঐ অবস্থা পরিচালন হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করা সমত হইতে পারে না।

—০—

মহাত্মা গান্ধীর পুত্র রামদাস গান্ধী "নবজীবন" পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক এবং মিঃ কালেনবাকার সম্পাদক। আহমদাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, রামদাস গান্ধীর প্রতি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৮ ধারামতে নোটিস জারি হইয়াছে এবং সমাধিমাত্রার জন্য এক বৎসরের মুচলেকা দিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। গত ২৯এ জানুয়ারী এবং ৫ই ফেব্রুয়ারী 'নবজীবন' পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া সম্পর্কেই নাকি এরূপ করা হইয়াছে।

—০—

পার্লামেন্টের কমন্স সভায় স্যার এন হিকেটের প্রশ্নের উত্তরে পাল ডেভারটন বলেন, যুদ্ধের পর হইতে আয়কর দিবার পার্টির পরিমাণ সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। এ জন্য ঐ পার্টিতে দেওয়ার কর্ম্মচারীর সংখ্যা অনেক কম করা হয়। সেজন্য বিশেষজ্ঞই ৩০জন লোককে সরাইয়া [illegible] যে যাবে।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

১ম বর্ষ ] ১৯শে ফাল্গুন শনিবার ১৩২৯, ইং ৩রা মার্চ। [ ৩১শ সংখ্যা

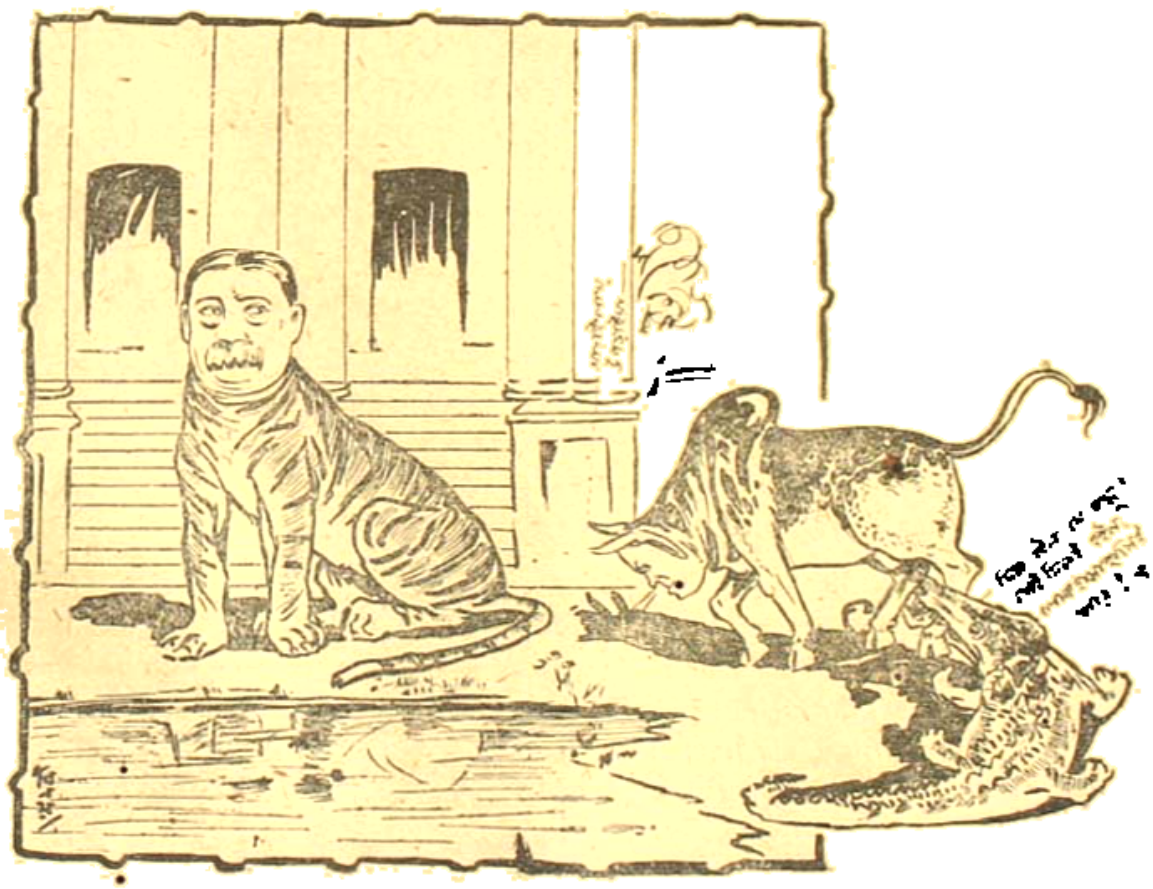

"সেইত যদু মরমি, তবে কেন লোক হাসাদি ?"

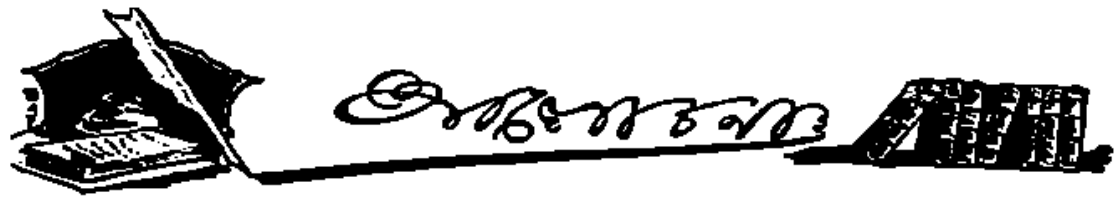

প্রবাসীতে আমাদের দেশ ছাইয়া আছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে, ধনে সম্পদে প্রবাসী আজ ভারতের সত্য অধিবাসীদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উন্নত। দেশীয় উন্নতির পরিপন্থী বা সংকোচক কার্য্যে ইহারা হাত দিলেও বা করিতে থাকিলেও এ দেশবাসীর তাহাতে বাধা দিবার অধিকার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আমাদের দেশী কেহ যদি ভিন্ন দেশে গিয়া এইভাবে আঁকাইয়া বসিবার চেষ্টা করে তবে তাহার লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও অপমানে পরিসীমা থাকে না। বিদেশে যাইবার চেষ্টা বা বিদেশে বস-বাস করিবার আগ্রহ আমাদের বড় বেশী নাই,—স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ের মতই স্বদেশের মাটি আঁকাড়াইয়া মরাও শ্রেয় আমাদের একটা সংস্কার হইয়া গিয়াছে। এ সংস্কার ভাল বা মন্দ তাহার বিচারের স্থল ইহা নহে কিন্তু বিদেশে বস-বাস স্থাপন জাতীয় উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন। এই গৃহপ্রিয়তা ঘর-মুখো ভাব জার্ম্মেনীতেও ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতি প্রবল ছিল তাহার পর যখন তাহারা এই ঘর-মুখো ভাবের কূকল বুঝিতে পারিল, যখন তাহাদের ভুল ভাঙ্গিল তখন আর তাহারা বাহিরে সূর্য্যের নীচে বড় বেশী স্থান খুঁজিয়া পাইল না। আর যাহারা দেশের বাহিরে গিয়া আঁকাইয়া বসিবার গুণ বুঝিতে পারিয়াছিল ও এই বহির্বাস হইতে কি ভাবে জাতীয় উন্নতি হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল তাহারা আজ সূর্য্যের নীচে সকলের অপেক্ষা বেশী স্থানের অধিকারী হইয়াছে। বহির্বাসের এই অধিকার রক্ষার জন্য মহাত্মা যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন পরাধীন ভারতের দুর্ভাগ্য, অধিবাসীর ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিবে। কিন্তু যে কোন উপনিবেশে বা বাহিরের কোন স্থানে ভারতবাসীর লাঞ্ছনা আজও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের সাম্প্রতিক ভ্রমণ ব্যাপারেও এ ব্যবস্থা যে শীঘ্র উন্নত হইবে তাহাও বোঝা যাইতেছে না। নিজ বাসভূমেই যাহারা প্রবাসী তাহারা বাহিরেই বা লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাত হইতে মুক্ত হইবে কি করিয়া? কিন্তু জীবনের পক্ষে ইহাও প্রয়োজনীয়।

আমাদের দেশের রেলযাত্রী বা ষ্টীমার যাত্রীদের অসুবিধা চিরকাল সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে। রেল, ষ্টীমার বা যে কোনরূপ যানের ভাড়াই অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইলেও সে সব যানগুলি যাহাদের ভাড়ায় চলিতেছে তাহাদের চলিবার সুব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। জগতের অন্যান্য সকল সভ্যদেশেই চলাচলের যান বাহনাদির ব্যবস্থা যাহাদের হাতে আছে তাহাদের নীতিই হইতেছে যথাসম্ভব অল্প ভাড়ায় যাত্রীদিগকে যত অধিক সুবিধা দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে এ নীতি আদৌ অবলম্বিত হইতেছে না। যাতায়াতে যান বাহনাদি আজকাল অতি আবশ্যকীয়, ইহা না হইলে আজকাল চলিবার উপায় নাই। দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত বলিয়াই বা এই সব কোম্পানীগুলি ভাড়া অতি বৃদ্ধি করিয়া দেশের অধিবাসী যাত্রীবৃন্দের আরও শোষণ করিবার মতলব করিয়াছিল। কিন্তু আর্থিক অবস্থা দেশের অতি শোচনীয় তাই এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে যাত্রীর সংখ্যা শতকরা দুইভাগ কমিয়া গিয়াছে। দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইনেস সাহেব বলিয়াছেন যে তিনি এই ভাড়া কমানো সম্বন্ধে রেলওয়ে এজেণ্টদের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। পরামর্শের ফলে ভাড়া যদি কিছু কমে 'গার্ড চার্জ' প্রভৃতি নূতন নূতন রেলের কর' ভারগুলি যদি কমিয়া যায় তবেই মঙ্গল। ইহা ভিন্ন আমাদের আর কি ক্ষমতা আছে।

• • • •

বর্ত্তমানে জগতের সকল সভ্যদেশেই রেলের ভাড়া কমান হইতেছে। ইংলণ্ড, ওয়েলস প্রভৃতি স্থানের রেলের ভাড়া কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন তথাকার রেলওয়ে প্রভৃতির ভাড়া শতকরা দশ ভাগ কমাইবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই আদেশ অনুসারে গত ১লা জুন হইতে তথাকার রেলওয়ে সমূহের ভাড়া কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে দেশের কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি উন্নতি লাভ করিবে, দেশবাসীরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। এই কমিশনে স্থির হইয়াছে যে

রেল বিস্তারের জন্য যে অর্থ গুপ্ত আছে তাহার উপর শতকরা ছয় টাকা সুদের পরিবর্ত্তে কতৃপক্ষগণ ৪ই হয় পাইবেন। ট্রানসপোর্ট আইনও এই বিধি বহুল করিয়াছে। জগতের সকল সভ্যদেশেই রেলের ভাড়া কমিতেছে—রেল যাত্রীদিগের সুবিধার ব্যবস্থা করা হইতেছে, বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করা হইতেছে। অথচ আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে রেলের ভাড়া ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। নূতন শাসনসংস্কার আইনে মহাযুদ্ধের অবসান কালেও রেল ভাড়া পুনরায় যেভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে ইহাতে দেশবাসীর যে কত অসুবিধা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু দেশের লোকের এই তীব্র প্রতিবাদ রেল কর্তৃপক্ষ বরাবরই অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন। যাহাদিগকে লইয়া রেলপথ চলিবে, যাহাদিগের অর্থে ধনী মহাজন ও কোম্পানীর বহু অর্থ লাভ হইবে তাহাদিগের প্রতি এ উপেক্ষা শুধু এই দেশেই চলিতে পারে। অপর কোন দেশে এমন ব্যবস্থা চলা মোটেই সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের বিধান অনুসারেই যদি আমাদের এই হতভাগ্য দেশের বিধানও চলিত তবে দেশ বহুভাবেই নানা জুলুমের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিত। কিন্তু কোন বিধান অনুসারে যে আমাদের দেশের ব্যবস্থা চলে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। শুধু রেলওয়ে বলিয়া নহে—ভারতের ভাগ্যে সর্ব্বকার্য্যেই এইরূপ জগৎ ছাড়া উল্টা ব্যবস্থা চলিতেছে বলিয়াই ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এত অসন্তোষ এত হাহাকার! কিন্তু কে ইহার প্রতিকার করিবে?

* * * *

বাংলার রাজধানী কলিকাতা সহরের উপর মধ্যবিত্ত লোকের চলিবার ফিরিবার ও নিত্যকর্ম্ম রক্ষা করিবার একমাত্র যান ট্রাম। মোটর বা গাড়ী আরোহণে চলিবার ক্ষমতা অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই আছে। ট্রামের ভাড়া অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরোহীদিগের শত আপত্তি সত্ত্বেও কোম্পানী ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নাই। কিন্তু ভাড়া বৃদ্ধির ফলে আরোহীদিগের সুবিধা কিছুমাত্র হইয়াছে কি? ভুক্তভোগীরা বলিবে—কোম্পানীও বোধহয় স্বীকার করিবে—আরোহীদিগের পক্ষে কিছুমাত্রও সুবিধা হয় নাই। সুবিধা যখন কিছুই এ পর্য্যন্তও হইল না তখন যাত্রীদের এ বর্দ্ধিত ভাড়ার কর্ম্মভোগ কেন? না আমাদের রেলের আর্থিক অবস্থা ক্রমে উন্নতিশীল—তাই এ রেলের কোম্পানীগুলি সকল সভ্য রেলের নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া এ রেলে জনমত উপেক্ষা করিয়া এই ধারা চালাইয়া যাইতেছেন?

* * * *

আমাদিগের দেশে নারী ও শিশু মৃত্যুর অভাব নাই। গর্ভিনী অবস্থায় ও সন্তান প্রসবের সময় কত নারীর যে অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তাহার সংখ্যা নাই। ইহার অন্যান্য আরও অনেক কারণের মধ্যে ইহাও একটি অন্যতম প্রধান কারণ যে সুচিকিৎসক ও সুধাত্রীর সাহায্য অনেক গর্ভিনীই পান না। মাতার জীবন যেখানে বিপদগ্রস্থ সন্তানের জীবনও সেখানে মোটেই নিরাপদ নহে। আমাদিগের বাংলার এই সমস্ত শিশু ও মাতার জীবন রক্ষার কোন চেষ্টা সরকার হইতে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কলিকাতা সহরে গর্ভিনীদিগের ও শিশুদিগের জীবন রক্ষার জন্য দু' একটি প্রদর্শনী হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে এই সব জীবন রক্ষার সত্য সুব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। মাদ্রাজ কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য পরিদর্শক এই উদ্দেশ্যে একটি শাখা বিভাগ খুলিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে সহরের যে কোন লোক এই স্থান হইতে সুচিকিৎসক ধাত্রী বিনা চিকিটে পাইতে পারিবে। পূর্ব্ব হইতে কর্পোরেশনে নাম লিখাইয়া রাখিলে সময় মত গর্ভিনী নারীর সাহায্যের জন্য ধাত্রীরা আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। মাদ্রাজ কর্পোরেশন নারী ও শিশুদিগের অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের চিকিৎসার এই ব্যবস্থা করিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন। আমাদের বাংলা দেশেরও এই সমস্ত বিভাগ দেশীয় লোকের হাতেই রহিয়াছে—তাহারাও ইচ্ছা করিলে এমন প্রয়োজনীয় জনহিতকর কার্য্য স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন।

* * * *

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন ভারত হইতে অস্পৃশ্যতা প্রথা যথাসম্ভব দূর করিতে হইবে। দেশে এখন যেভাবে অস্পৃশ্যতা ও ছুৎমার্গ রক্ষার ব্যবস্থা চলিতেছে ইহা অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা বা বম্বে যে কোন সহরে গেলেই দেখা যায় পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণাচার্য্য কুলতিলক মহাত্মা এবং গণিমিঞা মহাশয় একই

টেবিলে বসিয়া যথাসম্ভব আরাম সহকারে চা ও চপ কাটলেট বা সরষের তৃপ্তির সহিত পান ভোজন করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জাতসারেই এই একাদশী ভোজন ব্যাপার চলিতেছে—অজ্ঞাতে নহে। তবু দেশে গিয়া এই ব্রাহ্মণ কুলতিলক মহাশয় হয়ত অগ্রণী হইয়া অপর কাহাকেও সমাজে বদ্ধ দিবার সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী হইয়া দাঁড়ান। এইভাবে জাতি ও জাতীয়তা রক্ষা আমাদের দেশের একটা ধরণ হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর দুঃস্বার্থ জাতীয়তা রক্ষণের চেষ্টায় দেশের সমাজ জীবন ক্রমেই হীন হইতেছে ও ভণ্ডামীতে ভরিয়া উঠিতেছে। যাহা করিবার তাহা সত্য সরলভাবে করিলেই কোন কথা থাকে না। কিন্তু এসব জিনিসে যখন অতিমাত্রায় লুকোচুরি ঢুকিতে থাকে তখনি তাহা বড় বিশ্রী হইয়া উঠে।

গত বৎসর বাংলা সরকারের বাজেটে বহু টাকা ঘাটতি হইয়াছিল। ঘাটতির সংকুলান করিবার জন্য ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফি প্রভৃতি বাড়ান হইয়াছিল—আমোদ কর প্রভৃতি বসিয়াছিল। কিন্তু এসব দিকে কর বাড়াইয়াও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। সরকার কর বাড়াইয়া এসব বিভাগ হইতে যাহা পাইবার আশা করিয়াছিলেন তাহা পান নাই। অভাবে অনাটনে দেশের লোক বোধহয় চিঠিপত্র লেখা কমাইয়া দিয়াছে—আমোদ প্রমোদ দেখিবার উৎসাহও বোধহয় তাহাদের তেমন নাই। এসব বিভাগে আয় না বাড়িলেও বাংলা দেশের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা যে মাদক দ্রব্যাদির বিভাগে আয় এবার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মদ, গাঁজা প্রভৃতির মূল্য অনেক বাড়িয়া গেলেও এ বিভাগে আয় কমে নাই। জাতি নেশা খাইয়া সব দুঃখ বিষাদ ভুলিয়া থাকিতে চাহে তাই বুঝি দেশের দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে এসব বিভাগের আয়ও ক্রমে বাড়িয়াই চলিবে। মহাত্মার আদেশ আমরা সব দিকে যেমন পালনে তৎপর এদিকেও তেমন না হইলে জাতীয় গৌরবের পরিচয় আর কি ভাবে দেওয়া হইবে।

• • • •

নূতন বাজেটে ইস্পাতের কাঠামো বজায় রাখিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও শিল্প এ সমস্ত দিকে দান খয়রাত করা আর বোধহয় সম্ভবপর হইবে না। দেশের লোকেরা এসব কার্য্যভার একদিন আপনার হাতেই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল। এখনও তাহারা অনেক সময় তাহাই চায়। কিন্তু তবু এসব বিভাগ সরকার হাতছাড়া করিতে চাহিলে ও যায় সংকোচ করিতে অভিলাষী হইলে আমরা নানা বাদ-প্রতিবাদ করি।

• • • •

এসব বিভাগ চালাইতে হইলেও অর্থের প্রয়োজন, ইস্পাতের কাঠামো বজায় রাখিতেও অর্থের প্রয়োজন। দু'ই রাখিবার জন্য ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কর বহন করে দেশীয় লোকেরাই। কিন্তু তাহাদের কর ভার শুধু যদি ইস্পাতের কাঠামোর জন্যই যায়—তবেই দুঃখের কথা। নূতন করিয়া দেশের উপর কর ভার চাপাইয়া এই সব জাতিগঠন বিভাগ রাখিয়া জাতির উন্নতির চেষ্টা তাহাও এদেশে সম্ভব কি? না খাইতে পাইয়া যে জাতি মরিতেছে তাহাদের কাছে এখন জাতিগঠন বা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষণ সবই সমান। তাহাদের কোনদিকেই উৎসাহ নাই। আছে শুধু অবসাদ!

• • • •

ভূপালের বেগম সাহেবা তাঁহার রাজ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যবসায় বন্ধ হওয়াতে ভূপাল সরকারের ছয় লক্ষ টাকা আয় কমিয়া যাইবে। তবুও রাজ্যের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ইহা বেগম সাহেবা বন্ধ করিলেন। পৃথিবীর সকল উন্নত সভ্য রাজ্যেই এই বিষের ব্যবসায় বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অথচ আমাদের দেশে ইহা নির্ব্বিবাদে রক্ষা করিবার জন্য পুলিশ পাহারারও ব্যবস্থা হয়। ইহাই আশ্চর্য্য!

• • • •

ডাক্তার মৌরের বিল লইয়া আমাদের দেশের সমাজ-পতিরা অনেক মাথা ঘামাইতেছেন। বিল পাশ হলেই যেন হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যাবে—যেমন স্মৃতি আইনে গেছে যেমন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইনে গেছে। এ সম্বন্ধে সহযোগী আত্মশক্তি কয়েকটি বড় স্পষ্ট কথা লিখেছেন 'কোন ব্রাহ্মণ যদি ভালবাসার পড়ে বা অন্য কোন কারণে কায়স্থের কন্যাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করতে চান, তিনি তা পারবেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ শতাধিক উপপত্নী রাখতে পারবেন—তা'র মধ্যে হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতিও থাকতে পারে।...এমন কি ব্রাহ্মণ যদি এমন কিছুর অস্তিত্ব থাকেন যা' লেখনীর মুখে প্রকাশ করা যায় না, তাতেও তার ব্রাহ্মণত্বের খর্ব্বতা হবে না এবং সৌর বিল প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করবারও বাধা হবে না।' নিজের সমাজের উন্নতি কোন দিক দিয়ে কিছু করবার সাহস বা ক্ষমতা আমাদের আজো নাই—কেউ কিছু করতে গেলেই অমনি আমরা হাঁকিয়ে উঠি বলি—ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ—সমাজে হস্তক্ষেপ—গেল গেল সব গেল।

# শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

হেমন্ত কুমার ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার রাজধানী কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺মদনমোহন সরকার কৃষ্ণ নগরের একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহাদের আদি নিবাস শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী বাগাঁচড়া গ্রামে। হেমন্ত কুমারের ভ্রাতারা সকলেই সুশিক্ষিত এবং সাহিত্য ও কলা বিদ্যার অনুরাগী। মাতা অত্যন্ত দয়াবতী এবং ধর্ম্মশীলা হিন্দু রমণী।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

৪ বৎসর বয়সেই হেমন্ত কুমারকে ইস্কুলে দেওয়া হয়। ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি বাৎসরিক পরীক্ষায় হেমন্ত কুমার সকল বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোনও আকস্মিক ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় খুব উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ন। ইহার পূর্ব্বে তিনি বন্ধু বান্ধব মিলিয়া কৃষ্ণনগরে শ্রমজীবী নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিদ্যালয় এখন নিজস্ব গৃহে স্থাপিত হইয়া বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। কলেজে ভর্ত্তি হইয়া প্রথম বৎসরের পূজাবকাশে সন্ন্যাসী গুরু দর্শনের আশায় তিনি হিমালয় যাত্রা করেন। তৎপরে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সাংঘাতিক রোগে শয্যাশায়ী হ'ন। ডাক্তারে জবাব দিলেও বাঁচিয়া উঠেন এবং কোনও প্রকারে পরীক্ষা দিয়া ২য় স্থান অধিকার করেন। ১৯১৭ সনে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর সম্মানের সহিত বি-এ- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Comparative Philology তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৯১৯ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ- পাশ করেন। পরীক্ষার ফল এতই ভাল হইয়াছিল যে সেনেট হওয়ার ৮।১০ দিনের মধ্যেই স্যার আশুতোষ ডাকিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত বাংলা এম-এ- ক্লাসের অধ্যাপনা কার্য্যে হেমন্ত কুমারকে নিযুক্ত করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান ক্লাসের অধ্যাপক হন এবং এম-এ পরীক্ষক নিযুক্ত হ'ন। এই সময়ে বিলাতে যাইবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩ বৎসরের জন্য বাৎসরিক ৩০০ পাউণ্ড হিসাবে Govt of India Scholarship তাঁহাকে দেন। কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে ঐ বৎসর বৃত্তিটি সেখানে স্থানান্তরিত হয় এবং পরবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাইবার বন্দোবস্ত হয়। ১৯২০ সালে হেমন্তকুমার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দেন—কিন্তু ফলাফল সেনেট হইবার মাত্র কয়েক দিন আগেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন। হেমন্ত কুমার ঐ বৎসর নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যপদে বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাচিত হ'ন এবং জাতীয় বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ১৯২১ সালে দেশবন্ধুর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ এবং সাপ্তাহিক বাংলার কথার সম্পাদন কার্য্য করিয়া ডিসেম্বর মাসে ভলান্টিয়ার আন্দোলনে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সহিত ধৃত হন এবং ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাগার হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে বাহিরে আসিয়া তিনি ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নিজের জেলা নদীয়ার সেবায় নিযুক্ত হ'ন। বর্ত্তমানে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব নামক কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কাজ

নীতি, প্রাচ্যতত্ত্ব ও সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক বিক্রেতা এবং প্রকাশক কোম্পানীর ' উন্নতি সাধনে ব্রতী হ্যাছেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই নানা মৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় তিনি নিজের চিন্তারাশি প্রকাশ করিতেছেন। ইস্কুল হইতেই হেমন্তকুমারের সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হইতে থাকে এবং এই অল্প-বয়সেই তিনি নিম্নলিখিত সুপাঠ্য ও সুচিন্তিত পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন:—The Revolutionaires of Bengal(২) The Intellectual Laws of Laguage and the Science Meaning change (P. R. S. Thesis) (৩) ভাষাতত্ত্ব ও বাংলাভাষার ইতিহাস (৪) বন্দীর ডায়েরী ( কারাকাহিনী ) (৫) স্বরাজ কোন্ পথে ? (৬) বিপ্লবের পঞ্চশক্তি (৭) স্বাধীনতার সপ্তসূর্য্য (৮) ছায়াবাজি (গল্প) (৯) উল্টোকথা (১০) পাল্টকথা (১১) যুগসন্ধ।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি হেমন্তকুমার নিজের চিন্তা ও কর্ম্মের দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

---

# অকাল বাদলে।

[ শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায় ]

( ১ )

নতুন আলোর পরশ মাখা,
ফাগুন দিনের সকালে,
মেঘের মালায়, আকাশ ভরি',
নামল, বাদল অকালে।
নীরব পিকের কণ্ঠ আজি ;
মলিন, বিকচ কুসুম রাজি ;—
দিক্‌বালা সব, নয়ন মাজি'
বৃষ্টিধারার জলে,
প্রভাত বেলায়, আজকে এল,
ধূসর গগন তলে।

( ২ )

নতুন আলোর পরশ মাখা
ফাগুন দিনের সকালে
মেঘের মালায়, আকাশ ভরি'
নামল বাদল, অকালে !
আজ, এ অকাল বাদল ক্ষণে,
ভাসছে যে মোর, নয়ন কোণে,
তার ছবি সব ;—জাগছে মনে
তার যে সকল কথা ;—
প্রাণের মাঝে, আজ, জাগে তার
অকাল মরণ ব্যথা।

[ দুখের বিষয় বাঙ্গলাটা এমন কাটিয়া গিয়াছে—সঃ বাঃ ]

আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী লিলিয়ান রাসেল—বিভিন্ন বয়সে।

ইনি সামান্য গায়িকা হইতে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের বিশিষ্ট দূত হইতে পারিয়াছিলেন। এই চারিখানি ছবির সঙ্গে লিলিয়ানের জীবনের গতির একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। তিনি যে চারবার বিবাহ করিয়াছিলেন, ছবিগুলি প্রায়ই সেই সময়ের।

# বিদেশের স্মৃতি

[ শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল ]

৩টার সময় বাহির হইলাম। ভদ্রকে দেখিবার মত কিছুই নাই। ১ জন মুনসেফ, ২ জন ডেপুটী, এই সমস্ত! পুরাতন বালাবতী নদীর অপর পারে। সেটী এখন ছোট। নূতনটী নিতান্ত ছোট। স্কুলে বন্ধুবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বাৎসরিক পরীক্ষা হইতেছে একবার তাঁহার সহিত পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইলাম। মাত্র ৮টী বাঙ্গালী ছাত্র। কলিকাতার এত নিকট তবুও বাঙ্গালী এখানে নিতান্ত অল্প। বন্ধুবর বড়ই ব্যস্ত, একে পরীক্ষা হইতেছে তাহাতে আবার ইন্‌স্পেক্টরের শুভাগমন হইবার আশঙ্কা আছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া আছি এমন সময় একটা সোর-গোল শুনিতে পাইলাম—কে চেঁচাইতেছে "মনিষা মাকড় খাই গল" সেই দিকে তাকাইয়া দেখি দুইটি 'মাকড়' (হনুমান) একখানি ঘরের চালে বসিয়া ঝুমড়োর ভগ্না খাইতেছে। বড় বাঁশের কঞ্চি দিয়া তাহাদিগকে প্রহারের চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু তাহারা বেশ নিপুণ তরবারি ক্রীড়কের মত প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আহারে নিযুক্ত থাকিল। অবশেষে যখন বাস্তবিকই এক ঘা পিঠে পড়িল তখন উভয়ে 'কিচির মিচির' শব্দে কতকগুলি ফল, ভগ্না ইত্যাদি হাতে লইয়া লাফাইয়া নিকটবর্ত্তী গাছের শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞের মত Danger Zone পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। আমি তাকাইয়া আছি। মিনেট পাঁচেক পরে উভয়ে নামিয়া আবার আহারে মনোনিবেশ করিল। অবশেষে সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া উভয়ে দুঃখিতচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাসায় ফিরিয়া চা পানান্তে বিষয় কর্ম্মাদির বিষয়ে কথোপকথন হইবার পর বন্ধু আমাকে মুনসেফ বাবুর সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য লইয়া গেলেন। সেখানে ন—বাবু আরম্ভ করিলেন "ইনি আমার বন্ধু মিঃ—এম্, এ, বি—" কিন্তু তাঁহার কথা শেষ না হইতেই মুনসেফ বাবু "আরে এই যে" বলিয়াই আমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। উড়িষ্যার দেশে মুনসেফদের Summary power আছে নাকি ভাবিতেছি এমন সময় তাঁহার মুখে আলো পড়িল—দেখি যে আমারই সহযাত্রী। উভয়েই মহা খুসী। তিনি কিছুতেই আমাকে কাল যাইতে দিবেন না। অতি কষ্টে হাত এড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম। রাত্রে এক বিপর্য্যয় ভোজন ব্যাপার। পোলাও, মাংস, চপ্ ইত্যাদি—আজ আমার জন্মদিন বলিয়া গৃহিণী কাল আমায় আসিবার সময় আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু কথায় বলে "যারে যেত্রৌ মারে কে' আমার কপালে এ ভোজন ব্যাপার লেখা আছে সুতরাং গৃহিণীকে ত্যাগ করিয়া বন গমন করিলেও পোলাও কালিয়ার অভাব হইত না।

৪ঠা ডিসেম্বর—সকালবেলা উঠিয়া তাড়াতাড়ি ক্ষৌর-কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু আহারাদি করিয়া বাহির হইতে বেলা হইয়া গেল। কোনক্রমে হাঁটিয়া আসিয়া টিকেট করিতে যাইয়া দেখি যে একখানা ২৫৲ টাকার নোটের খাতা ফেলিয়া আসিয়াছি। মনটা খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু আর ফেরা যায় না। একখানা চিঠি বন্ধুবরের নামে গাড়োয়ানকে দিয়া ট্রেণে উঠিয়া বসিলাম। ট্রেণ ছাড়িবার সময় দেখি নোটের বইখানা আর এক পকেটে আছে। লাফাইয়া পড়িয়া গাড়োয়ানকে চিৎকার করিয়া ডাকিলাম কিন্তু উড়িয়া-প্রবর বখসিস্ পাইয়া তখন গাড়ী হাঁকাইয়া দিয়াছে। কটক হইতে চিঠি লিখিতে হইবে।

ভদ্রক স্থানটী বেশ। অধিবাসী প্রায়ই উড়িয়া, অতিশয় দরিদ্র। ব্যবসাদার সমস্তই মাড়োয়ারী। এ একটী সুতের মোকাম। খরিদ্দার প্রায় সমস্তই মাড়োয়ারী। এদেশে মাছ, মাংস ও দুধ সস্তা তরীতর-

মরিয়া না মরে তুর্কী এ কেমন ভেড়ী।

Muskete (Vienna)

কারী ও চাউল, ডাইল দুর্ম্মূল্য। একটী সুন্দর ট্রাঙ্করোড সহরের ভিতর দিয়া গিয়াছে। দূরে নীলগিরি বা নীলাচল সেখানে নাকি অসংখ্য বন্য জন্তু। পার্শ্বেই শুষ্ক গর্ভা সালঙ্কা। "সালঙ্কা" বোধহয় শৈলনন্দিনীর অপভ্রংশ।

পরের ষ্টেশন 'কেন্দুয়া পত্তা।' ছানার চাক বিক্রয় হইতেছে, বেশ সস্তা কিছু সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু ট্রেণ একেবারে কায়েমী মৌরসী পাট্টার বন্দোবস্ত করিয়াছে। প্রায় ১½ ঘণ্টার পর দয়া করিয়া চলিলেন। ইতিমধ্যে আমি বেশ এক নিদ্রা দিয়া উঠিয়াছি। আরও একেবার।

সুন্দর একটী গিরিনদী পার হইয়া ট্রেণ চলিল। অনেকে স্নান করিতেছে। অসংখ্য হনুমান জল বাঁধিয়া লাফালাফি করিতেছে। রাখাল বালকবালিকারা গরু ও ছাগল চরাইতেছে।

১৯৪ মাইলে একটী বড় নদী পার হইলাম। নদীগর্ভ শুষ্ক প্রায়। এটী বৈতরণী সুতরাং এবারে "যমের অধিকার" পার হওয়া গেল। এখন চারিদিকে দূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। বৈতরণী রোড ষ্টেশন পার হইয়া পাহাড় ক্রমে কাছে আসিতে লাগিল ছোট ছোট গ্রামগুলি ঘন বাঁশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জাজপুর রোডে বিপরীত দিক হইতে করুণ সুরে 'বাবু একটা পয়সা গুনিয়া' ফিরিয়া দেখি যে ৩৪টী নিতান্ত শিশু উলঙ্গ বালক বালিকা ঐরূপ করিতেছে। একটী পয়সা দেখাইয়া পুনরায় পকেটে রাখিতেই তাহারা আরও করুণ সুরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং উপুড় হইয়া বারবার নমস্কার করিতে লাগিল। তখন সকলকেই একটী করিয়া পয়সা বিলাম।

পাহাড়ের একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। আর যান ক্ষেত নাই দুই দিকেই শাল বন আর জঙ্গল। ২১৭ মাইলে একটী প্রকাণ্ড শুষ্ক গর্ভ নদী পার হইলাম। ডান দিকে অতি নিকটে পাহাড় কিন্তু জঙ্গল নাই।

আবার দুই দিকেই পাহাড় ও হরিতকী গাছের জঙ্গল। পাহাড়গুলি প্রস্তরময়। বাঙ্গালা ছাড়াইয়াছি। যে দেশের জলবায়ুর গুণে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত একটী মাটীর ঢিপি হইয়াছে সে দেশে এত ছোট পাহাড়ে পাথর থাকিত না। হরিদাসপুরে আর একখানি ট্রেণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহার জানালা দিয়া কয়েকটী কালো উড়িয়া মেয়ে মুখ বাহির করিয়া রহিয়াছে—লজ্জার চিহ্নও নাই। সম্মুখেই একটী প্রকাণ্ড পাহাড়। ক্রমশঃ

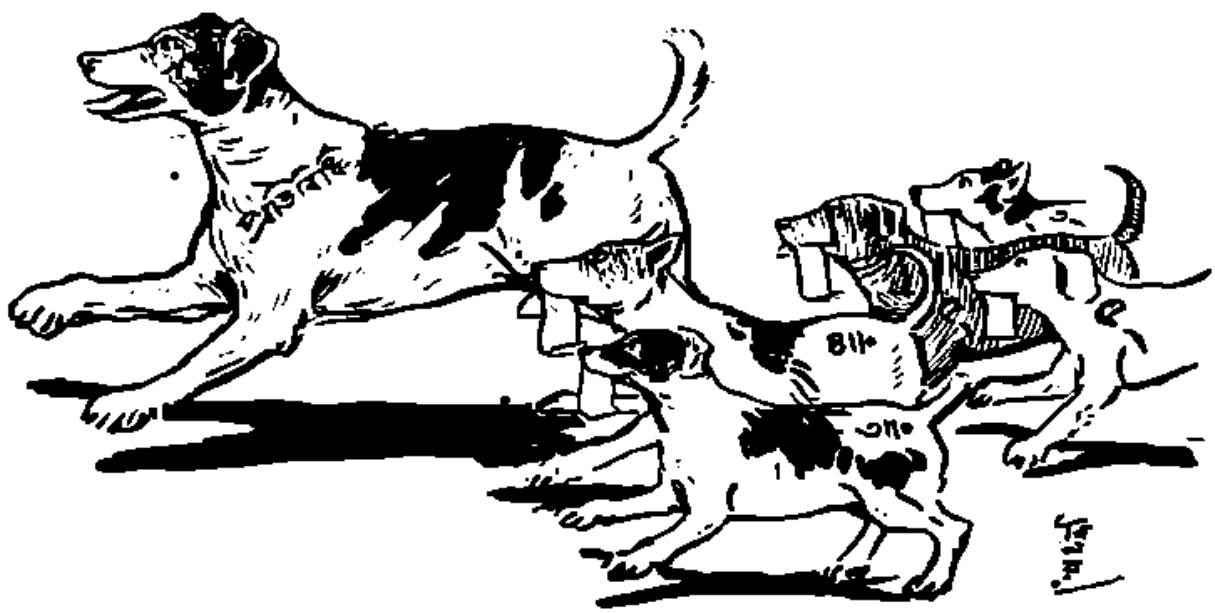

নেহাৎ অবুঝ! টেক্স দিলেই যে ভোটের অধিকার থাকতেই হবে—তার কোন মানে নাই—এ কথা আর গুরুর বোঝাতে পারলাম না। ঘেউ ঘেউ করে আর বলছে, দেবে ত দাও, নইলে পথে বসা দেখবে। সাধে কি আর লোকে এদের কুকুর বলে?

# জীবনের আলো

[ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ]

ফ্রান্সের সেন সভায় দাঁড়াইয়া গ্যাম্বেটা বক্তৃতা করিতেছিলেন—'আমার মতে ও রাজনীতিক কার্য্যে আমি জনসাধারণের আধিপত্যই স্থাপন করিতে চাহি।'

গ্যাম্বেটা।

অজ্ঞাত অখ্যাত যুবক আজ সেন সভার সর্ব্বপ্রধান বক্তা, সভায় তিল ধারণের স্থানও নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ানের সৌভাগ্য সূর্য্য তখনও উত্থানের পথে, এমন সময়েও গ্যাম্বেটার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমস্ত প্যারী সহর ভাঙ্গিয়া পড়িত। সেন সভা-গৃহে শুধু বক্তার বক্তৃতা ভিন্ন আর কিছুই শোনা যাইতেছে না। সভার প্রেসিডেন্ট, ডেপুটীরা, নারীরা সকলে স্পন্দহীন হইয়া বক্তার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। সুন্দর ভাবে হাত নাড়িয়া বক্তৃতা শেষ করিয়া গ্যাম্বেটা বক্তৃতা মঞ্চ হইতে নামিলেন। তখনও সভাগৃহ স্তব্ধ। তার পর নারীরা কথা কহিতে লাগিলেন—পুরুষেরা কথা কহিতে লাগিলেন। বক্তৃতার মোহ কাটিয়া গিয়াছে।

সভাগৃহের সকলেই যার যার স্থান হইতে উঠিয়াছেন। শুধু মাত্র একটি তন্বী সুন্দরী তখনও যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানেই বসিয়া আছেন, বক্তার যাদুকরী বক্তিবার তন্বী তখনও যেন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হল দিয়া যাইবার সময় গ্যাম্বেটা নারীর পানে কটাক্ষ করিলেন। গ্যাম্বেটা দিনের পর দিন কতদিন সেই সভা-গৃহে বক্তৃতা করিলেন। সেই রহস্যময়ী নারীও প্রতিদিন একই স্থানে একই আসনে বসিয়া বক্তার বক্তৃতা শোনেন—নারীর দৃষ্টি যেন গ্যাম্বেটার হৃদয় বিদ্ধ করে, গ্যাম্বেটার হৃদয় বিদ্ধ করে, গ্যাম্বেটা সে দৃষ্টির প্রভাব অনুভব করিলেন। সুন্দরীর সে দৃষ্টিও যেন রহস্য মণ্ডিত, সে দৃষ্টি ভাষা যে কি বলিতে চায় গ্যাম্বেটা তাহা বুঝিবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নিত্য বক্তার বক্তৃতা শুনিতে আসেন—একই ভাবে বক্তার পানে হৃদয়ভেদী দৃষ্টি হানিয়া বক্তৃতা শোনেন—কে এই রহস্যময়ী নারী! বক্তৃতা শুনিয়া নারী কি ভাবেন তাহা বুঝিবারও উপায় নাই। গ্যাম্বেটার মনে সহস্র প্রশ্ন ওঠে—কিন্তু কোন প্রশ্নের সমাধান তিনি করিতে পারেন না। নারী চরিত্র সম্বন্ধে গ্যাম্বেটা তেমন অভিজ্ঞ নহেন। কর্ম্মময় যোদ্ধার জীবন তাঁর, সমাজ বা সামাজিকতার ধার তিনি মোটেই ধরিতেন না। অবসর সময়ে বে-পরোয়া দলের কতকগুলি সঙ্গীকে তিনি "কেফ্ প্রকোপে" সাধারণ তন্ত্রের দীক্ষা দিতেন। বিশ্বের কাছে—দেশের কাছে এই তরুণ যুবা তখনও একটা রহস্যমাত্র। আপন চেষ্টায় আপন ক্ষমতায় শুধু তিনি উঠিতেছিলেন।

গ্যাম্বেটার জীবনের কৃতকার্য্যতাও ছিল অদ্ভুত। সামান্য ইটালীয় পিতামাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তেত্রিশ বৎসর বয়সের সময় গ্যাম্বেটা ফরাসী রাজনীতি ক্ষেত্রে অতি বিখ্যাত হইয়া পড়েন। এই তিরুপ রাজনীতিককে দেশবাসী দেবতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। সঙ্কল্পের প্রগাঢ়তাই ছিল ইহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রগাঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে অপূর্ব্ব সহৃদয়তা থাকাতে ইহার বক্তৃতায় সত্য প্রাণের স্পন্দন থাকিত ও তাহা হৃদয়গ্রাহী হইত।

ফ্রান্স গ্যাম্বেটার জীবনের অপেক্ষাও প্রিয় ছিল। তাঁহার সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা তিনি ফ্রান্সের কল্যাণেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যেন যুক্তিই যাহার জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত তাহার কুল ত্রুটিও হয়, গ্যাম্বেটার জীবনেও তেমন কুল হইয়াছিল কিন্তু ফ্রান্সে এমন যেন

লেখক বুঝি বা অতি অল্পই অবগ্রহণ করিয়াছেন। এমন দেশ প্রাণ পুরুষ জগতের ইতিহাসেও বিরল। দেশের জন্য মন প্রাণ সব অর্পণ করিয়া ইনি আসিয়াছিলেন, এবং অবশেষে তাহাতেই অমরত্ব হইয়াছিলেন।

করাসী সাধারণতন্ত্রের পত্তন গ্যাম্বেটাই করেন। গ্যাম্বেটার পেছনে এই রহস্যময়ী নারী শক্তি কতটা কার্য্য করিয়াছিল তাহাই আমরা দেখিব। তাঁহার প্রতি উচ্চ কল্পনার বন্ধু ও সঙ্গিনী ছিলেন এই নারী। এই নারীর অজস্র অগাধ ভালবাসা তিনি পাইয়াছিলেন। এই নারী বিশ্ব বিখ্যাত ক্ষমতাশালী রাজনীতিককে পূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার মনে আনন্দ ও নিরাশার উৎসাহ দিয়া তাঁহার প্রাণ শক্তিকে ইনি সঞ্জীবিত রাখিতে পারিয়াছিলেন।

গ্যাম্বেটাও এই নারীকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছেন, শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে গ্যাম্বেটা লিখিয়াছিলেন 'দেশ যদি আবার তার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পায়—তবে দেশবাসী এই নারীর মূর্ত্তি স্থাপিত করিবে ও শ্রদ্ধানত মস্তকে সেই নারীর সম্মুখে দাঁড়াইবে।

কিন্তু দেশ তাহা করে নাই। এবং সেজন্য গ্যাম্বেটা প্রণয়ী লিওনি ভুলীই হইয়াছিলেন। গ্যাম্বেটার জন্যই তিনি বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মান, মর্য্যাদা ও খ্যাতি ভিন্ন জীবনে তিনি আর কিছুই নিজের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। সেই ভাল বাসার জন্য সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠের মৃত্যুতে আর কি বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাঁহার হৃদয়ে।

প্রথম দর্শন হইতেই এই নারী গ্যাম্বেটাকে তাঁহারা হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। গ্যাম্বেটা কিন্তু একথা জানিতেন না, নিত্য কেন যে এই নারী তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন তাহাও তিনি বুঝিতেন না। গ্যাম্বেটা শুধু দেখিয়াছিলেন নারী সুন্দরী, অপরূপ সুন্দরী—অঙ্গের গঠন তাঁর অনুপম লাবণ্য মণ্ডিত, মুখে আত্মতার যেমন রক্তের উপর ঢেউ খেলান কালো কুন্তল রাশ! আর নীল নয়নদুটি—সে দুটি নয়নে তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। কি কি ভাষা এ চোখের—কেন সে এমন করে চায় বার বার—প্রতিভাশালী পুরুষের সহস্র চিন্তার মধ্যে এ চিন্তা সকলের উপরে দিবা নিশি মনে জাগিত।

কিন্তু এ ভাবে অপেক্ষায় অপেক্ষায় আর কতকাল থাকা যায়! একদিন বক্তৃতা দেবে গ্যাম্বেটা একখানি কাগজে কি লিখিয়া একজন লোক দ্বারা সেই রহস্যময়ী নারীর হাতে দেওয়াইলেন। কম্পিত চিত্তে তিনি পত্রের ফল দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রহস্যময়ী পত্র খানা হাতে লইয়া তাহা খুলিলেন। ধীরে ধীরে পত্রখানি পড়িয়া লেখকের দিকে একবারও না না চাহিয়া লিওনি পত্র খানি শত খণ্ড করিয়া ফেলিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। নারী তারপর আর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সে গৃহে আসেন না। গ্যাম্বেটা নিরাশ হইয়া গেলেন। তাঁহার বক্তৃতা আর যেন তেমন জমে না—গ্যাম্বেটা বুঝিতে পারিলেন জীবন পথে চলিতে এ রহস্যময়ী রমণী যেন তাঁহার অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। একজন বন্ধু যেন তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বুঝিত ও চিনিত, তাঁহার সেই সহানুভূতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টি হইতে আজ যেন তিনি বঞ্চিত। আজ আপনার দোষে এমন বন্ধুহারা তিনি হইলেন—হায় তাহাকে খুঁজিয়া পাইবারও তো উপায় নাই,—ফ্রান্সে যুদ্ধ লাগিবার উপক্রম—দেশ এখন তাঁহাকে চাহিতেছে, এ সময়ে নারীর সন্ধানে ফিরে হইলে তাঁহার চলিবে কি করিয়া?

গ্যাম্বেটা যুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। যুদ্ধে তাঁহার মত নাই। কিন্তু দেশ সম্রাটের শক্তিতে অতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল। বিপদের পর বিপদ আসিতে লাগিল, লুলাইয়ের মধ্য ভাগে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও আগষ্টের শেষেই তৃতীয় নেপোলিয়ান সিদানে আত্ম সমর্পণ করিলেন, ব্যাজেইন সৈন্য বল মেজে আটক পড়িলেন—প্রুশিয়ানেরা প্যারীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মান অভিমান, দল বিরোধ দেশের বিপদে গ্যাম্বেটা সকলই ভুলিয়া গেলেন। ফ্রান্স যদি সমরে বিজয়ীও না হয় তবু তাহার সম্মান অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। শত্রুর হাতে প্যারী সমর্পণ কখনও হইতে পারে না। গ্যাম্বেটা প্রাণপণে শত্রুকে বাধা দিতে লাগিলেন কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না—শত্রুসৈন্য চারিদিক হইতে প্যারী নগরীকে চাপিয়া আসিয়াছে। এমন বন্দী অবস্থায় নগরে থাকিয়া আর কোন ফল নাই দেখিয়া গ্যাম্বেটা বেলুনে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিয়া দক্ষিণ ফ্রান্সে সৈন্য সংগ্রহে নিয়োজিত হইলেন।

এই সময়ে ব্যাভাইন যদি যোগ দিতেন তবে গ্যাম্বেটা প্যারীর মুক্তিবিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সাধারণতন্ত্রের লোক এবং যিনি রাজাকে প্রত্যাহরিত করিয়াছেন ব্যাভাইন তাহার সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করিলেন। এইভাবে প্যারীর পতন হইল।

এইভাবে প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্টের সময়েও জাতীয় অধিবেশনে গ্যাম্বেটা যখন এলসাক, লোরেন ত্যাগের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন পুনরায় সেই রহস্যময়ী নারীকে তিনি শ্রোতার মধ্যে দেখিতে পাইলেন। নারীকে যেন আজ পূর্ব্বের চেয়েও সুন্দরী বোধ হইতেছিল। রহস্যময়ী নারী বক্তার প্রতিটি কথা মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন। গ্যাম্বেটা প্রাণ ভরিয়া তাহাকে একবার দেখিলেন—তাহার হৃদয়ের বন্ধ দ্বার যেন মুক্ত হইল, গ্যাম্বেটার বক্তৃতার উৎস খুলিয়া গেল।

গ্যাম্বেটা সেদিন ভাবিলেন, কি রহস্য এই নারীর যে এ ধরা দিয়াও ধরা দিতে চায় না। এবার যখন আবার সুন্দরীর সাক্ষাৎ মিলিয়াছে তখন যেমন করিয়াই হউক এ রহস্য ভেদ করিতেই হইবে। বক্তৃতা শেষে গ্যাম্বেটা রহস্যময়ী সুন্দরীকে পুনরায় ছ'ছত্র লিখিলেন। 'অবশেষে আবার একবার তোমায় দেখিলাম—একি সত্যই তুমি?'

এই ছ'ছত্র পড়িতে পড়িতে নারী হাসিলেন। হাসিয়া পত্রপাঠ শেষ করিলেন। কিন্তু প্রার্থনা যেন নারী শুনিলেন না—একটি ইঙ্গিত না করিয়া সুন্দরী পূর্ব্বের মতই উঠিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহ ছাড়িয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী এবার চিঠিখানি নষ্ট না করিয়া পরিচ্ছদের ভিতর রাখিয়া দিলেন। গ্যাম্বেটা তাহাও লক্ষ্য করিলেন। মনে আশা—এবার দেখা হইবে, আশা সফল হইবে। কিন্তু রাজদ্রোহ বিপ্লবে দেশ তখন ছাইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের যে অবস্থা ছিল তখনকার অবস্থা তার চেয়েও ভীষণ, ফ্রান্স যেন নিজেকে হত্যা করিবার জন্য নিজেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কাহারও সঙ্গে কাহারও মতের মিল নাই—চারিদিকেই একটা অশান্তি উত্তেজনার ভাব!

বলতা স্বীকার করিব না এই দল গ্যাম্বেটার নেতৃত্বে তখন যুদ্ধ চালাইবার উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু মুঁসো খেয়ালের বশে যে কোন মূল্যেই হউক শান্তির প্রার্থনা করিতেছিলেন। অবশ্য শান্তি বিষয়ে মুঁসো খেয়ালের মতই ঠিক কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধবাদী দলও প্রবল ছিল। তাই কিছুকালের জন্য মনে হইয়াছিল ফ্রান্সে অন্তর্বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। নিজের মতও দলের বিরুদ্ধনীতি হইলেও গ্যাম্বেটা এ অন্তর্বিপ্লব অপেক্ষা আর যাহা কিছুই পছন্দ করিতেন। তাই গ্যাম্বেটা প্রকৃত দেশ প্রাণের মত নিজ মত বিসর্জন দিয়া কর্ম্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মুঁসো খেয়ালকে নেতৃত্ব দিয়া অজ্ঞাতবাস লইলেন।

পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গ্যাম্বেটা আর প্যারীতে আসেন নাই। তারপরে আবার কর্ম্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া গ্যাম্বেটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ও হৃদয়ের দেবীকে সেই রহস্যময়ী সুন্দরী লিওনিকে পাইয়াছিলেন।

একদিন গ্যাম্বেটা এক বন্ধুর অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া বন্ধুকে দেখিবার জন্য তাহার গৃহে গিয়াছিলেন। গ্যাম্বেটার বন্ধুকে দেখিবার জন্য সহরের অনেকেই আসিয়াছিলেন। গ্যাম্বেটা পরিচিত মুখের জন্য চারিদিক চাহিতে সেই অতি পরিচিত রহস্যময়ী সুন্দরীর মুখখানি দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য আঁখিতে আঁখির মিলন হইল—দু'জনাই দু'জনার প্রাণের গোপন কথা বুঝিতে পারিলেন। প্রাণের টান আর গোপন রাখা চলিল না।

অন্যান্যের মত গ্যাম্বেটা নারীর পাশে গিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু হৃদয় যে ভাষা বলিবার জন্য আজ কতদিন হয় আকুল অধীর সে ভাষা যেন আর বাহির হয় না। অবশেষে গ্যাম্বেটা বলিলেন 'আপনি যেখায় একাকী থাকবেন সেথায় আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার সঙ্গে আমি আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারি কি?" এ অনুরোধ অস্বীকার করার সুযোগ তিনি আর নারীকে দিলেন না। এক সঙ্গে উভয়ে বন্ধুর গৃহের বাহির হইলেন—গ্যাম্বেটা লিওনিকে কহিলেন 'আমার চিঠি দু'খানি তুমি এভাবে উপেক্ষা করলে কেন?'

নারী কোন উত্তর করিলেন না।

গ্যাম্বেটা বলিলেন 'তুমি কি মনে কর—আমি তোমার সঙ্গে খেলছিলাম? তুমি কি জান না আমি তোমায়

কত ভালবাসি। কত বছর থেকে তোমায় কত ভালবেসে আসছি ?'

লিওনি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন 'থাম—কি বলছ সে তুমি জান না। আমি তোমার যোগ্যা নই, তোমার সঙ্গিনী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। ভালবাসার কথা আমায় বোলো না তুমি।'

এই বলিয়া রহস্যময়ী বিদায় লওয়ার উপক্রম করিলেন। গ্যাবেটা সুন্দরীর হাত দু'খানি ধরিয়া বলিলেন 'এ ভাবে তুমি আমায় ছেড়ে যেতে পারবে না—আমার কথা শুনবে তুমি, শুনতে হবে তোমায় !'

গ্যাবেটাকে না-ছোড় দেখিয়া নারী হাসিয়া বলিলেন 'বেশ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। একদিন আমার কথা তোমায় বুঝিয়ে বলবো। আমার দুঃখের কাহিনী শুনতে পাবে তুমি। তখন সব বুঝতে পারবে।'

'কিন্তু কখন, বল আমায় ? তোমার বাড়ী যাব কি ?' লিওনি বলিলেন 'না—কখনো না। আমার বাড়ীর পাশে তুমি যেও না। কাল সকালে যেখানে কেউ দেখবে না—তেমন কোন জায়গায় আমরা দু'জনে মিলিত হব।'

সকাল আটটায় ভার্সেলিসের পার্কে দু'জনার মিলনের কথা ঠিক হয়ে গেল। গ্যাবেটা পরদিন প্রাতে বহু পূর্বে ফিরে বান্ধিতার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষী হয়ে পার্কে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আটটা বাজিবার অনেকক্ষণ পরে সুন্দরীকে আসিতে দেখিয়া গ্যাবেটার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। নারী তাহার জীবনের গোপন দুঃখের কথা কি বলিবেন গ্যাবেটা তাহার মুখ দেখিয়া পূর্বেই কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন। নারী যখন তাহার দুঃখের কথা বলিতেছিলেন গ্যাবেটা বিষণ্ণচিত্তে তাহা শুনিতেছিলেন।

লিওনি বলিলেন 'তাঁহার পিতা সৈন্যদলে কর্ণেল ছিলেন। আত্মহত্যায় তিনি জীবন শেষ করেন। বন্ধুহীন অসহায় ভাবে তিনি এই কন্যাকে রাখিয়া যান। নারী স্বাধীন ভাবে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ইত্যাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সরলা বালিকা মাত্র। সংসারে সৌন্দর্য্যের শত বিঘ্ন—'এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নারী চক্ষে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গ্যাবেটা অসহায়া নারীর করুণ কাহিনী সবই বুঝিতে পারিলেন। গ্যাবেটা মনে করিলেন, অপরাধিনী এ সুন্দরী নহ—অপরাধ পুরুষ সমাজের! গ্যাবেটা সুন্দরীকে জয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু নারী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন 'এখন যাও। তুমি আমায় বিয়ে করতে পারবে না। তোমার এখন পত্নী আসবে যাকে নিয়ে সমস্ত জীবন সৌরযান্বিত হবে। এই তোমার কর্ত্তব্য—আমারও তোমার উপর কর্ত্তব্য আছে—সে কর্ত্তব্য তোমার আশা ত্যাগ করা। আমার কর্ত্তব্যকে আমার পক্ষে আরো কঠোর কোরো না।'

এ ভাবের কর্ত্তব্যপালনে গ্যাবেটা কিন্তু রাজী ছিলেন না। তিনি সুন্দরীর বাধা আপত্তি কোন কিছুতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুন্দরী গ্যাবেটার বন্ধু হইতে স্বীকার করিলেন এবং প্রতিদিন প্রাতে তাসে লিসের বাগানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন বলিলেন। এ সাক্ষাৎ গ্যাবেটার পক্ষে কত স্পৃহনীয়, আনন্দের! এই বুদ্ধিমতী নারীর উপদেশ কয়াসী সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার জীবনে কত কার্য্যকরী হইয়াছিল! লিওনিকে গ্যাবেটা সকল গোপন কথা বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। চিঠিতে লিওনিকে গ্যাবেটা লিখিয়াছেন 'তুমি স্বর্গের দেবী—দেবীর অনুগ্রহ পেয়ে আমি জগতের মধ্যে সবচেয়ে সুখী। আমার সবই তোমার—আমার কাছে ছোট তুমি কিছুতেই নও—তুমি আমার দেবী !'

কিন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যে এ ভাবের বন্ধুত্ব বেশী দিন চলিতে পারে না। তাহা হইলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় হয়। বন্ধুত্ব তো তাহাদের দু'জনার মধ্যে বন্ধন নয় বরঞ্চ তাহা বাধা। বৃথাই সুন্দরী এ বন্ধুত্বকে বন্ধনরূপে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভালবাসার বন্ধুর পরশে এ বাধা অচিরে দূর হইয়া গেল।

তাঁহাদের সাক্ষাতের স্থানে সুন্দরী লিওনি একদিন গ্যাবেটার আগে আসিলেন। গ্যাবেটা তো রোজ তাঁহার আগে আসেন। তবে তো গ্যাবেটার কোন বিপদ হয় নাই। সুন্দরী চিন্তিত হইলেন। একটু অপেক্ষা করিতেই দেখিতে পাইলেন গ্যাবেটা আসিতেছেন। কিন্তু নিত্য গ্যাবেটা যেমন হাসিভরা মুখে তাঁহার দর্শনে আসেন, আজ তো এ মুখ তেমন নাই। এ মুখ যেন গম্ভীর, কঠোর। লিওনির সম্মুখে আসিয়াই সে মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গ্যাবেটা সুন্দরীর

দিক একগোছা ফুল লিওনির হাতে দিলেন। গ্যাবেটা কহিলেন—

'লিওনি এইমাত্র এ ফুলগোছা আমি তুলে এনেছি। তুমি নেবে কি? আর সেই সঙ্গে আমারও গ্রহণ করবে কি? লিওনি আমায় তোমায় গ্রহণ করতেই হবে, আর আমি অপেক্ষা করতে পারি না!'

লিওনি আর তাঁহার প্রেমিককে বাধা দিতে পারিলেন না। গ্যাবেটা বলিলেন 'তবে চল এখনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাই—।' কিন্তু এ ভাবের বিবাহে লিওনির আপত্তি ছিল, তাঁহার ইচ্ছা গীর্জ্জায় বিবাহ হয়। কিন্তু গ্যাবেটার গীর্জ্জায় বিবাহে আপত্তি। তখন গ্যাবেটা বলিলেন 'তবে আমাদের বিয়ে এখনই প্রাচীনকালের রীতি অনুযায়ী হোক। এই আমার আংটির অনুরীয় কিন্তু এর উপরে আমার নামই খোদা আছে। এই আংটি আমি তোমায় দিচ্ছি।' লিওনি অনুরীয় গ্রহণ করিলেন।

এইভাবের গোপন বিবাহের পর দীর্ঘ ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল। গ্যাবেটা ক্রমেই দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন। এই বিবাহ ব্যাপার লইয়া কখনো কোন আলোচনা বা আন্দোলন হয় নাই। সুকৌচুরিতে কিছু করিলে তাহাতেই লোকের মনে সন্দেহ আসে। লিওনি ও গ্যাবেটা প্রকাশ্যেই দেখা শুনা করিতেন। গ্যাবেটা নানা উচ্ছ্বসিত প্রণয় লিপিতে পত্নীকে তাঁহার প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন বেশ সুখেই যাইতেছিল শুধু গ্যাবেটার মনে এক দুঃখ এমন প্রেমময়ী গুণবতী পত্নী পাইয়াও প্রকাশ্যে তাঁহাকে পত্নী বলিয়া জানাইবার ক্ষমতা নাই।

যত দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহারা উভয়ে উভয়ের অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। গ্যাবেটা তখন ফরাসী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সন্তান, চেম্বারের প্রেসিডেন্ট। বন্ধুবান্ধবের বাড়ী ভোজ হয় গৃহকর্ত্রী সকলের তত্ত্বাবধান করেন, কিন্তু গ্যাবেটা সে সুখ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত।

গ্যাবেটা এই সময়ে তাঁহার পত্নীকে লিখিতেছেন আমার সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ কর। তোমার পুষ্পগুচ্ছের সকলেই প্রশংসা করেছে। এ সময় তোমায় ছাড়া সব উৎসবই আমার কাছে মিথ্যা বোধহয়।' ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সত্যই এই রহস্যময়ী নারী গ্যাবেটার গৃহকর্ত্রী হইয়াছিলেন। সা জাস্তিন নামে একটি ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহারা বসবাস আরম্ভ করেন। ডিসেম্বর মাসে তাঁহাদের প্রকাশ্যভাবে বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে গ্যাবেটা তাঁহার পাঠককে পিস্তল লইয়া খেলিতেছিলেন এমন সময়ে পিস্তলের একটি গুলি তাঁহার হাতে লাগে। এই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আজ লিওনির সব শেষ। একাকিনী অসহায়া নারী যেমন ছিলেন আবার তেমনি হইলেন। গ্যাবেটার মৃতদেহের শয্যিনী পর্য্যন্ত তিনি হন নাই। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি দেশ তাহার সম্মান করিবে। কিন্তু লিওনির মন আজ দুঃখে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। যাহাকে সমস্ত ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁহাকে বিবাহ করিয়া গৌরবান্বিত করিতে চাহিয়াছিলেন কেন—কেন তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। আজ তাঁহার মৃত্যুতে সব কথাই স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িল। নিষ্প্রাণ দেশসেবকের গাত্রে তাহার অশ্রুই শুধু কণক স্পর্শ হইল। স্বামীর নিজ হাতে লেখা, 'জীবনের আলো আমার, জীবনের ধ্রুবতারা আমার—লিওনি লিওন' ফটোগ্রাফখানি চোখের সম্মুখে রাখিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সেই রহস্যময়ী নারী তাঁহার রহস্যময় জীবন-লীলা সম্বরণ করেন।

নব বসন্তে

প্রিয়জনকে উপহার দিতে; শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের অ্যাইডিক্যাল ব্রীজেন্সিয়াল এবং মেসিন প্রস্তুত—চন্দন, বকুল, মাল্য ও অডেলেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী

৬৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।　　টেলিফোন ২৪২৬

# মীরাবাই'র কবিতা।

[ শ্রীরমেশ বসু এম্ এ ]

মীরাবাইর কবিতা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই দেখা যায় যে তাঁহার জীবনের সঙ্গে কবিতার সুরের মিল আছে। সারা জীবনের সাধনার বাণীটিকেই তিনি তাঁহার কবিতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জীবনের সুখদুঃখের বিচিত্রতার এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাঁহার গান মনের গোপন উৎস হইতে আপনি ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহার জীবনের বিশিষ্টতাই তাঁহার বাণীকে গানের রূপ দিয়াছে। ভারতবর্ষে বহু রমণী ধর্ম্মের জন্যই জীবনের সফলতা কামনা করিয়াছেন, কিন্তু কে এমন গৃহ ও প্রিয় ছাড়িয়া প্রিয়-তমের আরতির জন্য জীবনকে দীপের মত জ্বালাইয়াছে ও ধূপের মত পোড়াইয়াছে? এই আন্তরিকতার জন্যই মীরার কবিতা মানুষের মনে উপযুক্ত আসন পাইয়াছে। সারা ভারতবর্ষের মহিলা কবিদের মধ্যে তাঁহার সমান বোধ হয় আর কেউ নাই।

অনেকে বড় বড় কবির জীবনের বেশী ঘটনা আমরা জানিতে পাই না, কিন্তু তাঁহাদের জীবন ও কাব্য জাতির মনে যে ছাপ রাখিয়া যায়, তাহা হইতে সাধারণ লোকে গল্প তৈরি করে। এই সব গল্প ঠিক ইতিহাস না হইলে ও সত্য, কারণ উহাতেই কবিদের অন্তরের ইতিহাস জানা যায়। মীরা সম্বন্ধে ও এইরূপ গল্প আছে। ছোটবেলায় এক পাড়াপড়শী মেয়ের বর দেখিয়া মীরা তাঁহার মাকে নিজের বরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আর মা হাসিয়া বাড়ীর 'গিরধরলালের' মূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এই গল্পটির মধ্যে তাঁহার সমস্ত জীবনের ও কবিতার মূল সুরটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মীরাবাইর কবিতার জড়তা কি জটিলতা মোটেই নাই, ভাষা আর ভাব খুব ঝরঝরে। প্রাণের ভিতরের কথাগুলি বিনা আড়ম্বরে অতি সহজেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বাপের ও শ্বশুরের বাড়ী ছিল রাজপুতানায়, তিনি রাজপুতনার মুখের ভাষাতেই গান রচনা করিয়াছেন। তবে দেশে নানা জায়গায় ঘুরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কবিতায় অন্যপ্রদেশের শব্দ ও দেখা যায়। রাজপুতানার উচ্চারণের বিশেষ কায়দাটি ধরিতে পারিলে, আর সেখানকার চলিত ভাষার বিশেষ কতকগুলি নিয়ম জানিলে মীরার কবিতা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাঁহার কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার আপন পথ কাটিয়া লইয়াছে, কোন নিয়মের দোহাই মানে নাই।

আমাদের দেশে সাধনা ও সঙ্গীত একে অন্যের সাহায্য করিয়াছে। অনেক জায়গায় কবি আর সাধক একই ব্যক্তি। মীরার কবিতায় যোগীর জ্ঞান সাধনা আর প্রেমীর ভাব সাধনা এই দুই ধারা একত্র মিলিয়া গিয়াছে দেখা যায়। তবে তাঁহার জ্ঞান ও প্রেমে কিছু বিশেষত্ব আছে। তিনি একদিকে কবির, সাধু প্রভৃতির মত সূফীদের প্রভাবে বিশেষ করিয়া জ্ঞান লইয়াই থাকেন নাই, আরেক দিকে তাঁহার বৈষ্ণবতার রাধা-ভাব ও তেমন বিশিষ্ট ভঙ্গি পায় নাই। তাঁহার কবিতায় নিজের অনুভবের কথাই আছে, তিনি জ্ঞানীদের মত তত্ত্বোপায় লইয়া বাহির হন নাই, আর বৈষ্ণবদের মত হৃদয়কে রাধা কল্পনা করিয়া লইয়া মনোবিজ্ঞানের ছায়াবাজী দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই।

মীরার সমস্ত কবিতার মধ্যে বিরহ আর প্রতীক্ষার কবিতা গুলিই খুব সুন্দর, এবং এ গুলির ভাব আমাদের মনকে স্পর্শ করে। যে আবেগ ও আকুলতার সঙ্গে তিনি গান গাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস বর্ণে বর্ণে জড়াইয়া রহিয়াছে বেশ বোঝা যায়। চিরবিরহের অনন্ত বেদনায় তাঁহার হৃদয়ের তার কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে—সে সুর বই বন্ধ করিলে ও মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়।

প্রেম ও দুঃখকেই বরণ করা। তাই মীরাকে অন্তরে বাহিরে, ঘরে পরে কত দুঃখই না সহিতে হইয়াছে। এ দুঃখ ত যাইবারও নয়, জীবনের সবটাই যে প্রেম দিয়া ভরপুর। মিলনের আশাতেই মীরা কত কত এই বিরহের বেদনা বরণ করিয়া আসিয়াছে। দুঃখের

কিরণ-পাতেই তাঁহার হৃদয়ের শতদল অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

বিরহের অশ্রুজলে যে লতা পুষ্ট হইয়াছে তাহার ফুল ধরিয়াছে মিলনে। সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, প্রেম হৃদয়ের কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, চিরবিলনের আশায় সকল উচ্ছ্বাস থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু মীরার ত মিলনেও শান্তি নাই! প্রিয়ের দৃষ্টি তাঁহাকে "বেহাল" করিয়া তোলে, সমস্ত শরীর ও মনে কি এক মাদকতা আনিয়া দেয়, তার উপর আবার হারাইবার ভয় ত আছেই!

মীরা যখন আপনাকে নিঃশেষে প্রিয়ের জন্য বিলাইয়া দিয়াও তাঁহাকে পান নাই, তখন তাঁহার মনে অভিমান আসিয়াছে। কিন্তু অভিমান লইয়াও ত থাকা যায় না, প্রিয়কে না হইলে যে জীবনই ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই আবার তাঁহাকে সাধিতে হইয়াছে। মিনতির বুকফাটা ক্রন্দনে মীরার মন আরও বেশী উতলা হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আত্ম-নিবেদনের সুর আরও বেশী করুণ হইয়া বাজিয়াছে।

প্রিয়ের ডাক শুনিয়া মীরার মন নাচিয়া উঠিয়াছে, লজ্জা, ভয় কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। সমাজের রীতি আর রাজকুলের মর্য্যাদা মনের বেগের কাছে কোথায় পিছাইয়া পড়িয়াছে তার ঠিক নাই। মীরা 'দিবানী' হইয়া ছুটিয়াছে, তার মন প্রিয়ের 'রঙে' রঙিন হইয়া গিয়াছে, সে যে আজ 'মগন' প্রেমের যাত্রী। প্রিয়হীন দেশ আর ভাল লাগে না, তাই পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, সখী ও স্বামীকে ছাড়িয়া পথের সব বাধা বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া চলিতেই হইয়াছে।

খুঁজার সন্ধানে ও আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ আসিয়া উঠিলে, মন আর ছোট ছোট জিনিষে তৃপ্ত হয় না। সংসার বন্ধনের পাক হইতে মনকে খুলিয়া লইয়া বৈরাগ্যকে 'সহজ' করিবার চেষ্টা আসিয়া পড়ে। কখন যে প্রিয়ের আগমন হইবে তাহা ত জানা নাই, সেই জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়, আরতির ডালা সাজাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মীরা যেখানে 'লুকোচুরি' খেলার জন্য সাজিয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিতার মধ্যে সব চেয়ে উঁচু স্থান পাইবার যোগ্য। এই খেলা চির-কালের বিশ্ব-রাস-লীলা। এই খেলায় মানুষ বাহিরের আবরণ ফেলিয়া দিয়া বিশ্বের সমস্ত জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-লীলায় যোগ দেয়। ক্রমে ক্রমে বিশ্বের সব জিনিষ সরিয়া যায়, চন্দ্র সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু, কিছুই আর থাকে না। কেবল "অটল রহে অবিনাসী," আর মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহার রাস-লীলা চলিতে থাকে।

মীরা প্রেমের আকর্ষণে স্থির থাকিতে পারে না, আবার প্রিয়ের সম্মুখে তাহার ইন্দ্রিয় বিবশ হইয়া পড়ে, মন বিচিত্র হইয়া যায়। প্রিয়ের রূপ দেখিলে, অঙ্গ স্পর্শ করিলে, অথবা শব্দ শুনিলে তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে। লোক পরলোকের কথা সব সে ভুলিয়া যায়, প্রিয়ের প্রত্যেক অঙ্গের ভঙ্গিতে নিজেকে বলি দিয়া তবে সে রক্ষা পায়। যখন সে প্রিয়কে পায় নাই তখন তাঁহার নামটিকেই সম্বল করিয়া সে বাঁচিয়া থাকে। এই 'অঘোলক' বস্তুটিই তাহার সকল সুখ-দুঃখের ধন। প্রিয়ের সাক্ষাতে শিহরণ ও অসাক্ষাতে 'সুমীরণ' তাহার প্রেমকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে।

প্রিয়কে না পাওয়ার দুঃখ, এবং প্রিয়ের মিলনের সুখ তবু সওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাকে পাইতে না পাইতেই হারাইয়া ফেলিলে সে দুঃখ ত আর সয় না! প্রিয়ের এই লুকোচুরি মীরাকে যে পাগল করিয়া তোলে! যখন সে ঘুমে থাকে তখন প্রিয় আসিয়া যাচিয়া দেখা দেয়, কিন্তু চোখ মেলিয়া চাহিতে না চাহিতেই তাঁহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রকৃতির নানা সময়কার নানা রকম রূপ মীরার মনে প্রিয়ের কথাই জাগাইয়া রাখে। বরষার সরসতা ও বসন্তের সজীবতা যেন তাঁহারই প্রাণের সুরে গাঁথা। প্রিয়কে না পাইলে প্রকৃতির হোলীখেলায় মীরার মন মাতিয়া ওঠে না, আর বাদলের ঘটা ত কেবল তাহার চোখের জলেরই বান ডাকায়। প্রিয়ের আগমনে বসন্তের সমস্ত সৌরভ ও সৌন্দর্য্য মীরার মনে সাড়া দেয়, আর বরষার ঘনঘোরের অশ্রান্ত বর্ষণে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া ওঠে। প্রিয়ের সঙ্গে তাঁহার মিলন হইলেই তাঁহার সমস্ত দেহ মন প্রকৃতির লীলায় যোগ দিতে পারে।

মীরা সমাজ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পূজা-

পদ্ধতিও ছাড়িয়াছেন। বহু দেবতার পূজা ছাড়িয়া তিনি 'আদি অনাদি' কে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। যে দেবতা শুধু পূজা চায় আর বাহিরের আয়োজন চায় তাহাকে তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি হৃদয়ের দেবতাকে অন্তরের ও ইন্দ্রিয়ের উপচারে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়াছেন।

বৈষ্ণবদের সাধনায় কয়েকটি ভাবের স্তর আছে। কোন বিশেষ কবির রচনায় ইহার কোন বিশেষ স্তরের ভাব বেশী মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা দেশের বৈষ্ণবদের 'মধুর ভাব' মীরার কবিতায় পাওয়া যায় না। মীরার মধ্যে রাধার আত্মভোলা 'ভাব' এবং নিজের প্রেমের জোরে প্রিয়কে সমান বা হীন মনে করার লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি নিজেকে সাধারণতঃ 'দাসী' এবং কোন সময় 'দাসী' বলিয়াছেন, কদাচিৎ ঈশ্বরকে পতি কল্পনা করিয়াছেন। তিনি গোপীর মত প্রিয়তমকে পূজা ও স্তব স্তুতি করিয়াছিন। তাই নাভাদাস তাঁহার প্রেমকে 'সদরিস গোপিন প্রেম' বলিয়াছেন। বাংলার বৈষ্ণবের কাছে রাধা ভাব এবং গোপী ভাবের মধ্যে অনেকটা তফাৎ আছে। মীরাবাই গোপীদের মত সংসারের সব কিছু ভুলিতে পারিয়াছেন, কিন্তু রাধার মত নিজেকে ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই।

এতদূর পর্য্যন্ত মীরার কবিতায় প্রেমের দিকের কথাই বলা হইল। জ্ঞানের দিকে তাঁহার কবিতা ভারতবর্ষের চিরকালের কথাই বলিয়াছে। বেদান্তের মায়া, গীতার আত্মবাদ, জীবনের ও পৃথিবীর নশ্বরতা দুঃখবাদ কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ কোন কথাই বাদ যায় নাই। এই সকল বিষয়ের জন্য মীরার কবিতার মাধুর্য্য অনেক সময় ততটা উপভোগ করা যায় না। প্রেমিকের মুখে জ্ঞানীর এই বাণী হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে অনেকটা দমাইয়া দিয়াছে।

মধ্যযুগের সাধকদের মত গুরুবাদের কথাও মীরার কবিতায় খুব প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। গুরুর প্রতাপও প্রভাবের কথা বলিতে মীরা কখনও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার গুরু রৈদাস জাতিতে চামার ছিলেন, তাঁহার প্রশংসা তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন। মীরা যে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার এক প্রমাণ এই যে তিনি চামার জাতীয় গুরুর জ্ঞানকে আপনার কাজে লাগাইয়াছিলেন। রৈদাস কিন্তু ছিলেন রামভক্ত, মীরা কৃষ্ণকে পূজা করিতে যাইয়া তাঁহাকে গুরুর পদে কেন বসাইলেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মীরার গান ও কবিতা লোকের মুখে মুখে নানা জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাই তাঁহার রচনার সঙ্গে অন্যের রচনাও জড়াইয়া গিয়াছে। কোন কোন রচনার ভাব মীরাবাইর কবিতার মূল সুরটির সঙ্গে যেন ঠিক মেলে না। মীরার প্রেমের মাহাত্ম্য না বুঝিয়া হয়ত কোন লোক তাঁহার নামে এমন সব গান ও কবিতা রচনা করিয়াছে যাহাতে মীরার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করে। নানা জনে চেষ্টা করিয়া নানা জায়গা হইতে তাঁহার কবিতা সংগ্রহ করিয়া মিলাইয়া লইলে কোনগুলি তাঁহার আসল কবিতা তাহা ঠিক করা খুব সহজ হয়।

---

## মানুষের মন

( ব্রহ্মদেশের ছড়া )

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

চরে অতল সলিলে মৎস্যগুলি,
ওড়ে আকাশের নীলে পাখীর সারি ;
মোরা বড়শী বিঁধিয়া মাছ যে তুলি',
আর শরের আঘাতে পাখী যে মারি।
মোর মানুষের মন নয়নে-ধূলি,
যাই যতই নিকটে ধরিতে নারি।

---

## জ্ঞানের বিকাশে

[ শ্রীকালিদাস রায়, বি,এ, কবিশেখর ]

যৌ যৌ তারা জন্ম যপে
যৌ যৌ উদ্ভেল সুর,
যৌ যৌ ছিন্ন কর্ম্মবশ-ভোগে,
যৌ যৌ জ্ঞান ন পূর।
কবীর।

জপ জপ করে তারা গগনের তালে,
যতক্ষণ ভানু নাহি জাগে চক্রবালে।
ততক্ষণ করে জীব কর্ম্ম কোলাহল
যতক্ষণ নাহি জাগে প্রজ্ঞান অমল।
জাগিলে সে পূর্ণ জ্ঞান কর্ম্ম যায় ডুবে
তারা যথা হারা, রবি জাগে পূর্ব্বে।

# স্মৃতি মন্দির

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙিতেই কামনা ধীরে ধীরে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। মুকুল তখনও নিদ্রাময়। পূর্ব দিকের খোলা জানালা দিয়া একটা ঘোলাটে রঙের আলো আসিয়া বিছানার কতকটার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই আলোকেই কামনা মুকুলের সুপ্ত মুখ খানির দিকে চাহিয়া দেখিল। কেন যে মুখখানিকে তাহার রক্তলেশহীন শুষ্ক দেখাইল কামনা তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল, মুকুল যখন শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল তখন তাহার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি কি অপূর্ব শ্রীই না ধারণ করিয়াছিল! রাত্রের মধ্যে এমন কি হইল যে মুকুলকে এমন শ্বেত পাংশু করিয়া দিল!

নিদ্রাভঙ্গে যে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা সঞ্চয় করিয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছিল, কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই তাহা বিলুপ্তিত হইয়া আবার কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। বড় দুঃখের সহিত মনে পড়িল সুশান্তকে সে বলিয়াছিল শীঘ্রই সংবাদ জানাইবে কিন্তু আজ পাঁচদিন কাটিয়া ছয় দিন আরম্ভ হইল, কোন সংবাদই সে তাহাকে দিতে পারিল না। সুশান্ত বাড়ী বদলাইয়াছে কি-না কে জানে, বদলাইয়া থাকিলেও নিশ্চয়ই পূর্বের বাসায় এমন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে যাহাতে চিঠি পত্রগুলি নূতন ঠিকানায় পুনঃ প্রেরিত হয়। সেখানে হয় ত সে রোজই এই পত্রখানির আশায় অধীর হইয়া পড়ে; হয় ত রোজই আকুল আগ্রহে পত্রবাহকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, রোজই তাহাকে হতাশ হইতে হয়। হয়ত আজ পর্য্যন্ত সে কোনরূপ কর্মের সন্ধান করিয়া লইতে পারে নাই, হয়ত তাহার দিন চলা দায় হইয়া পড়িয়াছে, হয়ত সত্যই তাহার দিন আর কাটিতেছে না, সে পথের পানে চাহিয়া পত্রের আশা করিতেছে—উপর্য্যুপরি ছয়দিন ধরিয়া, আশা করিয়া সে একেবারেই নিরাশ হইয়াছে! মনশ্চক্ষে তাহার সেই নৈরাশ্যপীড়িত ম্লান মুখখানি দেখিতে দেখিতে কামনার চক্ষে এই মধুর প্রভাতেরও কোন মাধুরী রহিল না। সমস্ত বুকখানা এই এক অনাত্মীয় দরিদ্র যুবকের চিন্তায় ভরিয়া গেল।

কামনা তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মাতুল অফিস হইতে ফিরিতেই সে শান্তর কথা বলিয়াছিল, মাতুল মহাশয় সব কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, আচ্ছা দেখি কি হয়!—দুইদিন পর্য্যন্ত তিনি কি দেখিতেছিলেন কে জানে, কামনাকে কিন্তু আর কিছুই বলেন নাই। তৃতীয় দিনের দিন কামনা আবার বলিয়াছিল, মামা সেই শান্ত যাদুর কথাটা বুঝি ভুলে গেছেন বোধ হয়! মাতুল উত্তর দিয়াছিলেন—নারে, না, ভুলি নি। তবে লোক একজন বিচক্ষণ নেওয়া হয়ে গেছে, এই যা!...মাতুল হাস্যমুখে কি সহজেই না এই কথা কয়টি বলিয়াছিলেন কিন্তু সে কথা কয়টি কি তীক্ষ্ণ নির্মম আঘাতই না কামনাকে দিল। কামনার বুকটি দুলিয়া উঠিল, কণ্ঠের নিচেই খানিকটা বাষ্পোচ্ছ্বাস একখণ্ড জমাট বরফের মত জমিয়া বসিল, চোক গিলিতেও কষ্ট হইতেছিল! কামনার মনে হইতেছিল, এখনি সে কাঁদিয়া ফেলিবে এবং সে অশ্রুর কোন কৈফিয়তই সে ইহাদের দিতে পারিবে না—তাই এক মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া সে মাতুলের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া, নিজের বালিসটার পরে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল! যে সামান্য অনুরোধটি মামা রক্ষা করিলেন না, সে যদি পিতাকে সেই অনুরোধ করিত? এই সামান্য অনুরোধটিই বা কেন সে যদি এক অতি বড় দুঃসাধ্য কার্য্যেও পিতার সাহায্য চাহিত, পিতা কি প্রাণ থাকিতে তাহা অবহেলা করিতে পারিতেন?

মাতুল তাহার জানিতেন না যে কত বড় মুখ করিয়া এই দাবীটিকে ব্যক্ত করিয়াছিল! তাহার সারা হৃদয়ের কতখানি সুখ-শান্তি এইটির পরেই ভরসা করিয়া ছিল। মাতুল সে-সব কিছুই দেখিলেন না, তাহার ইচ্ছার তলে

যে এতটুকু মূল্যও থাকিতে পারে—তাহাও একবার ভাবিয়া দেখিলেন না—আর পিতা—হইলে ?

কামনার ইচ্ছা হইতেছিল, তখনই এখান হইতে চলিয়া যায়। নিজের বাড়ীতে গিয়া তখনই পিতাকে একটা জরুরী তার করিয়া আসিতে লিখিয়া দেয়। পিতা আসিলে তাঁহাকে মুখাস্তর বর্ত্তমান অবস্থায় একটা প্রতীকার করিতে বলে! কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু করিবার মত সাহস কামনার ছিল না। আর ইহাও ছিল, মানুষ যে কাজ ভাবিয়া চিন্তিয়া সময়ের উপর নির্ভর করিয়া করিতে চায় তাহাতেই অনেক বিঘ্ন আসিয়া জুটে!

কামনারও ঠিক তাহাই ঘটিল। কামনা যদি তখনি পিতাকে তার করিয়া দিত, কি হইত বলা যায় না, ভাবিতে-চিন্তিতে গিয়া দেখিল, সে অনেকখানি পিছাইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমতঃ সেই দিনই নিঃ প্রিকেনাস বিমলেন্দু ডাক্তার আসিলেন, অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমস্তদিন তাহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কাটাইতে হইল। কতবার সে সব হাসি-গল্প রংতামাসা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার অসমা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোনবারই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কেমন একটা সঙ্কোচ, লজ্জা আসিয়া অন্তরায় হইয়াছে। অথচ সেই সব উৎসবে যোগদান করিতেও তাহার শান্তিটা কি কম হইতেছিল। প্রতি পলেই মুকুল তাহাকে অমনো-যোগের অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছে, প্রিকেনাস ডাক্তার ও মাঝে মাঝে তাহার অন্যমনস্কতার অল্প স্বল্প রহস্য করিতে ছাড়িতে ছিলেন না, সবীতে অপক্তি জানাইয়া মাতুলানীকে সে মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল, তবুও সব ফেলিয়া কেন যে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেছিল না—কে জানে! অনেক চিন্তার পর সে বুঝিল, হঠাৎ কোন রূপ বিরুদ্ধতা প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে সকালের সেই কথাটা লইয়াই আলোচনা উঠিয়া পড়ে এবং তাহা লইয়াই নানা মন্তব্যের সৃষ্টি হয়—সেই ভয়েই সে কিছুতেই আপ-নার মনকে রাজী করিতে পারিতেছে না। মানুষ পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে বসিলে, অন্যের আলোচনার কালে কিছুতেই সীমার মধ্যে থাকিতে পারে না, তখন তাহাদের তর্কের স্রোতে অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া বলে, ইহাও কামনা না জানিত তা নয়। তাই অতি সহজেই তাহার এই ভয় হইল, এখনই এখন একটা কদর্য্য আলোচনা আরম্ভ হইবে যাহা কল্পনা করিতেও তার ভয় হয়!

সারাদিন মনে এই রাশীকৃত অশান্তির মধ্যেও সে শুধু এই কথাটাই ভাবিয়াছে যে এই সঙ্কোচ কেন তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল? এ সঙ্কোচের তাহার কি কি কারণ ছিল? সেও ত মানুষ! মানুষ হইয়া আরেক-জন মানুষের যদি উপকার করিতে যায়, তাহাতে লুকাই বা কি কারণ থাকিতে পারে? লজ্জাই বা কিসের? সে স্ত্রীলোক! তাই কি? স্ত্রীলোকের কি সৎকর্ম করিতে নাই? পরোপকার করা কি স্ত্রীলোকের ধর্ম্মের বাহিরে? না, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকেরই উপকার করিবে? যেখানে পুরুষের সংস্পর্শ আছে, নারী কোন ধর্ম্মের দোহাই দিয়াও সেখানে যাইবে না, কোন কর্ম করিবে না—ইহাই কি রীতি?

সত্যই কি এই রীতি? কিন্তু এ-কি অবিচার? নর-নারীর মিলনেই যদি সমাজ তবে এ রীতি কেন? ইহার দ্বারা ত সমাজের অর্দ্ধাংশ অকর্ম্মণ্য পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে তবুও এই আইন বজায় রাখিতে হইবে? ইহার দ্বারা সমাজের কি কল্যাণ সাধিত হইবে?

পুরুষের সম্বন্ধেও এইরূপ কোন আইন প্রচলিত আছে কি-না, নারীর সংস্রব যেখানে পুরুষের সেখানেই বিচরণ সীমার বহির্ভূত কি-না কে জানে—কামনার মনে হইতেছিল কে এই কল্যাণকামী মহাপুরুষ যিনি এই সব বিধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যদি তাঁর দেখা পায় একবার জিজ্ঞাসা করে!

আর এক কথা, কামনার ইহাও স্মরণ আছে, পিতার কাছে ত এই বাধা বিঘ্ন ছিল না! সেখানে ত সে নিঃসঙ্কোচে, অত্যন্ত সহজভাবে এই সকল কথা কহিয়াছে। তিনি ত কখনও নারী বলিয়া, স্ত্রীজাতি বলিয়া কোন বাধা দেন নাই। এই মুখাস্তর কথা বলিতেও তাঁহার কাছে কোনদিন সে এতটুকু সঙ্কুচিত হয় নাই, তিনিও ত পুরুষ মুখাস্তর সব কথারই আলোচনা নারী-কামনার কাছে করিয়াছেন।

তবে কি পিতার আইন এক, ইহাদের আইন অন্য! সমাজের প্রতিনিধি কাহারা? পিতা না ইহারা? এখানে কামনাকে পরাজয় মানিতে হইল। সে নিজেই স্বীকার করিল, পিতার সহিত সমাজের কোন সম্পর্ক

নাই। তিনি কোথাও যান না, তাঁহার কাছেও কেহ আসে না, কলেজ লইয়া আর এই ক্ষুদ্র—দুইজনের সংসার লইয়াই পিতার সমাজ বলিতে, দেশ বলিতে যাহা কিছু সব! ইঁহাদের কাছে কত লোক আসে, ইঁহারাও কত বিচিত্র বসনে-ভূষণে সজ্জিত হইয়া কত স্থানে সমনাগমন করিয়া থাকেন, নিশ্চয়ই ইঁহারা "সমাজ" মানিয়া চলেন। কিন্তু কামনার জন্য সে সমাজ নয়! তাহার পিতাই তাহার সমাজ! পিতা যে সমাজের একজন, সে সমাজ ছাড়া অন্য কোন সমাজের বক্তব্য স্বীকার করিবে না।

কামনা পরদিনই পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে স্থির করিয়া রাত্রে পিতাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিল। অতিকষ্টে পত্র শেষ করিয়া সে যখন শয্যাগ্রহণ করিল, তখন রাত্রি অধিক ছিল না। নিশান্তের শীতল বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছিল, কামনার নিদ্রিত হইয়া পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। অল্প কিছুক্ষণ নিদ্রাভোগের পর যখন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল তখন আবার সেই বেদনাই তাহার জাগিয়া উঠিল, সারাদিন সারারাত যাহার ভারে সে ছুইয়া পড়িয়াছিল।

"বসন্ত সংখ্যা" বাসন্তী

যাতে সকলের মনরঞ্জন করে সে চেষ্টা আমরা সযত্নে করছি। আপনারা দেখে শুধু বলবেন আমাদের যত্ন সাফল্য লাভ করেছে কি না!

মলয় উঠিয়া বসিয়া কামনাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দিদি! আমি ভাই বড় একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি!

কামনা তাহার মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, অন্তত সংবাদটি জানিবার এতটুকু আগ্রহও তাহার জন্মিল না।

মলয় বলিল—আমি স্বপ্ন দেখেছি তুমি যেন ভাই এখান থেকে চলে যাচ্ছ।

কামনা বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া মলয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

মলয় বলিল—সত্যি ভাই! দেখলুম যেন আজই তুমি যাচ্ছ। বাবা বারণ করছেন, মা কত বলছেন, তবু তুমি·····

কামনা গুরুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—সত্যিই ত একদিন যেতে হবে ভাই! আজই হোক্, আর কালই হোক্····

মলয় দু'হাতে কামনাকে জড়াইয়া ধরিয়া সহাস্যমুখে কহিল—ইঃ! আজই হোক আর কালই হোক্! যাও না মশাই, আমি যেন কিছু জানি-নে! আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে—ওঃ!

কামনা বলিল—ভয় দেখাবো কেন মলয়! যেতে ত হবেই।

জানি গো জানি। পিসে মহাশয় এলে তখন ত! সে এখন অনেক দিনের কথা! বাবা পিসেমহাশয়কে পত্র চিঠি লিখেছেন, আরও অনেকদিন থেকে আসতে!

কিন্তু—আমি যে তাঁকে এখনই চলে আসতে লিখেছি মলয়। আমার চিঠি পেলে একদণ্ডও তিনি থাকবেন—ভেবেছো?

মলয় হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ! তুমি আবার কবে সে-কথা লিখলে মশাই? আমি বুঝি তোমার চিঠি দেখিনি সে-দিন?

কামনা বিশুষ্ককণ্ঠে বলিল—তারপর আবার লিখেছি।

কবে গা?—মলয় মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

কামনা বলিল—কাল। ঐ দেখ···সে টেবিলটা দেখাইয়া দিল।

মলয় ক্ষিপ্রপদে খাট হইতে নামিয়া টেবিল হইতে চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া এক নিমিষে পাঠ করিয়া ফেলিল, তারপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া কামনার মুখের দিকে এক মুহূর্ত আকুল বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এই চিঠি দিচ্ছ?

কামনা সে কথার উত্তর না দিয়া, দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিল—মধুর!—মধুর তাহার পিত্রালয়ের দাসদাসী।

মধুর ভিতরে ঢুকিতেই কামনা চিঠিখানি দেখাইয়া দিয়া বলিল—বড় পোষ্টাফিসে দিয়ে আসতে হবে—নিয়ে যাও।

মধুর চিঠিখানি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল—বাবুকে লিখলে দিদিমণি?

হ্যাঁ—মধুর। বাবাকে আসতে লিখে দিলুম। আর আমার ভাল লাগছে না মধুর!

মধুর তাহা জানিত, বিনাবাক্যব্যয়ে পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

মলয় বলিল—কামনা-দিদি···

কামনা বাধা দিয়া বলিল—চল, বাইরে যাই !

বাহিরে আসিতেই মাতুলানীর সহিত সাক্ষাৎ। তিনি চা-প্রস্তুত সংবাদ দিতে ইহাদেরই সন্ধানে আসিতেছিলেন। দেখা পাইবামাত্র হাসিমুখে বলিয়া উঠিলেন—লাহিড়ী আজ সকলকে নিমন্ত্রণ করেছে ডিনারে।

বলয়ের লজ্জানিত মুখের দিকে চাহিয়া কামনা দৃঢ় হাত ধরিল।

মামী বলিলেন—কামনাকে আলাদা করে বলবে বলে চায়ের টেবিলে বলে আছে। আয় কামনা !

আমায় যে এখনো মুখ ধোওয়া হয় নি মামি ! তোমরা বস-সে মামি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আস্‌ছি—বলিয়া সে গৃহকোণ-রক্ষিত লাল স্লেনডেটের চটিটা পায়ে দিয়া স্নান কামরার দিকে চলিয়া গেল।

( ক্রমশঃ )

---

# তুলির পণ।

[ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ]

রাজার প্রধান চিত্রকরের
তুলির বাক্স খানি,
পটুয়ার ঘরে আসিল কেমনে
সন্ধান নাহি জানি।
কত বিচিত্র রঙের সঙ্গে
গুটী বত্রিশ তুলি,
অতি সুন্দর, সুদৃশ্য পটুয়া
দেখে বার বার খুলি !
প্রাতে একদিন সোণালী রঙটী
যতনে তুলিয়া নীরে,
একটী তুলিয়া পটুয়া যেমন
চুবাতে যাইবে ধীরে—
জাগিয়া তুলিকা বলিল তাহারে
বলিল রিষম রাগে
পরশ করো না শোনো মোর কথা
উত্তর দাও আগে।
ও সোণালী রঙে চুবায়ে আমারে
আঁকিবে চিত্রকর,
অধরে রয়েছে রূপের অলকা
হাসি কান্নার ঘর।
নয়নের কোণে হেনেছে মদন
বিজলি নীলার সার।
আনতো টানেতে ফুটিয়া উঠিত
হিয়ার উলাহাস তার।
অঙ্গপরে তুমি রূপ দিতে কভু
প্রয়াস পেয়েছ কি না ?
অকূলে টেনেছ কূলের কাছে কি
আছে কি তাহার চিনা ?
রঙের সাথেতে গুনেছ কি কভু
হিয়ার অলক্তকে,
দাও উত্তর নতুবা আমায়
পরশ করো না সুখে।
অবাক হইয়া দ্বিতীয় তুলিকা
পটুয়া লইল করে,
জাগিয়া তুলিকা বলিল তাহারে
আরো কঠিন স্বরে।
ওরঙেতে আমি অরুণ কিরণে
এঁকেছি দিনের আশা,
সাড়া দিয়ে গেছে জগতের ভাষা
কমলের ভালবাসা।
আশোক ফুঁড়িতে নব বসন্ত
পরশ দিলায় আনি
গোলাপের পুরে মধু ভরিতে
আমিই বাজাতে জানি।
তারকে তুমি কি অঙ্ক দিয়েছ
বুকেতে দিয়েছ দেহ,
প্রেমিক নহিলে এ বিদ্যা তত্ত্ব
পরশিতে নারে কেহ।

অবাক পটুয়া　　সভয়ে লইল
নূতন তুলিকা হাতে,
আগিয়া উঠিয়া　　সেও যে আবার
কলহ লাগালো সাথে।
বলিল পার কি　　আকাশ কুসুমে
মধু ও সুরভি দিতে,
ধ্যানের বস্তুরা　　গঠন করিতে
শক্তি আছে কি চিতে।
আভাসের মাঝে　　বিশাল বিরাটে
ধরিতে পার কি তুমি,
ধরার ধূলায়　　গড়িয়া তুলিতে
পার কি অলকাভূমি।
নয়ন বায়ু　　বহাতে পার কি
রুদ্ধ কারার মাঝে
পারে যদি কেহ　　এ তুলিকা জেনো
তাহারি করেতে সাজে।
বলিল তুলি　　পুতলির মত
প্রশ্ন করিতে থাকে,
চিত্রকরের　　পুণ্য আসনে
বসিতে দেয় না তাকে।
সেদিন হইতে　　পটুয়া পাগল
তন্ময় হয়ে রহে
আপনার মনে　　তরুলতা সনে
দিন রাত কথা কহে।

রূপের মাঝারে　　রঙের মাঝারে
সন্ধান করে প্রাণ
পেয়ে সুরভির　　সাত বহরীর
পেয়ে সুখিকার ঘ্রাণ।
রঙের মাঝারে　　সঙ্গীত বাজে
উছলিয়া উঠে রস
আঁখরেতে পায়　　ঘরের খপর
আলো ছায়া করে বশ।
এমনি করিয়া　　বারশ বরষ
কাটায়ে কিরিল ঘরে,
সভয়ে আবার　　পুরাতন সেই
তুলিকা পরশ করে।
এবার তাহারা　　হেসে কথা কয়
সুখেতে সোহাগ ভরা,
এতদিন পরে　　দুই আর তুলি
এক সাথে মিলে ধরা।
দুই কথা কয়　　রস চেয়ে রয়
তাল বেতালের মত
আজিকে শিল্পী　　সিদ্ধ হয়েছে
আনন্দ তার কত।
স্বর্গ মর্ত্ত　　অভিষেক করে
ভারতীর বীণা বাজে
আজিকে ভাবের　　সিংহাসনেতে
বীর সে পটুয়া রাজে।

---

# তোড়া।

[ শ্রীউমাপ্রসন্ন দে বি-এ ]

**অকল্পনীয় দ্রুতগতি**—রেলগাড়ীর চলতি কত তাড়াতাড়ি দেখেছো তো? এক এক মিনিটে এক এক মাইল!—সোজা কথা নয়! মানুষ কিন্তু কখনো কখনো রেলগাড়ীর চেয়েও দ্রুত চলতে পারে। সত্যি বলছি!—বিশ্বাস না হয় তো পরখ ক'রে নিতে পারো। তুমি হয়তো নারায়ণগঞ্জ থেকে বাজ্ছ ঢাকাতে। ট্রেণের এক কামরাতে উঠে ধীরে ধীরে সামনের দিকে হাইতে সুরু করে। ট্রেণ যখন এসে ঢাকা থামল, তখন দেখবে তুমি ঠিক যে জায়গাতে প্রথম পা দিয়েছিলে, তার চেয়ে অন্ততঃ আরো কয়েক গজ জায়গা সামনে এসে পড়েছ! বাজী জিৎ হ'ল তোমারই। পেছন মুখো হ'য়ে চলতে হবেনা কিন্তু!

* * * *

**আলোকের গতি**—জগতে সব জিনিষের চলতি একরকম নয়। তা' হ'লে আর দৌড়ের বাজি হ'ত না। জলের ঢেউগুলি যে বেগে চলে, বাতাসের ঢেউ

চলে তার চেয়ে ঢের বেশী জোরে—সেকেণ্ডে অনেক দু' কিট্। তবুও কিন্তু আলোর গতির সাথে তার তুলনাই চলে না। সে কি চলতি—বাপ্‌রে বাপ—শুনলে হয়তো অবাক হ'য়ে যাবে! সেকেণ্ডে একলো আশি হাজার মাইল! তাই শব্দ আর আলোতে যখন পাল্লা লাগে তখন শব্দ পড়ে' থাকে বহুৎ পেছনে; আলোর ঢেউ চটুকরে এসে চোখে লাগে। কোন এক মাঠের দূর সীমা থেকে যদি কেউ বন্দুক ছোঁড়ে তা হ'লে বন্দুকের আগুনটা দেখ্‌বে আগে, শব্দ শুনবে কিছু পরে।

• • • •

আলো-শব্দেন্দ্র মিতালি—বৈশাখী ঝড়ের দিনে আকাশে প্রলয়ের উন্মাদ নৃত্য সুরু হয়। আলোর ঝলকে চোখ যায় অন্ধ হ'য়ে, আবার শব্দের হুঙ্কারে কাণ হয়ে যায় বধির। রীতিমত তৈরী না থাকলে তো অনেক সময় চমকেই উঠ্‌তে হয়। বুদ্ধো মানুষে তাই আকাশে হঠাৎ খুব আলোর নাচ দেখলেই ছেলেমেয়েদের সাবধান করে দেয়, বলে' "কাণ দুটো শক্ত করে এঁটে রাখ, এখুনি ভীষণ শব্দ হবে।"—যেন আলো আর শব্দে চমৎকার মিতালি! শব্দও সত্যি সত্যি হয়, এ রকম কেন হয় জানো?—ছুটো মেঘ যখন খুব সাম্‌নে এসে পড়ে তখন দু'য়ের তাড়িত এসে নিমেষে মিশে যায়। সেখানে হঠাৎ একটা আলোর ঝলক খেলে যায়। এদিকে তাড়িতে যেমন আলো আছে, তেমি তাপও আছে। তাপের ধরুণ সে জায়গার বাতাস-গুলো অকস্মাৎ বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে। এত তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় যে পাশের বাতাসে তার ধাক্কা লেগে একটা বিরাট শব্দ ওঠে। বন্দুক ছুঁড়লেও এ বাতাসের ধাক্কা থেকেই শব্দ হয়। ঘটনা কিন্তু শেষ হয়ে যায় চোখের পলক পড়্‌তে না পড়্‌তে! সেই আলোর ঝলক আর শব্দের হুঙ্কার! কিন্তু পৃথিবীতে সে আলোর খবর এসে পৌঁছায় অনেক আগে, শব্দ থাকে পেছনে পড়ে।

• • • •

মেঘেন্দ্র দূরত্ব—শব্দের চলা কতটুকু আর আলোর ঘোড় কতখানি তা' জানলে কতগুলি হিসেব চমৎকার সোজা হয়ে ওঠে। মনে করো খুব দূর আকাশে দু'টা মেঘে মেঘে ধাক্কা লেগে বজ্রের সৃষ্টি হ'ল। তুমি তোমার ঘরটীতে ঘড়ি ধরে' ব'সে আছ। সেখানে যে তার আলোর ঝলক্ শব্দের প্রায় এক সেকেণ্ড আগেই এসে তোমার চোখে লাগ্‌ল। শব্দ ও আলোর জন্ম হ'য়েছিল একই সময়ে—শুধু তোমার কাছে আস্‌তে এতটা তফাৎ হ'য়ে গেল। এ হিসেব ধরেই তুমি অতি সহজেই বলতে পার্বে মেঘের ধাক্কাধাক্কি তোমার কত মাইল দূরে হয়েছিল।

• • • •

মৌমাছিদের আত্ম-দান—অনেক পাগল কুকুর কাউকে কামড় দিয়ে তারপর আপনা আপনি মারা যায়, শুনেছি। মৌমাছিগুলিও তেমি; এদের হুলটা কারো চামড়াতে বিঁধিয়ে দিলে সেইখানেই থেকে যায়, মৌমাছি আর ফেরত নিয়ে যেতে পারে না। কাজেই হুল-ছাড়া হ'য়েই তাদের বাসায় ফিরতে হয়। কিন্তু এতে তাদের দেহের যে ক্ষতি হয় তা স'য়ে তারা আর বেঁচে থাকতে পারে না। একবার হুল ফুটিয়েই তারা পৃথিবী থেকে বিদেয় নেয়। এজন্য সহজে সে কারো ওপর এ শেষ-অস্ত্র ব্যবহার করে না। নিরীহ বেচারীর মত চুপ করেই থাকে। কিন্তু যখন দেখে, বিপদ এত বেশী যে ঝগড়া পাহাড়া না দিলে মৌচাকের সমূহ ক্ষতি তখন সে প্রাণ দিয়েও কর্ত্তব্য পালন করতে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হয় না, তাদের চরম অস্ত্র ত্যাগ করে শত্রুকে বিব্রত করে তোলে। নিজের জীবনের দিকে কোন খেয়ালই রাখে না। সামান্য মৌমাছিদের এ আত্ম-দানের দাম যে কত, তা কি আমরা বুঝি? অকারণে মানুষ আমরা হুল ফুটিয়ে দিলে মৌমাছিটিকে আরো গালাগালিই করে থাকি।

৪৷৷০ বিনামূল্যে লকেটসাইজ ফটো
ফটো এনলার্জিং ফিনিসিং
ফটো সহ তালিকা সিকি মূল্য পাঠান
কলি ষ্টুডিও, পেটিং ও রবারষ্ট্যাম্প মেকার
৩৩নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

নূতন বিলাতী ডাক্তার। আহা কি সৌভাগ্য! ত্রিশজন বিলাতী ডাক্তার আমাদের জন্য ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইতেছেন, খবর পাইলাম। ভারতবর্ষে বিলাতী ডাক্তারের সংখ্যা বড় কমিয়া গিয়াছে, চিকাশ বিলাতের লোকদের খুব হইতেছিল না, তাঁহারা ত্রিশজনকে বিশেষ সর্তে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেছেন। এমন না হইলে সৎ চেষ্টা? দেশী ডাক্তার আবার ডাক্তার! ছোঃ!

• • • •

পারসেন্টেজ। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে যদি কোন সভ্য বরাবর সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাঁহার সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য? গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, ঐরূপ অনুপস্থিত সভ্য—যাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ সভায় আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কর্তব্যের অবহেলা করিতেছেন! আহা, কর্তব্যের চিন্তায় এই সকল বাবু-ভায়াদের ত অস্থিচর্ম সার হইল দেখিতেছি! গবর্ণমেণ্ট একটা ব্যবস্থা করিলে পারিতেন—এই সব জাতি-গঠন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য একখানি রেজেষ্টারী খাতা রাখিয়া, প্রেজেণ্ট ছাড়, এ্যাবসেণ্ট ছাড় লইয়া শতকরা একটা হিসাবের অধিক দিনের অনুপস্থিত সভ্যের একটা জরিমানার বন্দোবস্ত করিলে কিঞ্চিৎ অর্থাগমেরও পন্থা হইত আর এই সব হামবড়া দেশহিতৈষীর ভিড়ও কমিত!

• • • •

উকীলমোক্তার। উকীলের মত মোক্তারকেও সমস্ত ফৌজদারী মকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা দিবার জন্য আবুল কাসেম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল পেশ করিয়াছেন। অনেকে বিলের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, উকীলের সংখ্যা যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে, মোক্তারদের আর তুলিবার আবশ্যকতা নাই। আবার অনেকে বলেন ওকালতী ব্যবসায়ে দুর্নীতি প্রবল হইবে। এ কথার অর্থ আমরা বুঝিলাম না। তবে সংখ্যাধিক্য হইয়াছে বলিয়া আপত্তি কেন জানি না, আমাদের মতে কাক-চিল দুই সমানই ভাগাড়ে পড়ক যদি পড়ে—যেই ছিঁড়িয়া খাক, আপত্তি নাই। আদালতের টিক-টিকি গিরগিটিকেও সর্ব ক্ষমতা দেওয়া যায়, আমাদের এই মনের কথা।

• • • •

ফাঁড়া-জ্ঞান। কলিকাতার কোন এক বলাইচাঁদ মৃত্যুকালে মাখনবালা নামে এক স্ত্রীকে ও বর্ষপুত্র পাঁচু চক্রবর্তীকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যায়। ইহার বিরুদ্ধে বলাইচাঁদের স্ত্রী মকদ্দমা আনিয়াছিল, হারিয়া গিয়াছে। বলাইচাঁদ যে বিরমস্থিতে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই উইল করে, মেডিক্যাল বোর্ডের প্রিন্সিপ্যাল তাহা সাক্ষ্যে বলেন। বলাইচাঁদের সহিত-কারের স্ত্রী ছিল একে-নম্বরের শুচি-বায়ুগ্রস্ত, সারাদিন কলতলা আর নোংরা ছোঁয়া লইয়াই থাকিত। দেখিয়া শুনিয়া বলাই মাখনবালার সঙ্গে ঘর বাঁধে। বলাইচাঁদের স্ত্রী নিজের আচার বিচার লইয়াই ব্যস্ত ছিল, স্বামীর সুখ সুবিধা দেখিবার সুযোগ তাহার তখন হয় নাই। মাখনবালা সেবিকা দেখিয়াছিল এবং পুরস্কারও পাইয়াছে প্রচুর! ভালবাসাটা বলাইচাঁদের স্ত্রীর সঙ্গে হয় নাই, হইয়াছিল মাখনবালার সহিত। হিন্দু হইলেও বলাইচাঁদ ভালবাসার পাত্রীকে স্বেচ্ছাকৃত সম্পত্তি দান করিয়া যাইতে পারে, হিন্দুর গৌরব ক্ষুণ্ণ না হইতেও পারে, এবং নিজের সম্পত্তি যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারে ইং। স্বীকার করিয়াও কোন এক রুচিবাগীশ কাগজওলা বলিয়াছেন—কুলটাকে সম্পত্তি দিতে পারে এরূপ স্বাধীনতা (হিন্দুর) থাকা উচিত নহে।

মহারাজ-অধিরাজ। বর্তমানের মহারাজাধিরাজ কীর্তিচন্দ পুরুষ। বক্তার সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিই, যাঁর গুণ খান, তাঁর ত গুণ গাহিবেনই। সম্প্রতি মহিলাদের ভোট ব্যাপারে তিনি এক অদ্ভুত যুক্তি দেখাইয়াছেন। ইনি বাগানে, ভোজে নারী সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে দিবা করেন না, নারীর পর্দাকে করিয়া দিব্যি শিক্ষিত এবং সভ্য হইতেও ইহার কোন বাধা নাই, আপত্তি কেবল নারীজাতির ভোট লইয়া! কেন মহারাজ! পক্ষ ভাঙিয়া যাইবে? পদ্মার কাঠ কি এত শক্ত? এতদিনেও ভাঙে নাই? না আমাদের নারী, নারী নয়?

সেনাপতি। ভারতবাসীর ভারি দুঃখ ছিল, সেনা হইতে তারা পারে, রণে হইতে পারে, কুলি-মজুরী করিতে পারে, গোলাগুলি হজম করিয়া হজম করিতেও বুঝি পারে, পারে না কেবল সেনাপতি হইতে! আরও দুঃখ ছিল, পঞ্চাশ বছর সেনাগিরি করিয়াও তাহাকে ছোড়া ইংরেজের অধীনে থাকিতে হয়, অথচ ইংরেজ তাহার অধীনে থাকে না। মাক্তঃ আর দুঃখ নাই, সব দুঃখ ঘুচিয়াছে (অন্ন-বস্ত্র ছাড়া) ভারতবাসী সেনা হইতে ত পারিবেই, সেনাপতি হইতেও পারিবে। ভারতীয় সৈন্যদলের সেনাপতি তাহাদেরই করা হইবে, ইংরেজকে নয়। তবে ইংরেজ সৈন্য ভারতীয় সৈন্যদলে থাকিবে না। তবে আর কি! তবু যদি কেহ বলে ইংরেজ কেন ভারতবাসীর অধীনে থাকিবে না? তার উত্তরে আমরা বলি, বাপু হে! নিচে আগুন থাকিলে তোমাদেরই ত বিপদ হইবে, যদি বাই করে—সেইজন্যই ত তোমাদের নিচটা পরিষ্কার রাখা হইতেছে। অমন আগুনের মত গনগনে রঙ, অমন আগুনের মত মেজাজ, আগুনের মত ভাষা, তোমাদের সাজে পরিবে কেন?

গুণ্ডা-দমন। সেদিন রাত্রি ১২টার সময় হেদুয়ার ধারে একজন লোককে আধা-খুন করিয়া ২৪ টাকা লইয়া কে চম্পট দিয়াছে। গুণ্ডা নয় নিশ্চয়ই। তাহাদের অস্ত্র ত ছুরা বিদ পাশ হইয়া গিয়াছে, আর তাহারা হেদুয়ার ধারের আশ্রিত পুলিশ প্রহরীর চক্ষু এড়াইয়া দশ বিশ হাতের মধ্যে এমন কর্ম করিবেই বা কিরূপে? নিশ্চয়ই কোন সাধু-সন্ন্যাসীর কর্ম! চিমটা বাড়াই আধা-খুনটি করিয়াছেন। আশ্রিত পুলিশ-প্রভু বোধ করি সাধুজীর চরণধূলি লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

ব্যয় সংক্ষেপ। ব্যয় সংক্ষেপ-সমিতির কাঁচির বহর দেখিয়া, বড়ই ভাবনা হইয়াছিল, দুর্ভাবনায় যে কি করিয়া রাত্রি কাটিয়াছে জগদীশ্বরই জানেন। যাক্—এবারকার মত যে গবর্ণমেণ্টের বডি-কার্ড কাটা পড়ে নাই, কমিশনার-দেরও চাকরী টিকিয়াছে—এই ভাগ্য। উঃ! এই লোকগুলার অন্নহীন বস্ত্রহীন শুষ্কমেহ কল্পনা করিয়া রক্ত জল হইয়া যাইতেছিল। দুর্গে দুর্গতিহারিণী!

---

## দেশ বিদেশ।

চট্টগ্রামের দুর্দশির প্রবর্ণরীর আসনে বসিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যে লোক খদর পরিধান করে না—সে দেশের কাজে বিশ্বাসঘাতক ও ঘৃণার পাত্র। যদি দেশের শতকরা ২৫ জন লোকও দুইখান করিয়া সুতা কাটে তবে বাঙ্গালা দেশের বৎসরে ১২ কোটি টাকা বাঁচিয়া যায়।

---

কলিকাতার বিখ্যাত এটর্ণী ও চেয়ারম্যান মিউনিসিপালিটির বিদ্যা পত্নী মেয়র মিউনিসিপালিটির পদ গ্রহণ করিবার পরে কলিকাতার মিউনিসিপালিটির ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁর চেয়ার পদ ১৩ই জানুয়ারী অধিবেশনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। মেয়র মেয়রেস পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া ছিলেন, ও স্বামী-বিয়োগে তাঁহার পদ হইল না।

---

বিশ্ববিখ্যাত দুর্গবীর কাবার পাশার পত্নী, দুর্গা পাশারা প্রভৃতি পুরুষের পোষাক পরিধান করিয়া রাজপথে, ঘোড়ার চড়িয়া আর্গা হইতে এডোয়ার্ড পরিদর্শনে উপস্থিত হইয়াছেন।

---

যে সময় হিন্দুকে মুসলমান-রাজত্বের সময় কর-প্রদোষধারক মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল তাহার অন্য সাক্ষিসাবুদ রাজপুতানায় আছে। সম্প্রতি প্রকাশ যে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের চেষ্টায় ফলে এই ৬০০ বৎসরের ৩০০ বৎসরের মুসলমান হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি হিন্দু-পুনর্গঠন ও সংগঠন উপলক্ষে সঙ্ঘে একত্র আহারাদি করিয়াছেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৩০ জন পণ্ডিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রায় ৭ শত হিন্দু এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

---

কুপালের মেয়র তাঁহার ব্যয় অন্য অনেক ব্যবহার নিবেদ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় আরও আড়াই লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

---

ভারত গবর্ণমেণ্ট ঔষধিতে ভারতের আয়ের যে নৈরাশ্য ঘটাইয়াছেন তাহা ভারতবাসিদের পক্ষে অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে, এই মর্ম্মে ভারতসচিবের নিকট কলিকাতা একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের মিঃ পেটেলি আগামী প্রস্তাব করিবেন যে, ভারত সরকার-কৃত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঋণ শুধু ভারতবাসিদেরই পরিশোধ করিবে।—আনন্দবাজার

---

পুনর্যৌবন লাভ। ভবানীপুরের পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি: কে এস, রায় বাহাদুরের মেয়ে বাসন্তীর বিবাহ সম্বন্ধে বরপক্ষের কিছুদিন বিবাদ হইয়াছিল। আবার কিন্তু মিলন, উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকদিন পূর্ব্বে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পরিবর্ত্তে রায়ের প্রতিনিধিরাই মধ্যস্থতার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমাদের দেশে ডাক্তারের ও রায়ের অভাব নাই, চিকিৎসায় রায়ের যোগ হলে ডাক্তারই ভাল হইবে। চিকিৎসিত হইবার সেখানকার নাই।

---

মহিলাগণের ভোটাধিকার।

মহিলাগণ সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে যে ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন তাহা লইয়া আমাদের এক সৈনিক সহযোগী ব্যঙ্গ একবার বাঙ্গচিত্র প্রকাশ করিয়া বেশ একটু কৌতুক করিয়াছেন। আমরা খদর ধারী করি, দেশোদ্ধার করি, দেশসেবা দেশে দেশে ঘোর ঘটা বক্তৃতা দিয়া সমাজ সংস্কারেরও প্রয়াস পাই। আমার, বাসিকপত্রে কোথায় কোন কুরুচি প্রকাশ হইয়াছে তাহারও সমালোচনা প্রতিবার করিয়া থাকি। কিন্তু "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরের শিখাই" এই বিভাস সরল ও সাধারণ সত্যটি আমরা কোনও ক্রমেই উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারি না। যে দেশের পাত্রে শ্রীরামচন্দ্রকেই বনবাসে সমাজে করিতে উপদেশ দেয় সেই দেশে ঐরূপ ব্যবস্থার প্রকাশ যে কি প্রকারে দুরুচি রক্ষিত হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত।

( বাঙ্গলার কথা )

সংখ্যা হ্রাস ও বিবাহসমস্যা হরণ মহান্ আর্য্যজাতি আজ অধোমুখ। ধার্ম্মিকত্ব হিসাবে যুদ্ধ, বিদ্যেবত্তা, পাণ্ডিত্য এবং নৈতিক চরিত্র হিসাবে জগতে ইহাদের সঙ্গে কেহ কাহাকেও তুলনা দেয় না। কিন্তু বিশৃঙ্খলতা ও অর্থাভাবের বশে আজ ইহারা বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। বহু বহু লোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার দুএক লোককে ফুসলাইয়া খৃষ্টান করা হইতেছে। এমন ইহাদিগকে পরধর্ম্মে দীক্ষিত করা কোনও ক্রমে করা হয় নাই। যেহেতু পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হৈলে, রাজপুত ও ব্রাহ্মণেরা দুইপুরু বংশের বন্দিনী আপনাদের পুত্রী আচার ব্যবহার অনুযায়ী দীক্ষিত হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গৃহীত হওয়ায় আজও হিন্দুসমাজের ভিতরে রহিয়াছে। ইহাই একটা আশার কথা হিন্দুদিগের কোন পুস্তিকা বেশ রাজপুত আছে। যেমনঃ কথিত আছে—গয়াক্ষেত্রে জন্য মুসলমান রাজপুত হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে প্রস্তুত। এই অভিপ্রায় সমাজের দৃষ্টিগোচর করিয়া দিয়াছেন। এদিকে কর্ণপ্রবন মুসলমানগণ শত শত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিলেন। ফলের মত চারিদিক হইতে অর্থের আমদানি আসিতে লাগিল। ইহাতে হিন্দু সমাজেরও উপকার হইল। আমাদের পরিত্যক্ত ভাইদের আবার সমাজে টানিয়া আনিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাই যাহারা পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে সমর, তাহাদিগকে ধর্ম্মে আনয়নের জন্য ভারতীয় হিন্দু শুদ্ধিসভা নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠিয়া তোলা হইয়াছে। আমি ইহার প্রেসিডেণ্ট এবং মহাত্মা হংসরাজ, মুন্সী রামজী, এবং বাবু রামপ্রসাদ এই সভার ভাইস প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। মুন্সী রামজীর পিতৃ ইহার সম্পাদক এবং আর্য্য সমাজের কার্য্য পরিচালক বাবু উদয়ন চন্দ্র ইহার কোষাধ্যক্ষ। এই কার্য্যের জন্য অন্ততঃ একলক্ষ টাকা ও ৫ লক্ষ টাকার দরকার। একলক্ষের জন্য ১০ হাজার টাকা চাই-ই। টাকা কড়ি সব সম্পাদক মহাশয়ের হিন্দুশুদ্ধি-সভা আফিস আমার ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। আর (বাং) কাহাকে।

নীলাম্বরী—বাতাসে উড়ায়ে—"

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

১ম বর্ষ ] ২৬শে ফাল্গুন শনিবার ১৩২৯, ইং ১০ই মার্চ। [ ৩২শ সংখ্যা

# বসন্ত সন্ধান

[ রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর ]

শ্রীমান্ সম্পাদক, বসন্তের সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে অনুরোধ করেছ, কিন্তু লিখি কি? তোমাদের এখন বয়স আছে, তোমরা বসন্তের খোঁজ রাখ; বিশেষ তোমরা আবার কবি, ঔপন্যাসিক তাই বসন্তের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় একটু প্রগাঢ় রকমের। কিন্তু, এ বৃদ্ধ কোন দিনই কবিত্ব চর্চ্চা করে নাই; অতি বড় শত্রুতেও এমন গুরুতর অভিযোগ এ অধীনের বিরুদ্ধে আনিতে পারিবে না। সুতরাং তোমরা নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিকে বসন্তের কথা লিখিতে বলিয়াছ।

বসন্তের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ছেলেবেলার পাঠ্য পুস্তকে; তাহাতে লেখা ছিল—ফাল্গুন চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল। বইতেই পড়িয়াছিলাম, বসন্তের কিন্তু কোন খোঁজ পাই নাই। তাহার পর একটু বড় হইয়া কবিদের মারফৎ অনেক বসন্ত বর্ণনা, অনেক বিরহিনীর বিরহ যন্ত্রণা শুনিয়াছি; কিন্তু তাহার একটা কথাও বিশ্বাস করি নাই, তাহার প্রত্যক্ষের বাড়া ত আর প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষে দেখিয়াছি—ফাল্গুন চৈত্র মাসে প্রচণ্ড রৌদ্র।

কথাটা কি জান ভায়া? এই যে বসন্ত, এ বনে আসে না। আসে মনে। আর একবার এর সাক্ষাৎ লাভ করলে এ আর ছাড়তে চায় না, বসন্ত আসেও না, যায়ও না; সে থাকে। আর তার কাছে যুবক বৃদ্ধের বিচার নেই। যার মনই সুপ্রসন্ন হয়, যার সাধনার জোর থাকে, তার বুকে বসন্ত একেবারে বাসা বেঁধে বসে; সে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা রাখেনা। কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের ধার ধারে না। আমি কত বৃদ্ধকে দেখিয়াছি, তাহারা বসন্তের রসে ভরপুর, একেবারে পাকা আমের মত। আবার কত যুবক দেখিয়াছি, তাদের সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলিলে বসন্ত কেন, ছয়টা ঋতুই এলেই মধুসূদন বলিয়া পলায়ন করে—তারা একেবারে Solemn Owl। আমার কথা বিশ্বাস না কর ত আমি তোমাকে কয়েকটি বৃদ্ধের খবর দিতে পারি, তাদের মধ্যে চিরবসন্ত বিরাজমান। কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে তাদের প্রাণে বসন্তের আবির্ভাব হয়েছিল, আর সেই থেকে একেবারে মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসে আছে। চুল পেকে গিয়েছে, দাঁত পড়ে গিয়েছে, শরীরের চর্ম্ম শিথিল হয়ে গিয়েছে, চক্ষের দীপ্তি হ্রাস হয়ে গিয়েছে; কিন্তু মনের মধ্যে বসন্তের বাতাস ঠিক একইভাবে বইছে। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি কোন ঋতুই তাঁদের কাছে আমল পায় না—তাঁরা চিরবসন্ত সাগরে ডুবে আছেন। আমি এমন লোকের, এমন মহাপুরুষের সন্ধান দিতে পারি; কিন্তু তোমরাই একটু খুঁজে দেখ না। যদি খুঁজে পাও, তোমাদের 'বাসন্তী' লেখা সার্থক হবে; তোমরা তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করে বসন্তের এমন পাকা ছোব পাবে, এমন রংয়ে রঞ্জিত হয়ে যাবে, যে সে রং কিছুতেই ঘুচবে না—সে রসধারা কিছুতেই শুকাবে না। একবার তাঁরই চেষ্টা কর না।

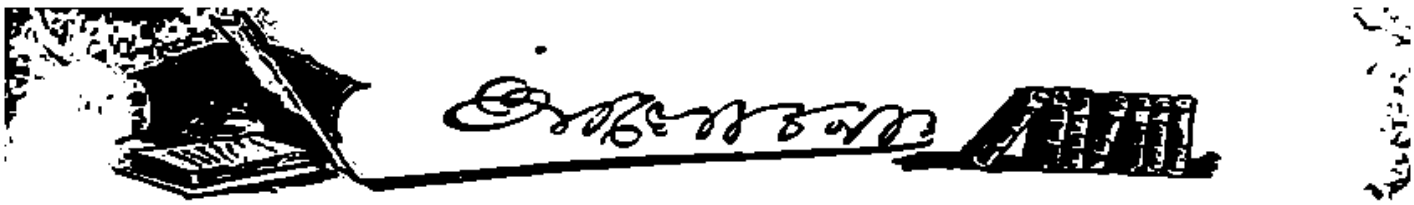


পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বসন্ত আগমনে বসন্ত উৎসবের আয়োজন ও ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও সে উৎসবের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। বর্ষের সঙ্গে মেলে আমাদের দেশের সকল উৎসবই যেমন পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল বসন্ত উৎসবেরও সেই পূর্ণতা লাভ ঘটিয়াছিল। শীত অন্তে বসন্তের আগমন। শীতের মোহ ও জড়তা ভাঙ্গিয়া বসন্ত প্রাণী-গণের উপর তাহার নূতন প্রাণের পরশ দিয়া যায়, প্রাণের এই অনুপ্রেরণায় প্রাণীগণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। নূতন আশায় নূতন উদ্যমে প্রাণ তাদের পূর্ণ হইয়া যায়। নূতন প্রাণ পাইবার এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই বসন্ত উৎসবের জন্ম—প্রাণ দানেই বসন্তের সার্থকতা। প্রাণ পাওয়াতেই প্রাণীগণের আনন্দ ও বসন্তবরণের সার্থকতা। বসন্ত আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া যুগে যুগে নবভাবে বিশ্বের প্রাণ সঞ্চার করিতে চাহি-তেছে—যাহারা প্রাণের দরদ ও মূল্য বোঝে তাহারা তেমন ভাবেই বসন্তকে বরণ করিতে পারে, যাহারা প্রাণের দরদ ও মূল্য তেমন বোঝে না বা বুঝিবার শক্তি শীতের জড়তায় ও মোহে হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছে তাহারা তেমন ভাবে বসন্তকে বরণ করিতে পারে না। নূতন প্রাণের সন্ধানীই বসন্তকে তেমন করিয়া পাইতে পারে—তেমন করিয়া হৃদয়ে বরণ করিয়া জনম সার্থক করিতে পারে।

• • • •

নিত্য নূতন নূতন অভাবের জ্বালায় আমাদের দেশের বোধ শক্তি ও প্রাণ যেন লোপ পাইয়া যাইতে বসিয়াছে। নূতন আনন্দ, প্রাণ শক্তির নূতন প্রবাহ এ দেশের প্রাণ আর ধারণ করিতে পারে না সানন্দে বরণ করিয়া জীব-নকে রস মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া লইতে পারে না। আশা আনন্দ হীন জীবনে স্ফূর্তি নাই—তাই ক্ষণস্থায়ী বসন্ত আমাদের দেশে আসিয়া ক্ষণেক থাকিয়াই উধাও হইয়া চলিয়া যায়। নব মাধুরী মুহূর্তে হইয়া উঠিয়াই আবার আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। বসন্তের মলয় পবন পাইয়াও আমরা তাহা উপভোগ করিতে পারিনা—জাগে থাকে আমাদের শীতের কম্পন ও গ্রীষ্মের ভয় ত্রাস। কে জানে কবে—দেশের প্রাণে আবার বসন্তের নূতন সঞ্জীবনী পরশ লাগিবে!

• • • •

আমাদের দেশের লোকের বড়ই অভাব। নানা ব্যাধি পীড়ায়, হাজার হাজার জৈব উৎপাতে এ দেশের যত না কষ্ট হয়, খাইতে না পাওয়ায় পরিতে না পাওয়ায় এ দেশের লোকের তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট হয়। অভাবই এ দেশের সকল উপদ্রবের মূল কারণ। যে দেশের অধিকাংশ লোক দু'বেলা পেট ভরিয়া দু মুঠা খাইতে পায় না, যে দেশের লোকের পরিধানের বস্ত্র নাই, সে দেশে ব্যাধি পীড়া নানা উপসর্গ উপদ্রব আসিবে না তো আসিবে কোন দেশে? অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে যেখায় শাকভাত নুন ভাত শুধুমাত্র সে দেশের লোকের লবণের উপর ট্যাক্স না বসাইলে কি করিয়া চলে? ভারত সরকার প্রাদেশিক নানা সরকার সব রকম ট্যাক্সই বসাইয়া দেখিয়াছেন। কোন দিক দিয়াই তাহাদের ঘাটতির মাত্রা পূর্ণ হয় না দেখিয়া এবার ভারত সরকার বিশেষ বুদ্ধি করিয়া লবণের উপর ট্যাক্স মনকরা আড়াই টাকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাতে সরকারের ৪ কোটি ৫০ লক্ষ মুদ্রা আয় বাড়িবে। এ আয় আনুমানিক ভাবে বাড়িবে না—সত্য সত্যই বাড়িবে। কারণ বিলাস ব্যসনের দ্রব্য কিম্বা আমোদ আহ্লাদের ট্যাক্সও লোকে খরচ বৃদ্ধির হিসাব করিয়া যথা সম্ভব বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারে কিন্তু লবণ যে তাহাদের অতি প্রয়োজনীয়। যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ অন্ততঃ নুন ভাতের অধিকার ও লোভ লোকে বর্জ্জন করিতে পারে না। নুন যখন লোকের চাই-ই তখন ইহার উপর ট্যাক্সের আয় অতি নিশ্চয়। এবার আর লোকে ফাঁকি দিয়া এ ট্যাক্স এড়াইতে পারিবে না!

• • • •

শোনা যায় আন্তর্জাতিক জগতের বাদশাহে উপাধি কোন

মন্ত্রী সবণের উপর ট্যাক্স বসাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মন্ত্রীবরের এ সুযুক্তি বাদসাহ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন 'দেশের লোকে শুধু নুন ভাত খাইবে তাহাতেও আমি বাদ সাধিতে যাইব? সে হইবে না। কিন্তু দেশ কাল পাত্র ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। চিরকাল কি আর সমান যায়! দু'আনা সেরের আদায় তিন আনা সের হইলেই যদি সরকারের কোটি কোটি টাকা ঘাটতির পূরণ হয় কে তাহাতে আপত্তি করিবে? আর আপত্তি করিলেই বা শুনিবে কে। সরকারেরও উপায় নাই—দেশের লোকেরও তথৈবচ তাই নুন ভাত শাক ভাতে হাত পড়িলেও নির্ব্বিকারই —থাকিতে হইবে।

• • • •

সৈনিক বিভাগের ব্যয় এবার অনেক ছাঁটিয়া কাটিয়াও ৬২ কোটি টাকার কম করা যায় নাই। ইকনেপ কমিটি সৈন্য বিভাগে ১০½ কোটি ও রেলওয়ে বিভাগে ৪½ কোটি টাকা কমাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই দুইটাই ভারত সরকারের বড় খরচার বিভাগ। সারা ভারতের লোক না খাইয়া মরিবার আগেই যদি এই হাতী পুষিবার খরচা গুলি কমে তবু কিছু লোক ট্যাক্স দিবার জন্য বাড়িয়া থাকিবে।

• • • •

আমাদের দেশের উপর বাহিরের অভাব যতই চাপিয়া আসিতেছে ভিতরের অভাব গুলির আমরা তেমনি জোর দিয়া দেশের লোকের জীবন আরও দুর্ব্বহ করিয়া ফেলিতেছি। বাংলার আর কোন দিক দিয়া জীবনে বসন্তের আগমন সম্ভাবনা না দেখিলেও বাংলার ছেলে মেয়েদের বিবাহ ব্যাপারে আমরা তাহার পূর্ব আভাস পাই। ঘরে খাইবার থাক আর নাই থাক বিবাহ ব্যাপারে আমরা অতি উদার। একদিকে বিবাহের বাজনা, হাসি, ও উৎসব, আনন্দ, অপর দিকে কনের বিবাহের অর্থ জোগাইতে সর্ব্বনাশ। একদিকে হাসি ও উৎসব অপর দিকে অশ্রু ও বেদনায় এমন অপূর্ব্ব সমাবেশের চিত্র যদি দেখিতে হয় তবে বাংলার বিবাহের এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখিতে হয়।

• • • •

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যে পরিবর্ত্তন হইবার কথা হইতেছে এ সম্বন্ধে সহযোগী 'আত্মশক্তি' লিখিতেছেন 'বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব আইনের যে সব পরিবর্ত্তন প্রস্তাব হইতেছে তা কাজে পরিণত হলে জমিদার যিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধে ভোগ কচ্ছেন তার কিছু ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে—মরতে মরবে মধ্য বিত্ত শ্রেণীর জমিলোকেরা যারা জমি চাষ করে না, কিন্তু চাষী প্রজার কাছ থেকে খাজনা নিয়ে বা তাকে বকয়া ভাগে দিয়ে দিন গুজরান করে। এই মধ্যবিত্ত লোকেরাই হচ্ছে পালটিক্যাল। যত হাঙ্গাম হুজ্জুত এরাই করে বেড়ায়। অতএব এদের গলাটিপে মারতে কারো আপত্তি নাই। তাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা পড়বে। এ আইন হলে বাংলা দেশের ১০ জনের অধির স্থলে ওলট পালট হয়ে যাবে।...সুবিধা হবে তাতে—উকিলদের।

• • • •

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার স্বরাজ সাধনার তিনটি জিনিষের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। খদ্দর, হিন্দু-মুসলমান মিলন ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। মহাত্মার আমলে স্বরাজ প্রচেষ্টায় এ তিনটি জিনিষই পাশা পাশি চলিতেছিল। কিন্তু মহাত্মা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইতেই সব ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এখন এসব দিকে কাহারও বড় লক্ষ্য নাই! লক্ষ্য গিয়েছে বক্তৃতার বাজে খরচে বিতণ্ডায়! স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্বরাজের রাজনীতির বাহিরে আসিয়া এই অস্পৃশ্যতা সমস্যা দূর করিবার কার্য্যেই আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। নানারূপ বাধা বিঘ্ন করিয়া নিজেদের পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছি। এই সব বাধা বিঘ্ন থাকিতে আমরা সবল সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিব না। মহাত্মা একক জাতীয় উত্থানের যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহার কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিবার কালে সেই কার্য্য গুলিই যদি বিভিন্ন জনে ভিন্ন বিভাগ করেন তবে তাহাতেও দেশের অনেক কাজ হইতে পারে।

• • • •

রুষ অঞ্চলে ফরাসীরা জাঁকিয়া বসিয়া জার্মেনদের উপর নিত্য নূতন আদেশ জারী করিতেছে। কিন্তু জার্মেনরা নানা কষ্ট সহিতেছে, অথচ ফরাসীর আদেশ তবু পালন করিতেছেনা। কোটপতি এক এক জন জমার খনির মালিককে ফরাসীরা কয়লাসরবরাহ করিবার

আদেশ করিতেছে কিন্তু ফরাসী আদেশে তাহাদের ভ্রুক্ষেপও নাই। তাহাদের ফরাসী পুলিশ ফরাসী সৈন্য ধরিয়া লইতেছে বিচার হইতেছে—কত লাঞ্ছনা তাহারা ভোগ করিতেছে, অথচ দেশের মান সম্মান তাহাদের কাছে নিজের মান ও শারীরিক কষ্টের চেয়ে অনেক বড়। তাই হাসিমুখে লাঞ্ছনা সহিয়াও তাহারা ফরাসীদের আদেশ অবজ্ঞা করিতেছে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির মনের সাহস ও নির্য্যাতন ভোগের ক্ষমতাও এইরূপ।

• • • •

অসহযোগ প্রথার উদ্ভাবক হইল ভারত। অথচ আজ তাহাকেই সাফল্যে মণ্ডিত করিতেছে পাশ্চাত্য জাতিরা। নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে দক্ষ, পরম যোদ্ধা জার্মেন জাতি আজ ফরাসীদের সঙ্গে অ-সহযোগ করিয়া বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করিতেছে। অ-সহযোগ করিয়া তাহারা যথেষ্ট কষ্ট নির্য্যাতন সহিতেছে—জার্মেন কোটিপতি ব্যবসায়ীদের ফরাসী পুলিশ সৈন্যেরা আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইয়া ফরাসী বিচারালয়ে উপস্থিত করিতেছে। শক্তিশালী জার্মেনদিগের পক্ষে ফরাসীদের হাতে এই লাঞ্ছনা ভোগ কম অপমানের কথা নহে। তবু জার্মেনী অচল অটল ভাবে এই লাঞ্ছনা সহিয়াও অ-সহযোগ যুদ্ধ করিতেছে। ফরাসী শাসনে তাহারা কিছুই করিবে না। নিষ্ক্রিয় নির্ব্বাক হইয়া তাহারা থাকিবে। ফরাসীরা দিনকত খুব আস্ফালন করিয়া জার্মেনদের উপর অনেক অত্যাচার নিগ্রহ করিয়া এখন শুনিতেছি ঘুর নরম করিতে বাধ্য হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, বীরের জাতি জার্মেন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া হানা দিতেও যেমন মজবুত, বিনা অস্ত্রে অ-সহযোগ চালাইতেও তেমনি দক্ষ। জার্মেনীর এই অসহযোগে ভারতের বোধহয় অনেক কিছুই শিখিবার আছে। সে সকল লোক বিলেতী রাজনীতির চালে ওস্তাদ হইয়া মহাত্মার অ-সহযোগকে বাতুলের অভিযান ও রাজনীতির সহিত এই আত্মার বলের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া উপহাস করিতেন, পাশ্চাত্য জার্মেন জাতির এই চালে তাহাদের জ্ঞান চক্ষুও একটু হয়তো উন্মিলিত হইতে পারে!

• • • •

রাজাজের সৈন্যপোট সহরে মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিসেস কাক্সিল বিচারাসনে বসিয়াছেন। শোনা যাইতেছে আরও একজন ভারতীয় মহিলা শীঘ্রই বিচারক হইবেন। এখানকার বিচারালয়ে শীঘ্রই মহিলা উকিল ব্যারিষ্টারেরও আবির্ভাব হইবে। বিচার বিভাগে নারীদের এই আধিপত্য দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

• • • •

ভারতের ভিতরেও ভারতবাসীরা যেমন ক্রমে স্থানচ্যুত ও সর্ব্ব বিষয়ে হীন হইয়া পড়িতেছে ভারতের বাহিরেও তাহাদের সেই অবস্থা। পূর্ব্ব আফ্রিকার কেনিয়া নামক বৃটিশ উপনিবেশে ভারতীয়দের দুরবস্থা ও অপমানের সীমা নাই। কেনিয়ার গবর্ণর ভারতীয়দের প্রতি ভাল ব্যবহার করিবার জন্য তথাকার ইংরেজদের উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু বাণীজ্য ইংরেজেরা বলিতেছে এ আমাদের দেশ—এখানে অন্য কাহারও আধিপত্য মানিব না। পথে ঘাটে ইহারা ভারতীয়দের অপমান করিতেছে। এ অবস্থা ভারতীয়েরা যে কতকাল হইল ভোগ করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। প্রতিকার কি ইহার—কবে ভারতীয়েরা মানুষের মত অধিকার পাইয়া মানুষের মত চলিতে ফিরিতে পারিবে?

• • • •

গত বুধবার হইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্পাদিত দৈনিক পত্র 'বাঙ্গলার কথার' প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। কেন বন্ধ হইল এ কথার বাঙ্গলার কথার কর্ণধার জানাইয়াছেন নানা কারণে ইহা প্রকাশের প্রয়োজন তাঁহারা দেখিতেছেন না, আবার প্রয়োজন হইলে প্রকাশ হইবে। কি প্রয়োজনে বাঙ্গলার কথা সামান্য দিন আত্মপ্রকাশ করিয়াই আবার লুপ্ত হইল জানি না। তবে বাঙ্গলার কথা আকারে ছোট হইলেও অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছিল। তাই ইহা বন্ধ হওয়াতে আমরা দুঃখিত।

• • • •

'বাঙ্গলার কথা' বিদায়দিনে আমাদের লক্ষ্যে বলিয়াছেন 'আজ স্পষ্টাক্ষরে নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে বলিবার সময় আসিয়াছে জাতীয় আদর্শ অর্থে আমরা কি বুঝিব? ভাবের ঘরে লুকোচুরি, বাহ্য শক্তির ভয়ে সত্য গোপন—আর কতদিন আমরা করিব? আমাদের হৃদয় নিহিত সত্য আজ সকলের সম্মুখে নিবেদন করিতে হইবে।'

জাতীয় আদর্শ বলিতে বাঙ্গালী শুধু এক কথা বুঝে—পূর্ণ স্বাধীনতা। যে জাতি সত্য বলিতে পারে না, সে জাতি কোন্ শক্তি বলে সত্য আচরণ করিবে? আদর্শ যাহার ঠিক নাই সে ব্যক্তি কোন আলোকের পানে ছুটিবে?

• • • •

কংগ্রেসের দুই দলের সাময়িক মিলন হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু এই মিলন যাহাতে স্থায়ী ও কার্য্যকরী হয় দেশ এখন তাহাই চাহিতেছে। মহাত্মা যে মিলনকে স্থায়ী করিয়া ভারতকে দ্রুত মুক্তির পথে অগ্রসর করিতেছিলেন সে মিলন বন্ধনে কর্ম্মের যতটা প্রাধান্য ছিল বাক্ বিতণ্ডার স্থান তত ছিল না। বাক্ বিতণ্ডায় নিজেদের দৌর্ব্বল্যই বেশী প্রকাশ পায়, কর্ম্মক্ষমতা বা কর্ম্মদক্ষতা প্রকাশ পায় না—অথচ দেশের মুক্তির জন্য সেইটিরই এখন আবশ্যক।

• • • •

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পণ্ডিত মতিলাল ও হাকিম আজমল খাঁ সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সেল কর্ত্তৃপক্ষ রাজনৈতিক আলোচনার ভয়ে এ সাক্ষাতের অনুমতি দেন নাই। সম্প্রতি রাইট অনরেবল শাস্ত্রীও অপর কয়জন সরকারের বিশেষ মানিত ও মানিত বিশ্বাস ভাজন লোক মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনাও কর্ত্তৃপক্ষ না-মঞ্জুর করিয়াছেন। আমরা এই সব সংবাদ শুনি আর বিস্মিত হইয়া যাই। যাঁহাকে ভারতের ও ভারতের বাহিরের কোটি কোটি লোকে দেবতার মত পূজা করে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অধিকারও ভারতবাসীর নাই!

• • • •

মেষ্টনী ব্যবস্থায় ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বের অধিকাংশই গ্রহণ করেন। তাই প্রাদেশিক সরকারদের অর্থের ঘাটতি আর কমে না। ভারত সরকারের অবস্থাও তদ্রূপ। বিলেতী সৈন্যদের ঘোর দোষ ঘোষাইতেই যেন ভারতের সব রাজস্ব আদায়। মেষ্টনী শোষণের নিন্দা অনেক প্রাদেশিক মন্ত্রীরাও করিয়াছেন। সেই মেষ্টন সাহেব এখন আবার বলিতেছেন আরও নূতন নূতন কর বসাও। লবণের উপর যে ট্যাক্স বসান হইয়াছে তা আইন সভায় পাশ হইবে কি না সন্দেহ তাই তিনি অন্য রকম কর বাড়াইতে বলিয়াছেন। ভাল, যত ইচ্ছা কর বাড়িয়া চলুক। গোটা ভারত তোমাদের হাতে পড়িয়া আছে যে ভাবে ইচ্ছা দোহন চলিতে পারে। কিন্তু দোহনে এখন আর দুধ বাহির হইবে কি?—আর যে দুধ নাই—এখন আছে শুধু শোণিত!

• • • •

১৯২২ সালের ১০ই মার্চ্চ

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ

## মহাত্মা গান্ধি

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হন এবং

১৮ই মার্চ্চে

ছয় বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন এই পুণ্য সপ্তাহে আপনি স্মরণ রাখিবেন যে আপনাদের এবং জগতের মঙ্গলের জন্য

তিনি আজ বন্দী

১০ই মার্চ্চ হইতে ১৮ই মার্চ্চের মধ্যে আপনি (১) বিদেশী বস্ত্র ছাড়িয়া পূর্ণ খদ্দর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবেন, (২) তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে যথাসাধ্য দান করিবেন, (৩) কংগ্রেসের সভ্য হইবেন, (৪) কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, এবং অপরকেও এইসব কর্ত্তব্য পালন করিতে অনুরোধ করিবেন, আর যেদিন তাঁহার কারাদণ্ড হয় সেই চিরস্মরণীয়।

১৮ই মার্চ্চ

## হরতাল করিবেন

১৭ই পর্য্যন্ত সকলকেই হরতাল করিতে অনুরোধ করিবেন এবং ১৮ই মার্চ্চ কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম বুদ্ধির উপর নির্ভর করিবেন এবং দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

আনন্দময় চক্রবর্ত্তী, সভাপতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি।

মৌলানা ওস্মান, মৌলানা ইসাক, সম্পাদক, কলিকাতা খেলাফৎ কমিটি।

মৌলভী মুজিবর রহমান, সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটি।

# উন্নত শির

'বল বীর বল বীর—উন্নত মম শির!' কবি নব বসন্ত সমাগমে উন্নতশিরের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন, সহস্র সহস্র দেশবাসী উন্নতশিরের মহিমা শ্রবণ করিতেছিল। যমনীতে যমনীতে তাহাদের জীবনের নব প্রবাহ, নবীন অনুভূতি সাড়া দিয়া যাইতেছিল। প্রাণে সত্য প্রাণের স্ফূর্তি ও স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল।

উন্নতশিরের মহিমা, জাতি, সমাজ, জন ও দেশবাসী বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। উন্নতশির লইয়া চলিবার যে কত সুখ—প্রাণের শক্তি যে তাহাতে কত বর্দ্ধিত করে দেশবাসী তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। তাই দেশে আজ বসন্ত ক্ষণিকের তরে আসিলেও শুধু দারপথে উঁকি দিয়াই চলিয়া যায়, দেশবাসীর প্রাণে তাহাতে নূতন অভিনব জীবনের উল্লাস দিতে পারে না।

শির উন্নত করিয়া চলিতে না পারিলে জাতির যেকতও ভাঙ্গিয়া গেলে—জাতির সকল সুখ, সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইয়া যায়। জাতি ক্রমে অবসন্ন হীন হইয়া পড়ে—মহৎ কিছু অনুভব করিবার শক্তি সে হারাইয়া ফেলে, মহৎ কিছু করিতে সে পারে না। তাই জাতিকে আজ উন্নতশির হইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে।

শিবোঽহং শিবোঽহং শিবোঽহং জানিবার দ্বারা আজ ভারত ভুলিয়া গিয়াছে। যে নিজে সোজা হইয়া চলিতে ও বলিতে পারে না—অত বড় বিরাট কল্পনা লইয়া অতবড় বিরাট সাধনার জিনিসকে প্রাণে আনিয়া শিবোঽহং বাণী তাহার আর সাজে না। প্রাণের গানের সে রূঢ় মহিমা—সে সত্যের আত্মবোধ ও আত্ম-বলের ধৈর্য্য ও সাহস তাহার নাই, তাই সে আজ ভারতের প্রেত মূর্ত্তির কঙ্কালসার বিভীষিকা দেখিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিতেছে। আপনার মধ্যে আত্মার বিকাশ ও প্রাণ শক্তির পরিচয় না পাইয়া সে ভগ্নক্ষুণ্ণ চিত্তে বিশ্বের এক কোণে মরমে মরিয়া অধোবদনে পড়িয়া রহিয়াছে।

জগৎবাসী আজ তাহাদের উন্নতশির লইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে বিশ্ব বিধান নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য গর্ব্বভরে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর ভারত সেই গর্ব্বের সম্মুখে আপনাকে ক্ষুণ্ণাম চিত্তে নোয়াইয়া দিয়া বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া আপনার লজ্জিত মুখ ঢাকিবার প্রয়াস পাইতেছে।

জগতের সমস্ত ভীরুতা, সমস্ত লজ্জা—সকল গ্লানি যেন এক ভারতের ভাগ্যেই পুঞ্জীকৃত হইয়া আসিয়া জুটিয়াছে। আজ তাহার নিজস্ব সম্পদ বলিবার কিছুই নাই।—আজ আপন-হারা আত্মবিস্মৃত হইয়া সে অবনত মস্তকে পরের কাছে ভিক্ষার দান গ্রহণ করিবার জন্য সলজ্জ দুঠায় তিল তিল করিয়া মরিতেছে।

বিশ্বের গৌরবে যোগ দিবার অধিকার তাহার নাই। শক্তির সাধক এ জগত—বিরাট শক্তির প্রভাবে বিশ্ব জগত চলিতেছে, জগতের গতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। জগতের মাধুর্য্য, আশা, উৎসাহ, পাপ ধর্ম্ম সকলই এই বিরাট শক্তি হইতে কর্ষিত হইয়া জগতের প্রাণ সঞ্চার করিতেছে। তাই এ জগতে প্রাণের সন্ধানী হইলে শক্তির সাধনা করিতে হইবে। অশক্ত, জড়, ম্লান যে, এ জগতে তাহার স্থান নাই। ধ্বংস তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

আজ এই ধ্বংসের মুখ হইতে ভারত যদি বাঁচিতে চাহে—আত্ম ক্ষমতায় যদি উন্নতি শির লইয়া সে দাঁড়াইতে চাহে, তবে সাধকের মত এক নিষ্ঠ হইয়া তাহাকে হারানো প্রাণও হারানো শক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সর্ব্ব বিষয়ে-পরবশতা বর্জ্জন করিয়া পরের অনুগ্রহ দানের উপর আলো নির্ভর না করিয়া তাহাকে নিজ ক্ষমতার সাধনায় উন্নতশির লইয়া দাঁড়াইতে হইবে। আপনার মধ্যে আপনাকে না পাইলে, নিজ ক্ষমতায় ও শক্তির উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে সে জাতি বা দেশ কোন-দিন উন্নত হইতে পারে না। নীতের মোহ-মূর্চ্ছা কোন দিন তাহার ঘোচে না—বসন্তের নূতন জীবনের আশ ও বিচিত্র উন্মাদনা কোনদিন তাহার আসে না। ভবিষ্যৎ ক্রমে তাহার পক্ষে তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে থাকে।

ভারতকে আজ আবার অতীতের গৌরব কাহিনী স্মরণ করিয়া বর্ত্তমানের অবস্থা ভাবিয়া ও কল্পনায় ভবিষ্যতের গভীর কৃষ্ণবর্ণ যবনিকার দ্বারা দেখিয়া, কোন পথে চলিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আপন মহিমায় ও আত্মবোধে আপনাকে উন্নতশির লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। ভারতকে প্রাণে প্রাণে সাধনা করিতে হইবে 'বল বীর—বল বীর—উন্নত মম শির।' এই সাধনা হইতেই ভারতবাসীর জীবনের আনন্দ উল্লাস আবার ফিরিয়া আসিবে, বসন্ত উৎসবে নূতন প্রাণশক্তি অর্জ্জন করিতেও তাহারা সমর্থ হইবে।

# উদ্বোধন

[ শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর ]

স্মর সে অতীত গৌরব তব
পতিত হিন্দু জাতি,
তব আশ্রমে প্রথম গোহাল
জাগো ভরসা রাতি।
স্মর' সে শৌর্য্য নিষ্ঠা পরম,
স্মর' ত্যাগ তেজ তপ সংযম,
মানস নেত্র কমলে তোমার
কোথা সে দিব্য ভাতি?
কোথা গেল তব ব্রহ্ম পিপাসা?
কোথা শাশ্বত ধন?
শুষ্ক তোমার চতুর্ব্বর্গ
ফলের কাম্য বন।

হেম মায়ামৃগ সন্ধান তরে
ঘুরিতেছ আজি পথে প্রান্তরে,
তুচ্ছ পরশ মণিরে হারায়ে
কাচ লয়ে আছ মাতি'।
কোথা গেল তব চিৎসম্পদ?
বিশ্বে হয়েছ হেয়,
ভোগের নিরকে ফিরিবি জীবন
হিন্দু কি তাবে শ্রেয়ঃ?
হুতাশন সম জ্বলে' উঠ পুনঃ,
অমৃত মন্ত্র পুনরায় শুন,
মোক্ষ পথের সাথি আবার
হও সত্যের সাথী।

---

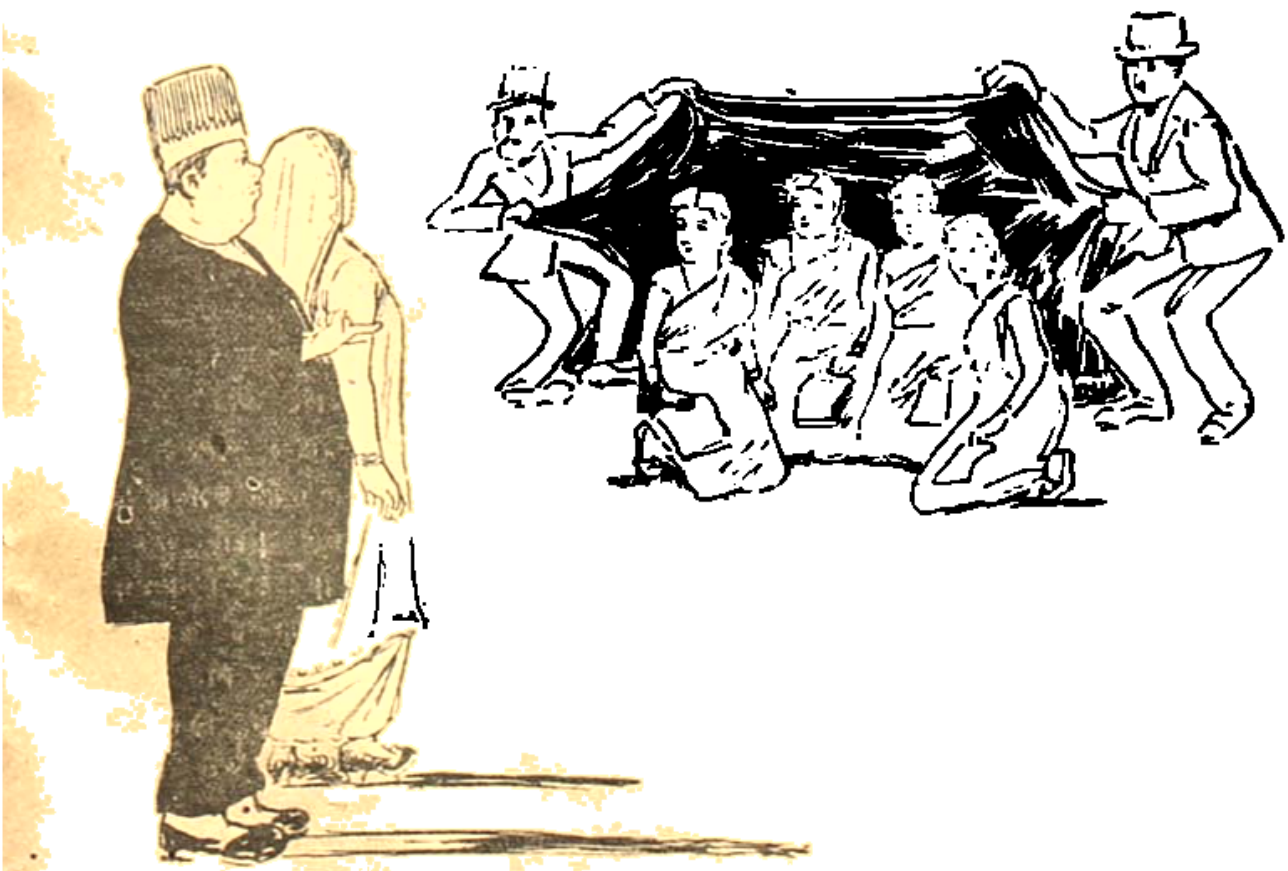

"ওদের বেলা পর্দা ঢাকা—নিজের বেলা ফাঁক? কেন দয়াময়?"

# উভয় সঙ্কট

শ্রীশশধর রায় এমএ, বি-এল ]

ম্যাল্‌থাসের সময় হইতে একটা ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে কোন একটী দেশের খাদ্য সংস্থানের পরিমাণে লোক সংখ্যা অধিক হওয়া মঙ্গল জনক নহে। এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। লোক সংখ্যার আধিক্যে ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। কিন্তু কিরূপ হইবে তাহা জাতির চরিত্রের উপর নির্ভর করে। জাতি উদ্যম-শীল হইলে ইহাতে মোটের উপর জাতি বিস্তৃতি লাভ করে; আর উদ্যমহীন হইলে জাতি অনাহারে মরিয়া যায়। ইংরাজ এবং আমরা—এই উভয়ের তুলনা করিলেই একথা উপলব্ধি হইতে পারে। দেশের খাদ্য সংস্থান অপেক্ষা লোক সংখ্যা অধিক হওয়ায় ইংরাজ জাতি পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং প্রায় খাইয়াও ফেলিল। আমরা কিন্তু এই অবস্থায় পালে পালে মরিয়া যাইতেছি। এত দিন খাদ্য সংস্থান বাড়াইতে পারিলে রক্ষা পাইতাম, কিন্তু এখন আর তাহাতেও লাভ নাই; কারণ এখন উহা বাড়াইলে অপরের পেট ভরিবে মাত্র; আমাদিগের বিশেষ কিছু ফল হইবে না। কবি গোবিন্দ দাসের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমরা এখন আর "গ্রামের মালীক" নহি, কেবল মাত্র চাষের মালীক। নানা কারণে এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে আমাদিগকে রক্ষা করিবার কাহারও সাধ্য নাই সুতরাং, অচিরেই ইহার প্রতিবিধান হওয়া অত্যাবশ্যক। সে প্রতিবিধানের পন্থা কি?

মানব সমাজের দুইটী মাত্র সম্বল। লোক এবং আহার। লোক কমিয়া গেলে সমাজ ধ্বংসের পথে যায়; এ নিমিত্ত ইহা স্বীকার করিতে হয় যে সমাজের সম্বল লোক এবং আহার। যে ধর্ম্ম সমাজের একমাত্র রক্ষক তাহাও লোক সংখ্যা এবং আহার সংস্থানের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

এরূপ ক্ষেত্রে, বর্ত্তমান অবস্থায় খাদ্য সংস্থান বৃদ্ধি হইলে যদি আমাদিগের বিশেষ কোন ফল না হয়, তবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করাই এক্ষণে একমাত্র পন্থা। বর্ত্তমান দুরবস্থা প্রতিবিধানের উহাই একমাত্র পন্থা।

ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে যে এতদ্দেশে এক্ষণে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করা, উভয়ই বিপদ জনক। আমাদিগের খাদ্য সংস্থান বৃদ্ধি করিতে গেলে অপরের খাদ্য সংস্থানের হ্রাস হয়। সুতরাং তাহারা বাধা দিবেই। আর, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেও নানাবিধ পীড়ায় অকাল মৃত্যু হইয়া বৃদ্ধির পরিমাণ ত খর্ব্ব হইবেই, বর্ত্তমান সংখ্যাও হ্রাস হইয়া যাইবে এ অবস্থা অতি মারাত্মক। সুতরাং উভয় সঙ্কটে পড়িয়া আমরা কি করিব? মরিয়া যাওয়াই স্থির করিয়া বসিয়া থাকিব; অথবা যে একমাত্র কারণে এই মারাত্মক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাই নষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

সেই একমাত্র কারণ কি? জীব বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান এক কথায় ইহার উত্তর দেয়——পরাপেক্ষা। ইহার অন্য নাম পরনির্ভরতা। জীবের এই প্রধান শত্রুকে নষ্ট না করিতে পারিলে কোন জীব সমাজ বাঁচিয়াথাকিবার আশা করিতে পারে না। সুতরাং আত্মনির্ভরতা মন্বাদিসম্মত জাতির অবশ্য অবলম্বনীয়। এই নিমিত্তই মনু বলিয়াছেন. সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।

## পুনর্মূষিক

পৃথিবীর শেষ ত-হল প্রায়! আমাদের দেখি আবার গোড়া থেকেই সুরু করতে হবে।

—Simplicissimus (Munich)

## পত্নী না পেত্নী?

ও বাবা! একটুখানি চুরু-চালি করে এলেই যদি এই দেখতে হয় বলের খাতায় নাম না লেখালে আর চলছে না। —Karikaturen (Christiania)

কাব্য-সুধা ।

এদের দেখে মনে পড়ে কবি Long fellowর সেই বাণী "For ye are living Poems."

Lakshmibilas Press.

# চার্লি চ্যাপালিনের নব-প্রণয়ণী

চার্লি যে শুধুই বায়স্কোপ দৃশ্যের অভিনেতা, তা নয়, বাস্তব জীবনেও প্রভু একজন বেশ বড়দরের অভিনেতা। আগের বিয়ে-টিয়ে কাটিয়ে আবার নতুন করে এই মেয়েটির সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেছেন। মেয়েটির নাম—পোলা নেগ্রী, ইনি বায়স্কোপের একটি নিখুঁত নক্ষত্র ( Star ) ; ইনি যখন বায়স্কোপ তোলাচ্ছিলেন, চার্লি তাঁকে আবিষ্কার করে ফেলেন—ব্যস্! বিয়ে যে ঠিক কবে হবে তা এখন বলা যাচ্ছে না যেহেতু এঁরা নিজেরাই এখনো বলতে রাজী নন, তবে সত্যি যদি বিয়ে হয় ত সেই যোগের সহিত যোগ—কি বলে না, তাই হবে।

# ভগবানের কেরামতি

[ ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল। ]

ভগবান পৃথিবীটাকে বাসের যোগ্য করে গড়তে পারেন নি এমনি তিনি সর্ব্বশক্তিমান্! অবাক্ হ'চ্ছ? হায় রে মতঃসিদ্ধতা, হায় Convention!

এ পৃথিবীতে আমরা বাস করি আর এক রকম চলনসই রকমের আরাম করেও বাস করি। কিন্তু—এই কথাটাই বিশেষ স্মরণ করবার যোগ্য—সে ভগবানের দয়ায় নয়। একটি একটি করে' খতিয়ে দেখ, আমাদের জীবনের জন্য যে সব জিনিষের প্রয়োজন তার কোনটি ভগবান তৈরী করে' দিয়েছেন।

প্রথম বাড়ী। বাড়ী নইলে বাস করা চলে না। থাকা চলে, হাঁটা চলে, স্নান বিশেষে বসাও চলে, হয়রাণ হওয়া চলে কিন্তু—বাস করা চলে না। বাড়ী যদি না থাকতো তবে বাস করা চলতো না। সে বাড়ী কি ভগবান তৈরী করেছিলেন? ক্ষমতা ছিল তাঁর? ছিল যদি তবে এমন সাধের মানুষ গড়লেন আর তাদের জন্য সম্বল পাকা বাড়ী কতকগুলো তৈরী করলেন না কেন?

তারপর ধর কাপড়চোপড়! এটাও না হ'লেই নয়। লজ্জা সরমের মাথা যদি চিবিয়েও খাও ধর তবু শীতের জন্যে তো গা'টা ঢাকা চাই। সে বিষয়ে ভগবান চক্রের কি ব্যবস্থা? একেবারে "নৈব চ নৈব চ"। আর তা ছাড়া এর ভিতর একটা ভয়ানক অন্যায়, ভয়ানক পক্ষপাতিত্ব এক কথায় ভয়ানক বজ্জাতি আছে। কাপড় যে ভগবান না তৈরী ক'রতে পারতেন তা নয়। এমন সরেস পশমের সুতো কেটে নানা রঙ বেরঙের জানোয়ারের গায় তিনি দিয়ে রেখেছেন—ইচ্ছা ক'রলে মানুষের গায় কোন্ না শাল দোশালা চাই কি র‍্যানকিনের বাড়ীর ছুট পর্য্যন্ত জন্মাবধি তৈরী ক'রে দিতে পারতেন। কিন্তু দেন নি। এ কথাটা কিছুতেই অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই যে তিনি দেন নি—দিতে পারতেও দেন নি। তাই তাঁর একটি অবর ভক্ত ও মনের দুঃখে কেঁদে ব'লেছিলেন "Naked we came into the world and naked shall we leave it." অর্থাৎ এ ভগবানের কি বিচার যে নেংটো হয়ে আমরা জন্মাই আর নেংটো হয়েই চলে যাই। শুধু তাই নয় এর ভেতর ভগবানের রুচির দোষও দেখতে পাওয়া যায়। নেংটো করে তিনি মানুষ গড়েন কেন? সভ্যতা ভব্যতার জ্ঞান তাঁর মোটেই নেই তা' বোঝা যায়। সেই সুদূর অতীত যুগে কিম্বা বর্ব্বর সমাজে যখন লোকে কাপড় পরতোই না তখন তিনি এই রকম করে মানুষ গড়তেন। তা না হয় Economyর ওজুহাতে justify করা যায় কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এমন বেয়াদবী—অসহ্য!

আর এ কথাটাও প্রণিধান যোগ্য যে তিনি যে ছোট শিশুদের উলঙ্গ করে তৈরী করেন শুধু তাই নয়, জীবনে কোনও দিনই তাদের কাপড় চোপড় গজায় না। অথচ গজাতে পারতো। এমন বন্দোবস্ত তাঁর পক্ষে করা কিছুই শক্ত হ'ত না। দাড়ি গোঁফ বড় হ'লে গজায়—সেগুলো গজাবার কোনও দরকার ছিল না, না গজালে বরঞ্চ ক্ষুরের খরচটা বেঁচে যেত। যত দিন যায় তত চুল বেড়ে ওঠে শেষে পয়সা খরচ করে' তাকে কেটে ফেলতে হয়। এই সব অনাবশ্যক বাহুল্য তিনি ক'রতে পেরেছেন আর বয়সের সঙ্গে কাপড় চোপড় গজাবার একটা কোনরূপ ব্যবস্থা ক'রতে পারতেন না? এ কথা যতই মনে করা যায় ততই ভগবানের উপর রাগ হয়! ভেবেদেখুন—এই যে উলঙ্গ থাকার ব্যবস্থা এ কেবল পুরুষ নয়, নারীর সম্বন্ধেও ভগবান ক'রেছেন! এমন লোমহর্ষক রুচিবিকার স্মরণ কর্ত্তে কার না ঘৃণা বোধ হয়। ভাগ্যে হঠাৎ তাঁর হাত থেকে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব বেরিয়ে গিয়েছিল তাই পৃথিবী এই ভীষণ অসহ্য নীতি-বিদ্বেষী ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

কাপড় চোপড় সৃষ্টি ক'রেছে মানুষ—ভগবান নিজে তো করেনই নি, মানুষের পক্ষেও কাপড় সৃষ্টি করবার পথে অশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করেছেন। কি করে' মানুষকে কাপড় তৈরী ক'রতে হয় তা একটা ইঙ্গিতের ফলে কিম্বা তাঁহার তাঁতশালে গেলেই বুঝতে পারা যায়। ভগবানের যদি উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে কাপড় পরান তবে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যও তো করতে পারতেন। সেই গাছ তুলো ক'রলেন—সেও অনেকটা। মানুষের কারিগরী—

সে কথা পরে বলছি—তার আগেকার গুটিপোকার গায়ের রেশমের মত গোটা করলে, আর একটু মজবুত করলে কোনও ক্ষতি ছিল না। সুতো কাটবার পরিশ্রমটা বেঁচে যেত। এমন না করবার কোনও হেতুই ছিল না—এর উদ্দেশ্য কেবল মানুষের কাপড় বোনার পথে বিঘ্ন উৎপাদন।

খেটে খেটে মাথার ঘাম পায় ফেলে যদি বা কাপড় তৈরী হ'ল তাও অমনি পরলে হয় না। মানুষের শরীর খানা এমন কারিগরী করেই তিনি সৃজন করেছেন যে নানারকম করে আড়িয়ে পেঁচিয়ে, কেটে, সেলাই করে না নিলে কাপড় পরে লজ্জা বা শীত নিবারণ হয় না তাদও দেখায় না। ভগবান যে পদে পদে কেবল মানুষের সুখ সুবিধার পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করে বেড়াচ্ছেন এ তার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত। বাস ক'রতে গেলে গৃহ চাই, কাপড়চোপড় লেপ তোষক আসবাব আদি চাই—সব মানুষের নিজের তৈরী করতে হ'য়েছে—কিন্তু সবার উপর চাই খাওয়া।

কেন?

এ না ক'রলে কি হ'চ্ছিল না? খাওয়া জিনিষটার সৃষ্টি ক'রবার কি দরকার ছিল? নাহক মানুষের কতকটা পরিশ্রম বৃদ্ধি করা বইতো নয়। হাসছো, ভাবছো লোকটা কি বোকা, খাওয়া না হ'লে মানুষ বাঁচবে কি করে'? তা' জানি। এইটাই যে ভগবানের রাজ্যের নিয়ম তা' জানি, বাঁচতে হ'লে খেতে হ'বে। কিন্তু এ নিয়ম অত্যন্ত অন্যায়—এটা Lawless law.

তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে এ নিয়মের গোড়ায় হ'চ্ছে এই বিধি যে কাজ ক'রতে গেলেই ক্ষয় হ'বে। পদার্থ ক্ষয় না করে কোনও ক্রিয়া হয় না। এ নিয়মের কি দরকার ছিল? এ নিয়মটা করবার বেলায় ভগবান ভেবে দেখেন নি যে কি ভয়ঙ্কর ফল হ'বে এর—আর কি ভয়ানক কাণ্ড সব হ'চ্ছে। এই নিয়মের জন্য চন্দ্রটা ঠাণ্ডা হ'য়ে জমে গেছে, এর ফলে কত সূর্য্য নষ্ট হ'য়ে গেছে—এরই জন্য আমাদের ভয়ে ভয়ে আমাদের নিজস্ব সূর্য্যটির বয়স খতিয়ে দেখতে হ'চ্ছে—কে জানে কবে তিনিও ঠাণ্ডা হ'ন। ঠাণ্ডা হ'লে যে কি উপায় হ'বে তাই ভাবতে হ'চ্ছে।

ভেবে দেখ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। রসগোল্লাটি তোমার সামনে র'য়েছে। অবশ্য তোমার সেটা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু হায়, যদি তুমি খাও তবে আর সেটি থাকবে না! এই নিয়েই তো মানুষের জীবনের তিন পোয়া কি পৌণে চার পোয়া অশান্তি। খেলেই খাবার ফুরিয়ে যায়, আবার খাবার যাম পায় ফেলে খাবার জোগাড় করতে ছুটতে হয়। কেন? এমন বন্দোবস্ত করা তো কিছু অসম্ভব হ'ত না যে খাবার খাব, তৃপ্তি হ'বে, অথচ যেমন খাবার তেমনি থাকবে। দেবতারা নাকি নিজের বেলায়, তেমনি ব্যবস্থাই ক'রে নিয়েছেন। যে ঠাকুর দেবতাকে ভোগ দিলে, যখন তাঁরা খেয়ে চলে যান তখন যে খাবার তাঁরা খেয়ে গেলেন তার এক কৌটাও কমে না, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। অথচ মানুষের বেলায় ভগবান এই সুন্দর নিয়মটি করতে পারলেন না!

"ক্ষয় বিনা ক্ষয় নাই" এটা আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিচ্ছি কেন না, না মেনে উপায় নেই। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তো এ নিয়মটা না ক'রলেও পারতেন, অন্ততঃ মানুষের শরীরের বেলায়। বিবেচনা কর এই যে বহুমূল্য শরীরখানা এটা ন্যাড়ছি চাড়াচ্ছ ওর মানে প্রতি মুহূর্ত্তে এর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষয় হ'চ্ছে। সে ক্ষয় মেরামত ক'রতে হ'বে তাই খাওয়া চাই। বার মাস ত্রিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা এই ক্ষয় চলছে। যেখানে অনায়াসে ক্ষয় ছাড়া কাজ চালান যেত সেখানে এতটা একটা প্রকাণ্ড অপচয়ের ব্যাপার সৃষ্টি করবার কোনও আবশ্যকতাই তো ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে ভগবানের রাজ্যে Retrenchment Committee ছিল না। আশা করি তাঁর রাজেন্দ্র যখন ইহলোকের ব্যয়সঙ্কোচ সমাপ্ত করে যাবেন তখন যদি ভগবানের দেখা পান তবে এবিষয়ে তাঁকে উপদেশ দেবেন।

এও বরদাস্ত হ'ত যদি মাসে মাসে এ ক্ষয়টা হ'ত। তা নয় দিনরাত সমানে ক্ষয় চলছে। তার জন্য আবার খেতে হ'বে রোজ,—দুবেলা কি তিনবেলা না চারবেলা সে সম্বন্ধে ডাক্তাররা এখনো মত স্থির করে' উঠতে পারেন নি। তা হ'ত যদি এমন যে মাসে দু মাসে একবার খেয়ে দেয়ে শরীরটাকে চলবার রাখতে হ'বে সে একটা চলনসই বন্দোবস্ত হ'ত। কিন্তু তা' নয় খেতে হ'বে রোজ—দুবেলা! আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি এটা কত বড়

প্রকাণ্ড অকর্মণ্যতার পরিচয়। হ'ত যদি মানুষ তবে সে কি ক'রতো? মানুষের হাতের কাজ দেখলেই বোঝা যায়। একটা ঘড়ি যদি মানুষে তৈরী করে তবে তাকে রোজ স্প্রিং দোয়াতে হয় না, তেল তাতে তেলও দিতে হয় না—সে অমনি চলে। দম অবশ্য দিতে হয়, কিন্তু ছোট চ্যাক ঘড়িতেও দম দিতে হয় মাসে দিনে একবার। সাধারণ ক্লক ঘড়িতে সাতদিনে একবার। আর এমন ঘড়িও আছে যাতে বছরে কি বছরের একবার দম দিতে হয়। ইচ্ছে ক'রলে এবং দরকার হ'লে মানুষ এমন কলও ক'রতে পারে যাকে দু' দশ বছরের মধ্যে ছুঁতেও হ'বে না, সে আপনি চলবে।

এমনি করে' মানুষকে জন্তুর মত দম দিয়ে দিতে কি বাধা ছিল বিধাতার? একথা তো ঠিক নয় যে তিনি শক্তির এমন পাকা বন্দোবস্ত ক'রতে পারেন না। ধর না এই যে কয়েক ভরি রেডিয়াম তিনি তৈরী করে রেখেছেন এদের বেলায় তো সে অমের নিষেধ নেই। মানুষের শরীরের বেলায়ই বা অম ছাড়া কাজ হওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে কে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ ক'রেছিল।

আচ্ছা হ'ক। মানুষকে না হয় খেতেই হ'বে। কিন্তু সে খাওয়াই ছাই বন্দোবস্ত তিনি কি করেছেন? কিছু না। পৃথিবীর কোনও দেশে ভাত আপনি জন্মায় না, লুচি গাছে ঝোলে না বা দুধের বৃষ্টি হয় না। এসব মানুষ অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক পরিশ্রমে তৈরী করে। তবে নিজেকে কোনও মতে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বিধাতার ব্যবস্থা অন্য রকম। তাঁর ব্যবস্থায় বাঘ নেকড়ে ধরে খায় নেকড়ে কুকুর খায়, কুকুর বেড়াল খায়, বেড়াল ব্যাঙ খায়, ব্যাঙ পোকা খায় আর পোকা বাঘ খায়। সমস্ত জগৎটা এমনি একটা বিরাট খাওয়া খাওয়ির ব্যাপার। এরই নাম Struggle for existence and survival of the fittest. পরস্পরকে খাওয়া খাওয়ি না ক'রেও যে খাওয়া যায় সেটা মানুষের আবিষ্কার আর তাতে করেই সভ্য হওয়া সম্ভব হ'য়েছে। নৈলে কি ভীষণ ব্যাপার হ'ত। যাদুঘরের সভায় ব'সে যদি সভ্যেরা পরস্পরের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ভাবতেন "ও লোকটি খেতে কেমন?" একটু মাংস ছেঁড়া সভ্যের দিকে চেয়ে যদি তাঁদের লোলায় জল আসতো আর কোনও সভ্য বক্তৃতা ক'রতে করতে যদি আর একজন লাফিয়ে এসে তাঁকে মুখে ফেলে দিতেন ভেবে দেখ কি ভীষণ ব্যাপার হ'ত।

পরস্পর খাওয়া খাওয়ি না ক'রেও যে খাওয়া যায় এটা সভ্যতার আবিষ্কার, ভগবানের নয়। আগেই বলেছি ভগবান ভাতও গড়েন নি লুচি রুটি, পাঁপর, তরকারী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের কোনওটাই তিনি গড়েন নি। সব মানুষ খেটে, বুদ্ধি খাটিয়ে এই সব তৈরী ক'রেছে। ব'লবে ভগবান ভাত করেন নি চাল বা ধান ক'রেছেন, রুটি বা লুচি করেন নি গম ক'রেছেন। আমি একথা বলবো, এমনি একটা কুসংস্কার সৃষ্টির আদি থেকে চলে আসছে। কিন্তু কেউ কখনও দেখেছো বনে আপনা আপনি অজস্র গম বা ধান গজিয়েছে। যদি তাই হ'ত তবে মানুষ এত বড় মূর্খ নয় যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনের পর দিন খেটে চাষ করে', জমীতে জল দিয়ে, নিড়িয়ে ইত্যাদি করে' ধান বা গম জন্মাত না, সবাই ভিড় করে' গিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সতো সেই বনের চারপাশে যেখানে গম ধান আপনি জন্মায়। এসব বাজে কথা। আপনা আপনি জন্মায় কি? চোরকাঁটা, কাঁটানটে, শেয়াকুল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জিনিষ। তাদের চাষ ক'রতে হয় না, এমন কি চাইতেও হয় না। বরং যত তাকে না চাইবে ততই সে গজিয়ে উঠবে—এটা পরীক্ষিত সত্য। এমন মাঠ হয়তো দেখতে পাবে যেখানে বড় একটা চোরকাঁটা নেই, কিন্তু ধাও গিয়ি কিনি এক ভদ্রলোকের বাগানে যেখানে Lawnএর উপর ভদ্রলোক হয়তো হাজারো টাকা খরচ ক'রে ফেলছে, সে লনের উপর চোরকাঁটার কি প্রতাপ। দশজন লোক দরকার লেগেই র'য়েছে কেবল চোরকাঁটা বাছতে। আচ্ছা ধান যদি বিধাতাই তৈরী ক'রলেন তবে সেইটাই চোরকাঁটার মত অজস্র ও অযাচিতভাবে গজাবার ব্যবস্থা করবার সুবুদ্ধি তাঁর ঘটে এলো না! বলিহারি বুদ্ধি!

একটা বিষয় আমরা এখনো অনেকটা ভগবানের হাতে। মাছ বা মাংস বা ডিম কতকটা পরিমাণে ভগবানের তৈরী বলা যেতে পারে বটে। এ বিষয়ে আমরা এখনো ভগবানের তৈরী সেই আদি খাওয়া খাওয়ির বিধি লঙ্ঘন করে যেতে পারিনি। তাই বলে মানুষ নিশ্চিন্ত নয়। এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা হচ্ছে। তবে এ পর্য্যন্ত যে সব চেষ্টা হয়েছে সে গুলো ফুল। তাতে করে মানুষকে

নিরামিষাশী হ'তে উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে। সেটা কোনও কাজের কথা নয়। এটা হ'ল destructive প্রচেষ্টা, এতে কোনও ফল হ'বে না, ফল হ'বে Constructive চেষ্টায়। সে রকম চেষ্টাও হ'চ্ছে, হবে, এখনো পুরো সফলতা লাভ হয় নি। তরকারী রান্না ক'রে তাতে ঠিক মাংসের স্বাদ ও গন্ধ আনবার অনেক চেষ্টা হ'য়েছে। কিন্তু এ সব চেষ্টা পরিপূর্ণ সফলতা লাভ ক'রবে সেই দিন যে দিন কোনও জীবিত জন্তু হত্যা করা ছাড়াইয়া মেকী মাংস তৈরী ক'রতে পারবেন যেমন তাঁরা কলা থেকে গোলাপফুলের গন্ধ আর কুসুম ফুলের রঙ বের করেছেন। সে দিন খুব বেশী দূর নেই। সে দিন এলেই আমরা ভগবানের খাওয়া খাওয়ির আইন ছাড়িয়ে যেতে পারবো।

সোজা কথাটা এই যে পৃথিবীটা যে বাসের যোগ্য সে আমাদেরই চেষ্টায়—ভগবানের তাতে কোনও হাত নেই। ভগবান পৃথিবী বাসের যোগ্য করে গড়েন নি!

---

# যেথা প্রাণখানি প্রেমে ভরপুর

[ শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ কবিভূষণকর ]

যেথা প্রাণখানি
　　প্রেমে ভরপুর—
সেথা সেথা ফোটে
　　গোলাপ মধুর!
থাকুক বাটিকা,
　　পড়ুক তুহিন,
অযুত গোলাপ
　　জীবন-বিপিন!
ছেয়ে রেখ ধীরে—
　　ধীরে ধীরে যায়
তালে তালে তালে
　　মাখাটী দোলায়
জানি যেথা প্রাণ
　　প্রেমে ভরপুর—
সেথা সেথা ফোটে
　　গোলাপ মধুর!

যেথা প্রাণখানি
　　প্রেমে ভরপুর—
সেথা সেথা ফোটে
　　গোলাপ মধুর!
আসুক না কেন
　　দুখ শোক রোগ
ভাবনা অভাব—
　　শত অভিযোগ—
তাহাদের মূল
　　গোলাপের মূলে
এমনি জড়ায়ে
　　যাবে—ভেদ ভুলে—
যা' হতে ছুটিবে
　　গোলাপ মধুর—
সেথা প্রাণখানি
　　প্রেমে ভরপুর।

---

# বহুরূপী

[ অধ্যাপক শ্রীমুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম-এ, বি-এল্ ]

আব-ভেজান জানালার পাশে রোজই বসি। আর রোজই দেখি নীচের গলি দিয়ে কত লোকজন কতগাড়ী ঘোড়া অবিরাম যায়। সেখানে বসি কেন? না ব'সে কোথায় যাব? সেখানে ঘরে তাই আইবুড়ো; মা আমাকে যে বেরুতে দেন না। তার উপর বাড়ীখানাও ছোট। আবার চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন জানালার পাশে এসে বসি। কিন্তু জানালাটা যে একেবারে খুলে রাখব সেটি হবার যো নাই, তা হ'লে বহুনির আর অন্ত থাকবে না।

যখন প্রথম বেশ থেকে বাবা এই সহরের বাসা বাড়ীতে নিয়ে আসেন তখন কতদিন দানা পানি ছেড়ে কেবলই কেঁদেছি। এখনও সেই পাড়াগাঁর গাছে ঢাকা ঠাণ্ডা বাড়ী খানার কথা আর মুক্ত জীবনের কথা মনে হ'লে অজানায় দীর্ঘশ্বাস পড়ে, চোখে জল ভ'রে আসে হা ভগবান্! কবে যে বাড়ী যাব! এখানকার ইট পাথর দেখে দেখে চোখ দুটো যে খোলা হবার মত হল! বদ্ধ বাতাসে দিনে দিনে প্রাণটা যে সাদা হয়ে গেল।

গলি দিয়ে কত রকম পোষাকের কত লোক যায়। যে যার কাজে যায়। কাজের কি শেষ নাই? কত ভিখারী করুণ সুরে ভিখ্ মাগতে যায়। কত ফেরিওয়ালা কত রকম ডাক ডেকে যায়। কত লোক পায়ে হেঁটে যায়। কত লোক আশে পাশে তাকাতে তাকাতে যায়। আমি বসে বসে দেখি।

এই অন্তহীন লোকের স্রোতের মাঝে আমি এক জনকে খুঁজে ফিরিছি। কখন সে মহারাজা সাজে, কখন সে কাঙাল বনে। কখন সে হাত পেতে ভিখ মাগে। কখন সে দুই হাতে দান করে। কখন সে বাবু! কখন সে মুটে। সেকি বহুরূপী? সে কখন রাস্তে যায়, কখন দিনে যায়। তার সময় নাই,—অসময় নাই। তাকে কিন্তু আমি ধরে ফেলেছি তার চোখ দেখে। সে সব লুকাতে পারে, পারে না কেবল তার ঢল্ ঢল্ ছল্ ছল্ চোখ দুটিকে লুকাতে।

তখন থেকে আমার নজর সেই বহুরূপীর উপর। কখন সে যায় কখন সে আসে—আমি তার আশায় বসে থাকি। আমার লক্ষ্য কেবল সকলের চোখের উপর। এত সে নয়। হাঁ এই সেই। এমন ক'রে কতদিন যায়।

আমি খুব জাগর হ'য়ে উঠেছি। আমার বিয়ের জন্য মায়ের ঘুম নাই। আচ্ছা, গরীবের মেয়ে এত শীঘ্র বেড়ে ওঠে কেন—তা তোমরা বলতে পার? জানালার ধারে বসা আর বহুরূপীর সন্ধান করা আমার মত বড় একটা বদ অভ্যাস জন্মে গেছে। তা না হ'লে মায় এত গালমন্দেতেও আমি আজ সেই আবডেজান জানালার পাশে বসে আছি!

নিশ্চয় সে আজ সারাদিন এ পথ দিয়ে যায় নি। গেলে নজরে না পড়ে যেত না। এই কথা মনে মনে ভাবছি এমন সময় কানে আওয়াজ এল এক ফেরিওয়ালার। চেয়ে দেখ্লুম হাঁ, সেই ঢল্ ঢল্ ছল্ ছল্ চোখ—সেই বহুরূপী। দক্ষিণ বাতাসে জানালাটা হঠাৎ খুলে গেল! ছি! কি লজ্জার কথা। আজ চার চোখ এক হ'ল। সে কি ডাকছিল "আমের আচার" না "আমায় চাই" আমি বুঝে উঠতে পারলুম না। ফেরিওয়ালার কথার ভঙ্গীই ও রকম, আমার মাথা ঘুরতে লাগ্ল। তারপর কি হল জানি না।

একদিন দেখি আমি রোগশয্যায়। বাপ মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। ডাক্তারবাবু আমার পাশে বিছানায় ব'সে আমার হাত দেখ্ছেন। আমি আমার ক্ষীণ চোখদুটি দিয়ে ডাক্তারের মুখের পানে চাইলুম। আ মরি মরি এই যে ঢল্ ঢল্ ছল্ ছল্ চোখ! এ যে সেই বহুরূপী! আমার মাথা ঘুরতে লাগ্ল। ডাক্তার বাবু বল্লেন "ওষুধটা খেয়ে নাও আমার লক্ষ্মীটী! সব সেরে যাবে।" আমি ঠোঁটের বাধায় ব'লে ফেল্লুম "না আমি সারতে চাই না।" আমার বুকের ভিতর যেন আমার পরাণটী কেঁদে বলে, "কেবল তোমারে আমার পাশে পেতে চাই, হে আমার বৈদ্যরাজ!"

• • • • •

অনেকদিন হ'য়ে গেছে। পাঠকপাঠিকারা আমাকে তোমরা বেহায়া ভেব না—তিনিই আমার স্বামী।

# বিদেশের স্মৃতি

[ শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল ]

ছেলেটী বাঙ্গালী কিন্তু বহুদিন পূর্ব্ব এ দেশে বাস করিয়া উড়িয়া হইয়া গিয়াছে। সে, আমাকে বার লাইব্রেরী, সিভিল কোর্ট, কালী মন্দির, কালেকটর আফিস ইত্যাদি দেখাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বাসায় ফিরিয়া একটু জোয়ানের আরক সেবন করিয়া টাইম্ টেবেল খুলিয়া কাল আবার আমার সাথের সাথী পুরী পেসেঞ্জার এ রওনা হইব স্থির করিয়া ফেলিলাম।

রাত্রে আরোও ২টি ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল, তাঁহারা ক্যানভাসার। শুনিলাম কলেরা এখন কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিনও বাসায় ভয়ানক বেজায় আহারে পেটের অবস্থা সুবিধাজনক ছিলনা, তারপর রাত্রে আহারে বসিয়া দেখি কেবল মাংস! যৎসামান্য আহার করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। একটু পরেই বুঝিতে পারিলাম যে কলেরা না থাকিলেও এমন একটী আনোয়ার আছে যে কলেরা অপেক্ষা বড় কম ভীতিপ্রদ নয়। সেটি মশা। এমন দুর্দ্ধর্ষ মশা জীবনে আর একবার মাত্র রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বিল চলনে দেখিয়াছিলাম। সমস্ত রাত্রি কুস্তি করিয়া ভোর বেলা একবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। উঠিতে দেরী হইয়া গেল।

এই ভিরেফর। একেবারে স্নান করিয়া চা পান শেষ করিয়া বাহিরে গেলাম। একখানা গাড়ী ঠিক করিতে চেষ্টা করায় সে আমাকে পাইয়া বসিল। অবশেষে ষ্টেসনযাবার গাড়ী যাইবার ভয় দেখাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আর হুকুম ব্যতীত কোন কথা নাই! বাজারের ভিতর দিয়া চাঁদনী চক পর্য্যন্ত যাইয়া বকসী বাবুর ও সাহেবদের বাসস্থানের দিকে যাইতে বলিলাম। ২।১ টী পুরাতন মাঠ ও কুঁড়ে ঘরের পাশ দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। উড়িয়া বালিকারা গায়ে হলুদ মাখিয়া এবং বয়স্ক ব্যক্তিগণ রোদের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে রোদ্রে বসিয়াছে। এখানে সেখানে রোদের বড়ই প্রাদুর্ভাব। ক্রমে গাড়ী বকসী বাজারে পৌঁছিল। দুইধারেই দোকান। এটী কটকের চৌরঙ্গী। মহানদীর ধারে সাহেবদের ও বড় বড় কর্ম্মচারীদের ঘরের বাংলো গুলি প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। দূরে নদীর অপর পারে নীলবর্ণ সৈনন্তেনী। প্রকাণ্ড খোলার মাঠ তার ডানদিকে পুরাতন কেল্লা। বেলা হইয়া উঠিল, যে একটু কাজ ছিল তাহা সারিয়া বাসায় ফিরিলাম।

আহারাদি করিয়া গাড়ী ডাকিলাম। কাল রাত্রে যাঁহার সহিত আলাপ হইয়াছিল তিনি আমার গাড়ীতেই উঠিলেন। ষ্টেসনে গিয়া ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় তৃতীয় বন্ধু মিঃ সেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্য ক্রমে ট্রেণ মাত্র ২৪ মিনিট late হইল। কিছু দূরে পুরী রোড হইয়া ওয়ালটেয়ার গিয়া বিকল্প পাইবার আশা আছে। মিঃ সেন আশ্চর্য্য স্ফূর্তিবাজ। তিনি একজন ট্রভলিং এজেণ্ট। কখনও সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় না, অথচ সঙ্গে যে লাগেজ দেখিলাম তাহা অন্তত ১-২০ সের মণ হইবে। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর টিকেট তাহাও কদাচিত কাটিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন যে পদস্থ রাজ কর্ম্মচারীরা T A হইতে যথেষ্ট লাভ করে কিন্তু তাঁহাদের মত গরীবে একটী পয়সা বাঁচাইলেই তাহা চুরি বলিয়া গণ্য হয়। অনেক আমোদ জনক গল্প করিয়া কাটিতে লাগিল। কাঠজুরীর সেতু পার হইয়া অত্যন্ত একটী ক্ষুদ্র নদী পার হইলাম। আবার জঙ্গল আর আশে পাশে পাহাড়! শরীরটা ভাল ছিলনা, ঘুমাইয়া পড়িলাম। জাগিয়া দেখি যে ভুবনেশ্বরে পৌঁছিয়াছি। দূরে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ মন্দির দেখা যাইতেছে—দূর হইতে নমস্কার করিলাম। ট্রেণ খুরদা রোডে থামিল। আমি বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নামিয়া পড়িলাম কারণ এ ট্রেণ পুরীতে যাইবে। ১৯০৯ সালে আমি একবার পুরী যাই আজ সেই কথাই মনে হইতেছে। তখন সবে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছি, যৌবনের আশা উৎসাহ অপরিমেয়। আমি বি-এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম বন্ধুবর 'স' বাবু একটী বড় জমিদার পুত্রের টাউটর পাইয়া যেন নিশ্চিন্ত হইয়া কার্য্যবশতঃ নিজে যাইতে না পারিয়া

[illegible]। বসিয়া ছিলাম, শুনিলাম ট্রেণের সহিত পুরী যাইতে হইবে, মন—কি? বিস্তৃত প্রশস্ত তীর, উচ্ছ্বাস ও বিস্তৃত-বিস্তৃত নীলাম্বু দর্শন করে প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তখনই স্বীকার করিলাম। অবিনাশ পুত্র ও প্রায় আমার সমবয়স্ক, হাওড়া বদলাইতে যাইতেছেন। গাড়ী রিজার্ভ করিয়া রাত্রে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বেশ ঘুমে রাত্রি কাটিয়া গেল। সকাল বেলা হইতেই কখন সমুদ্র দেখিব সেইজন্য উৎসুক হইয়া বসিয়া রহিলাম। 'সাক্ষী গোপাল' ষ্টেশন ছাড়াইলেই মন অস্থির হইয়া উঠিল। সকাল বেলা পুরী ষ্টেশন এ পৌঁছিয়া ট্রেণ হইতে নামিলাম। আমিই কর্ত্তা, লোকজন সকলেই আমারই হুকুমে ছুটিতেছে; সমুদ্রের উপরই বাড়ী নাম নিলীমা।

বাড়ী পৌঁছিয়াই ছাত্র ও আমি দু জনে ছুটিয়া সমুদ্র স্নান করিতে গেলাম। অনন্ত বিস্তৃত নীলাম্বু কি এক মহা সঙ্গীতে মন উদাস করিয়া দিতেছে। পুরীতে সমুদ্র স্নানের মত আনন্দ বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কোথায় নাই। ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ, বোম্বাই কোথাও সমুদ্র এত অশান্ত নয়। রীতিমত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় কিন্তু অসুখ হয় নাই। আমি প্রায় ১ মাস পুরীতে ছিলাম প্রত্যহ ১ ঘণ্টার উপর সমুদ্রে স্নান করিতাম কিন্তু কোন দিন অসুখ বোধ করি নাই। সমুদ্রের তীরে যেন চির বসন্ত বিরাজমান। বহু করিয়া সমুদ্র হইতে স্নিগ্ধ বাতাস সকলাই আসিতেছে। প্রায়ই বৈকাল বেলা নৈকত ভূমি দিয়া বেড়াইতে যাইতাম। অসংখ্য ছোটবড় কাঁকড়া, ঝিনুক কড়ি ইত্যাদিতে বড়ই আনন্দ জনক বোধ হইত। একটু দূরে গেলেই দলে দলে হরিণ চরিতেছে দেখা যাইত। সহর Seaside হইতে কিছু দূরে তখন একটী বৃক্ষাচ্ছাদিত অতি সুন্দর avenue দেখিয়াছি। এখন আছে কি না তাহা জানি না ভোর বেলা সেই রাস্তাতে বেড়াইয়া যত আনন্দ বোধ হইত সমস্ত ভারতে আর কোথায়ও পাই নাই। একটী ডাক্তার বাবু ছিলেন, একদিন তাঁর সহিত ৺জগন্নাথ দেখিতে গেলাম। বিচিত্র মন্দির। সিংহদরজা দিয়া একটী পাণ্ডার সহায়তায় প্রবেশ করিলে অতি কষ্টে অন্ধকার সিড়ি দিয়া পাতাল পুরীতে অবতরণ করিয়া একটী প্রকাণ্ড বেদীর উপর ৺জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তি দেখিলাম। মন্দিরের আশে পাশে বহু মন্দির তাহার মধ্যে 'বিমলা' দেবীর মন্দিরই প্রসিদ্ধ। ইনি নাকি বড়ই জাগ্রত। কোথায়ও মহাবীর (হনুমান) মূর্ত্তি। আর অসংখ্য দেবদেবী মূর্ত্তি। পাণ্ডাদের অত্যাচারে কিছু দেখিবার অবকাশ হয় না। বেশ মনে আছে যে একটী বড় গাছের নিচে একটী সুন্দরী যুবতী কাঁচল পাতিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়াছিলাম। তিনি নাকি একটী বড় ঘরের একজন বধূ। বট বৃক্ষের ফল কাঁচলে পড়িলে পুত্রবতী হইবেন, এই আশায় ধরা দিয়া বসিয়া আছেন। পাণ্ডার বাড়ীতে প্রসাদ খাইয়া একটী বড় মঠ দেখিতে গিয়াছিলাম মনে হয়। সেখানে মঠস্বামী হিন্দিতে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এখনও ভুলিতে পারি নাই। একদিন ভোরের সময় 'দেবদাসী' দের নৃত্য দেখিয়াছিলাম মনে হইতেছে। দূরবীক্ষন যন্ত্র দিয়া দূর হইতে তাহাদের দেখিয়া কি আনন্দ হইত তাহাও মনে হইতেছে। এখন পরিণত বয়সে আবার ৺জগন্নাথ মন্দিরে গিয়া এবং পুরীর সেই দৃশ্য দেখিয়া মনের কি সেই অবস্থা হইবে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ওয়ালটিয়ার বিমুখে চলিলাম।

---

## ভ্রম-সংশোধন।

'বসন্তে শান্ত নদীবক্ষে'র স্থলে ত্রিবর্ণ চিত্রখানির নাম ছাপাখানার লোকের ভ্রমবশতঃ 'বসন্তে-জ্যোৎস্না—নদীবক্ষে' হইয়া গিয়াছে। বসন্তের সহিত জ্যোৎস্নার নিকট সম্বন্ধ স্মরণ করিয়াই বোধ করি কোন অজ্ঞান কম্পোজিটার এই কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। ছবিখানি সূর্য্যাস্তের।

[illegible]

চিত্রকর—শ্রীযুক্ত ঠাকুর সিং।

# প্রতিদান

[ শ্রীগিরিবালা দেবী ]

বিবাহের পূর্ব্ব সুধীর নির্ব্বিকার চিত্তে শ্বশুর প্রদত্ত সমস্ত দ্রব্যই গ্রহণ করিল। শ্বশুর ধনী, সুতরাং প্রাপ্ত জিনিষের সংখ্যা অল্প ছিল না। হীরার আংটি, চেনহার, ঘড়ি, সরঞ্জাম, শাল, দোশালা, এমন কি সঙ্গীত চর্চ্চার বাদ্য যন্ত্রটির প্রতিও সুধীরের অখণ্ড মনোযোগ প্রকাশ পাইল। কেবল একটী জিনিষ সে গ্রহণ করিল না, সেটি শ্বশুর কন্যা মিনতি। অপরাধ—সে শ্যামাঙ্গিনী; সাদা কথায় যাহাকে কালো বলা হয়। সে কালো এই তাহার প্রধান অপরাধ তা ছাড়া অন্য কোন দোষ মিনতির শরীরে ছিল না, বরং এমন অনেক গুণ ছিল যাহা সাধারণে দুর্লভ। মাটী চাপা ফুঁইগোয়া ফুলের মত নব বধূর অন্তরের সুবাস সৌন্দর্য্যের খবর দেওয়া সে দরকার বোধ করিল না। উপর্য্যুপরি তিনবার বি,এ ফেল করিয়া সুধীরের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছিল। নিজেকে একটী অসাধারণ আদর্শ পুরুষ ভাবিয়া সে ধরাটাকে সরা জ্ঞান করিত। বিশেষতঃ আত্মীয় বন্ধুদের নিকটে তাহার একটু সৌন্দর্য্যেরও খ্যাতি ছিল। এই গৌরবে অধীর হইয়া সে সর্ব্বসাধারণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। একে তিন তিনটিবার বি,এ ফেল, দ্বিতীয় রূপবান, তৃতীয়, কলিকাতার সহরে পিতার একখানি দ্বিতল বাড়ী ও ব্যাঙ্কে কিছু নগদ টাকাও আছে, ইহাতে পিতা-মাতার সযত্নে 'নীলমণি' সুধীর সে কালো বধূ লইয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিবে এটা কি অন্যায় আশা নহে?

মিনতির সুগঠিত দেহলতা সলজ্জ যৌবনের স্নিগ্ধ হাসি নিরীক্ষণ করিয়া বন্ধুরা বলিলেন "বৌটি বেশ হয়েছে, চক্ষু দুটি বড় সুন্দর ভ্রূ ধনুকের মত বাঁকা, নাকটি বাঁশীর মত, ঠোঁট দুখানি গোলাপের পাপড়ি যেন, রং একটু ময়লা, কিন্তু ভারি প্রতিমা।"

সুধীর মুখ বিকৃত করিয়া তাচ্ছিল্য ভরে বলিল "রূপ না রূপের ছিরি, আস্তাকুড়ের পেত্নী! অমন স্ত্রীকে বিছানায় স্থান দেবার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরাও ভাল।"

সুধীরের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না; পিতামাতা সবিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহাদের আদরের নন্দদুলাল বিবাহের পর অন্দরমহল হইতে একেবারে বাহির মহলে আশ্রয় লইলেন। পাচকের দ্বারা ভাত লইয়া বাহিরের আহারাদি চলিতে লাগিল। পুত্রের অপ্রসন্নতার নিরীহ বধূটির প্রতি শাশুড়ী মনে মনে বিলক্ষণ কষ্ট হইলেন। কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না তাহার অপরাধ কি? সে তো নদীর স্রোতে কূলের মত ভাসিয়া তাঁহাদের শান্তির সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিতে আসে নাই। সাদরে সাগ্রহেই যে তাহাকে এ গৃহে তাঁরা বরণ করিয়া আনিয়াছেন! এখন এত হেলা ফেলা হতাদর কেন? সে তো ফুলেরমালা নয় উৎসবান্তে পথের ধূলায় দলিত হইবে! সে যে মানুষ, সুখে দুঃখে হাসি অশ্রুতে বিধাতা তাহার হৃদয়টুকু গঠন করিয়াছেন।

( ২ )

ছেলেকে অনেক উপদেশ দিয়াও মা কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রতিকারের পরামর্শে স্বামীকে গিয়া বলিলেন "ওগো, সুধীরের আমার কি দশা হবে, মনভাঙ্গা হ'য়ে বাছা অসুখে না পড়লে বাঁচি! আমি বলি কি—খুব সুন্দর দেখে ওর আর একটী বিয়ে দাও। গয়নাগুলো রেখে এটাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেই।"

বিবাহের খরচ বাদে বাকী পাঁচ হাজার টাকার নোট-গুলি গণিয়া গণিয়া সুধীরের পিতা সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। স্ত্রীর প্রস্তাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন "সাধে কি শাস্ত্রকারেরা বলেছেন মেয়ে-মানুষের বুদ্ধি কম; ছেলে রূপ চায়, রূপের অভাব কি? রূপের জন্যে আবার বিয়ে ছিঃ ছিঃ; এর নাম কি বি,এ পড়া? আমি ত বৌয়ের জন্যে ছেলে বিয়ে দিই নাই, একটা ক্রীতদাসী কিনেছি। বৌকে দাসী, বাঁদি করে ঘরে রাখলে তাদুকের আর ঘরেই আসবে। পুজোর উপর, জামাই ষষ্ঠী, আর একটা কাল ওটা বুঝতেই তো পারছ? ছেলেকে আবার বিয়ে দিলে ও দুবিধাটা কি হবে?" গৃহিণী নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "ঠিক বলেছ গা? আহা তোমার এত বুদ্ধি, ওটা আমার মনেই হয়নি। বৌটা এসেছে—অবধি একটা ঝিতেই কাজ চলছে। কদিন দেখে বাঁদীটাকেও বিদায় ক'রে দেব।"

মেয়ে এখানে কি করছে, না করছে তাদুকের কর্ত্তারা তো তা দেখ্‌তে আস্‌বে না, যৌ কিছু জানাতেও সাহস করবে না। সুবিধা ষোল আনা।"

একগাল হাসি হাসিয়া সুধীরের পিতা বলিলেন "এতক্ষণে যে বুঝ্‌তে পার্‌লে এটা আমার মত ভাগ্য। বুঝেছ গিন্নী, শর্ম্মার বিষয় বুদ্ধির ধার কত, কি কৌশলে ছেলের বিয়েটা দিলাম! কলকাতা আমার পঁচিশখানা বাড়ী আছে, তিনলাখ টাকা ব্যাঙ্কে মজুদ, ছেলে বরাবর ইস্কুল কলেজের 'ফাইবর' এই সব প্রচার করেই না পাড়াগাঁয়ের ভ্যাবা গঙ্গারাম জমিদারকে ভুলিয়েছিলাম। তাই বলছি ছেলের বিয়ে দেওয়া নয় তো ওটা আমার জমিদারী কেনা।"

( ৩ )

সুধীরের পিতা ছেলের বিবাহে কৌশলে যে জমিদারী কিনিয়াছিলেন; তাঁহার অদৃষ্টে যেদিন তাহা ভোগ করা ঘটিয়া উঠিল না। একদিন অকস্মাৎ কোন অজানা দেশ হইতে তাঁহার ডাক আসিল। জমিদারীর আশের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুত্রের মায়া পাশ কাটাইয়া তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। পিতার শোকে সুধীর দিনকয়েক হা-হুতাশ করিল। আমোদ প্রমোদ বন্ধ করিয়া বাহির হইতে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিল। স্বামীর এ নূতন অভিমান দেখিয়া প্রথমে মিনতি বিস্মিত হইল। হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের কারণ সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু না বুঝিলেও আনন্দে আবেশে তাহার মুকুলিত ক্ষুদ্র হৃদয়টি বিকশিত হইয়া উঠিল। স্বামী উপেক্ষা করিলেও মিনতির মনে স্বামী সৌভাগ্যগর্ব্বের সীমা ছিল না। বিবাহের চন্দ্রোজ্জ্বল রজনীতে প্রথম দৃষ্টি পাতের সঙ্গে সঙ্গেই সে যে তাহার প্রাণ মন ভক্তি ভালবাসা স্বামীর পদে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে। আপনার জগতের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার ভাবিয়া সুধীরের সুন্দর মূর্ত্তিটি হৃদয় কলকে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছে সেই সুধীর তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া, অবহেলা করিয়া দূরে সরাইয়া দিতেছিল, কিন্তু মিনতি তো তাহাকে হৃদয় হইতে দূরে সরাইতে পারে নাই। নিশি দিন প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি চালিয়া মিনতি তাহার জীবন দেবতার পূজা করিতে বিরত হয় নাই। যেই স্বামী সেই চির বাঞ্ছিত চির প্রিয় আজ মিনতির নীরব পূজা গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, এখন কি তাহার মাপ করা শোভা পায়! অভিমান করা সাজে?

সংসারের জ্ঞানহীনা সরলা কিশোরী স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারিল না, অভিমান করিতে পারিল না। একান্ত নির্ভরের সহিত সে সুধীরের শয্যার অর্দ্ধ অংশ লইয়া তাহার বাহুবন্ধনে ধরা দিল।

প্রথম সঙ্কোচ কাটার পর সুধীর স্ত্রীকে জানাইল—সে বিলাত হইতে কল কারখানার কাজ শিখিয়া আসে, কিন্তু মিনতির সাহায্য বিহনে কোনরূপেই সে আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বামী তাহার অনুমতি চায়, স্বামী তাঁহার সাহায্য চায়, শুধু এইটুকু ভাবিতেই মিনতির অন্তঃকরণ যেন আনন্দে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এতদিনের অনাদর অবহেলার গ্লানিবিদ্ধ বেদনা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। সে সুধীরকে কি দিয়া কেমন করিয়া প্রসন্ন করিবে তাহা বুঝিতেই পারিল না। সে না বুঝিলেও তাহাকে দিয়া অতীষ্ট কার্য্যের কতদূর সহায়তা হইবে সুধীর তাহা বিলক্ষণ রূপে বুঝিয়াই স্ত্রীর সহিত কয়েকদিনের প্রেমালাপ করিতে আসিয়াছিল।

আদরিণী কন্যার মিনতি ভরা চিঠি পাইয়া জামাতার, উন্নতির জন্য মিনতির পিতা সুধীরের বিলাতযাত্রার টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুধীরের পত্নী সম্ভাষণ নিরর্থক হইল না।

( ৪ )

সুধীর বিলাত চলিয়া গেলে মিনতির পিতা কন্যাকে লিখিলেন জামতা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তুমি এখানে আসিয়া থাক বহুদিন হইল সিরাজ, তোমার জননী তোমার নিমন্ত বড় ব্যগ্র হইয়াছেন ইত্যাদি মেয়ে জানাইল "এখন তাহার পিত্রালয়ে গিয়া থাকিবার সময় নহে। সদ্য বিধবা শাশুড়ী শোকে তাপে বিবশা শাশুড়ীর পুত্রও সুদূর সীমু পার তাহাকে একাকী ফেলিয়া এখন তাহার যাওয়া উচিত হইবে না। বিবাহ দিলে মেয়ে পর হয় ভাবিয়া পিতা মাতা আর জোর করিলেন না।

বছরের মধ্যেই সুধীর সাহেব সাজিয়া, সাহেবী বেশভূষা শিখিয়া দেশে ফিরিল। কিন্তু একাকী নহে—সঙ্গে আসিল—আতার কুসুম সুকুমারতা মেমসাহেব। সে অবশ্য অন্য ভাবে আসিল না, কারণ সাগর পারের আর কিছু যাবাবিহ না থাকিলেও এক স্ত্রী বিদ্যমানে দ্বিতীয়

গ্রহণ চলে না। তাই ভোরা সুধীরের বন্ধু রূপেই তাহাকে গ্রহণ করিতে আনিল। সাহেব পল্লীতে একটি ঘর ভাড়া করিয়া সুধীর বন্ধুর গৃহলক্ষ্মী কিনিয়া দিল। বিদেশে বন্ধুর একাকিনী থাকিতে ক্লেশ হয় বলিয়া সমস্ত রাত্রিও দিবসের অধিকাংশ সময় সুধীরের বন্ধুর গৃহেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। কৃপণ কদলীর ছলের মত পিতার সঞ্চিত টাকা গুলি ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হইয়া অবশেষে বাড়ী খানিও বন্ধক পড়িল। দেখিয়া শুনিয়া মা তীর্থ গ্রহণে চলিয়া গেলেন।* বন্ধুরা সুধা বিতাড়ে সরিয়া পড়িল। কেবল যাইতে পারিল না মিনতি। প্রিয়তমের প্রত্যাগমনের আশার উপর হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূত্রে বিবাহের অঞ্চলে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। সে সকাল সন্ধ্যা—তুলসী মঞ্চ চক্ষের জলে ভিজাইয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল—"তাঁর ভালকর ঠাকুর, তাঁর সুমতি দাও তাঁকে ফিরাইয়া আন, দুরদিষ্টের দুরন্তের মায়া জাল ছিন্ন করে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। আমি যে আর পারি না, এমন করে থাকা আর যে আমার সয় না আন তাঁকে ফিরিয়ে আন হরি।'

( ৫ )

মর্ম্মপীড়িতার আকুল ক্রন্দনে দেবতার আসন টলিয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু সুধীরকে ফিরিতে হইল।

সেবার বসন্ত সমাগমের সাথে সাথে সহরে শীতলা মায়ের করুণাটা একটু বেশী মাত্রাতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লোকের গৃহে গৃহে সকরুণ ক্রন্দন, আতঙ্কের করাল ছায়া।

জ্বর ও বসন্তে অভিভূত আত্মীয় জ্ঞানহারা সুধীরকে স্ত্রীর নিকটে পাঠাইয়া ভোরা বন্ধুর কর্ত্তব্য সমাধা করিল। বন্ধুর রোগের চিন্তায় শঙ্কিত হইয়া জিনিষপত্র বাঁধিয়া বসন্তের গন্ধবাহী একটি অলস সন্ধ্যার উৎকণ্ঠিতা ভোরা বোম্বাই যাত্রীর গাড়ীতে গিয়া আরোহণ করিল। সুধীরের অসুখের খবর ভোরার নিকটে গোপন ছিল না, হায় বন্ধুত্ব! হায় ভালবাসা!

যাহাকে সুধীর সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিল, সে তো উপযুক্ত প্রতিদান দিয়া আপনার পথ দেখিল, সে স্বামীর নিকট হইতে একটি দিনের তরে পথযাত্রার এক কণা পাথেয় পায় নাই, নিমিষের জন্য হৃদয়দ্বারে প্রবেশ করে নাই; সেই অনাদৃতা পরিত্যক্তা মিনতি আজ বিমুখ হইয়া দূরে যাইতে পারিল না। আহার ভুলিয়া নিদ্রা ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া—যমের সহিত অক্লান্ত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে স্বামীর প্রাণটি সে ছিনাইয়া আনিল। সতীর পতিসেবা দর্শন করিয়া প্রবীন চিকিৎসকরাও বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মরণপথের যাত্রী সুধীরের অন্তরও দ্রবীভূত হইল। মরুভূমে মন্দাকিনীর ধারা ছুটিল। সুধীর সেবারতা পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল "আমি ভাল হ'য়ে তোমার এত ভালবাসার প্রতিদান দেব মিনতি, তুমি আমায় বাঁচিয়ে তোল। একটি দিনের তরে ভুলেও আমি তোমায় ব্যথা দেব না। হৃদয়ের রত্ন জেনে হৃদয়ে রাখব।"

( ৬ )

যাহাকে হৃদয়ের রত্ন ভাবিয়া হৃদয়ে রাখার কথা সুধীর ভাবিয়া রাখিয়াছিল দুর্ব্বল শরীরে বল সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটাই বিস্মৃত হইল। মৃত্যুর ভয়াল মূর্ত্তির সম্মুখে প্রাণের ধারে উচ্চারিত বাক্যাবলী কার্য্যে পরিণত করা আর ঘটিয়া উঠিল না। মনেও পড়িল না। বিপদের সময় যে যাহা বলে সম্পদে তাহা আবার কাহার মনে থাকে?

সুধীরের আরোগ্য লাভের পর মিনতি সুধীরের রোগেই আক্রান্ত হইল। নিরানন্দ গৃহে রোগীর যন্ত্রণা ব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ তাহার ভাল না লাগিলেও সে বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিল না, কারণ তখনও শরীর বড় দুর্ব্বল। বৃদ্ধা ঝি হরির মার উপর গৃহাবধানের উপর স্ত্রীকে রাখিয়া সুধীর অগত্যা বাহিরেই আশ্রয় লইল।

* * * * *

তখনও ফাল্গুন শেষ হয় নাই। আম্র মুকুল ও বকুল সৌরভে ধরণী পুলকিত,—বাতাস গন্ধামোদিত কোকিলের কুহু কুহু মৌমাছিদের মৃদু গুঞ্জনে উৎফুল্ল মুখরিত। কানন রাণী প্রিয়তম বসন্তরাজের স্পর্শে ফুল সাজে সাজিয়া উঠিয়াছে কোথাও বিষাদ নাই, জগৎ আনন্দ রস পানে উন্মাদ বিভোর।

মিনতি মৃত্যুশয্যায় শায়িতা চিকিৎসকগণ জবাব দিয়া গিয়াছেন। হরির মা তাহার মাথার কাছে বসিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিল। এই স্নেহময়ী করুণাময়ী বস্তুটিকে কেহ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। একজনা ছাড়া সকলের হৃদয়ই সে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাই তাহার শেষ বিদায়ের সময় হরির মা অশ্রু বর্ষণ না করিয়া

থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। নীল আকাশের কোলে নক্ষত্রগুলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। দক্ষিণা বাতাস ঝিরি ঝিরি করিয়া প্রস্ফুটিত বেলার কাণে কাণে কি গোপনবারতা জানাইয়া গেল। পাশের বাড়ী হইতে কে যেন কোমল কণ্ঠস্বরে গাহিতেছিল—

কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'লনা গান!
কখন্ বকুল ফুল—ঝেরেছিল করা ফুল,
কখন্ সে ফুল—কোটা হ'য়ে গেল অবসান!

মিনতি অতিকষ্টে চক্ষু মেলিয়া অস্ফুটকণ্ঠে ডাকিল হরির মা, ডাকে—তাঁকে যে একটিবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করছে ডেকে আন্‌তে পার?"

"আমি দাদাবাবুকে ডাক্‌ছি বউমা" বলিতে বলিতে হরির মা চলিয়া গেল। পল্লীর আহ্বানে সুধীর গম্ভীর মুখে উত্তর করিল "এখন আমি কাগজ পড়ছি,—নিজের ব্যারাম শরীর নিয়ে এখন ও ঘরে যেতে পারি না।" বাবুর মেজাজের কথা কি চাকরদের বিলক্ষণরকমেই জানা ছিল, কাজেই হরির মা বিনাবাক্যব্যয়ে মিনতির নিকটে ফিরিয়া গিয়া বলিল "দাদাবাবু একটু বাদেই আস্‌ছেন বউ মা, তোমার কি বড় কষ্ট হচ্ছে?" হরির মা অশিক্ষিতা, স্ত্রীলোক কিন্তু হৃদয়হীনা নয়, তাই সুধীরের সত্য কথাটা ঘরপথের যাত্রীকে বলিতে পারিল না। মিনতি কথা বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। দ্বারের পথে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে তাহার চক্ষু তারকা স্থির হইয়া গেল। তখন পাশের বাড়ীতে সঙ্গীত চলিতেছিল—

'যতগুলি পাখী ছিল মেরে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল মনের বিলাপ তান।
ভেঙ্গেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি খেলা,
এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ!
কখন বসন্ত গেল এবার হ'ল না গান!

---

# অসার

## শিমুলের ঢেঁকি

[ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ]

১

কোটেনাক ধান কি চিঁড়া
সত্ত এটা নে কি!
আগড়া মোটা
আসকলাই খাঁটা
ভিতর ফাঁপা হঠাৎ আমার
খুল বলো বেধি।

২

কোন্ কাজে লাগে,
যব মাড়িতে পারবে কেন
এই বোকা ছাগে।
পিতল কাটারী
বাহটা ত ভারী,
মোলায়েমের ঘুষি গায়ে
বাউল আড়াগে।

৩

ইঁদুরের পালে
কামড়ে খেলে জীবন্ত ঐ
কাঠের বিড়ালে।
কাজুলের হাতী
দাঁতের কি জাতি
অলক তিলক কে পরালে
কাটা কপালে।

৪

এই গাধা ওরে
অশ্বমেধের যজ্ঞতুরগ
হয় কেমন করে।
আর কারে ছুবি
দাঁড় কাকে পুষি'
কনক নূপুর পরালেও
শেষর কি ধরে?

৫

শিমুলের ঢেঁকী
পায়ে বাধা তোমার টাকা
একবারে বেকী।
চাকুখানা শুধু
নাই মোটে বধু
পচাই ভরা মুখের কেউড়ে
তাবলো রে ঢেঁকি।

# নারীর জয়।

[ শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায় ]

বাঙ্গলা কাল্গুন ইংরেজী ফেব্রুয়ারী মাসের একটা স্মরণীয় দিন—বড় আনন্দের—বড় গৌরবের দিন। এইদিন বাঙ্গলার নারীদের অধিকার লাভের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। অধিকার লাভের জন্য আন্দোলনের পর আন্দোলন করে—নারী জাতিকে প্রবুদ্ধ ও সংহত করে তাঁরা জয়লাভের আশায় উদগ্রীব হয়ে ছিলেন, সেই আশা তাঁদের পূর্ণপ্রায় হয়ে উঠেছে। এতদিন ধরে যে প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় সর্বদাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, সেই প্রস্তাব এইদিনে অনুমোদিত হয়েছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনরের পদ এখন হতে নারীদের জন্য উন্মুক্ত হল—নারী ভোটের অধিকার লাভ করলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য নির্বাচনে এবার নারী ও পুরুষের তুল্য ক্ষমতা লাভ করেছেন। দেশের পক্ষে এ সংবাদটি কি মঙ্গলকর তা যাঁরা দেশের সম্বন্ধে একটু আধটু চিন্তা করেন তাঁদের সকলেই অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন। যদিও বাঙ্গলা দেশ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক অংশে উন্নত—যদিও সকল সৎকার্যে অন্য প্রদেশের অগ্রনী হয়ে বাঙ্গলা এতদিন চলে এসেছে কিন্তু এদেশে অবরোধপ্রথা থাকার ফলে নারীর পুরুষের সমান অধিকার লাভ এদেশের ভাগ্যে এতদিন ঘটে উঠে নাই। তাই সেদিন ও যখন বোম্বাই মিউনিসিপালিটিতে মহিলারা ভোট দিবার অধিকার লাভ করলেন, আর মহিলারা সদস্য হবার যোগ্যতলে বিবেচিত হলেন, সেদিন এই বাঙ্গলার নারীদের অবস্থা স্মরণ করে প্রাণ দুঃখে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যদিও বাঙ্গলার নারীর এ আন্দোলন বেশী দিনের নয়—যদিও এখানে নারীর অবস্থা বোম্বাইএর নারীদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না তবু ও সেদিন মনে ভয় হয়েছিল যে বাঙ্গলার নারীদের অধিকারলাভের আন্দোলন বুঝি বা বিফল হয়। কিন্তু সে ভয় দূর হয়ে গেছে। নারী আজ বিজয়লাভ করেছেন যেহেতু অল্প সময়ের মধ্যে মহিলা এই অধিকার লাভ করতে পেরেছেন, এত অল্প সময়ে, এত অল্প আন্দোলনে আর কোনও মহিলা সমাজই এ অধিকার লাভ করতে পারেন নি। তাঁদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের এই প্রথম সোপান। তাঁদের এই বিজয় তাঁদের উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত করে রাষ্ট্রীয় সকল অধিকারেই যে অদূর ভবিষ্যতে অধিকারী করে তুলবে, এ-বিষয়ে আর কারও সন্দেহ থাকতে পারে না। ইংলণ্ডে এই রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য সাফ্রেজিষ্টদের কি পীড়নই না সহ্য করতে হয়েছিল। যে সব মহিলা প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে নারীকে অধিকার দেবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন, তাঁদের পবিত্র মহিমার বলেই না আজ ইংলণ্ডের মত রক্ষণশীল দেশে ও নারী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেছেন! তাঁরা চিরকাল বিশ্বের কল্যাণকামীদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী।

আজ যখন অধিকাংশ লোকেই নারীকে শিক্ষিতা করে তোলা, ও নারীকে নারীর অধিকার দান করার পক্ষপাতী তখন, যাঁরা এই নারীর প্রথম জয়ের বিরুদ্ধে নানারূপ অখ্যাতিকর কথা বলেন, তাঁদের কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন নাই বলিয়াই বিশ্বাস। নারীকে ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখার ফল এখন অনেকেই বেশ উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। বিধি নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখার ফলে শক্তিস্বরূপিণী নারী আজ অবলা—সংসার পথে পথের সাথী না হইয়া ভার স্বরূপ। এই সব কুফলের একমাত্র কারণ নারীর অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতাই নারীকে এতদিন অন্ধকারের মধ্যে আনন্দে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু আজ যখন যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মৃতপ্রাণের মধ্যেও জাগরণের সাড়া প্রবেশ করল, মুক্তির স্বাধিপাতে জ্ঞানের আলোর রেখা ফুটে উঠল—তখন নারী বুঝলেন অজ্ঞতায় তিমিরে নিদ্রা যাওয়ার ফলে তাঁদের অবস্থা কি শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তাই তাঁরা সকল নারীকে জাগাবার জন্য বদ্ধ পরিকর হলেন। নির্ভয়ে তেজস্বীতার সঙ্গে তাঁরা পথের বাধা বিঘ্ন দূর করতে প্রয়াস পেলেন। তাই

স্বার্থ হানির ভয়ে পুরুষ যখন তাদের এ অধিকারলাভের পথে নানা বাধা দেবার সঙ্কল্প করলেন তখন তাঁরা বীর-দর্পে তাঁদের সঙ্কুচিত ভাবকে দূর করে দিয়ে নিজেদের গন্তব্য পথে ছুটে চলতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁরা বিশ্বের নারী প্রগতির সঙ্গে নিজেদের গতিকে চালিয়ে নেবার জন্য যত্ন করতে লাগলেন। অবশ্য উৎসাহের ভরে তাঁরা যে কার্য্যে রত হয়েছিলেন—তাতে এতদিনে তাঁরা কিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করেছেন। বাঙ্গলার নারীর সকল বাঙ্গালীর যে এতে গৌরব এতে কারও সন্দেহ নেই। বাঙ্গলার মহিলা সমাজ আজ আর ভারতের অন্য মহিলা সমাজের চক্ষে হীনভাবে পরিগণিত হবেন না। তাঁরা আজ অপর সকলেরই সমকক্ষ বলে তাঁদের সঙ্গে একযোগে চলতে পারবেন। যদি বাঙ্গলার নারীরা এই ভোটের অধিকার লাভ না করতেন তাহলে অন্যান্য মহিলা সমাজে, তাঁরা যে কৃপার পাত্রী হয়ে থাকতেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

নারী আজ যে অধিকার লাভ করলেন—এই অধিকারের সুফলের উপর তাঁদের রাষ্ট্রীয় অন্যান্য অধিকার নির্ভর করছে। যাতে এই অধিকারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সেজন্য নারী ও পুরুষের উভয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন। দেশের প্রত্যেক হিতৈষীর কর্ত্তব্য নারীর কার্য্যে সহায়তা করিয়া দেশের উন্নতির পথ সরল ও সুন্দর করিয়া তোলা। বর্ত্তমান সময়তা আমাদের এই কাজ করতেই ইঙ্গিত করছে।

---

## কেন

[ শ্রীলীলা দেবী ]

কেন তাড়াতাড়ি কাজ সারা আর
নাই উদ্যম প্রাণের ঢেউ
বোঝ তরে আজ অধীর আবেগে
পথ পানে চেয়ে নাই তো কেউ
নদীকূলে জল করে ছল্ ছল্ ছল্
ছল ক'রে সেথা কে যাবে আর
দুয়ারের আজে পুকুরের পাড়ে,
উঁকি মারা নাই হাজার বার
কাননের গায় বকুল শাখায়
শিরীষের ফাঁকে রাখিয়া চোখ
অধীর হয় না আশাপথ চেয়ে
যেতে বাধা দিলে অপর লোক
কাঁচ পোকা টীপ বাসন্তী সাড়ী
কেন পরা সেরে সকল কাজ ?
যে প্রেম চক্ষে সুন্দর করে
সে নাই কি হবে এমন সাজ ?
পুষ্প পরাগ অঙ্কিতে কেলে
ফিরে ফিরে দেখা সারটী পথ
অযোধ্যে পলাশ পথময় ছিঁড়ে
রচেনা তো কেউ আমার রথ ?
চম্পক আর রজনী গন্ধা
রাখেনা তো কেউ গোপনে ঘরে
মাধবী কামিনী গাঁথিয়া যতনে
সাধা সাধি নাই চরণ তরে
কাজ নিয়ে ভুলে থাকি এলোচুলে
কাজ সারা মন নাইরে আর
উন্মন তার উদাস সে দিঠি
খোঁজে না তো মোরে বারম্বার !

---

# উপেক্ষিতা

[ শ্রীসুধা দেবী ]

১

ফিরোজ আর দুলিয়া যখন এক সঙ্গে দু'টীতে গ্রামের পাঠশালায় পড়তে যেতো তখন সবাই ব'লত দুটীতে দিব্যি মানায়। যেন এক বৃন্তে দুটী ফুল। দুজনে এত ভাব যে কেউ কাউকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না। যেখানে ফিরোজ দুলিয়াও ঠিক সেইখানে আছে। দুলিয়ার বাপ ছিল গ্রামের সর্দার। এ সংসারে বুড়োর এক দুলিয়া ছাড়া আর আপনার বলতে কেউ ছিল না। দুলিয়া তার মার মুখের কথা ভুলে গেছে। সে যখন দু'বছরের তখন তার মা তাকে রেখে এক অজানা দেশের হঠাৎ যাত্রী হয়ে পড়ে। দুলিয়ার মার মৃত্যুতে বুড়ো একেবারে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। সবাই ভাবলো হয়ত বুড়োও স্ত্রীর শোকে তারই কাছে যাবে। কিন্তু তা আর হ'ল না। দুলিয়ার সুন্দর কচি মুখ দেখে আবার সে নিজেতে ফিরে এলো। দুলিয়াকে তার বুকে তুলে চেপে ধরলো। তার শূন্য হৃদয়ে আশার আলো জ্বলে উঠলো, কল্পনদীর মত তার শুষ্ক হৃদয়ে পিতৃস্নেহ রস-ধারা দু কূল ছাপিয়ে উঠলো। স্ত্রীর মুখ সে দুলিয়ার মুখে দেখে আনন্দে নেচে উঠলো। সে আবার সংসারে ধরা দিল শুধু দুলিয়াকে মানুষ করতে।

গ্রামের অনেকেই তার এই অবস্থা দেখে তাকে পুনর্বার দারপরিগ্রহণের জন্য পরামর্শ দিল। সবাই বলতে লাগলো তা না হলে তার এই কচি মেয়েকে বাঁচান দায় হবে। আরও এক কথা এই যে তার দুটী মুখে তুলে দেবার ত একটা লোক চাই। বুড়ো বয়সে একটু সেবা ত চাই অনেকে অনেক রকম ভাল পরামর্শ দিয়ে যেতে লাগলো। বুড়ো কিন্তু কারও কথায় কান দিল না। শুধু সে দুলিয়ার মুখের পানে চেয়ে তার এক দূরসম্পর্কীয়া মাতুলানীকে বাড়ীতে নিয়ে এলো।

ফিরোজ ছিল এই বিধবার একমাত্র ছেলে। স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা দাসীবৃত্তি করে পুত্রকে নিজের মুখের গ্রাস তুলে দিয়ে মানুষ করছিল। কষ্টের সীমা ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন কি জানি কোন শুভ লগনে ভগবান বিধবার ভাগ্য বদলে দিলেন। সে তার পাঁচ বছরের অনাথ পিতৃহীন বালককে নিয়ে দুলিয়ার বাড়ীতে এসে দুলিয়ার তার নিজের হাতে তুলে নিল। তারপর দেখতে দেখতে ফিরোজ আর দুলিয়া স্নেহের কোলে বেড়ে উঠতে লাগলো। এমনি করে ধীরে ধীরে ফিরোজ ও দুলিয়ার বাপের হৃদয়ের কোণে দুলিয়ার পাশে নিজের আসন একটু দখল করে নিল। বুড়ো ফিরোজ বলতে অজ্ঞান। বুড়োর ও শেষের দিনগুলো এই দুটী কিশোর কিশোরীর হাসিমুখ দেখে এমনিভাবে শেষ হতে লাগলো।

২

এমনি করে অনেক সুদীর্ঘ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। দুলিয়ার গায়া অঙ্গে প্রথম ফাল্গুনের মত হাওয়া তার আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দিয়ে যেতে লাগলো। বুড়ো ভাবলে ফিরোজের হাতে তার দুলিয়াকে রাঙ্গা সুতা দিয়ে বেঁধে দেবে। দুলিয়াকে সে প্রাণ থাকতে কাছ ছাড়া করতে পারবে না আরও সে বুঝেছিল যে দুজনেই দুজনকে ভালবাসে তাই সে সেদিন যখন ফিরোজের মায়ের কাছে গিয়ে বল্লে বউদি দুলির একটা বরের যোগাড় দেখতে হবে। কোথায় ভাল পাত্র আছে বলত। তার বউদি তখন বলেছিল আকবর সার ছেলের সঙ্গে হয় না। বেশ ছেলেটী। দুলিয়ার সঙ্গে দিব্যি মানাবে। বুড়ো তখন রাগ দিয়ে বল্লে না না ও ছেলের সঙ্গে হবে না। আমি মনে করেছি আসছে মাসের প্রথমেই আমি ফিরোজের হাতেই দুলিকে বেঁধে দেব। তুমি সব যোগাড় কর। সময় ত আর বেশী নেই। বিধবার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়লো।

* * * *

ঠিক সেই দিন রাতে হঠাৎ খবর এলো রাজার সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে। ফিরোজের যুদ্ধে ডাক এলো।

* * *

৩

সন্ধ্যার ম্লান আঁধার ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। শ্রান্ত বিহগ ক্লান্ত পাখা মেলে

নিজেদের খাদার কিনতে ব্যস্ত। নদীর জল কলকীতি গাহিয়া অবিরত কি জানি কার উদ্দেশে কোথায় ছুটে চলেছে। দখিন হাওয়া কি জানি কোন বিরহিনীর মর্মবেদনা বহন করে এনে বারে বারে বকুল শাখায় প্রত্যাহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। অদূরে বকুলের তলে দুটী তরুণ তরুণী বসে ছিল। বকুলের গন্ধে চারিদিক ভরে উঠেছিল। তারপর হঠাৎ তরুণ তরুণীর মুখ খানি নিজের কোলের উপর রেখে দিল। মাঝে মাঝে তরুণীর দুরন্ত চিকুর তার মুখের উপর এসে পড়ছিল আর তরুণ সেই এক একবার তার মুখ খানি তরুণীর মুখের পরে রাখছে অমনি তরুণীর মুখখানি সলাজ হাসিতে ভরে উঠে আরও সুন্দর শ্রী করে তুলছিল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তুলিয়া বলে আচ্ছা ফিরোজ তুমি যে কোথায় যাবে বলেছ? সে কত দূর ফিরোজ? তুলিয়ার কথা শুনে ফিরোজের মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে বল্লে যুদ্ধে তুলিয়া যুদ্ধে—কালই প্রাতে আমায় তোমাকে ছেড়ে জন্মের মত যেতে হবে। ফিরোজের কথা শুনে সজোরে তার হাতটী নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে বল্লে কেন ত ফিরোজ আমি তোমার সঙ্গে যাবো, যুদ্ধে। না তুলিয়া তা, হয় না, তা হয় না, তুমি তা কেমন করে সহ্য করবে, বলে ফিরোজ তুলিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। তবে তুমি কবে আসবে, ফিরোজ বলে তুলিয়া প্রফুল্ল নয়নে ফিরোজের মুখের পানে চেয়ে রইলো। তারও চোখ-জলে ভারী হয়ে উঠলো। জানি না তুলিয়া জানি না কবে আবার ফিরে আসবো। হয়ত আসতে ও পারি আবার হয়ত না ও আসতে পারি। আবার যদি আসি তখন হয়ত দেখব যে তুমি আমার আর নেই। হয়ত ভুলে যাবে। তুলিয়া ফিরোজের বুকে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো। ফিরোজ তুলিয়ার অধরে বিদায় চিহ্ন এঁকে দিল।

৪

আজ চার মাস হ'ল ফিরোজ যুদ্ধের সেনা নায়ক হয়ে যুদ্ধে গিয়েছে। তুলিয়া তারই আগমন পথ চেয়ে বসে আছে। প্রথম প্রথম সে প্রায় চিঠি দিত কিন্তু এখন আর তুলিয়াকে সে কোন খবর দেয় না। সে যখন তার বাবার কাছে শোনে যে ফিরোজ আজ একটা মস্ত দেশ জয় করেছে তখন তার বুক গরবে আরও স্ফীত হয়ে উঠতো। সেদিন আর সে স্থির হয়ে থাকতে পারতো না। সমস্ত রাত জেগে-মনের মত করে তাকে চিঠি লিখতে বসতো। চিঠি দিয়ে ভাবতো এবার নিশ্চয় তার উত্তর সে পাবে কিন্তু যখন দিন তার বারের পাশ দিয়ে চলে যেত একমাস ধরে তাকে কোন চিঠি না দিয়ে তখন সে ভাবতো হয়ত কাজের ভিড়ে সময় পায় না তাই দিতে পারে না। এমনি করে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে সারারাত চোখের জলে বিছানা ভিজিয়ে দিত। তবুও ফিরোজের সে চিঠি পেত না আশা ও ত্যাগ করতো না।

দীর্ঘ এক বৎসর অবিশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধ হ'ল। তারপর থেমে গেল; যারা বেঁচে ছিল তারা একে একে সবাই দেশে ফিরে আসতে লাগলো। তুলিয়ার বুক আনন্দে নেচে উঠলো—এবার তার প্রাণের ফিরোজ জয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে ফিরে আসবে এত দিন পরে তার প্রাণে আবার বসন্তের হাসি ফিরে এলো সে চারিদিকে নূতন আলো দেখে হেসে উঠলো। তুলিয়ার বাবা তার বউদিকে বলে বিয়ের সব ঠিক করে রাখ। ফিরোজ এলেই বিয়ে দেব। তুলি আমার কেবে এতটুকু হ'য়ে।

সে দিন একজন লোক ফিরে এলো। তুলিয়ার বাবা শুনলো তাদের মুখে যে ফিরোজ সেই দেশের রাজার মেয়েকে বিয়ে করে আনছে। হৈচৈ বলে পড়লো। ফিরোজের মা কেঁদে আকুল। তুলিয়া কিন্তু একথা বিশ্বাস কর'লে না। সে ভাবলো তাও কি হয়। বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে তুলিয়াকে ডেকে বল্লে মা শুনেছিস্ ফিরোজ কি হারাম—সে নাকি একজনকে সাদী করে নিয়ে আসছে। বাপের কথা শুনে মেয়ে নিজের ঘরের ছুটে গেল। অল্প কিছুতে বাধা মানতে চায় না। তবুও সে মনে ভাবলে তাও কি হয়।

* * *

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। রাঙা রবি তার শেষ বিদায়ের হাসিটী হেসে নদীর জলে ডুবু ডুবু। একখানা যুদ্ধ জাহাজ ঘাটে এসে থামলো। তুলিয়া গোপনে তার ফিরোজকে আনতে এসেছে। কিন্তু পরে তুলিয়া যা দেখলো তাতে তার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠলো। সে আবার চোখ মুছে ভালো করে দেখলো যেন ফিরোজের একটী তরুণীর অধরে অধর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা দেহ তার কেঁপে উঠলো। সে সেইখানে বসে পড়লো। মনে

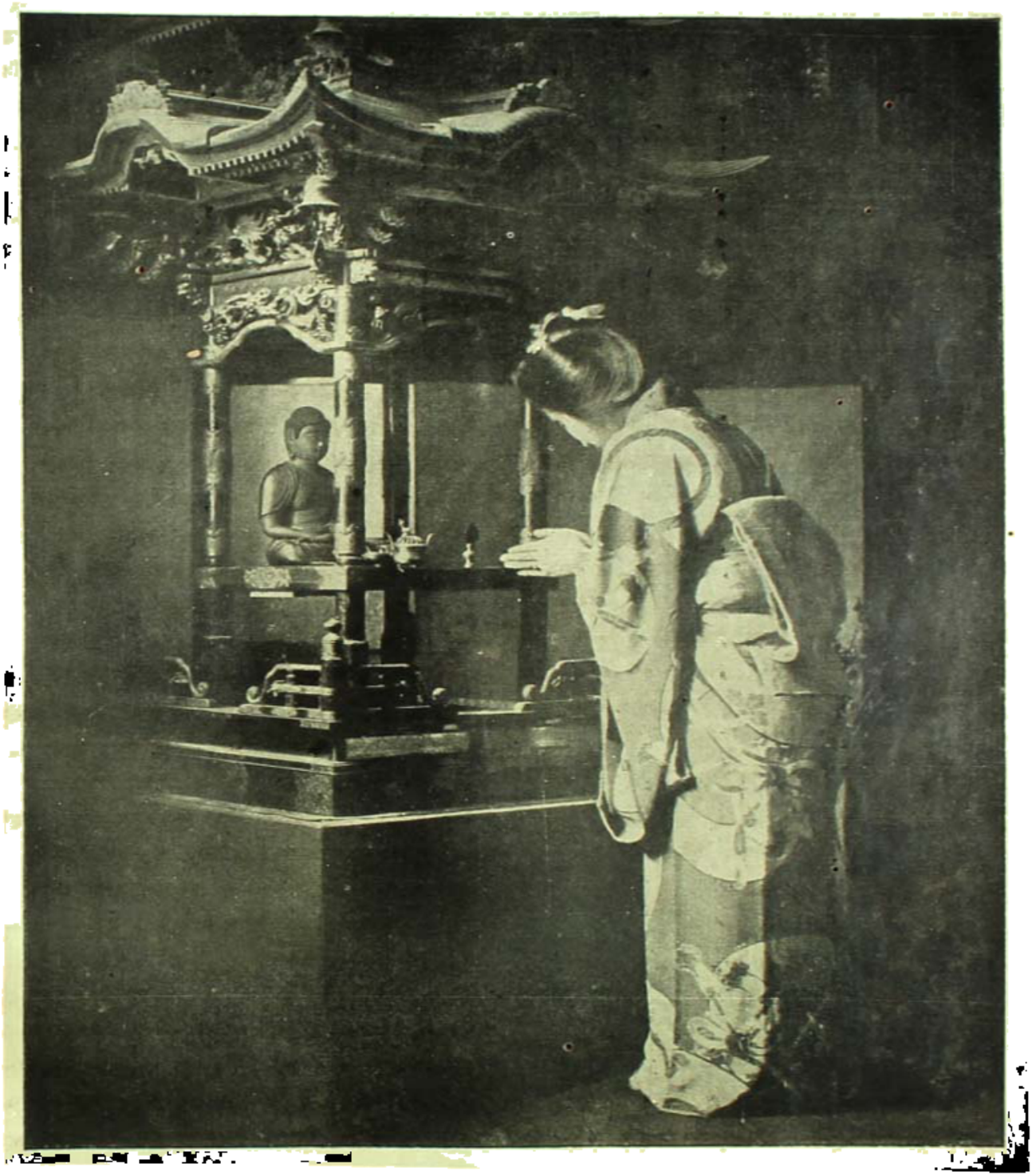

নিবেদন।

( বলিয়া রাখা আবশ্যক, বুদ্ধের মন্দিরে ক্যামেরার প্রবেশাধিকার নাই, তাহা সত্ত্বেও শিল্পী এখানি সংগ্রহ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ চুরী করিয়াই। এ চুরীতে পাপ নাই বলিয়াই বিশ্বাস। যেহেতু এমন একখানা ছবি না দেখলে পাপের। )

Lakshmibilas Press, Calcutta.

ভাবলো হয় ত তার দেখবার ভুল তাই সে আবার যেমন দেখতে যাবে অমনি কে যেন বলে উঠলো ঐ ফিরোজ এসেছে তার বউ নিয়ে। তুলিয়া আর সেখানে থাকতে পারলো না। সে তাড়াতাড়ি বনের পথ ধরে তার বাল্যের সাথী—কৈশরের সাথী—তার প্রাণের ফিরোজকে খুঁজে আনতে চলে গেল। সন্ধ্যার কাল যবনিকা তার আশে পাশে পড়ে গেল।

বাড়ী এসে তুলিয়া বেশ সহজ ভাবেই রইলো। তার বাড়ীর লোকের থেকে থেকে মনের ভেতর বেথা জমে উঠ্‌ছিল, সেথ থেকে জল খাবারও উপজন হচ্ছিল কিন্তু তুলিয়াকে দেখে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। যেন সে কিছু জানে না, কিছুই যেন তার দুঃখ নেই—এমনই ভাব!

হঠাৎ তাদের বাড়ীতে একটা রোল গোল উঠ্‌লো, ফিরোজ আস্‌ছে! তুলিয়ার বাপ ভাব্‌লে, ফিরোজ যখন নিজেই তার সঙ্গে এখনি দেখা করতে আস্‌ছে তখন সে হয়ত সত্যিই বিয়ে করে আসে নি; এখনও সে তুলিয়ার পাণিপ্রার্থীই আছে! এই ভেবে বড় আশা করে তুলিয়ার বাপ ফিরোজকে বুকে চেপে ধরলেন।

অন্য কথার পর ফিরোজ নতমুখে বল্লে—তুলিয়া কোথা?

তুলিয়ার বাপ্ মেয়েকে ডাকতে পাঠালেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তুলিয়াকে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। সে যে কোথায় গেছে, কেউ সন্ধান দিতে পারলে না।

ফিরোজ বল্লে—তাকে বলবেন তার সঙ্গে দেখা করতেই এত তাড়াতাড়ি আমার আসা!

সে চুপ করল। তুলিয়ার বাপ ভাবছিলেন, ফিরোজ আরও কিছু বলবে! তাই তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ফিরোজ আপনার মনে বল্লে—আর বলবেন, দৈব আদেশে আমাকে বিবাহ করতে হয়েছে।···বলে সে মাথা নীচু করে চলে গেল।

তখন অন্ধকার হয়ে গেছে! তুলিয়ার বাপ চোখে কাপসা দেখ্‌ছিলেন, পা চলছিল বুঝি বা পড়ে যান, ঠিক সেই সময়ে কে এসে তাঁর হাত ধরে বল্লে—ঘরে চল বাবা!

কে রে তুলিয়া! এখনই···

আমি জানি বাবা—চল!

চলতে চলতে তুলিয়ার বাপ রুদ্ধকণ্ঠে বল্লেন—তুলিয়া তোকে যে দুঃখ দিয়েছে···

কিসের দুঃখ বাবা? মানুষ বাপ যাকে ভালবেসে জীবন সুখে কাটাতে পারে না?—চল, চল, বৃষ্টি আস্‌ছে।

বৃষ্টি এসে পড়েছিল, দাবাটী বন্ধ করে সে বাপের পাশে বসে পড়ল।

---

## ধন ও দারিদ্র

( চীনা প্রবচন )

( শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র )

পুরবে বাকি থাকবে না কেউ
হ'লে মানুষ অর্থলালী;
থাকে সুখে থাকবে যে—'কেউ,'
দুখে হ'লে অন্ধ কালী।

## তিনটী

( শেখ সা'দী )

( শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র )

তিনের অভাবে এই ভিনে দেখি শুনি :—
'বাণিজ্য' ব্যতীত স্থায়ী নয় 'অর্থবল,'
'যুক্তি' ভিন্ন মৃত সে ত 'বিজ্ঞানের বাণী,'
'দ্রাক্ষার প্রলাপ' নাই বিহনে 'শৃঙ্খলা'।

নব বসন্তে
প্রিয়জনকে উপহার দিতে, গৃহের শ্রিষ্ট ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের অ্যাইভিক্যাল গ্লাসেস্‌ফিগার এবং মেসিন প্রস্তুত—চশমা, ফ্রেম, ঘড়ি ও জুয়েলেট সাবধান ব্যবহার করুন।
ইণ্ডিয়ান অপ্টিক্যাল কোম্পানী
৬৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪২৬

বসন্ত—সর্ব্বত্র।

# বৃদ্ধের বসন্ত

## ( ব্যঙ্গ কবিতা )

[ শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ]

সৃষ্টি ছাড়া এ কি যে অনাচার,
কলেজে পড়ার ফলে—
ছেলেমেয়ের সব লজ্জা হারাল,
দেশ গেল রসাতলে !
যুবক-যুবতী মিলিয়া আরামে
আছে গলাগলি ধরি',
দিনে দুপুরেও নাহি সঙ্কোচ,
ছি-ছি-ছি-ছি লাজে মরি !
আমাদেরও ছিল সুদিন কখনো,
ছিল না'ত হেন ধারা,—
গৃহিণীর সাথে হত না কিছুই—
মুচ্‌কি হাসিটি ছাড়া।
আনাচে-কানাচে ঘুরিয়াছি বটে,
তুলেও ফোটেনি গলা ;
কাশিয়াছি ঠিক্—পাই নাই সাড়া,
হয় নাই কথা বলা।
সে সোণার দিন গেছে আজ চলি,
দুর্দ্দিনে দেশ ছায় :—
ঘোর কলিকাল—বৃদ্ধের আর
নাহি সম্মান হায় !
সাহস দেখ না তরুণ-তরুণী
হাসিমুখে এসে কয়,
"বৃদ্ধের দল সহ পেন্সান,
এযে তরুণের জয়।
আকাশে বাতাসে প্রেমের তুফান,
ভুবনে দিয়াছে দোলা,
বন্ধন সব শিথিল করিয়া
এসেছে আপন ভোলা।
রক্তের রসের পিচ্‌কারী হানে,
হেসে উঠে খলখলি।
গোলাপী নেশায় আঁখি ঢুলু ঢুলু,
বুকে এসে পড়ে চলি।
আজ আর নাই লাজের বালাই,
ভুলে যাও অভিমান।
বসন্ত এল আনন্দ বহি,
গাহ তার জয়গান।"
বসন্ত সে'ত মস্ত একটা,
শুটি শুটে সারা গায় ;
শীতলা দেবীর আরাধনা কর,
তা ছাড়া বাঁচা যে দায় !
বাতাসে একার হুম্‌কী শুনিবে,
চৌকিদার এল না কি ?
ভিক্ষোজারীর কোরক্ এনেছে,
চলিবে না আর ফাঁকি।
শস্য লুটিতে বর্গীর দল
আবার এসেছে বুঝি,
এতদিনে হায় মাঠে মারা যায়
সঞ্চিত সব পুঁজি !
পশ্চিমা কোন গুণ্ডা কি এল ?
করিবে কি রাহাজানি ?
কেরার করিনে—পাশ হয়ে গেছে
'গুণ্ডা আইন' খানি।
পাগল কি এল ? ঝুলে ফেরে ঘরা
যাক্ সে ভিন্ন দেশে,
হেথায়'ত নাই পাগ্‌লাগারদ—
ধরিবে কেন সে শেষে !
মাতাল ঘরিবে আসিয়াই থাকে
মিলিবে না হেথা ঠাঁই,
বাবাজীর কিছু হবে না সুবিধা—
মদের আড়ৎ নাই।
ছেলেধরা এল ? কি হবে উপায় ?
হোস্‌নে ঘরের বা'র ;
বৃদ্ধের কথা মেনে চল্ সবে,
হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার।
বাবু সেজে বুঝি লম্পট এল,
গায় ঘিয়েভাজা গান ;
বউ-ঝিরা সব ঘোম্‌টা টান গো,—
সাবধান, সাবধান !

# তোড়া।

## মামী

এ মামার স্ত্রী মামী নয়। ব্যাপারটা এত সহজ নয় যে হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন। এ মিশরের মামী এবং ইহার ইতিহাসটাও একটু বিচিত্র। প্রাচীন মিশরবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, দেহ যতদিন থাকিবে আত্মাও ততদিন উহার সহিত জীবিত থাকিবে। এই বিশ্বাসের ফলেই তাহারা শবদেহ ধ্বংস করিত না বা কবর দিত না। শবদেহগুলি যাহাতে পচিয়া না যায় সেজন্য নানা উপায় অবলম্বিত হইত। তৎপর প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ-গহ্বরে ঐগুলি রক্ষিত হইত। ৪।৫ হাজার বৎসরের শবদেহও আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই সকল সুরক্ষিত শবদেহকেই মামী ( Mummy ) বলে।

## বিচিত্র আইন

জার্ম্মেনীর ভূতপূর্ব্ব কৈসার একটা প্রকাণ্ড ঘুড়ি ওড়াইয়া নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিলেও লোকটির ভিতর রসিকতার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন যে, বুড়ো বয়সে রসের নাগর সাজিয়া তিনি যে একটী বিবাহ করিয়াছেন, সে সম্পর্কেই বুঝি কিছু বলিব। বালাই, তিনি বৃদ্ধ বয়সে ( বৃদ্ধই বা বলি কি করিয়া?—তিনি না কি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রভাবে আবার যুবক সাজিয়া খোস্ মেজাজে বহাল তবিয়তে দিন কাটাইতেছেন ) লাভির আশার যোগনে যে বিবাহ করিয়াছেন তাহা লইয়া হুইচৈ করিয়া পাতকের ভাগী হইব কেন? কথাটা কি, তিনি তাঁহার যৌবনপ্রতাপের সময় এক আইন পাশ করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক সৈন্যকেই গোঁফ রাখিতে হইবে। তাঁহার ছবি দেখিলে, প্রথমেই তাঁর ঐ সুসজ্জিত গোঁফের উপর দৃষ্টি পড়ে না কি? ভূতপূর্ব্ব কৈসার আর কিছু জানুন বা না জানুন, গোঁফের কদর ষোল আনাই জানেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

## শিশু-সংসদ

শিশুদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য-জগতে নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। শিশুরাই যে জাতির ভবিষ্যৎ আশা এ কথা তাঁহাদের অজানা নাই, কিন্তু আমাদের দেশের অভিভাবকেরা এবিষয়ে একেবারে কুম্ভকর্ণ। তাঁহাদের ঘাড়ে অনেক কাজ তাই এ সকল বিষয়ে আর হুঁস্ নাই। সেদিন চন্দননগরের "নিবন্ধ" কাগজে এবিষয়ে একটী আশার সংবাদ পড়িয়া পুলকিত হইয়াছি। সেখানে না কি সুকবি শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেন, তাঁহার নিজ ভবনে একটী শিশু-সংসদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়াই এই সংসদ। শিশুদের সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যে উৎসাহ দেওয়াই এই সংসদের মূল উদ্দেশ্য। পাড়ার মৌটিকেও না কি সংসদের উপকারার্থ পরিশ্রম করিতে হয়। প্রত্যেক পরিবারেই এইরূপ এক একটী সংসদ গঠিত হইলে শিশুদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আতীয় উন্নতিও অনেকটা সাধিত হইবে এবং প্রতি গৃহে আনন্দের কল্লোল-ধারা প্রবাহিত হইবে।

## খুচরা খবর

ভারতবর্ষে শতকরা ৮৭জন, কষিয়ায় ৭০, অষ্ট্রিয়ায় ৬০, ইটালীতে ৫২, আয়রলণ্ডে ৪৫, ক্যানেডায় ৪০, ফ্রান্সে ৪২, জর্ম্মেনীতে ৩৯, মার্কিন যুক্তরাজ্যে ২৫, অষ্ট্রেলীয়া ও বেলজিয়মে ২৫ ও ইংলণ্ডে শতকরা ২২জন লোক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

• • • •

ব্রহ্মদেশের উনান যেলে এক বিচিত্র আইন আছে যে, ডাকাতির সংস্রবে কেবল ডাকাত নয়, ডাকাতের গ্রামবাসী সকলের মুণ্ডপাত হয়, চুরির অপরাধে চোরের পরিবারস্থ ছেলে মেয়ে সকলকেই কাটিয়া ফেলা হয়।

• • • •

এক লণ্ডনেই বাইশখানা দৈনিক কাগজ আছে।

• • • •

স্ত্রীলোকের ঘুম না কি পুরুষের ঘুমের চেয়ে অনেক পাতলা। মোটা স্ত্রীলোকের ঘুমও এই শ্রেণীতে পড়ে কি না সে বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে,—ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

৪৷৷ বিনামূল্যে লকেটসহিত ফটো
ফটো এনলার্জিং কিনিলে
ফটো সংশোধন সিকি মূল্যে পাঠান
কলিকাতা ও বেঙ্গল রবার ষ্টাম্প মেকার
৩৩নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

# স্মৃতি-মন্দির

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাচ ও আমাদের জাতের ধর্ম, বড়-বৌ! জাল করবার শক্তি এক-কড়ার যাবৎ আর নাই যাক্, মন্দ করতে সবাই মজবুত।

তুমি ত সব জান মা! অনাথা বিধবা আমি ঐ এক কোঁটা মেয়ে নিয়ে অকূলে ভেসেছি, আমার কি আছে মা যে, যেদিন ইচ্ছে করব, যে-দিন বলব, আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলব! আমি পাল-বাবুদের পা জড়িয়ে ধরে বলে ছিলুম মা, যে আপনারা পাঁচজনই ত আমাদের অভিভাবক, নেহাৎ কানা খোঁড়া না হয় একটি পাত্র দেখে-শুনে দিন, ভিটে বেচে হোক আর যে করেই হোক আমি শরতের বিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমাকে কায় বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে হয় কি বাই করতে হয় তার জন্যে আমি ভাবি নে—সে কথা শুনে সে কি হাসি মা! হাসতে হাসতে সেজবাবু বল্লেন, ভিটে বেচতে হ'বে কেন, জমিদারের ছেলে যখন হাতে আছে, নতুন কোঠা উঠবে অট্টালিকা হবে, ভাবনা কি-মা! এক বাড়ী নেমন্তন্ন লোক, তারই মাঝখানে...আমার মনে হল, মা বসুমতী, দ্বিধা হও মা, তোমার গর্ভে প্রবেশ করে সকল জ্বালা জুড়াই—বলিতে বলিতে এক বিধবা রমণী আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সম্মুখে বসিয়া আর একটি দরিদ্র বিধবা নতমুখে অভাগিনী দত্ত গৃহিণীর দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলেন।

বৎসরের পূর্বে এই অভাগিনীই এই গ্রামের মধ্যে সুভাগিনী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার স্বামী বিহারীলাল দত্ত মহাশয় সহরে পাটের দালালী করিতেন, দেশের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব বারো মাসে তের পার্বণ ত হইতই আর কত অনাথ-আতুর যে বিহারীলাল প্রতিষ্ঠিত স্বর্গ কাশীর অন্নপূর্ণা সত্রে অন্নবস্ত্র পাইত, তাহার ঠিক ঠিকানা ছিল না তারপর একদিনে কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল, একমাত্র ঈশ্বরই বলিতে পারেন। যদি মানুষ হীরা জহরত বোঝাই একখানা পান্সী মৃদুমন্দ বায়ুতে অনুকূল স্রোতভরে তরতর করিয়া বহিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ সে নৌকা কেমন করিয়া চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া অতলে তলাইয়া গেল, কেহই জানিল না, জানিল কেবল একজন, সে নৌকাডুবি হইতে ক্ষুদ্র একটি শিশু বুকে লইয়া ভাসিতে ভাসিতে একটা চড়ায় গিয়া ঠেকিল। অত বড় একটা পাহাড়ের অত্যন্তরদেশ যে এমন ধারা ফোঁপরা হইয়াছিল, কে জানিত! বিহারিলাল একদিনের জ্বরে সহরেই মারা পড়িলেন। মৃত্যু প্রকৃতির বিধান, অত্যন্তই স্বাভাবিক, অতি বড় দুঃখের হইলেও তাহার বিপক্ষে কিছু বলিবার নাই তবে আশ্চর্য্য এই যে, যে লোক এত রোজগার করিত দান-ধ্যানের যাহার তুলনা ছিল না, সৎকার্য্যে অর্থব্যয়ের পরিমাণ যাহার পরিচিত অপরিচিত লোককেও বিস্মিত করিয়া তুলিত, সেই লোকের মৃত্যুর একমাস পরেই যে তাঁহার বিধবা স্ত্রীকে একটি মাত্র কন্যার ভরণ পোষণের জন্য জমিদার বাড়ীতে পাচিকা বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, বোধ করি এ বিধান একমাত্র বিধাতারই জানা ছিল, মানুষ তাহা কল্পনা করিতেও পারে নাই। বার বছর কাটিয়া গেল, পাচিকা জননীর কোলে, তাঁহার স্নেহে যত্নে একটুকু শরৎ এত বড় হইল। প্রকৃতির নিকট শরতের যতখানি পাওনা ছিল, সবটাই সে পুরা মাত্রায় আদায় করিয়া লইল, সমাজের কাছে তার কোন দাবী দাওয়া ছিল কি না সে জানে, একচুলও সে পাইল না। পাচিকার কন্যা—এত বড় অপরাধ, এতখানি হীনতা মাথা পাতিয়া লইতে সমাজের একটি প্রাণীও রাজী হইল না। সমাজের শিরোমণির সে কন্যার জননীর হাতের রান্না খাইতে কোন আপত্য ছিল না কিন্তু সমাজের টিকটিকি গিরগিটিও সে কন্যাকে গৃহে স্থান দিতে সম্মত হইতে পারিলেন না। প্রৌঢ় জমিদার মহীনবাবু বাঁচিয়া থাকিলে কি হইত বলা যায় না, অভাগিনীর ভাগ্যদোষে তিনি বার্দ্ধক্যের পূর্বেই বসন্তরোগে

রোগে ভুগিয়া দ্বাবিংশবর্ষীয় পুত্র নন্দলালের হাতে অগাধ বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়া মহাযাত্রা করিয়া গেলেন। নন্দলালের মাতা বহুদিন আগেই কোথায় গিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তখন নন্দলাল অত বড় বাড়ীতে একেবারে একা হইয়া গেল। ভক্ত-গৃহিনী তখনই সে আশ্রয় ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, নন্দলাল কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়াছিল, আপনিও যাবেন? কি-জানি কেন পিতৃমাতৃহীন জমিদার পুত্রের এই কথা কয়টী এই বিধবার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া গেলিয়াছিল। বিধবা সে গৃহ ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই তখন কে জানিত তাহা হইতেই এত বিপত্তি আসিয়া জুটিবে!

ভক্ত গৃহিনী কিয়ৎক্ষণ পরে আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—তোমার কাছে সত্যি কথা বলতে ত দোষ নেই মা, এখন নন্দলালকে দেখে আমার ভয় করে।

এই ভয় যে কি পদার্থ তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না; বিধবা তাহা ঠিকই বুঝিলেন, বলিলেন—তুমি ত এক কাজ করলেই পার ভক্ত-বৌ শরতকে তোমার কাছে রাখবার দরকারই বা কি? শরত তোমার বাড়ীতেই থাক্, কাজকর্ম সেরে তুমি বাড়ীতেই এসে থাকবে। কিছু মনে করো না মা, গাঁয়ের লোকের বিষ মুখের কথা ভেবেই আমি বলছি। এ-রকম করলে মুৎসা রটবার পথ বন্ধ হবে আর...

ভক্ত-গৃহিনী কাতরকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, যার ঘরে এই এতকাল কাটালুম, যাকে একরকম কোলে পিঠে করে মানুষ করলুম বল্লেই হয়, তার অমতে ত কোন কাজই করতে পারব না; শরতকে একদণ্ড দেখতে না পেলে নন্দলাল সাতখ'বার খোঁজ করতে থাকে।

ভক্ত-গৃহিনী আরও কিছু বলিতেছিলেন, কিন্তু বিধবাটি তৎপূর্বেই কহিলেন—ভক্ত বৌ, এর কারণ বুঝেছ?

বুঝো হলুম, তিনকাল গিয়ে একালে ঠেকল, তবু যদি না···

তার কি ভাবছ?

সেইজন্যই ত যাচ্ছি মা। নন্দকে প্রাণ ধারণে অসুখী করতে পারব না ত, তাই...

নন্দকে কখন বলেছিলে, শরতের বিয়ের···

বলেছি মা! রোজই বলেন, চেষ্টা করছি কিন্তু···

বুঝেছি। ভক্ত-বৌ, শ্বশুরের ভিটে, স্বামীর ঘর; সব জানি, তবুও এমন অবস্থায় কোনমতেই তোমাকে এখানে থাকতে বলতে পারছি না। যাও মা, যা ভেবেছ, বাবা বিশ্বনাথ এই করুন, মনস্কামনা তোমার পূর্ণ হক্। কাশীতে তাঁদের কি খবর দিয়েছ?

খবর আর কি দেব মা? যাচ্ছি ত গলগ্রহ হতে, খবর আর কি দেব বল? শুনেছি বড় বন্ধু ছিলেন, প্রায়ই বলতেন, রাধিকা গোঁসাঞী তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারেন।

ভক্ত-গৃহিনী কথা কয়টি বলিয়া কয়েকমুহূর্ত্ত সযত্নে বসিয়া রহিলেন। রাধিকা গোঁসাঞীমহাশয়ের প্রসঙ্গে তাঁহার স্বর্গীয় বন্ধুর কথাও মনে পড়িয়া গেল। কিয়ৎপরে কহিলেন—সেই ভরসাতেই যাওয়া মা, তারপর পোড়া কপালীর বরাত মা! যে বরাত নিয়ে এসেছি ভূ-ভারতে, ভাল মনে করতেই উবে যায়। কি-যে দেখব গিয়ে, আছেন কি-না তাই বা কে জানে?—বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

বিধবা বলিলেন—সেই ত কথা বাছা, একটা খবর দিয়ে নিয়ে গেলেই ভাল হত। খরচ-খরচা করে' যাবে, তারপর!···

ভক্ত-গৃহিনী বিধবার পায়স্পর্শ করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন—আশীর্ব্বাদ কর মা, বেরিয়ে পড়ি, তারপর বরাতে যা আছে তাই হবে। এ কালা মুখ আর একদিনও গাঁয়ের লোকের সামনে বের করতে ইচ্ছে নেই।···এক-মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন—মা, সেদিন থেকে কি করে যে-বেঁচে আছি তা ভগবানই জানেন। যেয়েটা জল খেতে বলেছিল, পালেদের গিন্নী দূর দূর করে যেরাল কুকুরের মত···তিনি আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বিধবা করুণ স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—গাঁয়ের ধর্ম মা, গাঁয়ের ধর্ম। এ পোড়া দেশে সবই সম্ভব। অসম্ভব এখানে কিছুই নেই মা! ভক্ত-বৌ, আমি এই ভরসন্ধ্যা-বেলায় জোর গলায় বলতে পারি, গাঁয়ের লোকের অত্যাচারে তোমায় যদি এখনি করেই ঘরছাড়া হতে হয়, এ গাঁয়ের ভালো হবে ভেবেছ? এরের ঘর ঘরে সন্ধ্যে পড়বে ভেবেছ? না, মা, আমি নিশ্চয় বলছি···

ভক্ত গৃহিনী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—সতীলক্ষ্মী মা, তোমার মুখের কথা ত মিথ্যে হবে না মা, কিন্তু আমি

[সকলের ভাল কামনা করেই যাচ্ছি। শরতের বেশ মা, ভগবান এখানকার ভালই করুন।

তা করেন না বৌ, করেন না! ভগবান তা করেন না। উঃ কি অত্যাচার বলত? একটা কচি মেয়ে··· রক্ত-বৌ, কুল ছাড়তে পার?

রক্ত-গৃহিণী কথাটা বোধকরি বুঝিতে পারেন নাই, নির্বাক বিস্ময়ে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন—

কুল ছাড়তে পারবে? মৌলিকের ঘরে মেয়ে দেবে?

গৃহীরের আবার কুল কিসের মা! আমার আবার কুলীন মৌলিক কিসের? কিন্তু কে দেবে মা, রাঁধুনীর মেয়েকে কে নেবে বল? মা যার দাসীবৃত্তি করে, পরের বাড়ী গতর খাটিয়ে পেট ভরায় তার মেয়েকে কোন্ মৌলিকই বা ঘরের বৌ করতে নেবে মা?

রক্ত-বৌ! আমার শান্তকে নাও, তোমায় দিচ্ছি, শরতকে তুমি আমায় দাও। তুমিও গরীব, আমিও তাই, শরতকে তুমি আমায় দাও!

মা!···

বিধবা সজোরে দাকাইয়া উঠিয়া সাড়া দিলেন—কে রে? শান্ত?

আমি···মা!··· শান্ত অন্ধকারে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া বলিল—আলো জ্বালো নি মা?···সে নত হইয়া মায়ের দুই পায়ের ফাঁকে মাথা রক্ষা করিল।

তার মা সস্নেহে তাকে তুলিয়া বলিলেন—এই আমি মনে মনে তোকে ডাকছিলুম শান্ত!

শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল—নইলে আমিই বা এলুম কোত্থেকে মা! তুমি স্মরণ করলে বলেই ত আসতে হল!···ওখানে বসে কে—মা?

আমি বলব না,—বল্ দেখি শান্ত কে?

না···

এবারে শান্ত চিনিল, বলিল, পিসিমা! দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিল—শরত না?

সুশান্ত রক্ত-গৃহিণীকে নমস্কার করিয়া হাসিমুখে বলিল—অন্ধকারে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন শরৎ—ভেতরে এস।

শরৎ নমস্কার করিতেই, সুশান্ত বলিল—একটী বর শীগ্‌গির শীগ্‌গির এসে পড়ুক।

সুশান্তর মা প্রদীপ হাতে আসিয়া বলিলেন, এসে পড়েছে, শান্ত

শান্ত প্রসন্নমুখে বলিল—বাঃ বেশ, বেশ! কি রকম পাত্তর পিসিমা!

রক্ত-গৃহিণী সুশান্তর জননীর সঙ্গে সঙ্গেই তুলসীমঞ্চের নীচে মাথা রাখিয়াছিলেন, উত্তর দিতে পারিলেন। মৃদু আলোকে শরতের দিকে চাহিতেই শান্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কি সুন্দর সে মুখখানি, কিন্তু কি কুৎসিত বর্ণেই না লেখা ছিল!

(ক্রমশঃ)

## দখিণ হাওয়া

[ শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক ]

ওই দখিণ হাওয়া এলো গো আজ এলো তোমার দ্বারে
তারে বরণ করে নাও!
তব মনের কোণে যেটুক্ মধু কাঁদলো হাহাকারে
আজি মুক্ত করে দাও!
যে গান জাগে প্রাণের মাঝে,
সৃষ্টির আগে যে সুর বাজে,
জাগাও তারে বাঁজাও তারে বীণার তারে তারে
আজি আকাশটাকে চাও!

আজি সবুজ-হারা শাখার বুকে যে রঙ উঠে ভরি
জাগে যে শ্যামলোৎসব,
আর হতাশ শ্বাস উদাস করে যে ফুল ফুটে ঝরি
তাতেই বাঁচাও চিত্তেব শব!
কাছের হাওয়ায় দূরের হাওয়ায়
যেটুক মিলে চাওয়ায়,
সেটুক যাবেই পূর্ণ করি সকল পাওয়ার সারে
আজি আনন্দ গান গাও।

# নকল

[ শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ]

২৩, হনতানপাড়া লেন,
কলিকাতা ১২ই শ্রাবণ।

ভাই উষা,

কাল ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম যে তুই বীণা হাতে আমার শিয়রের কাছে বসে গান গাচ্ছিস, আর আমি অবাক হয়ে তোর মুখের মত সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে গান শুন্‌ছি। তোর মিষ্টি গান'ত কত দিন শুনেছি, কই এমন মিষ্টি'ত আর কোনদিন লাগে নি। মনে হচ্ছিল যেন সুরের রাণী তার সখীগণ নিয়ে তোর ঐ বীণায় ঘুমিয়েছিল—তোর পরশ পেয়ে এক সঙ্গে বিপুল পুলকে জেগে উঠে চারদিকে একটা আনন্দের বন্যা বইয়ে দিলে। স্বপ্ন অ-বাস্তব বলেই বুঝি এত সুন্দর। যেখানেই বাস্তবতা, সেখানেই কিছু না কিছু খুঁত আছে। উষার রঙীন আলো জানালার ফাঁক দিয়ে এসে তার সোণার-কাঠির পরশ দিয়ে আমার এত সাধের স্বপ্নের জালখানি ছিঁড়ে দিলে। স্বর্গের উষারাণীর আলোকে আমার মর্ত্তের উষারাণীর মধুর স্মৃতি প্রাণের পটে আরও রঙীন হয়ে উঠ্‌ল।

চা কর্‌ছি, এমন সময় শুনি যে পাশের একটা বাড়ীতে কে যেন উদাস সুরে গাচ্ছে,—

"সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি,
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!
এসেছিল নীরব রাতে বীণাখানি নিয়ে হাতে,
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিনী!"

কে জানে, সেও কি আমার মত স্বপ্ন দেখে এমনি আকুল? সত্যি কথা বল্‌তে কি, গানটা শুনে অবধি আমার বুক ঠেলে কান্না বের হতে যাচ্ছিল। তোর চিঠিটা পেয়ে প্রাণটা তবু অনেকটা শান্ত হয়েছে।

তুই এখন পুরীতে,—লীলার পুরী, শোভার পুরী, কবিত্বের পুরী, সমুদ্রের পুরী, প্রেম ও ভক্তির মিলন পুরীতে আছিস; নূতন সংবাদ কই তুই আমায় দিবি, আর আমার নিকটেই কি না নূতন সংবাদ চাস্! মজার মানুষ বটে! কল্‌কাতার একঘেয়ে জীবনে কি কোন নূতনত্ব আছে? তার মুখে যৌবনের চটুল হাসি, আর প্রাণে জরার চাপা কান্না। অপূর্ব্ব রহস্য বটে!

নূতন সংবাদের ভেতর আমাদের বাড়ীতে চোরের উপদ্রব বড় বেড়ে গেছে। তিনি হাকিমী করেন, অনেক চোরকে রাজকীয় অতিথিশালায় প্রেরণ করেন, আর তাঁর বাড়ীতেই কি না চোরের উপদ্রব! চোরের বুদ্ধিকে 'বাহবা' দিতে হয়। হাকিমদলের হাতে পড়ে তাদের স্বজাতিদের দুর্গতির আর পরিসীমা থাকে না বলেই বুঝি তারা এভাবে অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে। হাকিমবাবু যে জব্দ হচ্ছেন এ ভেবেই আমি আনন্দিত।

আমার প্রণতরা ভালবাসা নিস্। তাড়াতাড়ি চিঠির জবাব না দিলে আমি কিন্তু খুব রাগ করব, মনে রাখিস্।

তোরই
হেনা।

---

পুরী,
২০শে শ্রাবণ।

ওগো হেনারাণী!

তোর কবিত্বপূর্ণ চিঠিখানা পেয়ে প্রাণটা আনন্দে ভরে উঠ্‌ল। কবির স্ত্রী কি না, তাই পরশপাথরের সংস্পর্শে তুই ও কবি হয়ে উঠ্‌লি। আমি কিন্তু ভাই নীরস গদ্যভাষাপন্ন—আমার প্রাণের তিন মাইলের ভেতর কাব্যের কোন গন্ধ পাবিনে। আর তিনি? জানিস'ত উকীল মানুষের কাছে "আমীর আলীর এভিডেন্স এক্ট" হচ্ছে কাব্য-গ্রন্থ, 'প্রাণের নকল' হচ্ছে মহা-সাহিত্য, আর 'সওয়াল জবাব' তৈরের কথাই হচ্ছে সাহিত্য-সাধনা।

কল্‌কাতার কোলাহলের ভেতর কবিত্ব বাঁচে কি করে ভাই? আমার'ত মনে হয় রাতদিন ট্রাম-মোটরের ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ, ফিরিওয়ালার বিকট চীৎকার, চিনের মলিন ঘোঁয়া প্রাণের সব আনন্দটুকু হরণ করে নেয়। সত্যি কথা বল্‌তে কি, পুরীর মিষ্ট কোলে এসে হাঁফ

ছেড়ে বেঁচেছি। ইচ্ছে করে এ জায়গার বাতাস কিছু বাগে পুরে তোকে পাঠিয়ে দিই। কল্‌কাতায় এমন রক্ত বাতাস পাবি কোথায়? পুরীর সমুদ্র স্নানও (Sea bath) এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। যেমন আমোদজনক, তেমনি বিপজ্জনক। সূর্য্য-কিরণে সমুদ্রের দৃশ্য বর্ণনাতীত। মনে হয় যেন চঞ্চল জলপরীরা সোণার মুকুট পরে জল-কেলী করছে,—তাদের নৃত্যের ঝঙ্কারে সাগরের বুক দুলে উঠ্‌ছে—পৃথিবী কান পেতে সে ঝঙ্কারের ধ্বনিটুকু শুন্‌ছে। তোদের মত সমুদ্রস্নানের কাছে পুরীর সূর্য্যোদয় একটা দেখবার জিনিষ বটে। আমার মত অকবির কাছেও মনে হয় যেন তপনদেব দিনের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে সারারাত এই ভূতিন পুরীতে তাঁর শ্রান্ত দেহটা নিয়ে ঘুমিয়েছিল, তোদের বাতাসে জেগে উঠে সমুদ্রের জলে স্নান করে সাত ঘোড়ার রথ হাঁকিয়ে হু হু করে স্বর্গপুরীর দিকে ধেয়ে চলেছে আর তাঁকে ধরবার জন্যে সাগর যেন নীল শাল দুলে তাঁর পিছু পিছু ছুটছে। এ দেখে সূর্য্য হেসে উঠ্‌ছে আর তাঁর হাসি চৌচির হয়ে মুক্তার মত ঝুর্ ঝুর্ করে পৃথিবীর বুকে এসে লুটে পড়্‌ছে। এখন বুঝে নে এ যাদুকরীর লীলাভূমি কি না।

লীলা-বৌদি পুরীতে এসেছেন। তাঁর বাবা সমুদ্রের ধারে একখানা বিলি বাড়ী করেছেন। বিমলদা'ও 'ল' পরীক্ষা এ বছর সবার জলে ডুবিয়ে পুরী এসে বৌদির আঁচলেই নিধি হয়ে বসেছেন। তাঁর মনের ভাব বোধহয় "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"।

লীলা বৌদি আমাকে একদিন দাদার একখানা চিঠি দেখ্‌তে দিলেন। তাতে তিনি লিখেছেন—"ওগো আমার চক্ষের মণিক, বক্ষের অহরৎ! তুমি'ত পুরীর হাওয়া খেয়ে আনন্দে মসগুল্ হয়ে আছ আর এদিকে তোমার স্বামী বেচারা যে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে সে খবরটা রাখা বোধহয় দরকার মনে কর না। তুমি সুখে আছ, এ সংবাদ জান্‌তে পারলেই আমি সুখী, আমার আর কোন সাধ নেই। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া'ত সেসেই আছে, তার ওপর রোজ একটু একটু জ্বর হয় বলে মনে হচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন যে—আপনি আজই এ সহর ছেড়ে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যান। পরীক্ষা দেওয়া আর এ বছর হবে না। তুমি নেই, পুরী গিয়ে তোমাদের ডাক্ত করব না—ওয়াল্‌টেয়ার যাব ঠিক করেছি…।" পত্র পড়ে ত সবাই বুঝেছি তবু হাসি চেপে বৌদিকে বল্‌লুম—দুশ্চিন্তা করে কি হবে ভাই, তুমি বরং আজই দাদাকে ওয়ালটেয়ার না গিয়ে এখানেই আস্‌তে লিখে দাও। আমাদের আলাপ হচ্ছে, এমন সময় তিনিও এসে উপস্থিত। সব কথা শুনে তিনি খুব গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, "ই ব্যাপার বড় গুরুতর বলেই বোধ হচ্ছে। এ ব্যারামে সে শুধুই জ্বর জ্বর ভাব আনে তাই নয় বৌদি, এতে স্নানাহারে অনিচ্ছা আনে, আইন বইগুলোকে উচ্ছন্ন দেবার (Censor) করে গোদাবরীর জলে চিরকালের জন্যে ডুবিয়ে রাখি, মোটা খামের চিঠি পাওয়ার জন্যে গোপনে প্রতিমুহূর্ত্তে পিয়নের লাল-পাগ্‌ড়ী দেখবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। কি বল্‌ব বৌদি, এ রোগ বড় সাংঘাতিক, এতে শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, মানসিক শান্তিরও। তবে। আপনি বিমলবাবুকে কালই এখানে আস্‌তে লিখে দিন্। ওয়ালটেয়ারের জলবায়ু এ ব্যারামে কোনই উপকারে আস্‌বে না। তাতে আবার আমার বন্ধু "কালাজ্বরের" ডাক্তার মোহিনীবাবু আমাকে সেদিন বল্‌ছিলেন যে সেখানে নাকি ভয়ানক কালাজ্বর হচ্ছে। তিনি আরও বল্‌লেন যে কীট পতঙ্গও পর্য্যন্ত কালাজ্বরের ভয়ে নাকি ওয়াল্‌টেয়ার ছেড়ে পালাচ্ছে। এ অবস্থায় বিমলবাবুর সেখানে যাওয়া মোটেই ভাল দেখায় না।" বৌদি ত তাঁর কথা শুনে বেজায় রেগে বলে উঠ্‌লেন,—"আপনার ঐ দোষ, সব কথাতেই একটু 'ফোঁড়ন কাটা' চাই। ডাক্তার যে স্বাস্থ্যকর স্থানে যেতে বলেছে এগুলি বুঝি সবই কাজ্‌লামি?" তিনি বল্লেন,—"বৌদি রেগে ওঠেন কেন? আমিও ত ডাক্তারের কথাই বল্‌ছি যে তিনি অবিলম্বে এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে চলে আসুন। অবিবাহিতদের পক্ষে হিমালয়, কিনোলয় বা ওরকম যে কোন আলয়ই স্বাস্থ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে, আর বিবাহিতদের পক্ষে একমাত্র শ্বশুরালয়ই হচ্ছে best Sanitorium." তারপর সত্যি ভাই, বৌদির চিঠি দেখার দিন দুই পরই দাদা স্বাস্থ্য ফিরাতে পুরী এসে হাজির। এখন না কি ভালই আছেন। কিন্তু ভাই ভুলেও একবার এদিকে আসেন না। যাঁরা বিয়ের পূর্ব্বে খুব বাহাদুর সাজেন তাঁরাই কিন্তু বিয়ের পরে সকলের চেয়ে বেশী নাকাল হন। যে বিমল-

র্থ বিয়ে করবেন-না, বিলেত যাবেন, সেই বুড় প্রতিজ্ঞা হাজারটির বিয়ের ছুমাস পরই এরূপ পরিবর্ত্তন! একেবারে লীলাগত প্রাণ! উকীল বাবুকে যদি বলা যায় যে তোমার শ্বশুর কয়দিন যাবৎ পাচ্ছিনে, তুমি কিন্তু আজ তাদের সাথে দেখা করে এসো। তিনি অমনি বলে ওঠেন যে, "সেযে যদি তোমার বাবা শাশুড়ি অথবা অন্যকিছুর জন্যে বাড়ীতে প্রবেশের জন্যে কৌজদারীতে সোপর্দ্দ করেন তখন উপায় হবে কি?

তোর কাছে চিঠি লিখবার সময় কথা যেন আর ফুরোতে চায় না। আজব সহর কলিকাতার কত আজগুবী জিনিষ রোজ দেখ্‌ছি—নূতন খবর তুই'ত আমার দিবি।

আমার ভাব নেই—ভাষা নেই, তবু দেখ্‌ কত বড় চিঠি লিখ্‌লুম। তোর ভাব আছে, ভাষা আছে—এর চেয়ে অনেক অনেক-অনেক বড় চিঠি না লিখ্‌লে তোর মুক্তি নেই।

আমার ভালবাসা নিস্‌। মুন্ন—বাবুকে নমস্কার দিস্‌। আজ তবে আসি ভাই।

তোরই

উষা।

২৬, সুলতানবাগান লেন, কলিকাতা।

২৬শে শ্রাবণ।

ভাই উষা,

উকীলের স্ত্রী কি না, তাই অল্পকে কি করে ফলাও করতে হয়, সে বিদ্যেটা ভাল করেই শিখেছিস্‌। আমি এমন কি কবিত্ব ফলিয়েছিলাম যে আমার ওপর এমন তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে কসুর করিস্‌নি।

কিমল বা' বয়সেই বা যৌবির 'আঁচলের নিধি' হয়েছেন, তাতে দোষ হয়েছে কি? নিজের তিনিটি যে একেবারে উষা-গত-প্রাণ, তা আর বুঝি চোখে পড়ে না?

আজ তোকে আজবসহরের একটা আজগুবী লোকের অদ্ভুত সভ্যতার কথা জানাচ্ছি। তোর কাছে কোন কথা কোনদিন লুকোয়নি, এটাও লুকোতে চাইনে। কলেজে যাওয়ার সময় কদিন যাবৎই লক্ষ্য করেছি যে একটি লোক ঠিক একই সময়ে প্রত্যেকদিন আমাদের লেনের মোড়ে হাঁ করে গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেরবার সময়ও ঠিক ঐ জায়গায় তাকে মোড় ঘেসে আস্‌তে দেখ্‌তুম। গাড়ীর ঘোড়ার ডেঙ্গরও তাকে তেমনি ধ্যানমগ্ন কলিযুগের মত নির্ব্বিকার ভাবে গাড়ীর দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেছে। তার আবভাবটা মোটেই ভদ্রজনোচিত ছিল না। একদিন সব মেয়েদের পৌঁছিয়ে দিয়ে গাড়ী যখন একা আমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিতে লেনের ভিতর ঢুকেছে, অমনি সেই লোকটা একখানা চিঠি গাড়ীর ভিতর ছুঁড়ে দিলে। খামের ওপর আমার নাম দেখেত আমি একেবারে অবাক্‌ হয়ে গেলুম। এ কি ব্যাপার। চিঠিখানা না খুলেই তোদের মু—বাবুর হাতে দিয়ে বল্‌লুম এই দেখ তোমাদের পুরুষজাতে বুদ্ধির। যারা একজন অপরিচিতার কাছে ভীকর মত চিঠি ছুঁড়ে ফেল্‌তে—তারাকে কাপুরুষের মত এ ভাবে অপমান করতে লজ্জা বোধ করেনা তাদের ধিক্‌। তিনি কোথায় এ সময় গম্ভীর হবেন আর কি না আমার কথা গুলোকে নিতান্ত খেলো মনে করে হেসে বল্লেন—"ব্যাপার কি! তুমি দেখ্‌ছি regular Civil war declare কর্‌লে। চিঠিটা আগে পড়াই যাক্‌ তারপর যা হয় করা যাবে।" আমি রেগে বলে উঠ্‌লুম—"যা ইচ্ছে হয় তা তুমি কর কিন্তু আমি এই বলে রাখ্‌ছি যে কাল হতে যদি কলেজে যেতে বল তা হলে কিন্তু তোমার সঙ্গে ঝগড়া হবে।" তিনি বল্লেন—"এই ত তোমাদের বীরত্ব! যারা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে, তারাই বীর, না যারা অপমান পকেটস্থ করতে সঙ্কোচ বোধ করে, না, তারাই বীর?" আমি রাগে এতটা অস্থির হয়েছিলুম যে বেশী কথা আর বলতে ইচ্ছে হোল না। চিঠিতে যা দেখ্‌লুম তা ভাবতেও সারা মনটা ঘেন্নায় কাঁটা দিয়ে ওঠে। এক একটা অক্ষর যেন এক একটা প্রেতের মত কঙ্কালসার দেহ নিয়ে ক্ষুধিতের মত 'হাঁ' করে চেয়ে আছে। চিঠির নকলটা তোর কাছে পাঠালুম্‌—

"বান্ধিতা আমার,

তুমি কি দেখ্‌ছ না, একজন লোক তোমার প্রসাদের জন্যে প্রত্যহ তোমার পানে কেমন আকুলভাবে তাকিয়ে থাকে! হে দেবী, এ দীন ভক্তের হৃদয় অর্ঘ্য গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ কর। তোমার ঐ অপূর্ব্ব রূপ দিয়ে অনায়াসে সমগ্র পৃথিবী জয় করতে পার। যে গাড়ী তোমাকে বহন করে সে গাড়ী ধন্য। আমাকে হতাশ

করো না। নিবেদন গ্রহণ করলে কি না জানবার জন্যে প্রত্যহ ঠিক ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকব। ইতি

প্রেমাকুল"

বিকাশ।

প্রেমাকুলই বটে! দেখ ভাই এরাই না কি আবার মেয়েদের আশা-ভরসা। এরাই আবার নারীর কাছে বুদ্ধির বড়াই করে! অমন বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়। আমরা নারী যেন চিরকাল অজ্ঞ থাকি তবু যেন এমন বুদ্ধিমতী হওয়ার দুর্মতি আমাদের না হয়। তোদের হু—বাবু বলেন যে—"এর একটা জবাব দিতে হবে।" আমি'ত শুনে অবাক্—এ বলে কি? রাগ সাম্‌লাতে পার্‌লুম না। জিজ্ঞেস কর্‌লুম—"তোমারও কি শেষে মাথার ঘোর হ'ল না কি?" তিনি অমন সময়েও হেসে বল্লেন—"সব কথা না শুনেই অমন কেউটে সাপের মত ফণা বাগিয়ে ওঠো কেন? যে পর্য্যন্ত না এ হতাশ প্রেমিককে জব্দ করা যায় সে পর্য্যন্ত সে তোমাকে ত্যক্ত করবেই করবে। আমিই মেয়েলী ছাঁচে তাকে রাত বারটার সময় বাগান আস্‌তে নিমন্ত্রণ করে এক-খানা চিঠি লিখ্‌ব,—তুমি শুধু পত্র খানা তার কাছে ফেলে দিও। তারপর যা করতে হয় আমিই করব, তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। অগত্যা তাঁর কথায় রাজী হলুম। দেখি তিনি পত্রে দিব্যি মেয়েলী ছাঁচে লিখেছেন,—

"তুমি যে প্রেমের গোলাপজাম, রসের আঙ্গুর, সখের বেদানা তা তোমার চিঠি পড়েই বেশ বুঝেছি। তুমি আজ রাত বারোটার সময় আমাদের পাশের বাগান বিয়ে এসো। ভুলো না কিন্তু। মাথার দিব্যি এলো, এলো এলো।"

চোরের উপদ্রবে হাকিম বাবু কদিন যাবৎ বাড়ীতে একটা পুলিশ এনে রেখেছেন। সেদিন সেই ছোঁড়াটা মুষল ধার বৃষ্টিতে ভিজেও প্রেম কর্‌তে সেই বাড়ীতে ঢুকেছেন অম্‌নি পুলিশ তাকে ধরে চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছে হুজুর, চোর পাওয়া'। তোদের হু—বাবু তাড়াতাড়ি ল্যাম্প নিয়ে নীচে গিয়েই চোর যাদুমণির হাত ধরে বলে উঠ্‌লেন—"এই যে বিকাশ বাবু যে। এত রাত্রে কেন? আপনি দেখ্‌ছি একেবারে ভিজে গেছেন,—ওপরে চলুন, কাপড় চোপড় ছেড়ে এক পেয়ালা চা খান।" ইস্ বিকাশ বাবুর সঙ্গে যেন তাঁর কতকালের পরিচয়। পুলিশ'ত চোর ধরে অপ্রস্তুত। ছোঁড়াটার সে সময়কার অবস্থা দেখে হাসিও চেপে রাখতে পারছিলুম না, অথচ তার দুর্দ্দশা দেখে আবার দুঃখও বোধ হচ্ছিল। অনেক কষ্টে মাথা একটু উঁচিয়ে বিকাশ বলে উঠ্‌লে—"আমায় মাপ করুন এবার—পুলিশের হাতে দেবেন না। শপথ করছি, আর কখনো কোন স্ত্রীপরিচিতার দিকে ভুলেও তাকাবো না।" এই বলে সে তাড়াতাড়ি রওনা হল। ভীষণ লোক তোদের এই হু—বাবু, তিনিও ছোঁড়াটির সঙ্গে সদর দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে বলে উঠ্‌লেন,—একান্তই যদি চল্লেন বিকাশ বাবু, তবে আর কি করে ধরে রাখি? নমস্কার।

* * * *

ডাকের সময় চলে যাচ্ছে আজ এখানেই ইতি দেওয়া যাক্। তোরই

হেনা।

## সমস্যা পূরণ

[ শ্রীগিরিবালা দেবী ]

উঠিল প্রশ্ন সেদিন ভুবনে
"নির্ম্মল কি আছে দেখা"?
সকলে নীরব, কাহারো কণ্ঠে
ফুটিল না কোন কথা!
চন্দ্র নীরব, সুষুপ্ত মলিন,
লাজে সরে অবনত—
কোথা হতে ছুটে শিশুটি আসি
সমস্যা ভাঙ্গিল তত।

## ভবিষ্যৎ আশা

বনের গাধা—তুই কেন মিছেমিছি এত পরিশ্রম করিস? বনে আয় বেশ খোলাভাবে থাকবি, কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

সার্কাসের গাধা—না দাদা, এখানে Future prospect আছে। যে মেয়েটা তারের উপর নাচে সে বরা-বরই পড়ে যায়। Manager কাল বলছিল যে, ও যদি আবার পড়ে যায় তাহলে আমার সঙ্গে না কি ওর সাদী দেবে। আশায় আছি দাদা, আশায় আছি। অম্‌নি কি আর থাকি?

জার্ডের কয়লার খনির ম্যানেজের ফরাসী সামরিক বিচারালয়ে বিচার দৃশ্য।

জার্মেন কোটিপতি কয়লার খনির মালিক হার থিসেন, হার কেসেন, হার ইউরেনহোফার, হার টেয়েন্ম্যান, প্রভৃতির বিচার হইতেছে। ফরাসী সামরিক বিচারে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই অর্থদণ্ড হইয়াছে। বিচারালয়ে জার্মেন হার থিসেন গর্ব্বভরে ফরাসীদের বলিয়াছেন আমি জার্মেন—সুতরাং শুধু জার্মেন আইনই মানিব—অন্য কোন আইন মানিব না।

অর্থদণ্ডে দণ্ডিত জার্মেনদের রুহ্রে প্রত্যাবর্ত্তন দৃশ্য।

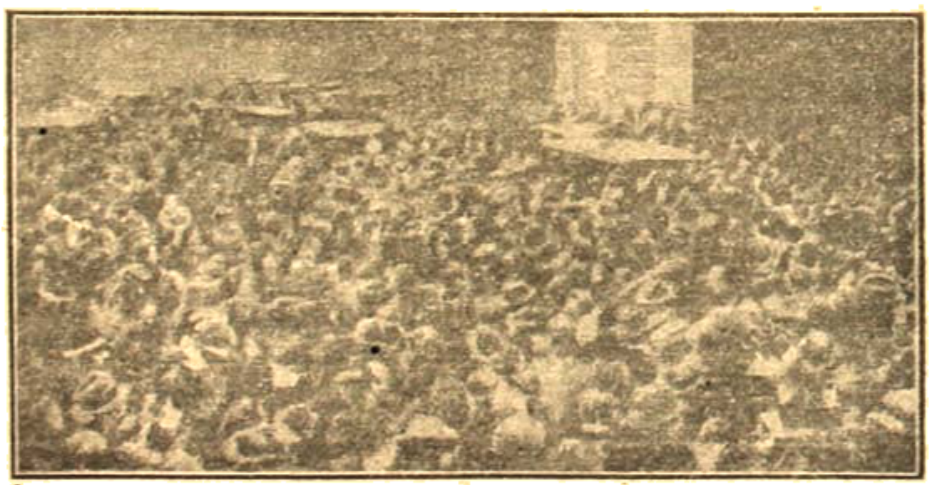

জার্মেনরা ফরাসী সামরিক বিচারালয়ে দণ্ডিত কয়লার খনির মালিকদের অভ্যর্থনা করিতেছে। রুহ্র হইতে জার্মেন কয়লার খনির মালিকদের মোটর গাড়ী অনবরত চলিয়া যাইতেছে।

# খাদ্যের পরিবর্ত্তনে মানব চরিত্রের কিরূপ উন্নতি হইয়া থাকে।

[ শ্রীঅমৃতলাল মজুমদার ]

যদি তোমার মনে হয় যে তোমার মানসিক অবস্থা তোমার কর্ম্মপটুতা এবং তোমার চরিত্র যে রূপ হওয়া উচিত সেরূপ হইতেছে না তুমি অধ্যাপক Friedriech Nietzoche এর মন্তব্য পাঠে জানিতে পারিবে যে খাদ্যই মানব স্বভাব ও মানব চরিত্র গঠনের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। অধ্যাপক Niefzoche এর মত অনুমোদন করিয়া British Medical Journal এ- হারবার্ট স্পেন্সার সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখিত হইয়াছে। হারবার্ট স্পেন্সার এক সময়ে নিরামিষ ভোজী হইয়াছিলেন। বৎসরাধিক নিরামিষ ভোজী থাকিয়া, স্পেন্সার সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁর ঐ সময়ের লেখা এতই জড়ত্ব হইয়াছে যে তিনি উৎসমুক্ত নই করিয়া ফেলিলেন এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মতন মাংস খাইতে লাগিলেন। স্পেন্সার সাহেব এবং তাঁর সমালোচকগণ তার পুনরায় মাংস খাইবার অব্যবহিত পরের লেখার উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক Nietzoche কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন লোকের খাদ্য লইয়া সমালোচনা করেন নাই, তিনি নানা জাতির খাদ্যের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রাচ্য দেশবাসীরা ভাত খাইবার জন্য অলুইবাসী হইয়া থাকে।

যখন জীবনে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মে, তিনি বলেন ইহাও শ্রমাত্মক আহারের ফল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচারে হিন্দুগণ নিরামিষ ভোজী হইতে আরম্ভ করেন, এবং এইসময় হইতে ইঁহাদের মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতার উৎপত্তি হইয়াছে। অতিরিক্ত ভাত ভোজনে মানুষের আফিম ও তামাক খাইবার ইচ্ছা প্রবল হয়, যেমন বেশী আলু ভোজনে মানুষকে মদ খাইতে অনুরক্ত করিয়া থাকে। মানুষের চিন্তা শক্তি ও জ্ঞান শক্তি নিস্তেজ হওয়া কেবলমাত্র ভাত খাওয়ার চরম ফল।

# ফাল্গুনী

[ শ্রীভক্তিসুধা রায় ]

ফাল্গুনেরি আবুল তানে
মাতন ভুলেছে
দক্ষিণ বায়ে বকুল বেলা
পাপ্‌ড়ি খুলেছে।
কোকিল মধু ভুলছে কুজন
শূন্য বিতানে,
পাগল ধরা মাতাল আজি
হাস্য তুফানে।
কোন উদাসী পাগল প্রেমিক
মর্ত্তে নেমেছে—
মদনেরি গন্ধ এনে
ভুবন ভরেছে।
নয়ন আজে পড়ছে কার
তরুণ সোহার ধার,
হাসির আলোয় অঙ্গ মিলে
করলে একাকার!

সবুজ বরণ ওড়না কাঁকে
লালচে আভা টুক্—
চাঁদের আলো আনলে ধরে
শুধুতে ধরা বুক্।
অচিন্ পথিক! কোন দেশাতে
এমন মাতালে
ফুলের নাচন্ পরাগ কাঁপায়
কেমন খেয়ালে।
দুঃখ সুখে এক করেছে
তোমার বাঁশীর তান—
ভুবন-ভোলা নবীন জীবন
করছে সে যে দান।
মলিন কালো ধুইয়ে ফেলে
চালছে তরুণ আলো,
অসীম পারের বন্ধু ওগো,
বাসবো তোমায় ভালো।

# গ্রন্থ পরিচয়

**জন্মাষ্টমী**। মূল্য চব্বিশ আনা। রায় এণ্ড রায় চৌধুরী এ খানির প্রকাশক। বইটি ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত। অনেক চিন্তাশীল ও প্রতিভাবান লেখকের গল্পে গাথায় পূর্ণ ও প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের চিত্রে ভূষিত। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতে হলে যে আমাদের সঙ্গে হাসি-গল্পের ভেতর দিয়েই দিতে হয় তা যাঁরা শিশু-সাহিত্য গড়বার ভার নেন, তাঁরাই জানেন। এরকম করা ছাড়া উপায় নেই। এই সংগ্রহ পুস্তকটিতে প্রকাশকগণ সেই পথেই চলেছেন। এবং সফলতাও লাভ করেছেন। এ বইটি ছেলেরা আনন্দে নেবে, আনন্দে পড়বে, আর যখন পড়া শেষ করবে তখনও আনন্দে মনটি তাদের ভরপুর হয়ে থাকবে।

---

**হৃতচূড়**। শ্রীযুক্ত বিমলপতি চৌধুরী এম্-এ প্রণীত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত, মূল্য ১০ বহি-খানিতে নবীন ঔপন্যাসিক বিমলপতি বাবু একটি নূতন সুরের পরিচয় দিয়েছেন। বইটিতে লেখকের সহৃদয়তা কল্পনা মিশে আছে, চরিত্রগুলির সঙ্গে লেখকের প্রাণের, সত্যের যে গূঢ় ও গাঢ় সংযোগ মিশে আছে, তাতে পাঠককে মুগ্ধ করে রাখবে। ভাষাটি বেশ ঝরঝরে, উপন্যাসোচিত সরল, কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নাই, আড়ম্বর নাই, সহজ সচ্ছন্দ গতিতে বয়ে গেছে। পাঠক এই নবীন ঔপন্যাসিককে বরণ করে নেবেন বলেই মনে হয়। বইখানির ছাপা বাঁধাই—চমৎকার। ডুলার প্যাডে, সুদৃশ্য সিল্কে বাঁধা, দাম ও সে হিসাবে খুব কম।

---

**তৃণগুচ্ছ**। শ্রীমতী গিরিবালা দেবী প্রণীত। চক্রবর্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং প্রকাশিত। এখানি গল্পের বহি। শ্রীমতী গিরিবালা বঙ্গ সাহিত্য জগতে অপরিচিতা নন, তাঁর মনোমুকুরের ছোটগল্পগুলি বঙ্গীয় পাঠক সাধারণকে আনন্দই দিয়ে এসেছে, এই গ্রন্থে সেই গল্পগুলি একত্রিত করা হয়েছে। বইখানির নাম তৃণগুচ্ছ বটে কিন্তু এ-যে তৃণের গুচ্ছ সে তৃণে বাগ্‌দেবীর পূজা করা যায় এই কথাই আমরা বলতে পারি।

---

**স্বাস্থ্য ও শক্তি**। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় এম্-এ বি-এল্ প্রণীত। মূল্য একটাকা। এখানি ছেলেদের মন স্বাস্থ্য ও শক্তির দিকে ফেরাবার উদ্দেশ্যেই লিখিত। এই দুই বিভাগের গুরু-গম্ভীর বিষয়গুলি লেখকের রচনা লালিত্যে অতি সহজ ও বোধগম্য হয়ে গিয়েছে। কতকগুলি ছবি থাকার ফলে বইটি ছেলেদের চিত্তে আনন্দ দান ও করবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। বড় বড় পালোয়ান ও শক্তিশালী-দের ছবি এবং তাঁদের পরিচয় দেওয়া আছে। ছেলেরা স্বাস্থ্য ও শক্তি বইখানি পড়ুক আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ও স্বাস্থ্য-শক্তি বর্দ্ধিত হোক এই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

---

# রঙ্গ

### পতিপরায়ণা

মৃণা—মিনের জন্য কি একমুহূর্ত্তও শান্তি আছে? মুখে আগুন—মুখে আগুন।

অমিয়া—সে আর বিশেষ কি? সিগারেট ত মুখে সর্ব্বদাই জ্বলছে।

### গুরুভক্তি

ভক্তিমতী নিবা—প্রভু! কাহার কাছা দেন না?

বাবাজী—পূর্ণ তিন বৎসর।

নিবা (বাষ্প সমগদকণ্ঠে) উঃ কি কঠোর!

### শিষ্টাচার

অনিলবাবু (বিনয়বাবুর চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন)—বাবু কি করছেন? আমি এসেছি; খবর দে।

চাকর—বাবুর সাথে এখন দেখা হবে না, তিনি বলেছেন—তিনি ঘুমুচ্ছেন।

# নারী মাধুর্য্য

( শ্রীমতী খুরসিদজাঁহা বেগম )

অনেকের মুখেই কোন নারীর প্রশংসা করিবার কালে শোনা যায়—যদিও তার তেমন রূপ নাই কিন্তু মাধুর্য্য আছে। রূপ নাই, সৌন্দর্য্য নাই অথচ মাধুর্য্য ভরা নারী—এ কথা শুনিয়া বিস্ময় লাগে বটে! রূপ সৌন্দর্য্য ইহা বিধাতার দান। মানুষ ইচ্ছা অনুসারে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে, একটু কষ্ট স্বীকার করিলেই সে মাধুর্য্যের অধিকারিণী হইতে পারে। জন্মের সঙ্গেই কেহ কেহ এই মাধুর্য্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অতি শিশুকাল হইতেই তাহাদিগকে দেখিলে মনোহারিণী বোধ হয়। এই মাধুর্য্যের জন্য তাহাদিগকে কোন চেষ্টা করিতে হয় না—চেষ্টা করিয়া ইহা অর্জ্জন করিতে হয় না। ইহাদিগের মধ্যে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির মত একটা শক্তি আছে—যাহার প্রভাবে ইহারা মানুষের মন অতি সহজেই অধিকার করিতে পারে।

অপরাপর গুণের ন্যায় চেষ্টা করিয়া মাধুর্য্যেরও উৎকর্ষ বিধান করা যাইতে পারে। যাহারা স্বভাবতঃ সুন্দর, জন্মকাল হইতেই অতুলন রূপ মাধুর্য্যের অধিকারিণী হইয়া সংসারে পদার্পণ করেন এ মাধুর্য্যগুণ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু যাহাদের ভাগ্যে রূপের ভাগ কম পড়িয়াছে তাহাদের চেষ্টা করিয়া এই মাধুর্য্যগুণের অধিকারিণী হইতে হয়।

প্রত্যেক নারীরই শারীরিক ও মানসিক শ্রী ও মাধুর্য্য বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রায় প্রত্যেক নারীরই মনে ও মুখশ্রীতে কোন না কোনরূপ মনোহারিণী ক্ষমতা আছেই। চেষ্টা করিয়া ইহারই পূর্ণতা আনিতে হইবে। যে বালিকা সব সময়ই মনে করে তাহাকে কেমন দেখাইতেছে—তাহাকে দেখিয়া সকলে সুন্দরী ভাবিতেছে কি না; সব সময় এরূপ ভাবিলে বাহিরের লোকদেখানো একটা ভাব ও ছলা তাহার ভিতরে আসিয়া পড়িবেই। ইহাতে তাহার মাধুর্য্য ও শ্রী কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হইবে না বরঞ্চ বিপরীত ফলই হইবে।

প্রকৃত মাধুর্য্য অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের একটি স্নেহ সম্পদ। স্নেহ ভাব ও কল্পনা মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকিলেই শরীর ও মনের উপর মাধুর্য্যের অপরূপ রেখা সম্পাত হয়। নারী লক্ষ্মী শ্রী বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও লাবণ্য মণ্ডিত হয়।

---

# অনুতপ্ত।

[ শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত। ]

সে চলেছে। —প্রভাতের উজ্জ্বলসূর্য্যের রশ্মি পড়ে ও তার মুখের—বিষাদের ছায়াটাকে ঢাকতে পারে নি। মুখ দেখলে মনে হয় যেন কি একটা তীব্র অনুশোচনা তার মনটাকে তোলপাড় করে তুলছে। কিন্তু সে অনুশোচনাটা কি? কিসের জন্য আজ তার এ-অনুতাপ? কিসের জন্য আজ তাকে এত—দুঃখ—ঘিরে রেখেছে? তার কি কোন মহামূল্যবান জিনিষ হারিয়েছে? আর এমন কি জিনিষ সে হারিয়েছে যে তার মনকে এত তোলপাড় কর্ত্তে পারে? ধন? —না তার এখনও যে অর্থ আছে তাতে সে রাজা! ধন?—তাতেও-ত তার অভাব নেই। দেবতার মত পিতা, জগদ্ধাত্রীর মত মাতা, আত্মীয় পরিজন সবই-ত তার আছে! তবে কি যৌবনের জন্য সে বিষণ্ণ? না—তা'ত নয়! তার বয়স ত—জোর একুশ ——যৌবনের সবে প্রভাত আরম্ভ। —তবে সে কি হারিয়েছে? কার জন্য সে এত অনুতপ্ত? —— সে আজ বুঝতে পেরেছে যে সে হারিয়েছে তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্র চরিত্র—যা ধন, জন, বা যৌবন এর—কোনটাই তাকে—ফিরিয়ে আনতে পারে না।

# দেশ-বিদেশ

### কাঁচির বহর

গত ১৯৩ সনে ভারতের ইংরেজশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। আমরা নিম্নে কি-কি বিভাগে কত ব্যয় কমাইবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

| | | |
|---|---|---|
| সামরিক বিভাগ | লাখে কম কোটি | টাকা |
| রেল | লাখে চার | — |
| ডাক ও তার | এক কোটি ত্রিশ লক্ষ | — |
| পাসপোর্ট | একশত লক্ষ | — |
| শিক্ষা | পাঁচলক্ষ বত্রিশ হাজার | — |
| রেল | চার লক্ষ আশি হাজার | — |
| কৃষি | একুশ লক্ষ এক হাজার | — |
| হিসাব বিভাগ | সাড়ে ত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার | — |
| বিমান | ছেত্রিশ হাজার | — |
| প্রাকৃতিক সাহায্য | সাতাশ হাজার | — |
| পেনসন | নয় লক্ষ আট হাজার | — |
| খুচরা খরচ | এক কোটি একান্ন লক্ষ | — |
| | আশি হাজার টাকা | — |
| বিবিধ | এক লক্ষ সাতাশ হাজার | — |
| অবেষণী (লবণ) ... | উনিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার | — |
| (তামাক) | দুই কোটি টাকা | — |
| সিভিল ওয়ার্কস্ ... | এক কোটি তিয়াত্তর লাখ | — |

ইহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে করিবার জন্য নূতন টাকা বাহির হইবার সম্ভাবনায় তীব্র সমালোচনা করিয়া তাহা বন্ধ করিতে বলিয়াছেন। এই সম্পর্কে বড় লাট বাহাদুর তাঁহার খেয়ালখুশীর খরচ হইতে ৮০০০০৲ টাকা অনাহারে উপবাস দিয়াছেন।

---

১৮ দিন পূর্বে সোনাডাঙ্গার বাজারে একজন লোক বিলাতী বস্ত্র কিনিতে যায়। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণের অনুরোধে উপরোধে বিফল মনোরথ হইয়া সেই বাজার পরিত্যাগ করে ও সোনাইমুড়ি বাজারে যায়। সেখানের স্বেচ্ছাসেবকগণ হয়ত পরিয়া অনুরোধে তথায় চৌমুহনী বাজারে আসে। চৌমুহনী বাজারের স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদিগকে বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে বিরত করে। আগন্তুকরা তাহারা খালিহাতে বাড়ী ফিরিয়াছে। বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ১টা পর্যন্ত সোনাডাঙ্গা আদর্শ বন্দরে ও বাজারে হাটাহাটি করিল।

"হেরম্ব বাবু"

অনুক দেশী কাপড় কিনিতে পারিল না। আশ্চর্য এই বিলাতী চীজ। কেন্ বিলাতীই হয়ত দেশী শিল্প-ব্যবসায়ে শিল্প-মাতা বলিয়া গ্রহণ করিতেও রাজী হইবে না।

---

ভার গঙ্গারাম লিখিয়াছেন যে, লোকের প্রতিমূর্তি দরাইবার আয়োজন খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সেই পত্রে তিনি লাটের দরবারকক্ষে অনুরোধ করিয়াছেন যে লোকের প্রতিমূর্তির বিরুদ্ধে যারা লিখিত আবেদন করিবেন তাহারা যেন "রাষ্ট্র দ্রোহী, রাজনৈতিক ও সৈনিক" এই কথাগুলি বাদ দিয়া লিখিত করেন। তাহা হইলে উহার অর্থ এই হইবে যে অসামরিক বেসামরিক এবং দেশের সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে।

---

লোকের মতি গতি দেখিয়া আমেরিকার রাজীয় মহাসভায় খুবই ভাবিয়া চিন্তিয়া হইতেছে। গবর্নমেণ্ট পক্ষ হইতে বহুসংখ্যক পাল্টা প্রস্তাব করা হইয়াছে, এই প্রস্তাবের মুসাবিদা ৯০ পৃষ্ঠা হইয়াছে, এই পাল্টা প্রস্তাবগুলি লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছে।

---

মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের জন্মপুরী মহানগরীতে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন। মুস্তাফা কামাল বলেন, তুর্কীরা পাশ্চিম ঢঙে ধরিয়াই চলিতেছে, মুখ ফিরাইয়া তাহারা চায় না। তুর্কীরা অবশ্যই ইউরোপীয়, জ্ঞান-বৈজ্ঞানিক, এবং বিদ্যা বিজ্ঞানে তাহাদের সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সভ্যতার এমন যদি আছে যাহা চাহেন, তবে তাহারা তুর্কীদের এই আত্মত্যাগ মানিয়া লইল, তুর্কীরা ইহা হইতে আর কিছুই চায় না। তুর্কীরা আত্মনিয়োগ এবং পরিশ্রমের সহিত সোনার্জনের মতন বুক করিতে চায়; অর্থ-নৈতিক বিষয়ে ইউরোপের সহিত সমান ছাপিত করিতে চায়—অন্য এগুলিই তুর্কি-নীতির ইহাই হইল ভিত্তি। বাণিজ্য বিষয় সংক্রান্ত ব্যবস্থার সহিত তুর্কীদের ইতিমধ্যেই কথাবার্তা আরম্ভ হইয়াছে।

---

বিশের পর দিন আমাদের অর্থনীতি বাড়িয়া চলিয়াছে কি অন্যদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। সম্প্রতি সরকার ১৯২০ ও ১৯২১ সালের আয়ব্যয়ের একটি প্রকাশিত করিয়াছে।

১৯২০ সালে জন্মসংখ্যা ১৩,৩০,৯১৩
মৃত্যুসংখ্যা ১৪,৮১,৩১২
১৯২১ সালে জন্মসংখ্যা ১৩,০১,০০১
মৃত্যুসংখ্যা ১৪,০৩,০৩০

দেখা যাইতেছে যে জন্ম-সংখ্যার চেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ কি?

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

বাসন্তী—

সফল স্বপ্ন

Lakshmibilas Press, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

# বাসন্তী

১ম বর্ষ ] ৩রা চৈত্র শনিবার ১৩২৯. ইং ১৭ই মার্চ। [ ৩৩শ সংখ্যা

# মহাত্মা স্মরণে

জগৎপূজ্য মহাত্মা, ভারতের মুকুটমণি মহাত্মার কীর্ত্তি গাথা গাহিবার দিন আসিয়াছে। অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা পরিপ্লুত হৃদয়ে, সত্য উদ্ভাসিত নেত্রে মহাত্মার পূজা করিবার দিন আসিয়াছে। কোটি কোটি ভারত সন্তান মাতৃভূমির প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া মহাত্মার কীর্ত্তি গাথা

মহাত্মা গান্ধি।

গাহিবে। তাঁহাকে পূজা করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আপনারা ধন্য হইবে। জগতের বন্দনীয় পুরুষ, বিশ্ব হিতৈষী মানবপ্রেমিক মহাত্মা পরহিত ব্রতে আত্মাহুতি দিয়াছেন।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এ মূক ঘোষনা, ভোগের বিরুদ্ধে ত্যাগের এ মূকপ্রতিনিনাদ জগতে একটা নূতন আত্মবোধের সূচনা আনিয়া দিয়াছে। বিরাট ক্ষমতা-শালীর বজ্রপ্রতাপের সঙ্গে এ অহিংস অ-সহযোগ মূক ঘোষনা জগতের মানব ইতিহাসে একটা অভাবনীয় ভাব-পর্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রেমের সাধনা, বিশ্বপ্রেমিকের গঠনা জগতের ইতিহাসে নূতন নহে। যুগে যুগে বিশ্বের সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানব-মিত্র ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহাপুরুষগণ এই সাধনা গঠনা অল্পমতি নরদিগের হাতে ভোগ করিয়া গিয়াছেন। আজ যাহাদিগের ভক্ত শিষ্য বলিয়া জগতের বিভিন্ন জাতি ও সমাজ গৌরব বোধ করে তাহারাই একদিন সেই স্বয়ংসীর মহাপুরুষদিগের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া আত্মতৃপ্তি উপভোগ করিয়াছিল। কালের প্রভাবে চিত্তের মোহাপসরণের সঙ্গে তাহারাই আবার নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ভুল লজ্জার মর্ম যাতনা সহিয়াছে।

আজ ভারতের কোটি কোটি নরনারী নব যুগ প্রবর্ত্তক মহাত্মার বন্দনা গান শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গাহিতেছে। যে সত্যের প্রভাবে মহাত্মার তৃতীয় নয়ন খুলিয়া গিয়াছে যে সত্য তাঁহার মনো-মন্দিরে জ্ঞানালোক সম্পাত করিয়াছে সেই সত্যের সন্ধানে আজ ভারতের নরনারী ব্যাকুল, আগ্রহান্বিত। ভারতের নব যুগের নবীন ভাব সাধক, তোমার ভাবপ্রেরণায় আজ সারা বিশ্ব মাতিয়া উঠিতেছে। তোমার অ-হিংস অ-সহযোগের জয়গানে আজ জগতের মনীষীবৃন্দ মুখর।

তোমায় ভারতের অন্তরেমী তুঙ্গ শৃঙ্গ, তোমায় ভারতের সাগরের অনোচ্ছ্বাস, তোমার আগমনে, তোমার ভাব মন্দাকিনীর সাধনায় আবার যেন যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশৃঙ্গ আবার যেন তাহার নমিত শৃঙ্গকে উল্লাসভরে আকাশ বক্ষ ভেদিয়া ঊর্দ্ধে উঠাইয়া দিতেছিল। নিজ গৌরব গানে ভারত আবার যেন তাহার হারাণো প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিল।

আজ এই যুগ সন্ধিক্ষণে এস ভারতের মূর্ত্ত বিগ্রহ—এস ভারতের ভাব-দেবতা, তোমার ভারতবাসীর চিত্তে আবার তেমন ভাবের প্রেরণা আনিয়া দাও যাহাতে সে তোমারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আপন শির সমুন্নত রাখিয়া—হারান প্রাণকে ফিরিয়া পাইয়া—নিজ ভাবে জগতের ভাব বিপ্লব ঘটাইতে পারে।

## ক'টি কথা।

শুনিতেছি, একটি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইবে। সেই উদ্দেশ্যে হাল থিয়েটারে গতকল্য নর্ত্তকী শিরোমণি গহরজানের নৃত্য গীতের আয়োজন হইয়াছিল। উদ্যোক্তা দেখিলাম, এস্, কে, হুদু। হুদু মহাশয়, দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের পরিচিত নহেন, তবে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ইহার অভিভাষকত্ব করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। কত টাকা উঠিল এবং প্রস্তুত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইল কি না সংবাদটি সংবাদপত্রের মারফতে শুনিতে পাইলেই সন্তুষ্ট হইব। ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখিলেই ভয় পায়, এই সকল উদ্যোগের পরিণাম প্রায়ই সন্তোষজনক হয় না, তাই একথা বলিতে হইল।

• • • •

১৮ই মার্চ সহরে হরতাল হইবে, অনেকদিন হইতে শোনা যাইতেছে। সহরে বাঙ্গালা থিয়েটার ক'টির কর্তৃপক্ষগণ শুনিয়াছিলেন কি-না কে-জানে, তাঁহারা সেদি রবিবারে অভিনয় করিবেন, বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। থিয়েটারওয়ালারা কি জাতীয় জীবনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহেন না? তাঁহাদের না-হয় স্বার্থে ঘা লাগিবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ে কি এমন একটা মানুষ নাই যে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে? অভিনেতা, অভিনেত্রী লইয়াই রঙ্গালয়, তাহারা এই পুণ্য রজনীতে নাই বা আমোদ করিতেন! বাঙ্গালী দর্শক সাধারণকেও কিছু বলিবার আছে। তাঁহারা কি মহাত্মার কারাবাসিকের দিন থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিতে যাইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন? আমাদের মনে হয় না যে এরূপ পাষণ্ড আজও এ-দেশে খুব বেশী আছে!

• • • •

এই বৎসরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা প্রশ্নপত্রে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে বলা হইয়াছে? প্রশ্নপত্র রচয়িতাটি কে, জানি না তবে ইহা বেশ বুঝা যায় যে স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিতে-থাকিতেই ইহার অদৃষ্টে একটা 'ডাক্তারী' জুটিয়া যাইবে! ভক্তির অর্ঘ্য কি, তাহা আর নাই বলিলাম। আর স্যর আশুতোষ! এই সব নির্লজ্জ তাবকদের তুমি প্রশ্রয় দাও এই আশ্চর্য্য!

## আলোচনা

একদিন দুইদিন করিয়া—দেখিতে দেখিতে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন কাটিয়া গেল। ভারতের ভাগ্যে, দেশের ও জাতির জীবনে এই যে একটা বৎসরের এতগুলি দিন কাটিল ইহা ঠিক ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের দিনগুলির মত কাটে নাই। ভারত অবোধ শিশুর মত প্রাণশক্তির বিকাশ না পাইয়া যতদিন ছিল ততদিন তাহার একরকম কাটিয়াছে। কিন্তু প্রাণশক্তির পরশ পাইয়াও—মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকাতে ভারতবাসীর পক্ষে বর্ত্তমানের এই দিনগুলি অতি অসহ্য ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণের স্বাদ ও উৎসাহ পাইয়াও সে জীবনে গতি দিতে পারিতেছে না। বিকশিত হইয়া উঠিবার জন্য সে অধীর লালায়িত—অথচ চারিদিকের পেষণে চাপে ফুটিয়া উঠিবার ক্ষমতা তাহার নাই। তাই ভারতের জীবন মুকুল তাহার কুণ্ঠাম্লান মুখ খানি নত করিয়া অ-ফোট অবস্থায়ই আবার যেন ঝরিয়া পড়িতেছে।

• •

মহাত্মা গান্ধী ভারতকে প্রাণের বারতা আনিয়া দিয়াছিলেন। বাহিরের মোহ জড়তা ও ভিতরের হীনতা হইতে মুক্ত করিয়া ভারতকে প্রাণ ও জীবন যৌবনের সাধনা শিক্ষা দিতেছিলেন। মহাত্মার প্রভাবে ভারত প্রাণের অনুভূতি পাইয়াছিল—প্রাণ শক্তির বিচিত্র উন্মাদনায়, জগতের আর আর জাতির মত ভারতীয় জাতিরও সহজভাবে চলিবার ও মনের কথা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছাশক্তি সবে মাত্র জাগিয়াছে—বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই এমন সময় ভারতীয় প্রাণশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহকে মন জীবন হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইল। ফুটোন্মুখ প্রাণশক্তি পূর্ণভাবে বাহিরের পেষণে ফুটিয়া উঠিতে পারিল না। বাহিরের চেয়ে অন্তরের মূল্য ও বোধ শক্তি চিরদিনই বেশী। হাত বাঁধা যায়, পা বাঁধা যায় কিন্তু মনকে বাঁধিয়া রাখিবার শক্তি কাহারও নাই। তাই প্রাণশক্তিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভারতীয় মন আজ এত অধীর। ভারতীয় জীবনে মহাত্মার আবির্ভাব ও বিকাশের পর হইতে যেন জীবন ও জাতীয় জীবন আর পূর্ব্বের মত জড় মোহাচ্ছন্নের অবস্থায় ঠিক চলিতেছে না। একটা বিরাট পরিবর্ত্তন ও বিক্ষোভের ভিতর দিয়া

এখন ভারত জীবন চলিয়াছে। ভারত এখন আর গতানুগতিক ভাবে মৃতের মত পড়িয়া থাকিয়া শান্তি পাইতেছে না। পরিবর্ত্তন ও বিক্ষোভের ভিতর দিয়াই সে তাহার জীবনকে চালাইয়া লইয়া জীবনের চঞ্চল মাধুর্য্য উপভোগ করিতে চাহিতেছে।

• • •• •

বাহ্যভাবে মহাত্মা আজ জাতির ভিতরে নাই। ভারতের ভিতরেই এক কারাগৃহে ভারতের নূতন জীবন মন্ত্রের ঋষি কারারুদ্ধ। এক বৎসরের তিনশত পঁয়ষট্টি দিন অতিবাহিত হইতে চলিল মাত্র. এখনও আরও পাঁচ বৎসরের পাঁচ তিনশত পঁয়ষট্টি দিন তাঁহাকে কারারুদ্ধ অবস্থায়ই থাকিতে হইবে। বাহিরের অবস্থা এই, কিন্তু ভারত অন্তরে তাহার মনোমন্দিরের দেবতাকে আজ ব্যাকুল ভাবে চাহিতেছে। প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও চাহিবার ব্যাকুলতা হইতেই বিপুল কর্ম্ম শক্তি ও কর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা আসে। যে প্রেরণায় জাতির ও দেশের ভিতরে এই উন্মাদনা, আকাঙ্ক্ষা আসিয়াছে, তাহাকেই আজ সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। আজ ভারতকে নিজ অন্তরের শক্তি দ্বারা, বাহ্য শক্তিকে পরাভূত করিয়া নিজ গৌরব মান বজায় রাখিতে হইবে।

• • • •

দেশের ও জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ—জনসাধারণ যাঁহাকে প্রাণের দেবতা বলিয়া ভাবে তাঁহাকে এভাবে জাতীয় জীবন হইতে সরাইয়া রাখা যে দেশের পক্ষে ও জাতির পক্ষে কতদূর অপমান ও লজ্জার বিষয়—জাতীয় জীবনে এর বাড়া কলঙ্ক আর নাই। জাতি ও দেশ শুধু অন্তরের শক্তি দ্বারাই বাহিরের এ অপমানকে প্রতিহত করিতে পারে, অন্য উপায়ে নহে। অন্তরে যদি সত্য ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে তবে বাহিরের এমন কোন শক্তিই নাই যে তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে। জীবন দাতের জন্য আত্মগ্লানিত জাতির সেই অন্তরের শক্তির সাধনাই আজ কারাবরণ করিতে হইবে। এত বড় তীব্র অপমান ও অসহ্য লজ্জা সম্মুখে রাখিয়া জাতি মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া রাখিয়া আর কতদিন কতকাল মূর্ত্তাভরে বিশ্বে চলিবে? আজ জাতীর জীবনের এই পরম লজ্জার অধ্যায়ের নিরাশা বিক্ষোভ ঘুচাইয়া এ লজ্জার হাত হইতে জাতিকে মুক্তি পাইতে হইবে। সত্য যাহা তাহা চিরদিন স্থির অবিচলিত থাকিবে। কিন্তু মিথ্যার ভীরুতায় ও মৌহে আমরা জীবন হইতে সত্যের আলোকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া মিথ্যা মোহে জীবন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। অন্তরশক্তির জাগরণে এ মিথ্যা জাতীয় জীবন ও জন জীবন হইতে অপসারিত হইলেই মহাত্মার অনুশাসন সফল হইবে। জাতীয় জীবন আবার প্রাণবন্ত হইয়া উল্লাস ভরে চলিতে পারিবে।

• • • •

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় বিদ্যালয়ের স্থাপনা চলিয়াছে। আমাদের বাংলা দেশেও কলিকাতার নিকটে যাদবপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অনেকে অনেক অর্থ এপর্য্যন্ত দিয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও অর্থ উঠিবার আশা আছে। এই অর্থে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড সৌধ উঠিবে, ছাত্রদের জন্য হয়তো বিরাট তিনতলা চারিতলা প্রাসাদের মত অট্টালিকাও উঠিতে পারে। ভাল ভাল শিক্ষক অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হইবেন। সবই ভাল, এইরূপ জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশে যত স্থাপিত হয় তাই ভাল। কিন্তু একটা কথা হইতেছে কি এই সব শিক্ষা মন্দির হইতে যে সমস্ত ছাত্র পাঠ শেষ করিয়া বাহির হইবে জাতীয় মন্দিরের অধ্যক্ষগণ তাহাদের কোন চাকুরী দিবার অঙ্গীকার করিতে পারিবেন কি? যদি তাহা পারেন তবে বিদ্যালয়ের আশাতীত উন্নতি হইবে—ছাত্রদেরও সকলকে স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে না, কিন্তু যদি ভুলেই ভুল হয় যদি এ বিদ্যামন্দিরে বিদ্যালাভ করিয়া বাঙ্গালীর চির ঈপ্সিত চাকুরী নামক মাকাল ফলটির সন্ধান না মেলে তবে ইহার ভবিষ্যৎ ফল কতটা আশাপ্রদ হইবে তাহা বলা যায় না।

• • • •

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান সভ্যতার আওতায় আমরা যাহা পাইয়াছি ও শিখিয়াছি তাহা একেবারে ভুলিতে পারিলেই আমাদের মুক্তি। বর্ত্তমান সভ্যতার শিক্ষা পর্য্যন্ত আমাদের ভুলিয়া যাইবার কথা। শিক্ষা সব সময়ই ভাল সন্দেহ নাই—কিন্তু যে শিক্ষা পদ্ধতিতে মানুষকে অমানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবারই সহায়তা করে, যাহাতে আত্ম নির্ভরতা আসে না আসিয়া পরমুখাপেক্ষীতাই সমূহ প্রশ্রয় যের যেরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়

জীবন হইতে যত শীঘ্র দূর করা যায় তাই ভাল। যে শিক্ষায় ও সভ্যতায় জাতীয় জীবনের আজ এই হীন অধঃপতন—যাহার মোহে পড়িয়া সমস্ত দেশটা না খাইতে পাইয়া হা অন্ন হা অন্ন করিয়া মরিতেছে সে শিক্ষা ও সভ্যতা যে জাতির পক্ষে ও দেশের পক্ষে অভিশাপের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

• • • •

মহাত্মা গান্ধী শিক্ষিত লোক—তার উপর জগতের লোকেও তাঁহাকে জানে, চেনে এবং মানে। মহাত্মা ইয়ং ইণ্ডিয়া নামক পত্রের সম্পাদনা করিতেন—শোনা যায় সংবাদ পত্রের সম্পাদকরূপেও তাঁহার বেশ একটু খ্যাতি হইয়াছিল। তিনি ভারতবাসী হইয়া ভারতের উন্নতি ও মুক্তি চাহিয়াছিলেন এই তাঁহার অপরাধ এবং এই অপরাধের জন্যই তিনি ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মহাত্মার সঙ্গে বাহিরের লোক যাহাতে সাক্ষাৎ করিতে না পারে সেজন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থা হইয়াছে। কি জানি পাছে তিনি কোন রাজনৈতিক মতামত দিয়া ফেলেন ও বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় ও ভারতবাসী মহাত্মার মত জানিতে পারে এই আশঙ্কা। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে মহাত্মাকে একখানা মাত্র হিন্দী 'সরস্বতী' পত্রিকা ভিন্ন আর কোন পত্রিকা পড়িতে দেওয়া হয় না। সভ্য লোকেরাই নাকি নিত্য সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে, যে দেশ যত সভ্য সেই দেশেই নাকি সংবাদপত্রের প্রচলন তত বেশী। শিক্ষিত লোকেরা বাহিরের খবর দেশের খবর সংবাদপত্র পড়িয়া জানিতে চাহে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক আগ্রহ। চোদ্দ হাত উঁচু জেলের প্রাচীরের মধ্যে কত কত রক্ষী ঘিরিয়া যাঁহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে বাহিরের সংবাদপত্র পড়িতে দিলে তিনি জেলে বসিয়া আর কি করিবেন? এ সব সভ্য দেশের সভ্য ব্যবস্থা!

• • • •

আলি ভ্রাতৃদ্বয়—মৌলনা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলিও সংবাদপত্র পাঠে বঞ্চিত। মৌলনা মহম্মদ আলির নামও সংবাদপত্র সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার উপরেও কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা। এই সব সংবাদ শুনিয়া আমরা শুধু এইমাত্র ভাবিতে পারি যে কেন এমন হয়? তবে রাজার জাতি মহাশয়—তোমরা যা সভ্যতাবে তাই সয়।

জার্মেনরা বড় বিব্রত। ফরাসীরা সুযোগ পাইয়া তাহাদের আঁকিয়া বসিয়াছে। এক সময়ে ফরাসীরা জার্মেন ভীতিতে অস্থির হইয়া জগতের কাছে জার্মেন বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কথা গাহিয়া জার্মেন যে মানুষ নহে—নরাকারে পশু তাহাই প্রমাণ করিতেছিল—আজ সময় পাইয়া তাহারাই ফ্রার্মেনদের উপর তেমনি নিষ্ঠুরতা চালাইতেছে। জগতের নীতি ও ধর্ম এখন যার যার সুবিধা অনুযায়ীই গঠিত হয়। সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। জার্মেন এখন অন্নাভাবে অস্থির ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহেও তাহারা নিজ দেশের দুর্দশার কাহিনী জানাইয়া অর্থ সাহায্য চাহিতেছে। কিন্তু এই দুর্দশার মধ্যেও জার্মেন জাতি ভারতে ৫,২৮৫,০৯২৲ লোহার জিনিস, ২,০১১,০১২৲ কাঁচের জিনিস, ৩,৬৮৯,৯২৫৲ নানা-বিধ কল, ৫৪২,৯৩৩৲ কাগজ, ৮৫,১০১৲ মদ পাঠাইয়াছে। পাঁচ মাসে জার্মেনেরা এত টাকার জিনিস এদেশে পাঠাইয়াছে। ইহা ছাড়া জার্মেন রং ও লক্ষ লক্ষ টাকার আসিতেছে। কলিকাতা সহরে ফিরিওয়ালাদের হাতে হাতে এখন শুধু জার্মেন মালই দেখা যায়, দোকানেও তাই। জাপান যেন হটিয়া গিয়াছে। আমরা ভারত-বাসীরা দিব্যি এই সব জিনিস কিনিয়া বিলাসিতা করিতেছি ও ঘরের টাকা বাহির করিতেছি। কে বলিবে ভারত দরিদ্র;—যে দেশের লোক নিজেরা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিছুই নিজ হাতে করিতে পারে না জগতের সকল দেশের পণ্যদ্রব্য কাটাইবার যে শ্রেষ্ঠ স্থান সে দেশকে দরিদ্র কে বলিবে?

• • • •

সহযোগী আনন্দবাজার 'যৌবনের জাগরণে' জার্মেন প্রসঙ্গে লিখিতেছেন 'তরুণ কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর ভাস্কর নব্য জার্মেনীকে নবীনভাবে গড়িয়া তুলিতেছেন।...নব্য জার্মেনীর যুবকদল সর্বত্র আবৃত। নব-জীবনের আনন্দে কর্ম চঞ্চল জার্মেনীর যুবক শক্তি কি অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত জাতীয় জীবনের সমস্ত সৌষ্ঠবকে জাগ্রত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে—তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা রুঢ়ের নিরুপদ্রব তিরোধ সংগ্রামে লক্ষ্য করিতেছি। সমগ্র ইওরোপের প্রলয় বিক্ষোভ হইতে রুশিয়া, জার্মেনী, ইটালী এবং সর্বোপরি তুরস্কের যুবক শক্তি কি অসাধারণ ত্যাগ ও শৌর্য প্রদর্শন করিয়া

ষ ষ জন্মভূমিকে ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিল—আর আমরা বাঙ্গালী যুবক আমরা কি করিতেছি ?

• • • •

'বাঙ্গলার যৌবন আজ অকালে জরাগ্রস্ত। পুঁথির দুর্ব্বহভারে বঙ্গ মেরুদণ্ড বাঙ্গালার যৌবন আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাষাণ মুষ্টিমে পড়িয়া ধুঁকিতেছে। তাহার জীবনে উচ্চাশা নাই, জাতীয় গৌরব বুদ্ধি নাই, যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা নাই, আত্মসম্মান জ্ঞান নাই—আছে কদর্য্য বিলাস আছে বার্দ্ধক্যের নৈরাশ্য ব্যঞ্জক বিজ্ঞতা, পরিণামহীন চেষ্টা, আর শূন্যময় জীবন !...রামমোহন, বিবেকানন্দ, কি অরণ্যে রোদন করিয়া গিয়াছেন ? গর্জ্জন সিংহের গর্জ্জন কি সিংহ শিশুর মূষিকবৃত্তি দূর করিতে পারিল না ? আমরা কি নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস মোচন করিবার জন্যই বাঙ্গালা দেশের যুবক হইয়া জন্মিয়াছি। আমাদের কি কর্ত্তব্য নাই—অধিকার নাই—দায়িত্ব নাই ? আমরা কর্ম্মবীর শিশুকে অমানুষ প্রস্তুত করিবার জন্যেই শিক্ষা যন্ত্রে ফেলিয়া দেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলের পেষণে মনুষ্যত্বটুকু নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লয়—প্রাণে মারে না, কিন্তু প্রাণহীন জীবন্ত নরকঙ্কালগুলি পরীক্ষার ছাপে দাগিয়া ভবের হাটে ছাড়িয়া দেয়। গোলামী করিয়া জীবন কাটাইবার চেষ্টা ছাড়া আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোন নব উদ্ভাবনী শক্তি থাকে না। যাহার আত্মবোধ নাই তাহার আত্ম নির্ভরতা কেমন করিয়া আসিবে ?'

• • • •

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীদের মাহিয়ানা কমিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে এ পর্য্যন্তও কমে নাই। কিন্তু মন্ত্রীদের মাহিয়ানা কমিবার পূর্ব্বে,—কোন প্রদেশে মন্ত্রীদের স্বেচ্ছা-আত্মদানে কোন প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার চাপে যখন বহিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন বাংলাদেশেও শীঘ্রই বহিবে আশা করা যায়। কিন্তু শুধু ট্রান্সফার্ডের দিকে হাত দিলেই বা কি হইবে ? রিজার্ভে যে এমনি মোটা মাহিনা শ্রেণী প্রচুর রহিয়াছে। দেশের লোকে ট্রান্সফার্ড কমাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ওদিকে রিজার্ভ আরও বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। সিভিলিয়ানদের নাকি এতটেও পোষায় না তাই আরও চাই রব উঠিয়াছে হয়তো হইবেও। দু'দিকেই চাপটা সমান পড়িলে ভাল হয় না ?

---

মহাত্মা গান্ধীর কারাপ্রবেশ দিন ১৮ই মার্চ, ভারতব্যাপী হরতাল।

---

বেলুড় মঠে উৎসব দৃশ্য।

আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

৪৷৷ বিনামূল্যে মার্কেটসাজি ফটো
ফটো এনলার্জ্জ ফিনিসসহ ১২×১০
ফটো সহযোগীর সিকি মূল্যে পটান
কমার্শিয়াল, পোর্ট্রেট ও রবারষ্ট্যাম্প মেকার
৩৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

# রুশ-ইতিহাসের একপৃষ্ঠা

## ( উপক্রমণিকা )

[ শ্রীকিশোরীলাল ঘোষ এম-এ, বি-এল ]

রুশ দেশের খবর আমাদের দেশের লোক বড় একটা রাখে না। জাপান যখন রুশকে বিষম জব্দ করল সেই সময়টা দিন কতকের জন্য আমাদের স্বদেশবাসীর রুশ দেশের বৃত্তান্ত জানবার কিছু আগ্রহ হয়েছিল। মাঝে মাঝে এক একখানা ইংরেজীগল্পের বহিতে কিংবা তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ পড়ে অনেক সময় আমরা নিহিলিষ্টদের "চিত্তচমৎকার" ও "লোমহর্ষণকর" ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারি আর রুশিয়ার লোক তাদের সম্রাট ও তাঁর কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে কিরূপ উৎপীড়িত হয়ে কি উপায়ে তাদের দেশকে এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল সে বিষয়ের একটা ক্ষীণ ধারণা আমাদের মনের মধ্যে হয়ত আছে। উপন্যাস ছাড়া রুশ দেশ বা রুশ জাতির সম্বন্ধে খবরাখবর ইংরেজী কাগজ থেকে কতক পেতুম। ইংরাজেরা রুশজাতিকে আগে বড়ই ভয় করত। তাদের সর্ব্বদা ভয় ছিল কখন বা আফগানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রুষ সৈন্য খাইবার পাশ বা বোলান পাশ দিয়ে ঘাঁ—করে সোণার ভারতে এসে পড়ে আর ইংরেজদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে ফেলে। ইংরেজরা কত কষ্ট করে ভারতে এসে আমাদের এই স্বর্গপ্রসূদেশের বর্ব্বর লোকগুলাকে একটু একটু করে বহুকষ্টে সভ্যতার গাছে চড়াচ্ছে ঠিক যদি এই সময় রুশ সেনা এসে পড়ে তো তার চাইতে আপশোষের কথা আর কি হ'তে পারে? সেই জন্যে ইংরেজী কাগজগুলা রুশ দেশের ভাল দেখ্‌তে পার্‌তো না আর দেখ্‌তে পেলেও সেটা আমাদের কাছে বলা দরকার বিবেচনা কর্‌তো না। মাঝে মাঝে রুশ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারের কথা বেশ করে গুছিয়ে লিখে তার ওপর বেশ একটা লম্বা চওড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য জুড়ে আমাদের সাবধান করা হ'তো যাতে রুশিয়ার প্রথার সঙ্গে আমাদের নিজেদের অবস্থা তুলনা করে ইংরেজদের দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পারি—আর তা না করে যদি কখনও করি যা খবরের কাগজে ছুটো নিজের দেশের দুঃখের কথা লিখি তাহ'লে আমাদের শাসকেরা বুঝতেন যে আমাদের পাখা উঠেছে "মরিবার তরে।"

সুতরাং আমরা যে রুশদেশ বা জাতিটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান্‌তাম না এটা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। গত যুদ্ধের সময় থেকে রুশদেশ সম্বন্ধে কিছু খবর কাগজে বেরুতে আরম্ভ করে ছিল। কিন্তু সে খবর থেকে আসল কথা জানা বড় শক্ত। আগে যেমন রুশ বল্‌তে যা কিছু মন্দ, জঘন্য তাই বোঝাত, লড়াইয়ের প্রথম প্রথম কিন্তু রুশের নামে ইংরেজদের লাদ্ পড়তো—তারা যে তখন ally—মিত্র। জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে রুশ ইংরেজ ও ফ্রান্সকে সাহায্য করবার জন্যে কোমর বেঁধেছে। রুশের কি কোন দোষ থাকতে পারে? দোষ যার যা কিছু আছে, ছিল বা হবে সব চাপাও ঐ বেঁড়ে ব্যাটা জার্ম্মানীর ঘাড়ে। রুষ সম্রাট দেবতার মত ন্যায়পরায়ণ, প্রজাদের ছেলের মত ভাল বাসেন। রুশজাতি ভয়ানক সভ্য, বীর, স্বদেশ ভক্ত আর জার্ম্মানীকে বিষম ঘৃণা করে কাজেই ইংরেজ কাগজওলারা রুশ সম্রাট আর রুশজাতির ছবি এমনি রঙ্ ফলিয়ে আমাদের সাম্‌নে ধর্‌লে যে আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। কখনই বা রুশেরা অসভ্য ছিল আর কখনই বা কোন যাদুকরের সোণার কাঠির স্পর্শে সভ্য হ'লো? আবার লড়াইয়ের শেষভাগে কাগজ ওলাদের মত বদ্‌লে গেল। রুশেরা নাকি বোলশিভিক্ হয়ে গেছে। বোলশিভিকরা নাকি শিশু হত্যা করে, স্ত্রীলোকের সতীত্ব মানে না, আর লোকের টাকা কড়ি নিয়ে দেয় না। তাদের নেতা লেনিন্ আর ট্রট্‌স্কি নাকি নরাকারে পশু আর তারা নাকি ইংরেজ, ফরাসী, আর অন্যান্য যে সব জাত অসভ্য জাতদের সভ্য করবার চেষ্টা কর্‌ছে তাদের ওপর বিষম চটা। বোল্‌শিভিক নাকি বলে, যে জাত যেমন আছে তাকে তেমন থাক্‌তে দাও, তার উন্নতি অবনতি সে বুঝবে—তাতে অন্য জাতের মাথা ব্যথার দরকার নাই। যদি কোন জাতের অন্য জাতের দুঃখে মাথা ধরে উঠে সে মাথাটা কেটে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়—যে জাতের দুঃখে মাথা ধরে উঠ্‌ল সে জাতটাও সভ্য হবার পাপ থেকে পরিত্রাণ পায় আর মাথা ধরাটাও সেরে যায়। এ সব কথায় ইংরেজের আর

করাসীর বড় রাগ। আবার রুশজাতি অসভ্য হ'লো—অন্ততঃ ইংরেজ আর করাসীদের কাগজওলা ও রাজনীতিজ্ঞদের কাছে। এতেই দেখা যাচ্ছে রুশজাতটা বড়ই বেয়াড়া জাত। গত বিশ বৎসরের ভিতর কখন সাধু কখন অসাধু—কখন সভ্য, কখন অসভ্য।

কিন্তু কাগজওলা আর রাজনীতিজ্ঞ ছাড়াও পৃথিবীতে আরও অসংখ্য লোক আছে। তাদের মধ্যে আবার জনকয়েক লোক আছেন যাঁরা মানব জাতির হিত চিন্তা করেন এবং কি উপায়ে মানুষ দ্বেষ হিংসা ভুলে পরস্পরকে ভালবাসতে শিখবে সেই বিষয়ের আলোচনায় অনেক সময় কাটান। মিঃ বার্ট্রাণ্ড রাসেল যদিও ইংরেজ—তিনি এইপ্রকারের লোক। রুশবিপ্লববাদীদের বিখ্যাত মুখপাত্র ও ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম্ গর্কির "Mother" নামক নূতন উপন্যাসের মুখবন্ধে বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান জগতের চক্ষু, রুশিয়ার দিকে নিবদ্ধ। এক পক্ষে বলতে গেলে রুশিয়ায় এখন যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের ফলাফলের উপর পৃথিবীর সুখ দুঃখ ষোল আনা না লোক বার আনা নির্ভর করছে। কথাটাতে অনেকেই আশ্চর্য্য হতে পারেন কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যাপারের প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু যাঁরা গত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়া হইতে বর্ত্তমান সময়ের ঘটনাবলী স্থির চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন তাঁদের কাছে রুশিয়ার স্বরূপ, তার লক্ষ্য ও সাধনা একেবারে অজানা নয়।

রুশজাতির ইতিহাস ভারতবাসীর পক্ষে আদরের জিনিষ। তার প্রধান কারণ রুশদেশ ও রুশজাতির সহিত ভারত ও ভারতবাসীর অনেক সাদৃশ্য আছে। রুশিয়া ভারতের ন্যায় বিরাট। রুশ সাম্রাজ্যের (রুশিয়া, সাইবিরিয়া, রুশিয়ান মধ্য এসিয়া ও ককেসাস্) পরিধি মোট এককোটি দশলক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত বর্গক্রোশ। লোক সংখ্যা চৌদ্দকোটি সাতলক্ষ। ভারতের পরিধি মোট নয়লক্ষ বর্গক্রোশ, লোক সংখ্যা প্রায় একত্রিশ কোটি। মুসলমান, ইহুদি, মঙ্গোলিয়ান, আর্য্যেনিয়ান্ ও স্লাভজাতি নিয়েই রুশজাতি গঠিত হয়েছে। ভারতের উদীয়মান নবীন জাতি হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শী ও জৈনদের নিয়েই বীর কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে গড়ে উঠছে। রুশিয়াকে ভারতের ন্যায় বিরাটদেহ ও বিপুল লোক সংখ্যা সত্ত্বেও ছোট ছোট দেশের ছোট ছোট জাতির কাছে জড়সড় হয়ে থাকতে হয়েছে। রুশিয়া তার স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের ও তাঁর আত্মীয়পরিজন ও কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে যথেচ্ছাচারের সুখ হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। ভারতবাসীর হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বিদ্যাতের জনসভার অধীনস্থ ভারত সরকারের অনুগ্রহে আমাদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে।

রুশ জাতির চরিত্রে একটী বিশেষ গুণ আছে যার দরুণ তার ইতিহাস জানবার আগ্রহ আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক। য়ুরোপীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে যেরূপ বর্ণগর্ব্বিকতা (race arrogance) দেখা যায় রুশজাতির মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। মধ্যএসিয়ায় রুশিয়ার প্রভাবের একমাত্র কারণ যে স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত রুশেরা বিশিয়া তাহাদের আপন করিয়া লইয়াছে। রুশজাতির ধমনীতে এসিয়ার রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। এসিয়াবাসীর চরিত্রের দোষগুণ রুশিয় চরিত্রে পরিস্ফুটরূপে দেখা যায়। ভারতবাসীর ন্যায় রুশিয়ার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি দরিদ্র, ধর্ম্মপরায়ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সরল এবং অজ্ঞ। ভারতের যেমন সেনা বিভাগ, পুলিশ বিভাগের ও অন্যান্য সরকারি চাকরের মাহিনার খরচ যোগাইতে রাজস্বের প্রায় বার আনা উবিয়া যায় আর শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প বা বাণিজ্যের জন্য বিশেষ কিছুই থাকে না রুশবিপ্লবের পূর্ব্বে রুশিয়ারও ঠিক সেইরূপ অবস্থা ছিল। সভ্য ভারত সরকার যেমন মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, অহিফেন প্রভৃতি জাতীয় স্বাস্থ্য ও নৈতিক উন্নতির অকাট্য ঔষধের ব্যবসা করে এই বিশাল ভারত রাজ্য শাসন করছেন, রুশিয়ার প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ ভডকার (একপ্রকার দেশি মদ) ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ করতেন ও সেই লাভের টাকায় নবাবী করতেন। দেশভক্ত রুশের রুশিয়ায় স্থান ছিল না। তাঁহাকে হয় বিদেশে পলায়ন করতে হ'ত অথবা সাইবেরিয়ার খনি কিম্বা রুশ রাজধানী পেট্রোগ্রাডের (পেট্রোগ্রার্ডের) নিকটবর্ত্তী শ্লুসেলবার্গ নামক দুর্গে (রুশদেশের ব্যাস্টাইল্) আবদ্ধ থাকতে হ'ত। বিনা বিচারে লোককে ধরে চালান করা রুশরাজ কর্ম্মচারীদের নিকট "শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষার এক প্রকৃষ্ট উপায় বলে বিবেচিত হ'তো। ভারতবাসীরা অবশ্য ১৯১৮ সালে তিন নম্বর আইনের (Regulation) কথা জানেন ও Defence of India Actএর দোহাই দিয়ে গড়ারের সময় কিরূপভাবে পুলিশ মহাশয়েরা ভারতের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিলেন তাও কারও অবিদিত নাই।

রুশ জাতির ইতিহাসের সহিত ভারতের অনেক সাদৃশ্য যে আছে তা উপরোক্ত কয়েকটা উদাহরণে কতকটা বোঝা যায়। সুতরাং ১৯১৪ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মোটামুটি একটা রুশজাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস বোধহয় আমাদের লোকের কাছে ভাল লাগতে পারে। সেইজন্যই "রুশ ইতিহাসের একপৃষ্ঠা" পাঠকদের চক্ষের সাম্নে ধরবার ইচ্ছা রহিল।

বাসন্তী—

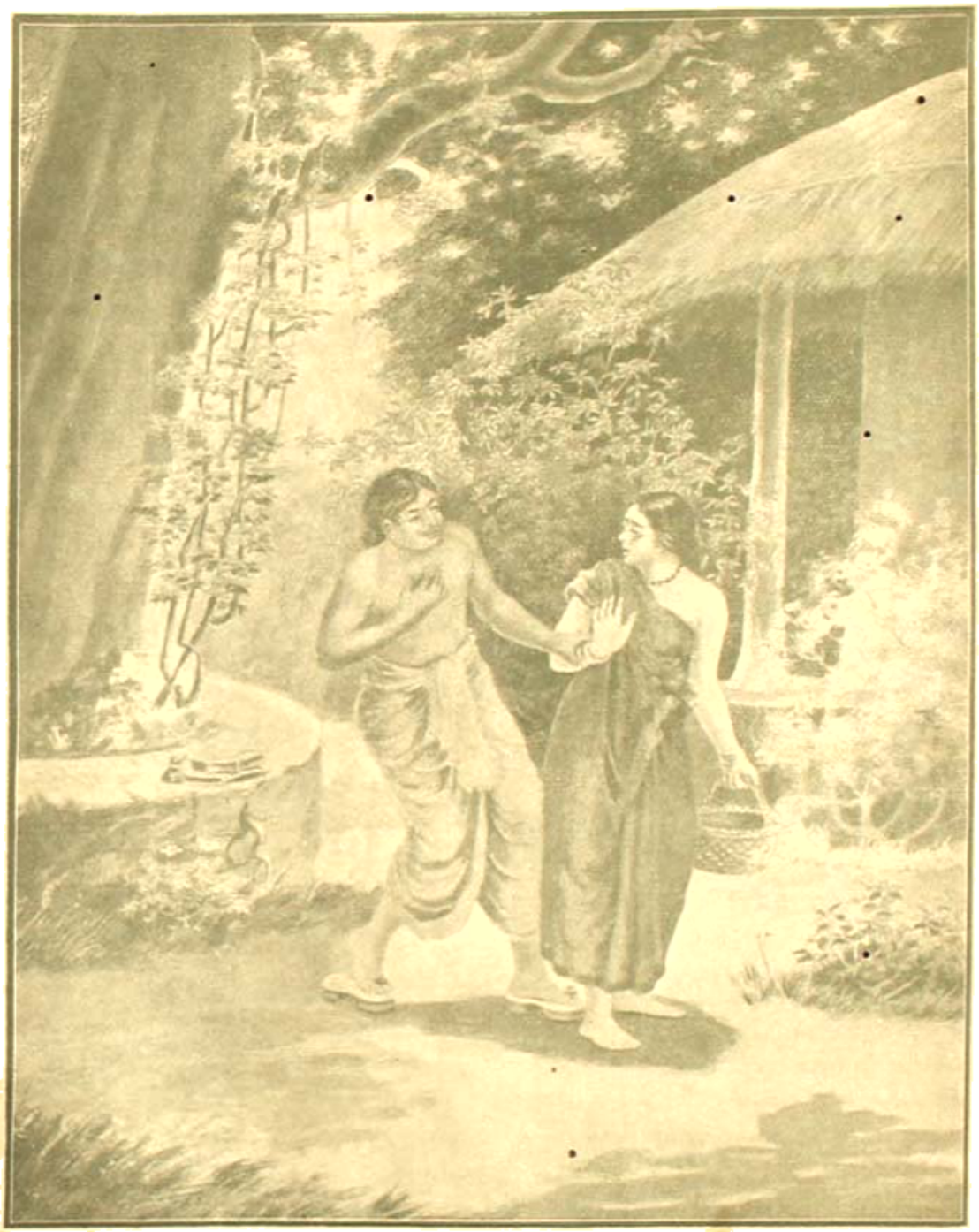

শুকতলা আজা যায় পুষ্প আহরণে।
দণ্ড তারে বলে মোরে তোর উদ্যানে।

রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

# রাহুর প্রতি

[ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ]

হে রাহু তুমি যে প্রবল পরম
হিংস্র তাহাও জানি,
অঘটন তুমি ঘটাইতে পার
তাহাও ঠেকিয়া মানি।
সৌর জগতে গ্রহের মধ্যে
ঘুরিতেছ তুমি ঠাঁই
তবু কেন তব অকারণ রোষ
হীন বিদ্বেষ ভাই।

( ২ )

দুঃশীল তুমি কোপন কুটিল
বিশাল তোমার গ্রাস,
অসাধুর তুমি গৌরব বট,
কিন্তু সাধুর ত্রাস।
জীবন খোয়ালে অত্যাচারেতে
নিজেই দেখ না ভাবি'
অমৃতের ভোজে পংক্তি-ভোজনে
কতটুকু তব দাবী?

( ৩ )

ভেবেছ কি তুমি ভেবেছ দম্ভী
মৃত্যুঞ্জয়ের কথা,
সেই দশানন কংস কুটিল
আজিকে তাহারা কোথা?
আলোকে আঁধার করিতে তোমার
যদিই জীবন গেল,
দুখী অমরতা লাভ করা চেয়ে
মরা যে অনেক ভালো।

( ৪ )

গ্রাস কর তুমি, গোপনে বন্ধু
নাশ কর আপনারে,
বন্ধী এবং চন্দ্রী হইয়া
নিজেকে ফেলাও পাকে।
কেন এ গোপন আত্মহত্যা
ঘৃণা দ্বেষ দাও ছাড়ি,
পশু বলে কেহ হইতে পারে না
অমৃতের অধিকারী।

( ৫ )

ঘৃণার পুরের অধিকারী হয়ে
থাকিতেই চাও যদি,
থাক চিরদিন দাবী দাওয়া হীন
তব কণ্টক গদী।
অমর হইয়া মর পলে পল
স্বীয় বিদ্বেষ জ্বরে
বিষ তরু তুমি উগারো হে বিষ
চোরা সুধা পান করে।

---

# 'সারি-পাঁচি'

[ শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় ]

( ক )

পৌষ-সংক্রান্তির হিম-আড়ষ্ট অপরাহ্ণ বেলায় পেতাপ বাউরীর উঠানে 'সা-রি-পাঁচির' মজলিস্ বসিয়াছিল। আজ দু' তিন দিন তাহারা কয়লা-খাদে কাজ করিতে যায় নাই,—যত সব নষ্ট চরিত্রা মেয়েদের নিকট টাকা আদায় করিয়া মদ খাইতেছে এবং নাচ গান করিয়া আমোদ আহ্লাদে দিনগুলা যে কেমন করিয়া পার করিতেছে কাহারও খেয়াল নাই!

পেতাপের উঠানের একপাশে একটা ছেঁড়া চটাইএর উপর তাহারা বসিয়াছিল। দু'তিনটা মদের হাঁড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিল; মুড়ি, কলাইভাজা এবং বেগুনির চাট সমস্ত উঠান জুড়িয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মধ্যাহ্নবেলায় যখন উঠানখানা রৌদ্র ছিল, তখন হইতে একটু একটু করিয়া মদ চলিতেছে, এখন পড়ন্ত বেলায় শীতের প্রকোপও একটু বেশী হইয়া আসিল, গাছের পাতাগুলা নড়াইয়া বাতাস বহিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে

কাপড় ধরাইতেছিল ; পেতাপ্ গায়ের মলিন কাপড়খানা বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া ডাকিল,—গরবী, তোর বাপ্ কই ?.....

একটি যুবতী বাউরীর মেয়ে, উঠানের একপাশে একটা পত্রবিহীন ফুলগাছের নীচে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়াছিল, পেতাপের ডাক শুনিয়া, অদূরে লছু বাউরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—ই, এই যে !

লছু একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল,—এই যে আমি রইছি হে সর্দ্দার !.....

পেতাপ্ সর্দ্দারের জবাফুলের মত রাঙা চক্ষু দুইটা তখন অর্দ্ধমুক্ত। ঝিমাইতে ঝিমাইতে কহিল,—হঁ..... বল্‌ছিলম্ কি, তুদের গরবী তো শ্বশুরঘর যায় না। ... হুঁ।...একটু চুপ্ করিয়া ঘাড়টা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে পুনরায় বলিল,—বল্ বেটে কি না লয় ?... হেঁ.....হেঁ।

লছু ধীরে-ধীরে বলিল,—মান্‌লম্—তা বেটে।

স্বীকারোক্তি পাইয়া অপেক্ষাকৃত জোর গলায় পেতাপ্ বলিল,—তবে,—হুঁ···হুঁ। বুঝ লি,—দশ টাকা !—গরবী শুন্ !—কাল সকালেই দশ টাকা।...বাস্, সমস্তর আর কেউ 'রা'টি কাড়্‌বেক্ নাই।

লছু একবার চোখ দুইটা তুলিল বটে কিন্তু গরবীর মুখের পানে তাকাইতে পারিল না ; অনুযোগের সুরে বলিল,—বড় বেশী হলো সর্দ্দার,—উ ছেলে-মানুষ, কোথা পাবেক্ বল্ ?

পেতাপ্ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই হাত বাড়াইল, মদ্যপাত্র রূপে ব্যবহৃত কাঁসার একটা বড় বাটি হাতে ঠেকিতেই সেইটা তুলিয়া লইয়া ঘোরে ঘোরে মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে কহিল,—বেটে,—বেটে ? নিজের বেলায় তা হবেক্ বৈ কি ?.....যাহাতে লছু। যখনীর না হয় সমস্ত্ ওঁর চেয়ে দু বছর কম,—কপালবাবুর ঘরেই না হয় কাজ করে, সে যখন পঁচিশ্ টাকা দিলেক্, তখন গরবীকে দিতে হয় তিরিশ্ টাকা !...না না উ সব শুনা হবেক্ নাই লছু, দশ টাকায় কম কাল 'ছেগেনের' দিনে কিছুই হবেক্ নাই।...হঁ, ঠিক্, ঠিক্...লে বাবু লে, আর কথা কস্ না। চট্ করে' আর এক বাটি মদ্ ঢাল্—গরম করক্ ।...বাবাঃ যে জাড় !—বলিয়া পেতাপ মদের জন্য হাতের বাটিটা অগ্রসর করিয়া দিয়া বেশ জমকাইয়া বসিল।

আর এক 'কচ্' করিয়া মদ ঢালিবার পর, পেতাপ এক গ্রাস শুক্‌নো মুড়ি ও একটা কাঁচা লঙ্কা চিবাইতে চিবাইতে গরবীর দিকে একবার তাকাইল। গরবী তখনও ফুলগাছের তলায় বসিয়া বসিয়া পায়ের অবশিষ্ট মলটুকু পরিতেছিল। পেতাপ্ কহিল,—যা তুদের ঘরে যা গরবী, তাগাদা যে তোর বাবুকে, যা।....

গরবী চলিয়া গেল।

( খ )

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।.....

অদূরে খেতের পাশে সাঁওতালদের কুলিধাওড়ায় তখন 'বোঙাবুড়ির' পূজা এবং মূর্গি বলি চলিতেছিল।

গরবী সেই রাস্তা দিয়া পার হইয়া কয়লাকুঠির বহুকালের জরাজীর্ণ অফিস্ ঘরটার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একটা হাতভাঙা চেয়ারের উপর বসিয়া বড়বাবু নন্দলাল কপাসের উপর চশমাটা তুলিয়া রাখিয়া একখানা বড় খাতার উপর কত কি লিখিতেছে। টেবিলের একধারে একটা ধুম্র মলিন হ্যারিকেন লণ্ঠন মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। অফিসঘরের আসবাব পত্রের মধ্যে দেওয়ালের উপর একটা জাপানী 'ক্লক' বহুকাল ধরিয়া, ৬টার ঘরে ১০টা, এবং ১২টার ঘরে ৬টা, করিয়া অনিয়মিতভাবে বাজিয়া আসিতেছে। ঘরের এক কোণে একটা ঘুণ্-ধরা কাঠের 'বুক্‌সেল্‌ফের' উপর ধূলিমলিন খাতাপত্র বোঝাই করা আছে। সেখানে ইস্তক্ কুঠি আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত খাতাই খুঁজিলে পাওয়া যায়। তাহারই একপাশে একটা স্টীলআলমারি বড়-ছোট, ভাঙা গোটা, নানারকমের শিশি বোতলে পরিপূর্ণ। ডাক্তারবাবু জিম্ম অন্য কাহারও ঐ আলমারীর উপর হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হইলেও, তাহার প্রত্যেকটি আর্শি ভাঙিয়া গিয়া, কুলি মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া ইতরবর্গ নির্ব্বিশেষে সকলেরই কপালে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। দেরেকের উপর লোহার পিঞ্জে ঝোলানো চিঠির বোঝার চারিটি দেওয়ালের কোথাও এতটুকু অংশ অবশিষ্ট পড়িয়া নাই।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার ঠিক এই সময়টায় বড় বাবু নন্দলাল তাহার উপরি পাওনার হিসাব ইত্যাদি খাতায়

তুলিয়া লয়। ইহার পূর্ব্বে কুঠিতে যে বাঙ্গালী ম্যানেজার ছিলেন, তাঁহার আমলে নন্দলালকে এতসব কিছুই করিতে হইত না। ম্যানেজার বাবু তাহাকে একটু নেক্-নজরে দেখিতেন এবং সময় অসময় তাঁহার ফরমাস্ মত 'চিজ' জোগাইতে পারিলে নানাপ্রকারে বহুল রোজগারের পন্থা বাড়লাইয়া দিতেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, কমিশনের লোভে রেন্ট বাড়াইতে গিয়া মাকি অজ্ঞার উপরে তিনি এক মাসের মধ্যে পাচটি মাল্‌কাটা কুলি খুন্ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সেই অপরাধে "মাইনস্ ইন্‌স্পেক্টর" সাহেবের আদেশ মত তাঁহাকে কমলাকুঠির ম্যানেজারির কাজে চিরজনমের মতই ইস্তাফা দিতে হইয়াছে। এখন তাঁহার স্থানে আসিয়াছেন একজন কিরিঙ্গি ইংরাজ ম্যানেজার। সাহেবটাকে নিজের হাতের মুঠার মধ্যে আনিবার জন্য নন্দলাল চেষ্টার ত্রুটি করে নাই,—বহু তোষামোদ করিয়াছে, অনেক প্রকার প্রলোভন দেখাইয়াছে কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এই অর্ব্বাচীন শ্বেতাঙ্গটাকে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে কমলাকুঠির ম্যানেজারি চাকরীটা কত সুখের; কাজেই তাহার হৃষ্টের অন্ত ছিল না। উপরি পাওনার হাড়টাও কমিয়া আসিয়াছিল। এই সব নানা কারণ বশতঃ আজ কাল তাহার মেজাজটাও সকল সময়েই যেন একটু রুক্ষ হইয়া থাকিত।

হঠাৎ হাতের চুড়ির ঝুন্ ঝুন্ শব্দ পাইয়া নন্দলাল খাতা হইতে মুখ তুলিয়া দরজার দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিল, গরবী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে হঠাৎ আজ অফিস ঘরের দরজায় দেখিয়া নন্দলাল একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দরজার নিকট আসিতেই গরবী বলিল,—আমাদের 'সারি পাঁ-চি' মজ্‌লিসে সর্দার আমার নামে দশ টাকা চাঁদা ধরেছে,—দিতে হবেক্।

নন্দলাল ভাবিল, দুএকদিন পরে দিলেও চলিবে, বলিল,—কবে?

—আজই। না দিলে চল্‌বেক্ নাই। যাও—বলিয়া গরবী হাত পাতিয়া বলিল।

—বাঃ, গাছের ফল পেরেছিস্ আর কি? নাড়ু দিলেই পড়্‌বে ভাবিস্—যা...এখন চলে যা গরবী, এমনি 'জেন্‌সেচ্ বাবু এলে' মুস্কিল্ কর্‌বে...যা।

উত্তরে গরবী একটু রাগের ভান করিয়া চৌকাঠ ধরিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল,—আস্থক্ তোর 'ভিন্ দিস্' বাবু,—সর্দ্দারের দশটা টাকা, তাও যদি দিতে পারবি, তবে তুর অত সবে কাজকি উনোন্—মুখো!

গরবীর নিকট হইতে তাহার এই আদরের গালাগালি শুধু আজ বলিয়া নয়, সেটা ছিল তাহার নিত্য নৈমিত্তিক। কাজেই নন্দলাল তাহাতে রুষ্ট না হইয়া, চকিত নয়নে একবার দরজার এদিক-ওদিক দেখিয়া লইয়া খপ্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল,—যাও গরব্ যাও, আজ না হয় কাল সকালেই এসো, আমি টাকা দিব।

গরবী একটু জোর গলায় বলিল,—অতসব মিষ্টি কথায় আমি ভুল্‌চি না বাবু, আজ দিব তবে উঠ্‌ব।

—তবে তোর যা খুসী তাই কর্‌গে যা,—আমি দিতে পার্‌ব না।

গরবীর সত্য সত্যই রাগ হইল। যে লোকটা তাহাদের পঞ্চায়েট করিয়াছে, এবং গত তিন বৎসর ধরিয়া বহু লোকের বহু প্রলোভন যে যাহার জন্য এড়াইয়া আসিয়াছে, আজ তাহারই নিকট সম্বৎসরের পাওনা মাত্র দশটি টাকা চাহিতে আসিয়া আজ যে এমন করিয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে তাহা সে জানিত না। গরবী উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—না দিস্ খাস্-তরা, এই আমি চল্লুম সাহেবের কাছে বল্‌তে,—দেখি, কেমন করে' না দিয়ে পারিস্।

( ৭ )

এইবার নন্দলালের ভয় হইল। তাহাদের ম্যানেজার সাহেব লোকটি যে তেমন সুবিধার নয়, তাহা সে বেশ ভাল করিয়াই জানিত। গরবী যদি আজ রাগের বশে তাহাকে সমস্ত কথা বলিয়াই ফেলে, তাহা হইলে সাহেব না—জানি কি করিয়া বসিবে। নন্দলাল তাড়াতাড়ি গরবীর পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া, ডাকিল,—গরবী শোন!

গরবী ফিরিয়া চাহিল না দেখিয়া নন্দলাল আর একটু তাড়াতাড়ি চলিয়া পিছন হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল'—খাস্ গরব, আজ বাজে রোজগার মোটে সাড়ে চোদ্দ গণ্ডা পয়সা। মাইরি বল্‌ছি, খাস্ না হয় তুই দেখ্ পকেটে হাত দিয়ে।...যাক্ যা হবার তাই হয়েছে তুই এই পথের বাঁকে কদম্ গাছের তলায় দাঁড়া, আমি চট্ করে' বাড়ী থেকে' দেখে' আসি কিছু পাই কি না!

গরবী এইবার একটু নরম হইয়া গেল; পথ পাশে

অন্ধকারে গা ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—খাম বড় বাবু, তুই সত্যি কথা বল্ দেখি, আমি তোর কাছে কখনও বিড়ী খাবার তরেও একটি পয়সা চেয়েছি? আজ যদি 'সাত্তি-পাচি' উপলক্ষে আমি টাকা না দি, তাহ'লে আমার বাবার জাত যাবেক্ যে,—তার গায়ে যে সবাই থিলে থুথ্ দিবেক্। সেটা কি ভাল হয় বড় বাবু···তুই বল্ কেনে!

আচ্ছা, তুই দাঁড়িয়ে থাকিস্ যেন,—বলিয়া নন্দলাল অন্য দিকে চলিয়া গেল।...কয়লাকুঠির কালো মরলা-বিছানো রাস্তার ধারে কয়েকঘর গরলার বস্তি ছিল। তাহাদেরই কয়েকটা ঘর এক আধটাকায় ভাড়া লইয়া কুঠির কয়েকজন বাবু সে গুলাকে 'ফেমিলি কোয়ার্টারে' পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিল। নন্দলাল তাহাদেরই মধ্যে একজন। বাসায় তাহার থাকিবার মধ্যে ছিল—স্ত্রী, এক পুত্র এবং এক কন্যা!

নন্দলাল বাসায় ফিরিয়া দেখিল, নষ্টু ও কুসুকুমি উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং সাবিত্রী রন্ধন করিতেছে। কি প্রয়োজনে এবং কিসের আশায় সে যে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। ঘরে তো টাকা নাই! সাবিত্রীকেও তো সে কোনদিন একটি পয়সা দেয় নাই—সে ই বা পাইবে কোথা? ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নন্দলাল কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রন্ধনশালা একটু দূরে ছিল, কাজেই সাবিত্রী বুঝিতে পারে নাই যে তাহার স্বামী আসিয়াছে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, নন্দলাল খাটের উপর বসিয়া পড়িল। পাশেই পুত্র নষ্টু ও কন্যা কুসুকুমি ঘুমাইতেছে—কয়লাখাদের একটা ইঞ্জিনের শব্দ এবং ট্রাম লাইনের উপর টব-গাড়ীর ঘড় ঘড়ানি শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

হঠাৎ নন্দলালের নজর পড়িল কুসুকুমির উপর। তাহার হাতে দুগাছি সোণার বালা লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোর আভায় চক্ চক্ করিয়া উঠিল। মাসখানেক পূর্ব্বে, নন্দলালের উপরি পাওনাটা যখন বেশী ছিল, সেই সময় স্ত্রীর অনুরোধে সে-ই তাহাকে এই বালা দুই গাছি কিনিয়া দিয়াছিল। নন্দলাল ধীরে-ধীরে ঘুমন্ত কন্যার হাতের দিকে নিজের হাতখানি বাড়াইল। একবার ভাবিল,—না, না, কাজ নাই! আবার মনে হইল গরবী তখনও তাহারই অপেক্ষায় রাস্তার পাশে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে! আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া নন্দলাল কুসুকুমির হাত হইতে একগাছি সোণার বালা খুলিয়া লইল। বাহিরে আসিবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছে, পায়ের জুতার শব্দ পাইয়া, রান্নাঘর হইতে সাবিত্রী মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল,—কে?

—আমি এসেছিলুম একবার · আস্‌ছি। বলিয়া নন্দলাল বাহির হইয়া গেল।

প্রত্যহ প্রত্যূষে গরবী নন্দলালের বাসায় চুলী ধরাইয়া দিত এবং পূর্ব্ব রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন গুলা মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইত। তাহাদের 'সাত্তি পাচি' উৎসবের কয়েকটা দিন সে আসিতে পারে নাই। উৎসবান্তে সেদিন কাজ করিতে আসিয়া উঠানে পা দিতে না দিতেই যে সংবাদটা তাহার নিকট আসিয়া পৌঁছিল, সেটা তাহার নিকটেও বিশেষ প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইল না।

নন্দলাল কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, কুসুকুমি উঠানের একপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল, নষ্টু হাসিতে হাসিতে তাহার মুখের নিকটে হাত দুইটা নাড়িয়া বলিতেছিল,—কেমন মজা! কেমন মজা!...আর মারবি?.....

গরবী কাছে গিয়া বলিল,—কি হলো কুসুকুম্! কাঁদ্‌ছ কেনে?

কুসুকুমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নষ্টু বলিল,—একগাছি বালা হারিয়েছে, তার জন্যে মা আজ্ঞাটি করে মেরেছে ওকে।

গরবী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নন্দলাল সেদিন তাহাকে যে বালাটা দিয়াছিল সেইটার কথা তাহার মনে পড়িল। ইহার ভিতরে যে এত রহস্য আছে, সেদিন গরবী তাহা বুঝিতে পারে নাই; জিজ্ঞাসা করিল,—নষ্টু, তোমার বাবাও উকে মেরেছে নাকি?

নষ্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হঁ, বাবাও খুব মেরেছে—একটা ছড়ি দিয়ে।

নন্দলালের উপর বিতৃষ্ণা ও ঘৃণায় গরবীর মনটা ভরিয়া গেল। সেদিন আর তাহার ভাল করিয়া কাজ করা হইল না। তাড়াতাড়ি যাহা পারিল, করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

গরবীর বিবাহের সময় শ্বশুরবাড়ী হইতে সে একটা রূপার সাতনর হার পাইয়াছিল। সে তাহাকে অতি যত্নে একটা কাপড় জড়াইয়া হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিত এবং পূজা, পার্ব্বণ, মেলা ইত্যাদি হইলে বাহির করিয়া পরিত। আজ তাহার সেই মূল্যবান গহনা খানি বাহির করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে পাঁচুকিবাবুর নিকট হইতে ঝুমঝুমিথ বালা খানি ছাড়াইয়া লইয়া আসিল।

ভাবিল, ঝুমঝুমির হাতে ফিরাইয়া দিবে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তো দেওয়া চলিবে না!

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই, বালাখানি অঞ্চলে বাঁধিয়া পেটের নীচে লুকাইয়া গরবী নন্দলালের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নন্দলাল বাড়ীতে ছিল না, নন্টু ও ঝুমঝুমি ঝুমঝুমির অপরিসর প্রাঙ্গণের উপর ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, রন্ধনশালায় বসিয়া সাবিত্রী একমনে তরকারী কুটিতেছিল।

গরবীকে দেখিয়া সাবিত্রী বলিয়া উঠিল,—এ বেলায় এলে যে বাউরী-বৌ? সাবিত্রী তাহাকে বাউরী-বউ বলিয়াই ডাকিত।

গরবী প্রথমে বুঝিতেই পারিল না—কি উত্তর দিবে। একটু ভাবিয়া বলিল,—কাজ ছিল নাই তাই দেখ্‌তে এলম্—তোমার উনোন্ ধরানো হলো কি না—ধরাই দিব না কি?

—না, উনোন্ আমার ধরে গেছে—আর ধরাতে হবে না।

গরবী ধীরে-ধীরে বালাখানি বাহির করিয়া নন্টু ও ঝুমঝুমির সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘরের উপর গিয়া উঠিল। ভাবিল, বিছানার তলায় রাখিয়া দিবে!

তাহার অনভ্যস্ত হাতখানা বাড়াইয়া বিছানার নীচে রাখিতে যাইবে, এমন সময় সেদিকে সাবিত্রীর হঠাৎ নজর পড়িয়া গেল। সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—ওকি বাউরী-বৌ, বিছানাটা ছুঁয়ে ফেল্‌লে যে! ..ও কি রাখ্‌লে কি ওখানে?

গরবীর মুখখানা নিমেষেই ধরা-পড়া চোরের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। মুখে কিছুই বলিতে পারিল না, এক পা নড়িতেও পারিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বিছানাটা উল্টাইয়া দেখিল,—ঝুমঝুমির বালা। নির্ব্বাক বিস্ময়াহত হইয়া সেও কিয়ৎক্ষণ তাহার রক্তহীন মুখের পানে তাকাইয়া, কহিল,—তুই তো আজ কদিন আসিস্ নি?—কখন নিয়েছিলি?

হেঁটমুখে ধীরে-ধীরে গরবী উত্তর দিল—ই—নিয়েছিলম।

সাবিত্রী আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল,—তুই এমন তা আমি জান্‌তুম না—ছি, ছি,—দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা হয়েছিল এতদিন।....যা... বেরো আমার ঘুমুর থেকে। তোকে কাজ কর্‌তে হবে না আর।

গরবী কলঙ্কের বোঝা লইয়া তেমনি হেঁটমুখে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মায়ের কথা শুনিয়া নন্টু ও ঝুমঝুমি খেলা বন্ধ করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। নন্টু গরবীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল,—হবে রে চোর!

গরবী ট্রাম লাইনের পাশ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল; দেখিল, একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া মনের নেশায় টলিতে টলিতে নন্দলাল সেই দিকেই আসিতেছে।

তাহার সহিত কথা কহিতেও গরবীর ঘৃণা বোধ হইতেছিল। ভাবিয়াছিল, পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু নন্দলাল তাহাকে চিনিতে পারিয়া খপ্ করিয়া গরবীর আঁচলের একটা প্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়া জড়িতস্বরে কহিল,—কি গো গরব সুন্দরী, সন্ধ্যেবেলা কোথা থেকে?—

একটা হেঁচ্‌কা টান্ মারিয়া তাহার হাত হইতে কাপড়টা জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া গরবী শুধু বলিল,—হুঁ!...বে-ইমান্ কোথাকার!

গরবীর রাগের কারণটা যে কি, নন্দলাল তাহা বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

গরবী আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।.....

নন্দলাল বাসায় ফিরিয়া সাবিত্রীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল; বলিল,—এঁ! এমনতর ব্যাপার! কাল থেকে' ও চোর হারামজাদীকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিও না আর!

দিন কয়েক পরে, নন্দলাল নিজে হইতে একদিন গরবীর অনুসন্ধান করিতে গিয়া শুনিল, সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেছে।

# বিদেশের স্মৃতি

[ শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল ]

•Byrei ষ্টেশন পাহাড়ের পাদদেশে লোকগুলি বেশ কালো। একেবারে পার্ব্বত্য প্রদেশ, জঙ্গল লাল মাটী আর পাহাড়, চাষবাস নিতান্তই অল্প। কলিলাস রোড এ নামিয়া একটু পায়চারী করিয়া লইলাম। অল্প দিনের প্রচণ্ড আহারে একটু জ্বর বোধ হইতেছে। পাহাড় দূরে গিয়াছে। আবার সেই ধান ক্ষেত আর মাঝে মাঝে একটী কেনাল canal আবার একটী বড় নদী আসা গোড়া বাঁধ দিয়া বাঁধা। পরের ষ্টেশনই কটক। নামিবার বন্দোবস্ত করিলাম। চারিদিকে রাশীকৃত কেয়াগাছ জঙ্গলের মত হইয়া উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে ট্রেণ শুকপ্রায় মহানদীর বিরাট সেতুর উপর উঠিয়া পড়িল। সমস্ত নদীটী বাঁধ দেওয়া, কয়েকটী স্থান দিয়া সহস্রধার সঙ্গে জল বাহির হইতেছে।

কটক ষ্টেশনে ট্রেণ থামিয়া দাঁড়াইল। ষ্টেশনটী বেশ বড়। নামিবামাত্র দুটী কুলী আসিয়া উপস্থিত। বাহির হইবামাত্র একটী মুসলমান গাড়োয়ান নিতান্ত পরিচিতের মত গাড়ীতে মাল তুলিয়া হাঁকাইয়া দিল। Hindu Resturant নাম শুনিয়া তখনই বলিল যে সে তাহা চিনে, সুন্দর স্থান ইত্যাদি। সহরের দিকে গাড়ী চলিতে লাগিল। সম্মুখেই জঙ্গল, মহা পল্লীগ্রাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হোটেলের দরজায় গাড়ী দাঁড়াইতে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। হোটেলের ভৃত্য বিবেচনায় ম্যানেজারকে ডাকিতে বলিলাম। তিনি উত্তর করিলেন যে তিনিই ম্যানেজার! উপরের একটী ঘরে আমার বাসস্থান স্থির হইল। মুখ হাত ধুইয়া 'চা' হুকুম করিলাম। চা পান করিয়া লিখিতেছি এমন সময় ম্যানেজার আসিয়া একখানি খাতা ধরিলেন। তাহাতে আমার নাম পত্রিকা লিখিয়া দিতে হইল—বোধ হয় টিকটিকি বিভাগের কর্ত্তাদের। তিনি আহারের হুকুম লইয়া চলিয়া গেলেন, আমিও ২।১ খানা চিঠি লিখিয়া শুইয়া পড়িলাম।

৪—০০ টায় সাজ সজ্জা করিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বাহির হইয়াই বাজার আরম্ভ। একটী লোজা রাস্তা, দুই ধারে নানা রকম দোকান—অধিকাংশই মাড়োয়ারী। ২টী ঠিকানা ছিল খুঁজিয়া পাইলাম না। ক্রমে সিভিল কোর্টের নূতন অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আরও একটু গিয়া নদীর ধারে দাঁড়াইলাম। বিশাল বালীর চর ধূ ধূ করিতেছে। মধ্যে রেখার মত ক্ষীণ কাঠমুরী, দূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। কতকগুলি বালক বালীর চরে ফুটবল খেলিতেছে। একটী ছেলের সহিত আলাপ করিয়া লইলাম। সে আমাকে সমস্ত দেখাইতে লাগিল। কথায় কথায় জানিলাম যে এখানে ভয়ানক কলেরা ও ইনফ্লুএঞ্জা আরম্ভ হইয়াছে। একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর! মনে মনে স্থির করিলাম কাল সকালেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিব। বেড়াইতে বেড়াইতে কমিশনারের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড ওয়ালা কুঠীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাগানে কতকগুলি হরিণ বেড়াইতেছে।•

একটী কামরা রিজার্ভ করিয়া বসা গেল। পাশের কামরায় একটী ভদ্রলোক পরিবারাদি লইয়া যাইতেছেন। পরিচয়ে জানিলাম তিনি রেলওয়েতে চাকরী করেন, মাদ্রাজ যাইতেছেন। ওয়ালটেয়ারও আসিবেন। সুতরাং আলাপ করিয়া লওয়া গেল। নিজের কামরায় আসিলাম। আবার আমি একেশ্বর। ভিখারীর অত্যাচারে বসিয়া থাকাও কঠিন।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। লোকগুলি ক্রমেই যেন কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিতেছে। চিল্কাহ্রদের খুব নিকটে আসিয়াছি। বেলাও খুব কম আছে। রৌদ্র থাকিতে হ্রদটি দেখিতে হইবে। চারিদিকে অগণিত আম ও কাঁটাল গাছ। পাহাড়গুলিও খুব নিকট। ট্রেণ বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। আনন্দায় বসিয়া বাঁ-ধারে দূরে উজ্জীয়মান পাখী দেখিতে পাইতেছি। ঐ বোধ হয় চিল্কা। দূরে সমুদ্রের মত দেখা যাইতেছে।—সত্য সত্যই চিল্কা দেখিতে পাইলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় নীল জলরাশি দেখা যাইতেছে।

একেবারে চিল্কার উপর, আশে পাশে ছোট ছোট পাহাড়। চিল্কার পাশ দিয়া ট্রেণ আসিতেছে। পূর্ব-

---

• চিহ্নিত অংশটুকু ভ্রমক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, ০৯শ সংখ্যার শেষে ও ০৮শ সংখ্যার পূর্বে এই অংশ পঠিতে হইবে।

মতের বিলের মত। বাঁদিকে ধান ক্ষেত ডানদিকে ছোট্ট ছোট পাহাড়। ছোট ছোট গ্রামগুলি আম কাঁটাল গাছে পূর্ণ আর কাঁলো কালো ছেলেমেয়েগুলি দারিদ্রের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ট্রেণ যখন চিল্কা হইতে একটু দূরে যাইতেছে তখন তাহাকে ঠিক সমুদ্রের মত দেখাইতেছে। "কালু পারঘাট" "ঘাট"—কেন? একটা কালো ছেলে "সে গরমাগরম মুড়ি মুলা" হাঁকিয়া গেল। একটী দুর্ব্বল ক্ষুদ্র বালিকা "বাবু সাতে একটা পয়সা" বলিয়া একাদিক্রমে কাঁদিতেছে। এত ভিখারী আর কোথাও দেখা যায় না।

নামিবার চেষ্টা করিয়া দেখি দরজা খুলিতে পারি না। একটা নীল জামাপরা লোককে ডাকিয়া বলায় সে বলিল "চাবী বন্ধ" সাহেব আদমীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া চাবী বন্ধ করিয়াছ! চিৎকার করিয়া বলিলাম "কোন বন্ধ কিয়া? ষ্টেশন মাষ্টারকা বোলাও।" লোকটা দৌড়িয়া চাবী লইয়া আসিল এবং তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিয়া ভটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। "জি" বাবুর কামরায় গিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "চা খাইবেন?" আমি বলিলাম "পাই কোথায়"? তাহার সহিত সরঞ্জাম ছিল। আমি ভাল চা দিলাম।'

সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন। চিল্কার পাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র পাহাড় তাহার মধ্যে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য বড়ই রমণীয়। 'ছহরী ষ্টেশন প্রায় হইল'। তখন সকল দিকেই পাহাড় দেখা যাইতেছে।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। চিল্কার সুবিস্তৃত জলরাশির উপর ক্রমে ছায়াপাত হইতেছে। চিল্কা অদৃশ্য হইয়া গেল, এখন দুইধারেই জঙ্গল। আবার হঠাৎ চিল্কা দেখা দিল। এবারে ভিন্ন মূর্ত্তি—ছোট ছোট পাহাড়গুলি দ্বীপের মত দেখাইতেছে। আবার দুইদিকেই পাহাড়। একটী ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ থামিল। ষ্টেশনটি একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে। 'জি'-বাবু 'চা' লইয়া হাজির। আরাম করিয়া চা পান করা গেল। আমার কামরায় বসিয়া উড়িষ্যে কোন ট্রেণে যাতায়াত সুবিধা হইবে সে বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম। ট্রেণ একেবারে চিল্কার ধার দিয়া যাইতেছে—পাঁচ হাত দূরেই জল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়গুলি দ্বীপের মত চক্র করিয়ে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। চিল্কাকে এখন ঠিক সমুদ্রের মতই দেখাইতেছে। আর সেই সুবিশাল জলরাশি চন্দ্রকিরণ স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর হইয়া উঠিয়াছে।

উঠিয়া তখন হইয়া দেখিতেছি এখন সময় ট্রেণ আসিয়া গেল। একটী বড় রকম ষ্টেশন বলিয়া বোধ হইল। নামিয়া দেখি নাম "বল্লা"। একটী শীর্ণা কৃষ্ণবর্ণা বৃদ্ধা "বাবু বলিয়া ক্রন্দনের সুর টানিয়া যাইতেছে। আর দুইটী ছেলে "কবরি কাছা" হাঁকিয়া প্রবল বেগে চলাফেরা করিতেছে। এক বর্ণও বুঝিবার উপায় নাই। জিনিষ দেখিয়া বুঝিলাম বৃদ্ধার হাঁড়ীর পদার্থটী দুধ আর ছেলে দুটা 'নারিকেল' বিক্রয় করিতেছে। ৵০ সের গরম দুধ একটু পান করিয়া প্লাটফর্ম্মে অন্যমনস্কভাবে পাদচারি করিতে লাগিলাম। উপরে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে, আর পার্শ্বেই চিল্কার রজতের মত জলরাশি। উপভোগ করিবার মত বটে। যাহারা চিল্কা দেখিতে আসেন তাঁহারা এইস্থানেই নামিয়া থাকেন। কালিকোটার রাজা এখানে একটী Rest house করিয়া দিয়াছেন ভ্রমণকারীগণ তথায় আশ্রয় পাইতে পারেন। এখানকার কাঁকড়ার মত সুস্বাদু ও বৃহৎ কাঁকড়া নাকি আর কোথাও পাওয়া যায় না।

অল্পক্ষণ মধ্যেই একটী বড় নদী পার হইলাম—নদী নয় চিল্কারই একটী শাখা। এখন বেশটী বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। চারধার বড় নাই, ছোট ছোট পাহাড়-পরিষ্কার পাছপালা। চিল্কা আর দেখা যায় না, ছাড়াইয়া আসিয়াছি। একটী বড় ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। আবার সেই চিৎকার "আরনী পালে" 'কবরিকারা' অর্থাৎ কলা আর নারিকেল।

নব বসন্তে
প্রিয়জনকে উপহার দিতে; শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের ক্যাইটিক্যাল জ্যাসেন্সিল্স এবং মেসিন প্রস্তুত—চন্দন, বরেল, বকুল, যাস্ত ও ভায়োলেট নামান ব্যবহার করুন।
ইণ্ডিক্যাল সোপ কোম্পানী
৩৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

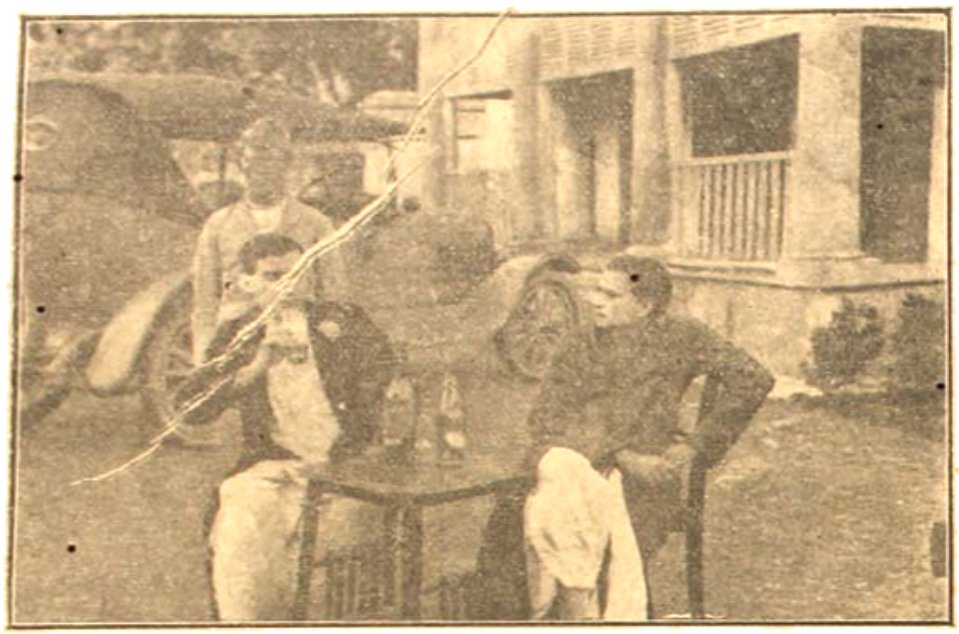

রমণী-প্রেম-বঞ্চিত গোপীনাথ নির্জ্জনে দিন যাপন করিতেছিল, তাহার পূর্ব্ব দিনের মধুপ বন্ধু তাহাকে আবার একটা 'নূতন খবর' দিতে আসিয়াছিল, কিন্তু রমণীর উপর গোপীনাথের অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়িয়াছে, সে 'নূতন খবরে' বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া মারবান ডাকিয়া বন্ধুবরকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে কহিল। ভাঙ্গনমহল থিয়েটার কর্তৃক ছায়া-চিত্রাকারে গৃহীত রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "আলভঙ্গনেক্স" একটি দৃশ্য। এই নাটকটি শীঘ্রই রঙ্গ থিয়েটারে প্রদর্শিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল এই গ্রন্থের মূল অংশ গ্রহণ করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীও এই নাটকে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"এ ভরা বাদর এ মাহ বাদর শূন্য মন্দির মোর!"

"মানভঞ্জনের" আর একটি দৃশ্য। বসন্তসেনের একটি নিখুঁত প্রতিচিত্র। গোপীনাথ যখন সহকর্ম্মী রূপ যৌবন খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহার পত্নী গিরিবালা তখন গৃহে—একাকিনী চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছে। গিরিবালার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীমতী নীলিমা।

শরতের কাতর মুখ দেখিয়া শান্তর ব্যাপারটা বুঝিতেদেরী হইলনা, সে জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—কেন অমন তাড়াতাড়ি করে যা-তা করছ, পিসিমা!...

তাহার পিসিমা সে-কথার কোন উত্তর দিলেন না, উত্তর দিলেন, শান্তর জননী। তিনি মৃদু সহাসকণ্ঠে কহিলেন—শান্ত, পিসিমা তাঁর মনের মত জামাই পেয়েছেন এবার!

এ কথা শুনিয়া শান্ত কতকটা শান্তি পাইল বটে কিন্তু শরত যে তখনও কেন অমন বিষাদ মলিন মুখে এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার কোন কারণই সে নির্দেশ করিতে পারিল না। সে একবার মায়ের মুখের পানে, একবার শরত ও শরতের মা'র মুখের পানে চাহিয়া সমস্যা পূরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তাহার জননী বলিলেন—শান্ত! শরতকে আমিই নিলুম বাবা!

অতি-মাত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া শান্ত একটি কথাও বলিতে পারিল না, একবার মা'র মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়াই চক্ষু নত করিয়া রহিল কিন্তু তাহার সমস্ত মন এ-সংবাদে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার মা বলিতে লাগিলেন, মস্ত-বৌ আজই গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, শান্ত। যারা একদিন ওর পায়ের ধুলোর যোগ্য ছিল না, তারই সব ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, মস্ত-বৌ আজই মেয়ে নিয়ে কাশী চলে যাচ্ছিল। এক ঘর লোক গাঁয়ে বসাবার ক্ষমতা নেই, এক ঘর লোককে এমন ছন্নছাড়া করে গাঁ থেকে বিদেয় করলে কি সে গাঁয়ের কখন ভাল হতে পারে শান্ত? শান্ত...

শান্ত অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুমিই বা কোন সাহসে ওঁদের রাখতে চাও মা?

তাহার জননী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন—এতে এমন সাহসেরই বা কি দরকার শান্ত!—বলিয়াই তিনি শরত ও শরতের মা'কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—শান্ত, এঁদের পৌঁছে দিয়ে আয় ত!

মস্ত-গৃহিণী বলিলেন—না মা, শান্ত এই এলেন, আমরা যাবে বিয়ে খুব যেতে পারব।

না, মস্ত-বৌ! শান্ত তোমাদের রেখে আসুক—শান্ত!

শান্ত শরতের মা'র দিকে ফিরিয়া বলিল—চলুন পিসিমা!

সারা পথ কেহই কোন কথা কহিলেন না। মস্ত-বৌর প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল, এই যে প্রস্তাব শান্তর জননী এইমাত্র করিয়াছেন, ইহাও যেন তাঁহার অপরাধ! শান্ত এই যে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়াছে, ইহা আরও বেশী অপরাধ! অপরাধের ভার যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই বাড়িয়া চলিয়াছিল, তাই পায়ের শক্তি তাঁহার হ্রাস পাইয়াছিল। শরতের মনের ভাব বলা যায় না, সে ধীরে ধীরে চলিয়াছে, বাড়ীর দ্বারে পৌঁছিয়া সেই প্রথম বলিল—আপনি আসুন।

যাই বলিয়া শান্ত প্রত্যাগমন করিল। বিধবা নারী অন্ধকারে অদৃশ্য লোকটির পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন—না জানি সেও কত বড় অপরাধ!

কন্যা কহিল—মা, চল আমরা কাশীই যাই।

শরতের মা'র চমক ভাঙিল। তাড়াতাড়ি দ্বারটি অর্গলবদ্ধ করিয়া সিক্তকণ্ঠে কহিলেন—শরতের ভিটে, কেমন করে ছাড়ি শরত? যখন খুব রোজগার,—দোল দুর্গোৎসব হয়, পাছে কলকাতায় বাড়ী করেন, গ্রাম ছেড়ে যান, তোর ঠাকুর্দা বামুনের পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছিলেন! শরত, সেই ভিটের শেয়াল কুকুর বাস করবে, সন্ধ্যে দীপ জ্বলবে না,—বলিতে বলিতে তাঁহার বাকরোধ হইয়া গেল।

সেদিন তিথি ছিল ত্রয়োদশী! সারা ভুবন জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছিল। নির্মেঘ নির্মল আকাশ হইতে দেব-তার আশীর্ব্বাদের মত মধুর জ্যোৎস্না গৃহের চারিদিকে

হয়াইয়া পড়িতেছিল, শরতের মাসেই জ্যোৎস্না বিনোদ মুখের পানে চাহিয়া আকুলস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। হরদ্বার ঘরখার গাছ পালা আজ যেন সব জাগ্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সবাই যেন নিরবে, উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

শরত ডাকিল—ঘরে চল মা!

হ্যাঁরে শরত, শান্ত এতক্ষণে পৌঁছেছেন ত?

পৌঁছেছেন মা!

সত্যই শান্ত এতক্ষণে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। ঘরে ঢুকিতেই শান্তর মা বলিলেন—হাত পা ধুয়ে ফেল শান্ত!

শান্ত জোয়ালের একদোলে বসিয়া ডাকিল—মা!

মা বুঝিলেন, বলিলেন—কি শান্ত?

শান্ত কোনদিন মা'র মুখের দিকে চাহিয়া জোর করিয়া কথা বলিতে পারে নাই, আজও পারিল না। নতমুখে বলিল—কাজকর্মের ত কিছুই করতে পারলাম না মা!

মা জ্যোৎস্নালোকে পুত্রের বিবাহ-মলিন মুখ দেখিয়া বলিলেন—কাজ নেই শান্ত চাকরীর জন্যে ঘুরে-ঘুরে। আহ্লাদের ঠেঙ্গে জমি কটিয়ে হাড়ারে নিয়ে চাষবাস কর।

শান্ত এই কথাটাই ঠিক ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতা হইতে আসিতেছিল। মার আদেশ পাইয়া সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের জন্য। আবার এক কথা ভাবিয়া উহার আবার বিষণ্ণ হইয়া গেল।

কি ভাবছিস শান্ত? চাষবাসে মন সরছে না?

তা নয় মা! চাষবাস আমি করবই। কিন্তু—

মা বুঝিলেন, স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—কিন্তু কি শান্ত?

শান্ত মা'র মুখের দিকে চাহিল, কি-কথা বলিতে গেল, আবার না পারিয়া মুখ নিচু করিল।

মা বলিলেন—শান্ত, পরস্ত পরের মেয়ে নয়, তোর সব কাজে সহায়তা করবে, বিয়ে হবে না।

মা···

ওরে পাগলা ছেলে! এখনো কেন ভাবছিস্ না যে তোর মা তোকে যা দিচ্ছে, তা থেকে তোর ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট কি হতে পারে?

এতবড় অন্তরবাসীর পরেও শান্ত মুখ সরল হইয়া উঠিতে পারিল না, নতমুখে, নিরবে বসিয়া রহিল।

মা জিজ্ঞাসিলেন শান্ত—শরতের কথা ভাবছিস্?

শান্ত উত্তর হইয়া মার পায়ের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—মাপি যে অকর মা! তোমাকে দুবেলা খেতে দিতে পারছি না, তার ওপর ঘরজামাই! বইতে পারব কেন মা?

ঘরজামাই নয়, শান্ত, শরতকে তুই ঘরজামাই ভাবিস্‌নে। শরত তোর ঘরের লক্ষ্মী, তার আগমনে তোর ঘরে লক্ষ্মী শ্রী ফুটবে—বুঝলি বোকা ছেলে!

শান্ত উঠিয়া বসিয়া মা'র পায়ের ধুলা মাথায় দিল, বলিল—তুমি যা ভাল বোঝ, কর মা! কোনদিন আমি হুঁ করিনি, আজও করব না।—সত্য সত্যই এতক্ষণে যেন সে অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখিতে পাইল।

সে রাত্রে আর কোন কথা হইল না। জননী তাড়াতাড়ি রাঁধিয়া, পুত্রকে খাওয়াইয়া, বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন। নিজে পাশে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছিলেন, কিছু পরে শান্তকে নিদ্রিত জ্ঞানে উঠিয়া গেলেন। শান্ত ঘুমায় নাই। আজ কোথা হইতে কতকগুলা ভাবনা চিন্তা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল সেগুলোকে সে কিছুতেই ঠেলিতে পারিতেছিল না। সে কত চিন্তা! আর সব চিন্তার মাঝখানে চিন্তাজগতের নারীর সিংহাসনে বসিয়া কামনাও যেন তার দিকে চাহিয়া কি বলিতেছিল। কি কথা সে—শান্ত বুঝিল না, কিন্তু তার দৃষ্টির ব্যথাটুকু শান্তর হৃদয় আজন্ন করিয়া দিল।

ভোরের পূর্বেই টেলিগ্রাফ পিওন ডাকাডাকি করিয়া তাহাদের উঠাইল। শান্ত বাহিরে আসিয়া দেখে, পিওনের চারিপাশে জড় করিয়া পাঁচ সাতজন পল্লীবাসী। সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাফ আসে না, যদি বা আসে রাত পুহাইতে হয় দাইল দূর ষ্টেশনের লোক কখনই গ্রামে আসে না, সেইজন্য এতবড় একটা অঘটনের সংবাদ যে পাইয়াছে সেই পিওনের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে।

শান্ত টেলিগ্রাফ খুলিয়া মার পানে চাহিয়া বলিল—মা! কলকাতায় যেতে হবে, খবর আছে।

পাড়া প্রতিবেশীগণ নানা প্রশ্নে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, শান্ত ঘর হইতে খড়িটা দেখিয়া আসিয়া বলিল—আমাকে এখনি বেরুতে হবে, মা, ৩ ৪২৩ প্রবল মাড়ী, সেই গাড়ীতেই যাই। কি-জানি কেন কামনা এত তাড়া করে যেতে বলে। আমি ত কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে।

পৌঁছে খবর দিস্ শান্ত, নইলে ভেবে মরব।

সেত বৈ-কি মা!—বলিয়া শান্ত বিদায় লইল। (ক্রমশঃ)

নেশাখোর। রেলের ভিড় যেমন দিনের দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে,, বাঙ্গালী নেশাখোরের সংখ্যাও তেমনি-বাড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। রেলের সঙ্গে নেশার সম্পর্ক যে অতি নিকট তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগের আয় ৬লক্ষ টাকাবাড়িয়াছে, রেল কোম্পানীর হিসাব যাঁহারা রাখেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে রেলগামী বাঙ্গালীর সংখ্যাও গত বৎসরের চেয়ে এবৎসর বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট রেলের বন্দোবস্ত আর একটু ভাল করিয়া দিন, আবগারী বিভাগের আয় আরও বৃদ্ধি পাইবে!

মদ বিক্রয়। বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে মাদে মদ বিক্রয় ভারি কমিয়া গিয়াছিল। আবগারী বিভাগ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আবার তাঁহাদের মলিন মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর নাকি ০২ লক্ষ গ্যালন অমৃত লোকের উদরে ঢুকিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে এই সুধা আরও ১ বা ১½ লক্ষ গ্যালন বেশী ঢুকিত বটে কিন্তু মন্-কো অপরেশন যে ভাবে ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে বসিয়াছিল, তাহাতে মূলে ছা-ভাত হইবার যো-ই হইয়াছিল। এখন ১½ লক্ষ গ্যালন কম হইলে ও—মা ভৈঃ! আর ভয় নাই শীঘ্রই পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

শিক্ষা-বিভাগে প্রজাপতি। বিলাতে স্থির হইয়াছে, শিক্ষা-বিভাগে যে সব মহিলা থাকিবেন তাঁহাদের বিবাহ করা চলিবে না। ইহাতে এমন মারাত্মক হুকুম কিছু নাই বটে যেহেতু বিবাহ-টা একটা অতিরিক্ত বন্ধন! বন্ধন ছাড়া মুক্তিটুকুতেই আনন্দ! তার বিরুদ্ধে বিশেষ আইন কিছু না হইলেই হইল!

মহিলা-বিচারক। আজকাল শুনি মাদ্রাজে না কোথায় একজন মহিলা বিচারক হইয়াছেন আরও হইবেন খবর পাওয়া গেল। হউন, খুব ভাল কথা। উকীল হউন, ব্যারিষ্টার হউন, মোক্তার হউন, স্বাধীন ব্যবসা, ভালই কিন্তু বিচারক যদি অনূঢ়া মহিলারা হন, তবে একটা "কিন্তু" আছে, সেটার মীমাংসা কিরূপে হইবে? ধরুন, এই মহিলারা যদি অবিবাহিতা হন, কথা নাই কিন্তু যদি বিবাহিতা হন, এবং কার্য্যবশে যদি কখন করে, তখন—বিচার কার্য্য কিরূপে চলিবে—তাহা ত ভাবিয়া পাইতেছি না। সন্তান-প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে কয়েক মাস নিশ্চয়ই "স্পেশাল প্রিভিলেজ লিভের" (বিশেষ প্রাপ্য ছুটি) ব্যবস্থা থাকিবেই, যেহেতু ঐ কার্য্যটা রমণী ছাড়া আর আরদালি-পিয়নের দ্বারা সাধিত হইবার নয়!

হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস। হিন্দুর সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে যে ভাবে কমিতেছে তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেরই বড় দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৭৯ সালে বাঙ্গালার হিন্দু সংখ্যা ছিল ১১০।১৫৩ আর মুসলমান ছিল ৩,৬৮, ১৯১ আর ১৯২১ সালে হিন্দু দাঁড়াইয়াছে ২,০৮, ৭৯,১৩৮, মুসলমান ২,৪৯,৮৮, ১২৪ অর্থাৎ মুসলমান বাড়িয়াছে সাড়ে ছেচল্লিস লক্ষ। অনেকে বলেন, জাতি বর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন বাড়াইবার আয়োজন করুন। বিধবার বিবাহ দিন, জাতিভেদ, বর্ণাশ্রম উঠিয়া যাক—যাউক, কিন্তু কথা এই হইতেছে যে জাতি যে বাড়াইব, খাওয়াইব কি? জাতি যে পরিবার বাড়িয়া আছে, তাহারই খাদ্য জুটে না, আবার যদি বিপুল উদ্যমে মনে মনে বংশ বৃদ্ধিতে মন দেন, অবস্থাটা কি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আমাদের এখন যা অবস্থা, তাহাতে "হয় মহম্মদ পর্ব্বতের কাছে আসিবে নয় পর্ব্বত যাইবে মহম্মদের কাছে"—গোছের নয়! কেউ কাহার কাছেই যাইতে পারে না, অর্থাৎ কোনটি করাই চলিতে পারে না বলিয়াই মনে হয়। যেহেতু বংশবৃদ্ধি করিতে আহারবৃদ্ধি করার প্রয়োজন, অভিভাবকগণ তাহাতে প্রস্তুত হইবেন কি না যথেষ্ট সন্দেহ! কাজেই আহার্য্যবৃদ্ধি করার পরে বংশ বৃদ্ধির কথা উঠিতে পারে, তার আগে নয়।

স্বাস্থ্য-রক্ষক। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে চলিতে পারে তজ্জন্য আমাদের একজন মন্ত্রী আছেন, মন্ত্রীর বেতন পাঁচহাজার, তাঁহার স্বাস্থ্য মন্দ নয়, অর্থাৎ ভালই। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে সাধারণ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যও যে ভাল থাকিবে সে-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ নাই: তাই গবর্ণমেণ্ট একটি মন্ত্রী পুষিয়াছেন, আর ৪৮০০০,

••• জন বাঙ্গালীর জন্য ৫০ জন স্বাস্থ্যরক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যের লোক সংখ্যা ৪৭•••, •••, তাদের জন্য ক'জন স্বাস্থ্যরক্ষক আছে মনে করেন? খুব বেশী নয় মোটে ৪••• জন! ভারতবর্ষে মোটের উপর স্বাস্থ্যরক্ষক আছেন ২০২ জন, হিসাব করিয়া দেখা যায় ১৬ লক্ষ লোককে একজন স্বাস্থ্য-রক্ষক স্বাস্থ্য রক্ষার পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু এখন যদি কেহ মনে করেন যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর জন্য পাঁচ-হাজার ব্যয়িত হয় না, তিনি অত্যন্ত অর্বাচীন!

অনুকরণ। আমরা বিলাতের রকম-সকম অনুকরণ করিতে ভারি পটু, বেশ আনন্দও পাই। একটা অনুকরণীয় সংবাদ দিই। ক্যাপ্টেন স্যাণ্ড নামক এক ভদ্রলোক স্ত্রীর "ব্যবহার" যোগাইতে দেউলিয়া হইয়াছেন। বাজারে তাঁর স্ত্রীর কম করিয়া ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা দেনা। পোষাকের জন্য ৭৪ হাজার আর দু লক্ষ কিসের জন্য বল জানে! এখন বিবাহচ্ছেদ পর্ব্ব চলিতেছে। জজেরা মামলার রায় দিতেছেন না! কোন্ কূল রাখেন? পোষাক ভাল আর স্বামী না হইলে শ্রীমতী স্যাণ্ড গলায় দড়ী দিতে যাইতেন আর দড়ী বাঁচাইতে শ্রীমান স্যাণ্ড মারেছাল! অজেরা বোধ করি একটা আইন করিয়া দিবেন স্বামীর এত আয় থাকিলে এত টাকা পর্য্যন্ত পোষাকে ব্যয়িত হইতে পারিবে; তাহার বেশী খরচ করিলে অন্যায় হইবে। তা যেন হইল, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি তখন স্ত্রী আত্মহত্যা করিলে স্বামীকে বিপত্নীক হইতে হইবে না ত?

বাঙ্গালীর মেয়েরা নাকি দিনের মধ্যে পঁচিশবার মরেন। পোষাকের জন্য নাও হইতে পারে তবে, নিন্দুক লোকে নানা কথা রটায়, তাহারাই বলে যে সহ্য না পাইলে কে জানে বাপু, কথা সত্য কি মিথ্যা! সত্য হইলে কিন্তু বিপদ আছে! প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে উভয় দেশেই যদি এক অবস্থা, মৌলিকত্ব কার? Originality লইয়াই ত সোলমাল! একটা Research সমিতি বসাইলে কেমন হয়? 'পোষাক অলঙ্কার তৈজস পত্তর ঘটি-বাটি কমিটি"—নামটা বোধ হয় এখনও অব্যবহৃত আছে!

প্রেম-অভিধান পর্য্যায়ের নূতন স্তবক
নারীর গৌরব
—জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্ত্তী
আগামী সংখ্যায় দেখ তে পাবেন।

মহিলা শিক্ষা প্রদর্শক। যার যখন কমাইতেই হইবে, তখন এই দিকটা হইতে আরম্ভ করাই ভাল বোধিতেছি। ভাল অনেক কারণে, প্রথমতঃ এদেশের স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষিত করিয়া লাভ কি? তাহাদের দিয়া কেরাণী গিরি করাইবার আশা ত এখনও হয় নাই দ্বিতীয়তঃ মহিলা-পরিদর্শকদের কাট ছাঁট করিলে তাঁহারা নারী সমল অঙ্গ নিক্ষেপ করিবেন, অন্য কোন বিপদাশঙ্কা নাই। তাঁহারা পুলিশ নহেন, যে চোখ রাঙ্গাইবেন, সৈনিক নহেন, যে তোপের মুখে উড়াইবেন, একে মহিলা তায় আবার শিক্ষা বিভাগের! মন্ত্রীবর প্রকাশ মিত্র মহাশয়ও ইঁহাদের বেতন ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ড সম্বন্ধে সম্প্রতি মত জাহির করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, হাসপাতালে শুরু বসাইয়া এক মন্ত্রীপ্রবর যেমন কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, ইনিও তার নিম্নে যান নাই, অন্য মন্ত্রী আবগারী বিভাগের আয় বাড়ে ভারি ব্যস্ত! আমরা বলি দেশে যাও, দাদা, দেশে যাও, এবার বাজী তোমাদেরই মাৎ! পাঁচ হাজার থাকে সহাইতে যা দরকার করিয়া যাও। জানিয়া রাখিও, দেশবাসী পাঁচ হাজার দূরের কথা, পাঁচ কড়াও তোমাদের দিবে না, কাজেই দেশ দেশ করিয়া বেশী মাথা না ঘামাইয়া "কাজ" করিয়া যাও!

---

## তৃপ্তি

( দাদু )

[ শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ]

যে মনে সতত রহে গো তৃপ্তি,
সেথায় অভাব কিসের আছে?

কিন্তু যে মনে তাহারি অভাব,
সুখ কারে বলে—জানেও না সে।

# বিদুষী রেনাইট

[ শ্রীমতি দেবী ]

আমাদের বাংলা দেশেও অনেক মহিলা আজকাল সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছেন। কেহ সখের খাতিরে সাহিত্য-চর্চ্চা করেন, দু'একজন জীবিকা অর্জ্জনের জন্যও সাহিত্য-চর্চ্চা করেন। কিন্তু বাংলাদেশে একমাত্র সাহিত্যকেই

বিদুষী রেইনাট।

জীবিকার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে ধরিয়া লইলে তাহাতে দুর্গতির সীমা থাকে না। ইউরোপে অনেক মহিলা সাহিত্যকে জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা ধরিয়া লইয়াছেন। এই সব লেখিকাদের আয়ও প্রচুর। আজ আমরা এই প্রবন্ধে যে মহিলার পরিচয় দিতেছি ইনি আমেরিকার একজন খ্যাতনামা বিদুষী মহিলা, ইনি গত আট দশ বৎসর হইতে বই লিখিয়া বৎসরে দশ হাজার পাউণ্ডেরও বেশী উপার্জ্জন করিতেছেন।

শ্রীযুতা রেইনার্ট বলেন 'সাহিত্য সেবাই আমার প্রধান সহায়। একথা বলতে আমার বড় আনন্দ হয় যে আমার তিনটি ছেলে আমাকে ভাল লেখিকার চেয়ে ভাল মা বলেই বেশী মনে করে ও জানে। ঘর সংসারের অন্যান্য কাজের মত সাহিত্য সেবার কাজও আমি করে যাই।

শ্রীযুতা রচনা কার্য্যে বসেন এইজন্যে যেন তিনি সাংসারিক খরচ পত্রের হিসাব লিখিতেছেন। এইরূপ সহজভাবে বসিয়া ইনি এক এক খানা উপন্যাস রচনা করিয়া ফেলেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ, খানা পুস্তক ইনি লিখিয়াছেন। সব গুলি বহিই উল্লেখ যোগ্য।

উনত্রিশ বৎসর বয়সের সময় ইনি প্রথম পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রতিদিন ঠিক নিয়মিত ভাবে নিয়মিত সময়ে ইনি কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহাতে কোন ব্যতিক্রম হয় না। ইনি বলেন 'ছেলে কোলে লইয়া আমি টাইপ রাইটারের ব্যবহার শিখি। ছেলেরা বাহিরে বেড়াইতে গেলে, ঘুমাইলে বা খেলা করিতে থাকিলে তখনি আমি বেশীর ভাগ লিখি।

এখন আমার কত কাজ। দেশ বিদেশ হইতে কত চিঠি আসে, পুস্তকের প্রুফ্‌সব, বৈদেশিক স্বত্ব, অনুবাদস্বত্ব, নাটকীয় স্বত্ব, ফিল্মের স্বত্ব সব চিঠিরই জবাব আমাকে দিতে হয়। দিনে দিনে কাজ করিতে করিতে কর্ম্মশক্তিও আমার খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

বিলাতের বিখ্যাত সংবাদপত্র ডেলিছে, ইহার বিখ্যাত উপন্যাস The breaking point পাঁচহাজার পাউণ্ড লেখিকাকে দিয়া তাঁহাদের কাগজে ছাপি-তেছেন। দেশে বিদেশে এই লেখিকার গ্রন্থের অত্যন্ত আদর। ইনি আমেরিকান মহিলা। ওয়াসিংটন সহরে বাস করেন। ইহাঁর স্বামী গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগে কর্ম্ম করেন। স্বামী ও পুত্রদের লইয়া বিদুষী লেখিকা মনের আনন্দে ঘর সংসার করিতেছেন।

---

চোরা-বালি।

The Daily Expres
(London)

শ্বেত মনুষ্যের ১৭শ ভার।

The Looker on
(Calcutta)

# সাচ্চা কথা

## ( ভগীবর্গের হৃদয়-বাণী )

### [ শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ]

(১) মানুষকে ভালবাসাই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

(২) যাহার নিজের ধর্ম্মে আস্থা নাই, সেই অপরের ধর্ম্মকে সর্ব্বদা বিদ্রূপ করে।

(৩) পাপকে ঘৃণা করিও—পাপীকে নয়। ঘৃণার ফলে পাপীর উপরই হওয়া যুদ্ধের কথা, সে ক্রমেই পাপের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়।

(৪) বুদ্ধিমান ব্যক্তি সামান্য বালকের নিকট হইতেও উপদেশ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না কিন্তু মূর্খই দুর্ব্বহ অভিমানের ফলে 'সব জান্তা' ভাব ধারণ করিয়া থাকিতে চায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দশজনের নিকট আরও মূর্খতার পরিচয় দেয়।

(৫) বক্তৃতার ফলে কেহ জগতে বিখ্যাত হইয়াছে আবার কেহ বা মারাও পড়িয়াছে।

(৬) তর্কের সময় রাগিও না। যে চটিয়া যায় তাহার পরাজয় সুনিশ্চিত।

(৭) একটি যুবতী যখন অপর যুবতীর রূপ-লাবণ্য প্রশংসা করে তখন উহাতে বিদ্রূপের ভাবটাই বেশী থাকে।

(৮) একটি স্ত্রীলোক অপর একটি স্ত্রীলোকের প্রশংসা করে কখন,—যখন জানা থাকে যে, সে সর্ব্ববিষয়েই অপরটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

---

## ফাল্গুন প্রভাতে

[ শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায় ]

( ১ )

ফাগুনে আজ পড়ল ঘরে,
আলোর মেলা,
প্রভাত বেলা।
শিশির ভেজা দূর্ব্বাদলে,
হীরা মাণিক উঠল জ্বলে,
গগন তলে ;—
আকুল হয়ে বাতাস ঘোরে !

( ২ )

নব শ্যামল, যুঞ্জবনে,
কুসুম ফোটে,
মধুপ জোটে।
মধুর তানে কোকিল ডাকে
মুকুল ভরা আম্র শাখে
পাতার ফাঁকে ;—
কি সুখ ধারা বইছে মনে !

( ৩ )

অশোক, রাঙা ফুলের সাজে
সাজছে বনে,
আপন মনে।
মধুর সুরে বাজছে বাঁশী,—
প্রিয়ার মুখে ফুটছে হাসি,
যেমন নাশি'—
হর্ষ জাগে প্রাণের মাঝে !

( ৪ )

হোলির রাঙা আবির লভি'
আকাশ আজি,
উঠল সাজি'।
প্রভাত বেলা ফাল্গুন দিনে,
কি সুর জাগে হৃদয় বীণে,—
দুঃখ বিনে !
পুলকে আজ মত্ত সবি !

---

### প্রকাশের ভীতি।

"আমার গোপন করে' সবাইকে চোখে ধুলো দিচ্ছে। আমি প্রকাশ করে দিতে চাই যে।"

অভিনেতা—শ্রীকালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধি আর অদ্য ভাল্লুক।

বৃদ্ধ মুসলমানটির কাছ থেকে অনেক দরদাম করে লোকটি একটি পাঁঠা কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, পথে একদল ধূর্ত চোরের সঙ্গে দেখা। প্রথম চোর বল্লে—এ গাধাটা তুমি কত দিয়ে কিন্‌লে বাপু?

লোকটা ত অবাক! বল্লে—গাধা কি হে বাপু! এটা যে পাঁঠা!

চোর বল্লে—পাঁঠা ত পাঁঠা!

লোকটা চলেছে, দ্বিতীয় চোর এসে বল্লে—বেশ গাধাটি!

লোকটা হতভম্ব!

লোকটা ক্ষুণ্ণমনে চলেছে। তৃতীয় চোর বল্লে কত দাম হে বাপু গাধাটার?

উপরি উপরি তিন-তিনটে লোকের মুখে গাধা শুনে লোকটার আর অবিশ্বাস রইল না। সে যে বুড়ো মুসলমান পাঁঠা বেচেছিল, তার উদ্দেশ্যে বন্ বন্ শব্দে ছুটলো।

এদিকে এরা সেই রাত্রে এক বোতল মদ কিনে তারই সঙ্গে.....

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ডি, আই পি রেলওয়ে।— ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলা রেলওয়ে. যাহা দুরাইলে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইবে তাহার দৈর্ঘ্য যাহাতে বর্দ্ধিত হয় এই প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।—

---

গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া ভারত কর্ত্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষে পালমেণ্টের রাজার যে শাসন আছে তাহা যথাযথ পালন করিতে যেরূপ রাজপুরুষ প্রণালী তাহা করা যাইতে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের শাসনকার্য্যে ভারতীয়দিগকে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট মহাসভা যে রীতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং ভারতের উক্ত সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট আইন বা বিধিমত আইনে যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন সেই আইনে এতদ্বারা তাহা করিতে যে বহু ধর্ম্মিয়া এবং জাল লাভ হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই অনুসন্ধান করা চালাইতে হইবে। নিম্নলিখিত বিষয় অনুসন্ধান করা হইবে :—

(১) উক্ত চাকুরীগুলির সাধারণ অবস্থা কি? ইহাদের অর্থ বা অন্য সুযোগ সুবিধাই বা কি?

(২) বর্ত্তমানে একেবারে অথবা ক্রমশঃ উক্ত চাকুরীগুলির কতক কতক ভাগ প্রাদেশিক চাকুরীগুলির সহিত কতদূর যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে?

(৩) ভারত গবর্ণমেণ্ট আইন বা বিধি আইন অনুসারে উক্ত সাধারণ চাকুরীগুলিতে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের নিয়োগ সম্বন্ধে নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া এবং এই বিষয় যত বাড়াইতে কাজ হয় সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। উপরিউক্ত বিষয়গুলি অনুসন্ধান করিয়া কমিশন তাঁহাদের বক্তব্য জানাইবেন। (স্বরাজ)

---

আগ্রার ১২ই মার্চ্চ তারিখের খবরে প্রকাশ যে গত ১০ তারিখ আগ্রার দুই সপ্তাহ মজুরী, শিয়ার এবং জাটকে হিন্দু সমাজ পুনঃগ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশজন সমাজের ব্যবস্থাপক এবং আর্য্যসমাজের পরিচালক শুদ্ধি পর্ব্বে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, সন্ন্যাসী এবং নারায়ণ স্বামীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহাসমারোহে হিন্দু ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর, জাট এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ঐ সব পতিত ভ্রাতৃগণের পরিবেশন করা আবশ্যক আহার করিয়াছেন।

---

"ধূমকেতু" সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনলেশ কাঞ্জিলাল ধূমকেতুতে "ভাবনার কথা" শীর্ষক রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত করায় আদালতে ভারতীয় পঞ্চবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারামতে অভিযুক্ত হন। চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনলেশ বাবুকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

---

সেই বিখ্যাত আর্য্য রাজনী এবারকের আগের কাজের জন্য মুরেলায় পরলোকে গমন করিয়াছেন। যত, বাঁচা গেল, "এমারসন" পূর্ব্বেই বিদায়িল, তাহার পরিচালকও গেল। দুঃখের বিষয় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ানের অবস্থা উন্নতির চেষ্টারী তাহার দ্বারা পারিল না।

---

ভারত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেন যে, একটী অন্ধ ছাত্র স্বামী পুণ্যানন্দের কাছে রাষ্ট্রী হইয়া কিছু অর্থের সাহায্যের জন্য তাহার বন্ধুদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। সেই ছাত্রটী তাহার নিকট হইতে বেশী টাকা পয়সা আদায় করে না, যে যাহা ইচ্ছা করিয়া দেয় তাহাই গ্রহণ করে। সেই ছাত্রটী প্রথম কিস্তীতে ৪২।০ আনা প্রফুল্ল বাবুর নিকট জমা দিয়াছে। তাহার পর ১২ই মার্চ্চ তারিখ আবার ৩৭।০ আনা দ্বিতীয় কিস্তীতে প্রদান করিয়াছে। আমাদের বন্ধুবর্গের পক্ষে এই অন্ধ ছাত্রটীর কার্য্যের অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

---

পাত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। তমলুক পাত্রীগণ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া বালিকা ও যুবতী অপহরিত হওয়ার অভিযোগ শুনা যাইতেছে। তমলুক ফৌজদারী কোর্টে এতদ্বিষয়ে এক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কালিদাস ঘোড়াই নামক এক ব্যক্তি তাহার যুবতী পত্নীকে বাড়ী হইতে ভুলাইয়া অপহরিত করায় অপরাধে কয়েকজন পাত্রীকে আসামী করিয়া মকদ্দমা রুজু করিয়াছিল। আদালতে প্রার্থীয় সমন জারি করিলে পুলিস তাহাদিগকে লইয়া সার্চ্চ করিতে গমন করায় পাত্রীগণ তখন বাধ্য হইয়া স্ত্রীলোকটিকে তাহাদের বাড়ী হইতে বাহির করেন। মোকদ্দমা তুমুলভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু শেষে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রার।

---

এক বিঘতবৃক্ষের ২০।৩০ ফুট উপরে একটী পাইকড় মুক্ত অন্ধে সম্পূর্ণরূপ উপড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু হঠাৎ তাহা একদিন রাত্রিতে মহাসমারোহে সড় সড় করিয়া পূর্ব্ববৎ খাড়া হইয়া উঠে ইহাতে গ্রামস্থ লোকগণ দেবতার আবির্ভাব স্থির করিয়া বিস্তর পূজা অর্চ্চনা ও মানত আদি উপঢৌকনের ইয়া আদি প্রভৃতি দর্শন করিলাম। যুবতী স্বাভাবিক অবস্থায় এবংবিধ বিষয়ের এবং হঠাৎ উত্থান সম্বন্ধে স্থানীয় লোকজনের নিকট অবগত হইয়া প্রচার করিলাম। সুযোগ্য ব্যক্তিগণ ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত রহস্য প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

হিন্দু রঞ্জিকা।

---

## হাসপাতাল ট্যাক্সের কথা

### একটি ঘটনার কথা

সম্প্রতি স্বাস্থ্যবিভাগের ভারী স্যর সুরেন্দ্রনাথ হাসপাতালের উপর যে ট্যাক্স বসাবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে দেশের দরিদ্র লোকের কিরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, নিম্নে এই সংবাদটী পাঠ করিলেই তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারি কর।

রাজাপাড়া বন্দোপাড়ার মাঝে এক ব্যক্তি সাজাহারের কোন রাজরাণীর কাছে বসে বেহারে কাজ করিতেন। তিনি অল্পদিন যাবৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে প্রথমতঃ আলতাবাদের এক কি দুজন সিভিল সার্জ্জন দেখাইয়াছিলেন, অবশেষে অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ায় রাজাপাড়াবাবু কলিকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনেন। হাসপাতালে প্রবেশকালে তাঁহাকে হাসপাতালের নূতন ট্যাক্স বাবদ ১০৲ টাকা দিতে হয়। সর্ব্বসাধারণ রাজাপাড়াবাবু তাঁহার স্ত্রীর অবশিষ্ট অলঙ্কার এবংবেচা বাসন বিক্রয় করিয়া এই টাকা সংগ্রহ করেন। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া হাসপাতালের এক সহৃদয় চিকিৎসক তাঁহাকে বসে ৭৲ হিসাবে সাবাস্ত করেন। আর তাঁর পরিবারবর্গ সহযাত্রীরূপে অবশিষ্ট ১০৲ টাকার জন্য বারে বারে ফিরিয়া করিয়া ফেরাইতে হইতেছে। যদি কেহ পুরুষ বা স্ত্রী এই নিঃসহায় পরিবারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে তাহা আমাদের মেডিকেল হাসপাতালে শ্রীযুক্ত রাজাপাড়া বন্দোপাধ্যায় এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। (অনুসন্ধানক)

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

# বাঁশরী

১ম বর্ষ ] ১০ই চৈত্র শনিবার ১৩২৯, ইং ২৪শে মার্চ। [ ৩৪শ সংখ্যা

ডিগ্ বাজীর দাম—৫৩৩৩

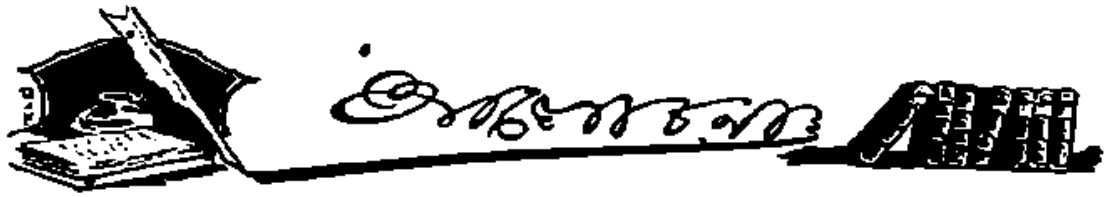

মহাত্মা গান্ধীর কারা বার্ষিকী উৎসব দেশে হইয়া গিয়াছে। এ আনন্দের উৎসব নহে—দুঃখের উৎসব, বেদনার উৎসব। এ দুঃখের দিনের উৎসবে দেশ ও জাতি দুঃখ বেদনাকে সানন্দে বরণ করিয়া লইবার মত শক্তি সাহস ও মনের বল সঞ্চয় করিয়া লইতেছে। যে জাতি ও দেশ দুঃখ বেদনাকে প্রাণে প্রাণে বরণ করিয়া লইতে পারে তাহাদের উঠিবার ও মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার পথে যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন আছে তাহা ইহাই দূর হইয়া যায়। দুঃখকে বরণ করিবার সাহস ও শক্তির মধ্যেই ভাগ্যলক্ষ্মী আসিয়া ধরা দেন। দেশ-লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্য ও নানা সম্পদে পৌরবান্বিতা হইয়া আজ বিকাশ করেন। দেশের সন্তানেরাও দুঃখের বহন জ্বালার ভিতর হইতেই নূতন জীবন ও আনন্দের স্বাদ পাইয়া জীবনের কামনা ও বাসনা সফল করিতে পারে। ভগবান—তোমার ইচ্ছায় দুর্ভাগা দেশের পরম বেদনাময় আজ নিবেদন যেন সার্থক হইতে পারে।

• • • •

মহাত্মা উৎসবের সহস্র বিষাদময় স্মৃতির মধ্যেও একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া প্রাণ আশা ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া ওঠে। এতবড় বিরাট দেশের জনসাধারণ যেন তাহাদের প্রাণের একান্ত জিনিসটিকে হারাইয়া তাহারই সন্ধানে ঊর্দ্ধগ্রীব উন্মুখ হইয়া চলিয়াছে। আপনভোলা সহজ সাধনা সজনা সেবাপে প্রাণহীন জাতি যেন আবার তাহার প্রাণের প্রাণকে পাইবার জন্য আকুল অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাই দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিরাট পুরুষ মহাত্মার নামে দেশ আজ আবার প্রাণের সাড়ায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণ শক্তির অর্জ্জনই আজ দেশের একান্ত সাধনা, মিথ্যা মোহ ভীতি দূরে সরাইয়া সত্য প্রাণকে প্রকাশ করিয়া দেওয়াই আজ তাহার বড় কামনা। দেশ প্রাণের ধারে আজ মিথ্যা হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছে। চাহিবার এই একান্ত ইচ্ছা হইতেই আনন্দের সন্ধান মিলিতে পারে, দুঃখের নিরানন্দময় জীবনের অবসান হইতে পারে। দেশের ইচ্ছা শক্তিকে কার্য্যকরী করিয়া তোলাতেই এই উৎসবের সার্থকতা। আজ আদর্শ চরিত্র, বিরাট কর্ম্মী পুরুষের দুঃখ বরণ করিবার মধ্যে জাতীর জীবনের অগাধ বেদনাও যেন পুঞ্জীকৃত হইয়া ওমরিয়া মরিতেছে। অসীম অনন্ত দুঃখের তারকে সোজা সরল ভাবে বহন করিয়া জাতি যেন আবার সত্যের মুক্ত শুভ্র আলোর সন্ধানে জীবন ধন্য করিতে পারে।

• • • •

মহাত্মার নামের প্রভাবে দেশে আবার সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব হরতাল হইয়াছে। আবার দেশের কার্য্যের জন্য তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। আবার কর্ম্মীরা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। এ সমস্তই মহাত্মার নামের প্রভাবে হইতেছে। দেশের জন্য মহাত্মার আত্মত্যাগ ও দুঃখ সহনের প্রচণ্ড সাহস ও একান্ত নিষ্ঠার দেশের নিরাশ প্রাণে আবার আশার রাগিনী ধ্বনিত হইতেছে। এ সব অত্যন্ত শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই কিন্তু এ সময় মহাত্মার নাম ও তাঁহার সত্য শুভ্র পতাকা লইয়া যাঁহারা দেশ গঠনের মন্ত্রে দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন তাঁহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের উপরেই এ কার্য্যের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। দেশের গতি ও মুক্তির পথে আবার হয়তো সহস্র বাধা অজস্র আসিয়া পড়িবে—সে গুলিকে সবলে সরাইয়া দিবার পথ নির্দ্দেশের মধ্যেই জাতীর কর্ম্মীদিগের সাফল্য নিহিত রহিয়াছে। দেশ জীবনের মুক্তির এ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন মত ভেদ বা দ্বন্দ্ব নাই—মুক্তি সব সময়ই মুক্তি—বন্ধন সব সময়ই বন্ধন। পথ নির্দ্দেশ তাহাও মহাত্মা যেমন করিয়াছেন এ পর্য্যন্ত আর কেহই তাহা পারেন নাই।—অবশ্য মতের বিভিন্নতা ও স্বাধীন মত প্রকাশ মানুষেরই লক্ষণ কিন্তু বিভিন্ন জনের এইরূপ বিভিন্ন স্বাধীন মত ও বুদ্ধিমত্তার অল্প হলতন্ত্র ও মনো-ভেদেরই কারণ হয়। অপর কোন প্রকার জাতীয় নেতৃত্ব যে ইহাতে হইতে পারে তেমন প্রমাণ আমরা আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। ব্যক্তি বিশেষের নেতৃত্ব অপরাজেয়

উপর জাতীয় লাভ নির্ভর করে না। তাই বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতবাদের ও বুদ্ধিমত্তার একটা সামঞ্জস্য যদি সম্ভব হয় তবে জাতীয় ভাবে তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া লইলে এ আন্দোলনের পক্ষে কাজে লাগিতে পারে। কিন্তু অতি বুদ্ধি ও অতি ব্যক্তিকতা লইয়া যিনি এই জাতীয় কার্য্যে বিরোধেরই সূচনা করিতে আসিবেন তাহার অন্য কোন প্রকার কার্য্যে আত্ম নিয়োগই শোভন হইবে। আজ সব বিরোধ বিক্ষোভ ভুলে গিয়াইয়া মহাত্মা যেমন অখণ্ড ভাবে দেশের মুক্তিকেই সব চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন তেমনি উদার নিষ্ঠাবান আত্মত্যাগী দেশ সেবককেই আমরা পুরোভাগে দেখিতে চাহি।

• • • •

বাংলার কৌন্সিলে নূতন বাজেটে দেশীয় মন্ত্রীদের মাস মাহিয়ানা বার্ষিক চৌষট্টি হাজার কমাইয়া বার হাজার বা আটচল্লিশ হাজার করিবার কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশীয় মন্ত্রীদের মাহিয়ানা কমাইবার জন্য যে সব দেশীয় সভ্য আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহাদের সে আপত্তি ভোটে টেঁকে নাই। মাহিয়ানা কমাইবার স্বপক্ষে ছিলেন ষোল জন বিপক্ষে ছিলেন বাহাত্তর জন। অনেক হোমড়া চোমড়া দিক্ গজ সভ্যও 'নায়' দিকেই মাথা নোয়াইয়াছিলেন অনেকে বা চক্ষু বুজিয়া নীরব ছিলেন। যাহা হউক দেশীয় মন্ত্রীদের এই সামান্য কয়েক হাজার টাকা কমাইয়া ফেলিলেও তাহাতে দেশের বিশেষ কিছু লাভ হইত না—তবে তাহাতে দু'একটি হাতে রাখা বিভাগ যথা শাসন ও শৃঙ্খলার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার পক্ষে আরও কিছু পাইবার সুবিধা হইত। তবে এ কথা নিশ্চয় অর্থের মায়া কাটাইয়া মাহিয়ানার লোভ ছাড়াইয়া অন্যান্য প্রদেশের দেশীয় সভ্যেরা ও মন্ত্রীরা যেমন একটু জনপ্রিয় হইবার সুযোগ পাইয়াছেন বাংলার কৌন্সিলের সভ্য সমাজ ও মন্ত্রী সমাজ তাহা পারিলেন না ইহা তাহাদের সুবুদ্ধির কথাই বলিতে হইবে। জন মত মাহিয়ানা কমানোর দিকেই ছিল—কিন্তু দেশীয় সভ্যেরা ইহাও সুবুদ্ধির মতই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন।

কৌন্সিলে অন্যান্য বাজেট—অর্থাৎ সরকারের নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য যাহা—অর্থের প্রয়োজন তাহা স্বচ্ছন্দে পাশ হইয়া যাইতেছে। টাকা ঢালিলে দেখোর গৌরীসেনের মত লোক মুক্ত হস্ত সেখার শব্দ অভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার অসুবিধা ঘটিবে ইহা কি সম্ভব? তবে দিল্লীর ব্যবস্থা পরিষদ্ এবার সত্যই একটা অপূর্ব্ব কাণ্ড করিয়াছেন,—রয়াল কমিশন অর্থাৎ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস বা ঐরূপ মোটা মাহিয়ানা ভোগী কর্ম্মচারীদের বেতন আরও বাড়াইবার জন্য যে একটি কমিশন বসিবার কথা ছিল তাহাদের সফর খরচ ইত্যাদী বাবদ একটা মোটা অর্থের মঞ্জুরী চাহারা না-মঞ্জুর করিয়াছেন। সবশেষ ট্যাক্সও বোধ হয় বাতিল না। দেশের প্রতিনিধিরা সুবুদ্ধি সোপানের নত এসব কার্য্যেও যে কেন সায় দিতে পারিলেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। একি বিবেক—মর্য্যাদা জ্ঞান-না দেশের প্রতি—জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা?

• • • •

আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকেই শ্রমজীবিদের জন্য কাঁদিয়া মরিতেছেন। যেমন ধারা একালে লোকে ধোঁয়ার ছলনা করিয়া চোখের জলে ভাসিত। শ্রমজীবি এখন দেশের সকলেই, সত্যি শ্রমজীবিদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে অ-শ্রমজীবিদের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয়, নীতি হিসাবেও যে শ্রমীকদের চেয়ে অশ্রমীকেরা কিছুমাত্র উন্নত তাহাও আমাদের মনে হয় না। অবস্থা সকলেরই সমান—তফাৎ উনিশ বিশ—এ পিঠ আর ও পিঠ এই মাত্র। ইহাদের সকলের উন্নতির জন্যই যত্ন ও চেষ্টা ভাল কিন্তু ইহারা পেছনে পড়িয়া আছে অন্য হাতেই যে কংগ্রেসটা কিছু নয়—এ কিছু নয় ও কিছু নয় এই কথা প্রচার করা ইহাও যুক্তি যুক্ত নয়। মহাত্মা গান্ধীর নামে ও কর্ম্মের মহিমায় এই পেছনে পড়া দল ও অনুন্নত সমাজই সব চেয়ে বেশী সাড়া দিয়াছিল। দুঃখের বিষয় বক্তৃতায় ও কথার চেয়ালীতে ইহারা মুগ্ধ হয় না। ইহারা চাহে মহাত্মাজীর প্রাণের সরল ও কর্ম্মের মহিমা দেখিতে। কারণ ইহারা বড় কাজই করুক আর ছোট কাজই করুক—কর্ম্মশ্রেণীর লোক কিনা—তাই কর্ম্মের মহিমায় ও প্রাণের ভাবেই ইহারা সাড়া দেয় ভাল। কংগ্রেসকে মহাত্মা নিজের কর্ম্ম মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া-

ছিলেন, অকথ্য ও নিষ্কথার ঘরও তাঁহার প্রাণ ও কণ্ঠের উজ্জ্বলো কখনই হইয়াছিলেন। আজ পরশ পাথরের সম্মোহনী শক্তি দূরে যাইতেই তাহাদের বাক্‌চাতুরীর খেলা ও অকথ্যার অভিযান সুরু হইয়াছে।—কোন পথে ইহার সমাপ্তি?—

বাংলার সকল শিক্ষাবিভাগেই যেমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়াছে মেডিকেল স্কুল কলেজগুলিতেও তেমনি ছাত্রদিগের অসম্ভব ভিড় হইয়াছে। পাঁচশতেরও কম ছাত্র কলিকাতার তিনটি চিকিৎসা শিক্ষা মন্দিরে লওয়া হয়। সেখানে আবেদন পড়ে প্রায় দু'সাত হাজার ছাত্রের। জগতের হিতার্থে, মানব সমাজের উপকারার্থে, মানবের বেদনা উপশমের জন্য ছাত্রদিগের এ আকাঙ্ক্ষা ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পাঁচ হাজার ছাত্র এই চিকিৎসা মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিয়া বিফল মনোরথ হইতেছেন তাহারা কি করিবেন? ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ ব্যবসায়ীদের আপিসে কর্মপ্রার্থী হইয়া আবেদনের পর আবেদন প্রেরণ করিবেন, কেহ কেহ বা সাধারণ বিদ্যালিক্ষা করিয়া শেষকালে অগত্যার গতি আইন সাগর পড়িয়া কোর্টে গিয়া যাহার ভাগ্য তাহা তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য তালিম করিবেন—আর যাহার ভাগ্যমন্দ তিনি ঘটকালীর ব্রত গ্রহণ করিয়া ভাগ্য ও শিক্ষাকে বিদায় দিবেন: সত্য-শিক্ষা বোধ হয় বাঙ্গালীর ছেলেদের আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। তাহারা চাহে চাকুরী লাভ করিতে তাই মেডিকেল কলেজে পাশ করিয়া চাকুরে ডাক্তার হইতে চাহে। সত্য চিকিৎসাবিদ হওয়াই যদি ইহাদের আকাঙ্ক্ষা হইত তবে এই এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসা মন্দিরের দ্বারে দ্বারে না গিয়া ইহারা আয়ুর্বেদী হাকিমি, ইউনানী, হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা বিদ্যার দিকেও ঝোঁক দিতে পারিত দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেরও উন্নতি বিধান করিতে পারিত। কিন্তু এ সব তো শিক্ষা নহে। ইহা হইল চাকুরী পাওয়ার একটা উপায় মাত্র। দিল্লীতে হাকিম আজমল খাঁর যে কলেজ স্থাপিত হইয়াছে তথায় কেবল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র নহে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ছাত্রও আসিতেছে। কিন্তু তথায় চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কতজন বাঙ্গালী ছাত্র গিয়াছে? কলিকাতা বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের অবস্থাই বা কিরূপ? চাকুরীর লোভ ও মোহ ভারির মজ্জায় মজ্জায় জাঁকিয়া বসিয়াছে ইহা থাকিতে দেশের নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বোধ হয় কোনদিনই হইবে না।

মিশ্রি-মিছ
( আসামের মিরি নাচ )
আলোক চিত্র-শিল্পী - শ্রীযুক্ত এস, বরুয়া লোই।

# রুশ ইতিহাসের একপৃষ্ঠা

[ শ্রীকিশোরীলাল ঘোষ এম্-এ, বি-এল ]

## প্রথম পরিচ্ছেদ

১৯০৪—১৯১৪

### রুশনীতি—ঘরে বাহিরে

রুশের ইতিহাসে ১৯০৪—১৯০৫ খৃঃ অব্দে রুশজাপান যুদ্ধ এক স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলাফল সমস্ত পৃথিবীতে একটা বিষম চাঞ্চল্য এনেছিল। একদিকে যেখন সমস্ত জগৎ দেখলে ক্ষুদ্র জাপানের বেটে বেটে লোকগুলা কোমর বেঁধে আর মাছভাত খেয়ে দাঁড়িয়ে বিরাট রুশদেশের বিশাল বাহিনীকে জলে স্থলে কাবু করে দিলে; আর একদিকে তেমনি আমেরিকা যুক্তরাজ্যের তখনকার প্রেসিডেন্ট রুজ ভেল্ট মহাশয় শ্বেতাঙ্গ সমাজের "পেল রাজ্য পেল মান" বলে প্রায় তাক্ ছেড়ে কেঁদে না উঠুন, হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আর ফরাসি দেশের প্রেসিডেন্ট লুবকার এর চেষ্টায় ও মধ্যস্থতায় রুশজাপানের সন্ধিপত্র ১৯০৫ খৃঃ অব্দে পোর্টসমাউথএ স্বাক্ষরিত হয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টএর চেষ্টায় ও চোখরাঙানির জোরে ব্যাচারা জাপান লড়াইয়ে জিতেও যথাপাত্র ক্ষতিপূরণ বাবদ কোন টাকা ( Indemnity or Reparations, আদায় করতে পারলে না। যাহা হউক রুশকে মাঞ্চুরিয়া, পোর্টআর্থার দক্ষিণ সাখালিয়ান প্রভৃতি প্রদেশ যাহা চীনদেশের নিকট থেকে Lease-নেবার অছিলা করে নিয়ে সাম্রাজ্যভুক্ত করার মতলব করেছিল তাহা বিসর্জন দিয়ে জাপানের হাতে মানে মানে সমর্পণ করে দিতে হয়েছিল। পাঠক শুনে আশ্চর্য্য হবেন জাপান আজ পর্য্যন্ত চীনের দেশ চীনকে ফিরিয়ে দেবার সময় পায় নাই। যাক্ সে কথা অপ্রাসঙ্গিক। তবে মনে রাখিবেন যে জাপান এখন জবরদস্ত "সঙ্ঘ"।

যাহা হউক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টএর বোদ্ধনীতে রুশকে হারার উপযুক্ত বিশেষ কিছুই অসুবিধা ভোগ করতে হয় নাই। তবে ঘরে বাহিরে তার prestige বা দাপটের কিছু হ্রাস হয়েছিল। লোকে একদিকে যেমন জাপানকে বাহাদুরি দিলে—আর একদিকে তেমনি সকলে বলতে লাগল—আরে ছ্যা—রুশদেশটা দেখতেই বড়। আর ঐ Cossack দের বাহাদুরি কেবল নিরীহ রুশ প্রজাদের উপর অত্যাচার করবার বেলায়। আর রুশ সম্রাটের ৪৪ লক্ষ সৈন্য হাতিয়ার নিয়ে রাজ্যের ভেতর কেবল "শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষা করতে মজবুত। হাতিয়ার এঁটে যুদ্ধ করতে গেলেই বাছাধনদের চক্ষুস্থির। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রুশ সেনাগণের কোনও দোষ ছিল না। তারা বীরত্বে জাপানিদের চেয়ে একটুও কম ছিল না। তবে রুশদের সেনানায়কদের অধিকাংশই লড়াই করার চাইতে মজলীশে বা বৈঠকখানায় ইয়ারকি, নাচ, তাসখেলা আর জমকের যাওয়াটা বেশী পছন্দ করতো আর এসব কাজে বেশ পটুও ছিল। রুশ সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন—যাঁর প্রয়োচনায় ও ভরসায় সম্রাট্ জাপানের সঙ্গে লড়াই বাধালেন—সেনাপতি হবার কোন গুণ তাঁর ছিল না। তাঁর না ছিল সৈন্য পরিচালনা করবার ক্ষমতা না ছিল সেনাদের ভাল করে organise করবার শক্তি। তাছাড়া রুশ সেনাদের মধ্যে একটা বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তাদের কতকগুলা মিথ্যা কথা বলে জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দূরের সমরক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয়েছিল।

রুশ যখন জাপানের কাছে হেরে গিয়ে মাঞ্চুরিয়া আর পোর্ট আর্থার ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লো তখন থেকেই য়ুরোপের শক্তিপুঞ্জের ভিতরে ভিতরে একটা বেশ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। জার্ম্মানি বরাবর রুশিয়াকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছিল। বিসমার্কের নীতি "রুশকে খুসী কর" কাইজার অনুসরণ করে আসছিলেন এবং বহুদিন থেকেই তাঁর মতলব ছিল যে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুষিয়ার সহিত একটা সন্ধি বা alliance করে জার্মেনীর বল বাড়াবেন। কিন্তু রুশের বিরাট বাহিনী যখন জলে স্থলে জাপানের কাছে বিষম রকম জখম হয়ে পড়লো তখন জার্মেনী বিসমার্কের পথটা ছেড়ে দিয়ে অষ্ট্রিয়া, ইটালি আর তুরস্কের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করতে আরম্ভ করলে। ফরাসী—১৮৭০ সালে জার্ম্মানীর কাছে হেরে যাওয়া থেকে প্রতিশোধের বাসনায় ছিল। ফরাসী এটাও বুঝেছিল যে একলা জার্ম্মানীর সঙ্গে আর লড়াই করে বড় সুবিধা হবে না। কাজেই রুশের অসময় টাকাকড়ি ধার দিয়ে তাঁকে বরাবর হাতে রেখে আসছিল। আর জার্মেনী

রুশকে যে মুহূর্তে অবহেলা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাতে আরম্ভ করলে ফরাসী সরকার জোর্ স্থরে এক রাষ্ট্র-নৈতিক "কোপে" রুশিয়ার সঙ্গে সখ্য করে ফেছে। আবার ঠিক যে কারণে জার্মানী রুশকে ছাড়লে ইংরেজ ঠিক সেই কারণেই রুশকে বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে বদ্ধ করে রাখিত করা দরকার মনে করলে। পরাজিত রুশ যে ভারতের সীমান্ত প্রদেশে বিশেষ চাঁ্যা চোঁ করতে পারবে না—এই যুক্তিটাই প্রবলভাবে ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফরাসীর সঙ্গে ইংরেজ স্বার্থের খাতিরে আঁতাত ( Entente ) করে জার্মানীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় করার কিছু পরেই ফরাসীর চেষ্টায় ও রাজা এডোয়ার্ডের ও সার এডোয়ার্ড গ্রের উদ্যোগে রুশকেও আঁতাত রজ্জুতে বেঁধে ফেলা হ'লো। রুশও দেখ্‌লে যে তার স্বার্থ জার্মানীর ও অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের বিরোধী। কারণ অষ্ট্রিয়া চায় যে বলকানে তার প্রভুত্ব থাকে। আবার রুশ চায় যে সারভিয়া প্রভৃতি বলকানের যত স্লাভদেশ রুশিয়াকেই তাদের রক্ষাকর্ত্তা বলে মান্‌বে। আর তা ছাড়া জার্মানীর তুর্কি প্রীতি রুশের চক্ষে ভাল ঠেকে নাই। কন্‌ষ্টান্টিনোপল্‌টা এক-কালে রুশের অধীনে আন্‌তে হবে এ স্বপ্ন রুশ রাজার সফল করবার চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু ইংরেজের চেষ্টায় ও দাপটে তা পেরে ওঠেনি। রুশ এটাও বুঝে-ছিল যে ইংরেজ নিজে কনষ্টান্টিনোপোল নিতে চায় না, তবে অন্য কোন শক্তিশালী শক্তির কবলেও প্রাণ থাকতে তুলে দেবে না। কারণ কনষ্টান্টিনোপল এশিয়ার সিংহদ্বার। কিন্তু জার্মানী যখন তুর্কির পিঠে হাত বুলোতে আরম্ভ করে বাগ্‌দাদ রেলওয়ে করবার অনুমতি পত্র হস্তগত করলে তখন রুশের মনে সন্দেহ হ'লো যে জার্মানীর লক্ষ্য কনষ্টান্টিনোপলের দিকে। আর তা ছাড়া রুশের দুই প্রতিবেশী জার্মেনী ও অষ্ট্রিয়া সামরিক হিসাবে যদি খুব বলবান হয়ে উঠে সেটা রুশের পক্ষে বিশেষ সুবিধার কথা নয়। যদিও য়ুরোপে যে স্লাভ জাতির "রক্ষাকর্ত্তা" বলে রুশের খাতির তাতো যাবেই—অধিকন্তু হয়তো সার্ভিয়াটা অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়তে পারে।

অতএব দেখা যাচ্ছে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রুশ, ইংরেজ ও ফরাসী একদিকে—আর জার্মেনী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক আর ইটালী এক দিকে। ইটালীর বিষয়ক্ততা সম্বন্ধে জার্মেনীর একটু সন্দেহ ছিল। কারণ যদিও ইটালী ফরাসীকে সন্দেহ করতো অষ্ট্রিয়ার প্রতি ইটালির বিশেষ বিদ্বেষ ছিল যেহেতু অষ্ট্রিয়ার অধীনে ইটালি এক কালে অনেক দুঃখভোগ করেছে—স্বাধীন হবার পরও তার দু'একটা এমন জায়গা অষ্ট্রিয়ার কবলে ছিল যাতে ইটালিয়ান এর সংখ্যা খুব বেশী। এই জায়গাগুলি ইটালির অধীনে নিয়ে আসা ইটালিয়ান রাজনীতিজ্ঞদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু জার্মেনী ইটালীর সাহায্যে বিশেষ আস্থাবান না থাকলেও তুর্কীকে সে নিজের দলে টান্‌তে পারবে সে ভরসা খুব ছিল। এবারে রুশকে যুদ্ধে নাবান গেল। আগামীবারে রুশ কিরূপ লড়াই করলে আর লড়াই করতে করতে কেমন হঠাৎ এক বিরাট বিপ্লবে সমস্ত পুরানো শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে দিলে তার কথা বল্‌বার ইচ্ছা রহিল।

তারা লড়াই করতে করতে যখন দেখ্‌লে যে জাপানীরা তাদের মতই মানুষ—তারা ছোট ছোট ছেলের মাথা ফড়্‌ফড়িয়ে চিবিয়ে খায় না, তারা বরাকারে পড় নয়, তাদেরও মারা পরা আছে তখন রুশ সেনাদের যুদ্ধে আর বিশেষ রুচি রহিল না। ওদিকে জাপানের ছেলে বুড়ো আদি করে সকলে বুঝেছিল যে স্বর্গ জাপানের দিকে আছেন। আজ মাঞ্চুরিয়ায় রুশকে যদি ছেঁকে বসতে দেওয়া যায়, কালুকে কোরীয়া তার কবলে পড় বে; আর দিনকতক বাদে জাপানকেও রুশসাম্রাজ্যের একটা প্রদেশ হয়ে থাকতে হবে। সুতরাং ক্ষুদ্র জাপান যে বিরাট রুশকে কাবু করবে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

রুশ জাপান যুদ্ধের সময় ইংরেজ জাপানের বন্ধু ছিলেন। রুশের ভারতের প্রতি লোভ আছে এ কথাটা বরাবরই ইংরেজদের ধারণা ছিল। তাই ভারতের কোটি কোটি টাকা সীমান্তপ্রদেশকে সুরক্ষিত করবার জন্য আজ পর্য্যন্ত জলের মতন খরচ করা হচ্ছে। রুশ জাপান যুদ্ধের সময় জাপানের বীরত্ব দেখে ইংরেজ ভাবলে এইবার একটা বন্ধুর মতন বন্ধু পাওয়া গেল। যেমন রুশ বুড়ো গুল্ হয়েছে তেমনি তার বাধা জোটুল—জাপান ও ক্রমে বড় হয়ে উঠেছে। অবশ্য যাঁদের পক্ষ বাদে মারলে বড়মহাশয়ের যেমন আহ্লাদ হয় রুশ

জাপানের হাতে হেরে যাওয়ায় ইংরেজেরা খুব খুসী হয়েছিল।

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার একটা উদ্দেশ্য রুশ গবর্ণমেণ্টের ছিল। সেটা আর কিছুই নয়—লোকের মনটা অন্যদিকে ফেরাবার জন্য। রুশ গবর্ণমেণ্টের শাসনের দাপটে "নিহিলিষ্ট" সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। অনেক অত্যাচারীকে বোমার চোটে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। এবং দ্বিতীয় নিকোলাসের পিতাকেও নিহিলিষ্ট এর বোমায় প্রাণত্যাগ করতে হয়। কিন্তু রুশ গবর্ণমেণ্ট বোমার ঔষধ ঠিক করতে না পেরে মনে করলে—কতকগুলা লোককে গাড়ি ভর্ত্তি করে সাইবিরিয়ায় চালান করে দিলেই বাকি লোকের ভয় হবে। আর নিহিলিষ্টেরা ভয়ে ভয়ে এই সব পথ ছেড়ে দিয়ে রাজভক্ত প্রজা হয়ে দাঁড়াবে। যখন গবর্ণমেণ্ট দেখলে শুঁতোয় রাজভক্তি হয় না উল্টে অসন্তোষ বেড়ে উঠে—তখন একটা লড়াই বাধিয়ে কতকগুলি লোককে মরতে পাঠিয়ে দিয়ে আর লোকের মনে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করে তাদের মনটা অন্যদিকে চালিয়ে খুব বড়দরের একটা রাজনৈতিক চাল চেলে দিলে।

কিন্তু "উল্টা বুঝিলি রাম।" যুদ্ধে হেরে যাওয়াতে লোকের মনে অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। নিহিলিষ্টেরাও ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। রাজকর্ম্মচারীরাও আইনের মস্তকে পদাঘাত করে যথেচ্ছাচারের একশেষ করতে লাগলেন। সাইবীরিয়ার খনি ও কারাগার রাজনৈতিক কয়েদিতে পূর্ণ হতে লাগ্‌লো। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যত বাড়তে লাগ্‌লো লোকের মনে ততই দৃঢ় ধারণা হতে লাগ্‌লো যে দেশের সাধারণ লোকের হাতে ক্ষমতা যতদিন না আসে ততদিন এই সকল অত্যাচারের প্রতিবিধান কিছু হবে না; ততদিন সরকারের চাকর সাধারণের মনিব থাকবেই। ক্রমশঃ জনমতের কাছে প্রবল প্রতাপান্বিত রুশ সম্রাট্‌কেও শির নত করতে হয়েছিল। তার ফলে রুশদেশে ডুমা বা রুশ পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'লো। কিন্তু নামতঃ যদিও গণতন্ত্র প্রণালী মতে রুশ সাম্রাজ্য শাসন চলতে লাগল কার্য্যতঃ রুশ সম্রাট আর তাঁহার কর্ম্মচারীগণ পূর্ব্বেকার ন্যায় দায়িত্ব শূন্য রইল। তিন ডুমা যথেচ্ছাচারের প্রতিরোধ করতে বিশেষ সমর্থ হ'ল না। রাজ মতের সহিত জনমতের যেখানে বিরোধ ঘটত সেই খানেই রাজমত প্রবল হ'ত। ভেতরে ভেতরে বেশ অসন্তোষের বহ্নি জ্বলতে লাগল। ১৯১৪ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে যখন অষ্ট্রিয়ার ভাবী সম্রাট সিরাজেভো নগরে সার্ব্বিয়ান্ যুবকের দ্বারা নিহত হন সেই সময় রুশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ। এইবার দেখা যাক্ বাহিরে রুশ গবর্ণমেণ্ট কি নীতি অনুসরণ করেছিল। রুশের সহিত অন্যান্য য়ুরোপের শক্তি নিচয়ের সহিত কি সম্বন্ধ ছিল সেটা আগে না বুঝ্‌লে রুশবিপ্লবের পর বর্ত্তমান রুশ নীতিটা ঠিক বোঝা যাবে না। বর্ত্তমান রুশবিপ্লববাদীগণ রুশ নীতির ঘরে বাহিরে আমূল পরিবর্ত্তন করেছেন। কেন করেছেন আর কি করে করেছেন জান্‌তে গেলে আগে সেই নীতিটা কি ছিল সেটা জান্‌তে হবে। পরে রুশ গবর্ণমেণ্ট কি নীতি অনুসরণ করতেন তা উপরে যা বলা হয়েছে তাথেকে কতকটা বোঝা যায়—এইবার অন্যান্য শক্তির সহিত রুশের ১৯১৪ খৃঃ অব্দে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহার আলোচনা করা যাক্।

---

## সু ও কুলোক

### ( তামিল কবিতা )

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

সুজন লোকের সংখ্যাটা কম,
　　সুজন দেশে ছড়াছড়ি;
হয়—সে যে মহার্ঘ্য ভাই,
　　যাচ্ছে ছুড়ি, গড়াগড়ি।

# বিজয়িনী নারী

[ শ্রীমতী খুরসিদ আঁহাবেগম্ ]

এতকাল আমরা জানিতাম পুরুষই নারীর জন্য অধীর লালায়িত। আজ ডাক্তার যোশিয়া ওডকিন্ড মত প্রকাশ করিতেছেন নারীই বেশীর ভাগ পুরুষদের মন হরণ করিবার জন্য অধীর ও লালায়িত। ডাক্তার বলিতেছেন নারীরা পাখীর মত পুচ্ছ বিস্তার করিয়া কিম্বা ফুলের মত সহস্র দলে বিকশিত হইয়া পরাগ গন্ধে পুরুষের মন হরণ করিতে পারে না বলিয়া নানারূপ বসনে ভূষণে, অনুরাগও প্রসাধনে তাহারা পুরুষের চিত্ত জয় করিতে অভিলাষিনী। এই ভাবে অহ সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া পুরুষের মন অল্পক্ষণের তরে অধিকার করিয়া বসে বলিয়াই আজ ডাইভোর্স কোর্টে বিবাহচ্ছেদের মত এত মামলা উপস্থিত হয়।

সত্যিকার স্নেহিভালবাসারঞ্জিত গোলাপের মত যে নারী, হৃদয় যাহার গোলাপের মত গন্ধে ভরা সে একবার যে পুরুষের চিত্ত হরণ করে মরণ কাল পর্যন্ত তাহাকে আপন বাহুপাশে হৃদয় মন্দিরে বাঁধিয়া রেখে। পাউডার ঘসা মুখ, রঞ্জিত ওষ্ঠ, তুলি আঁকা ভ্রু ও সজ্জিত কেশদাম, পুরুষকে ভাল খেলিতে পারে বটে—কিন্তু দু'দিনেই সে শিকল কাটিয়া চলিয়া যায়।

প্রত্যেক নারীরই নিজস্ব কোন গুণের বিকাশ হওয়া কর্ত্তব্য, যে গুণের জন্য অনুরাগী পুরুষ চিরতরে তাহার অনুরাগীই থাকিতে পারে। সিঁদুর বা হাজবোনিয়ার লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই মন এক জন সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যায় না—পোষাকের দোকান উজাড় করিয়া সেই পোষাকে বার বার প্রজাপতি সাজিলেও পুরুষের মন পাওয়া যায় না।

দু'জনাই দু'জনার কাছে ভালবাসা, প্রাণের আদান প্রদান চাহে। সেইটুকু যাহাতে ভুল করিয়া দিতে পারা যায়, দু'জনার এক সঙ্গে জীবন কাটাইতে হইলে তাহাই জানা কর্ত্তব্য।

---

## .....এর প্রতি

[ শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ ]

সত্যকথা বল্লে দেখি হেসে ও হও টং,
অন্তলোকের আদরে তাই দিচ্ছ কতই সং!
হাসাচ্ছ ত দেখচি বেজায়,
অমন করে বলো কে যায়
লোক হাসাতে চুণ কালী আর
মুখে মেখে রঙ?
বয়স ত আর কম হলো না
হুঁস কবে হয় আর বলো না?
ভাট চালাকী চলছে আজো
হাই ঝুমুরে চঙ।
পদার্থ হায় ছিল যা তা,
ছ্যাবলামীতে পড়লো ছাতা,
বিদ্যে বুদ্ধির গোড়ায় কবে
ধরে গেল ঘুণ।

## সাধ

( শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন, কাব্যবিশারদ )

একখানি আছে ঘর হো'ক না সে কুঁড়ে'
তবু তায় পারো যদি এসে বস' জুড়ে'।
ছিন্ন-বাস একখানি থাকে যদি মোটে
দিব তায় আধখানি বস্ত্রহীনে কেটে।
এক মুঠো থাকে যদি দীনের ভবনে
দিব তাই লয়ে' তাই যদি লয় মনে।
যদি কেহ তব দিয়া ক্ষীণ বাহুখানি
উঠিবারে পারে তবে বল মোরে আনি।
মোর স্থান হো'ক হেথা সকলের নীচে
যাও চলে' সবে আগে আমি র'ব পিছে।

# সারথী

[ শ্রীলীলা দেবী ]

## আমার কথা

সেদিন দেওয়ালীর আলোয় সহরের খুব শোভা, অমন ঝিম্‌ঝিমে কালো রাতখানা দিনের মত ঝল্‌মল্ ক'রছিল দীপের আধারে। দেওয়ালী দেখার সখে আমিও পথে পথে ঘুরছিলুম। কে জানতো যা সেদিনের দীপালী আমার জীবন প্রদীপকে চির উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে যাবার জন্যেই অমন ক'রে সেজে দাঁড়িয়েছিল। উৎসব মত্ত রাজপথের বিরাট জনতার মাঝখানে একটী সুন্দরী কিশোরী ন যযৌ ন তস্থৌ এইভাবে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখে ভয়ের বিহ্বলতা আর বেদনার কালীমা দেখে আমার নিস্তরঙ্গ মন নবীন্ত কতকগুলো ঢেউএর লীলা উথলে উঠ্‌লো। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস্ ক'রলুম "তুমি কাঁদছ কেন?" সে আমার কথার সুর পেয়ে আরো কান্নার বেগটা বাড়িয়ে ব'লে "আমি হারিয়ে গেছি। আমার সঙ্গীরা আমায় ফেলে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেলো,—আর তাদের দেখতে পাচ্ছিনে। কখন তো এ সহর দেখিনি—পাড়াগাঁ থেকে এসেছি আমরা।" সমবেদনায় মনটা কেমন ক'রে উঠ্‌লো, আমি ব'লুম—"তুমি তোমার বাড়ীর ঠিকানা জানো? আমি তোমায় তাহলে পৌঁছে দিই. আমার গাড়ী আছে।" সে অধির হ'য়ে ব'লে—"তাদের না ব'লে ক'য়ে কেমন করে বাড়ী যাবো? তারা হয়তো আমায় কত খুঁজ্‌ছে।" আমি ব'লুম "তুমি তাদের জন্যে এত অধির হ'চ্ছ কেন? তারা ঠিক নিজের নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে—তুমি কি ভাবছ তোমার জন্যে তারা পথে পথে ঘুরছে?" অবাক্ হ'য়ে সে ব'লে—"ঘুরছে না? সবাই মিলে আমোদ আহ্লাদ ক'রব আলো দেখ্‌বো এই সব যে আমরা এসে ঠিক ক'রেছিলুম। হঠাৎ পথ হারিয়ে সব এমনি হয়ে গেল যে যার বাড়ী যাবে—তাও কি হয়?" ব'লতে ব'লতে তার চোখ বেয়ে আবার বৃষ্টী ঝ'রতে লাগ্‌লো, সান্ত্বনা দিয়ে ব'লুম—তুমি মনে ক'রছ খুব একটা আমোদ হ'ত কিন্তু বাস্তবিক তা হ'ত না। শুধু পথ চ'লে আর একটু বেশী ক্লান্ত হ'তে আর খেল্‌না কিনে জমা পয়সা আরো কিছু খরচ হ'ত। আর তুমি যে ব'লছ তাদের খুঁজে তা কি সম্ভব?"

—"কেন সম্ভব নয়?"

—"চোখ মেলে দেখো দিকি তোমার আশে পাশে কত লোক কি বিপুল জনতা! আর তাদেরও কত অনন্ত—এর মধ্যে তারা কোন দিকে কোন পথে গেছে পাওয়া নিতান্তই কঠিন! এখনি এখনি কি তা হয়, পরে খোঁজ ক'রলেই হবে।"

## রাণীর কথা

এতগুলো কথার বক্তা যিনি এতক্ষণে তাঁর মুখের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলুম। দেখলুম—সেই স্নিগ্ধ তার কান্তিপূর্ণ মুখে প্রেমপূর্ণ দুটী চক্ষু যেন আমার পথহারা জীবনে ধ্রুবতারার মত পথ দেখিবে দেবার জন্যে চেয়ে আছে। ব'লুম—"তুমি তাহলে ঠিক ব'লছ সঙ্গীদের ফেলে গেলে দোষ হবে না?" তিনি যেন নিরাশ হ'য়ে ব'লেন "কেন আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না?" আমি তাড়াতাড়ি ব'লুম "হ্যাঁ বিশ্বাস হ'চ্ছে—তোমার প্রত্যেক কথাটা সত্য—সত্য সত্য—এমনি মনে হ'চ্ছে।" এবার তিনি হাসলেন সে হাসিতে মধু ঝ'রে পড়ল! সে কি হাসি! অমরলোকের রাণী যিনি তিনিও বোধহয় এমন মোহন হাসিতে বাঁধা প'ড়তেন! আমার মনে হ'ল যাঁর একাধারে এত রূপ এত গুণ তিনি নিশ্চয়ই দেবতা—মানুষ নন্। আমি মুগ্ধ হ'য়ে ব'লুম—"তুমি নিশ্চয় দেবতা নইলে এই অসময়ে একান্ত ব্যাকুল হ'য়ে দেবতাদের ডাকতে ডাকতে তুমি কেন এসে আমায় রক্ষা ক'রলে?" নিজের প্রশংসার দিকটা তিনি এত কম দেখতেন যে এ কথাটা উড়িয়ে দেবার ছলে হেসে ব'লেন "দেবতা কখনই নয়—বরঞ্চ ভূতের অংশই বেশী! এখন তোমার বাসার ঠিকানা বলো, পৌঁছে দিই" কিন্তু আমার তখন বাড়ীর দিকে

মন খুব কমই কুঁকড়িল। বেশী কুঁকড়িল পথের দিকে যে পথে এই নূতন মাহুষ রথ চালিয়েছে—আমি সতাকে বাদ দিয়েই ব'লুম "বাপার ঠিকানা মনে নেই—ভুলে গেছি!"

## আমার কথা

দিগ্‌বিদিগন্তব্যাপী গভীর অন্ধকার! তার যেন সীমা নেই শেষ নেই—সেই নিবিড় তামসী রজনীর কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ ক'রে আমরা দুটীতে পরস্পরের প্রতি চেয়েছিলুম একজন শিশুর এত অসীম নির্ভরতায় আর একজন স্নেহাকুল স্নেহপূর্ণ দায়িত্বে। সেইদিন থেকেই তাকে ব'লব মনে ক'রছি কিন্তু মনের দুর্বল দিকটার অশেষ প্রয়োচনায় বলাটা অ-বলায় থেকে যাচ্ছিল। কিন্তু যতই যেন ঠেকছিল বিবেক ব্যক্তিটা ততই অধৈর্য্য হ'য়ে আমায় দিনরাত ঠেলাঠেলি আরম্ভ ক'রলে! যে কাজটা তাদের দিক্ থেকে দেখতে গেলে একান্তই করণীয় হ'য়ে পড়ে অথচ সে কাজ যখন স্বার্থের দিক্ দিয়ে নিতান্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য হ'য়ে তার নিদারুণ নৈরাশ্যময় বেদনাপূর্ণ প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে খুলে ধরে তখন সেটা করণীয় কর্ত্তব্য হ'লেও তাকে থামিয়ে রাখার জন্যে ছেলে ভোলানর মতন নিজেকেই নিজে মিথ্যার প্রবোধ দিয়ে ঠকিয়ে রাখা ভিন্ন উপায় কি?—কিন্তু তাও বেশীদিন চলে না—বিশ্বস্রষ্টার নিয়তির নেমিচক্রে এমন একদিন আসেই যেদিন মৃত্যুর মত ভয়ের হ'লেও সত্যকে আলিঙ্গন ক'রতেই হয়! খবর এলো মেদিনী-পুরে বন্যা, তমলুক্ ভেসে যাচ্ছে, ঝড়ে ও প্লাবনে দীন দুঃখীর সর্ব্বস্ব গেছে হ'য়েছে! প্রাণ কেঁদে উঠলো এই তুচ্ছ জীবন কাজে লাগাবার অবসর এইবার পাওয়া গেছে ব'লেই মনে হ'ল! আর নয়—আর নয়—এবার আমার ডাক্ এসেছে প্রলয় ঝড়ের হুহুঙ্কারে, প্লাবনের সর্জ্জনেনে হাহাকারে, দুর্ভিক্ষপ্রস্তের মৃত্যুক্লিষ্ট মুখে! তাকে গিয়ে ব'লুম "দেখো আমার ডাক্ এসেছে আমায় এবার যেতে হবে আর তো নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকলে চ'লবে না। কিন্তু তোমায় যে এখনো বাড়ী পৌঁছে দিতে পারলুম না, তাই মনের উদ্বেগ আর যাচ্ছে না।" সুন্দর মুখখানি অভিমানে ফুলিয়ে রাণী ব'লে—"কেন আমার বাড়ীর কি দরকার, আমি তো আর কিছুই চাই না।" তার সুন্দর মুখের উপর একরাশ ছোট ছোট চুল পদ্মের উপর ভ্রমরের মত উড়ে বেড়াচ্ছিল সেগুলি সরিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে ব'লুম "তা কি হয়! কতদিন আর পথে পথে ঘোরা যাবে! বাড়ী না পৌঁছিলে যে শান্তি নেই! তার উপর তোমার ভার নিয়েছি একি কম দায়িত্ব! সে তখন রুদ্ধ অভিমানের তপ্ত আবেগে আমার কাছ থেকে খানেকটা দূরে গিয়ে মাটীতেই ব'সে প'ড়ল। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর শিশির ভেজা ফুলের মতন কান্না ভরা মুখখানি তুলে সে ব'লে "আমি যদি তোমার জীবনের বোঝা হ'য়ে বিষম অভিশাপের মতই এসে থাকি তবে যাও আমাকে দূর ক'রে যেখান থেকে, এনেছিলে, সেইখানে।" তার বিলাপ গান আগুন হ'য়ে আমার বুকের মধ্যে দহন ক'রছিল। মন ব'লে সত্যিই তো নিষ্ঠুরতা হ'চ্ছে, বিবেক তাড়াতাড়ি সোজা হ'য়ে ব'সে, তা হবে না তোমাকে দয়া ক'রতেই হবে তা না পারলেই তো যথার্থ নিষ্ঠুরতা, মন যা ব'লছে সেটা মায়া-দয়া নয়! এই দুইদিনে রাণীর পরিচয় যেটুকু পেয়েছি তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, বেশী বিনয়ে আর তাকে তার অধিকৃত সিংহাসনে ব'সতে যেবার অধিকার তারা দেবে না যাদের দুঃখের রাণী সে! সেটা আমার পক্ষে অসহ্য, অসহ্য! যেমন ক'রেই হ'ক ওকে ওর নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে তবে আর কাজ! পরভরা সুন্দর ফুলটীকে অনর্থক দুঃখাহত ক'রে লাভ কি? চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্লুম—"রাণী, তুমি বুঝছ না, যখন তোমার বাড়ীতে একবার পৌঁছে দিতে পারবো তখন বুঝবে তোমায় কত ভালবাসি তার আগে নয়। ঐ দেখো তোমার সামনে কুলুকুলু বাহিনী পতিত পাবনী, মাথার উপর অনন্ত তারার মালা, পায়ের নীচে চোখ জোড়ান নরম পৃথিবী—এত সৌন্দর্য্য এত মায়ার সবই যে তার কাছে বৃথা যে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গৃহ হারা! তার চেয়ে দুঃখ আর কার আছে?" সে ব'লে "কেন, আমরা গৃহহারা কিসে হ'লুম? এটা কি আমাদের বাড়ী নয়?" বল্লুম —"এ বাড়ী যে ক্ষণভঙ্গুর, এমন বাড়ী চাই আমাদের যে বাড়ী ভাঙবে না, পড়বে না, নড়বে না, অক্ষয় হ'য়ে কল্প কল্পান্তর ধরেই অচল থাকবে! সেই গৃহের উদ্দেশে ছুটে যাও সেখানে পরম আনন্দ চরম শান্তি! আমাকে পেয়ে তোমার যত আনন্দ তার এক ক্রণাও এ নয়!

আনন্দ সেখানে জমাট পরিপূর্ণ আছে—সে আনন্দের মধ্যে আমাকেও নতুন ক'রে পাবে।" রাণী এবার সুবোধ শিশুর মত আমাকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে ব'লে "কোন পথে যেতে হবে দেখিয়ে দাও, তোমার কথা তো আমি অমান্য ক'রতে পারিনে।" আমার চিরশুষ্ক মরুর মত চোখ দিয়ে তখন উৎস ধারা নেমে এলো!

যাবার সময় তার সঙ্গে আর দেখা করিনি। মনটা তখন এক অদ্ভুত বীরত্বের লৌহ কঠিন নির্ম্মমতা বর্ম্ম প'রে অক্ষুণ্ণ অম্লান চিত্তে সমস্ত দুর্ব্বলতাকে জয় ক'রে ফেলেছে! তার কাছে মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি আতঙ্কে পাণ্ডু ম্লান হ'য়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেলো আর নজর হ'ল না!

## রাণীর কথা

ভোরের আলো সেই সবে ফুটছে—শুকতারা তখনও জেগে—পুকুরে পানা মোড়া জলের উপর চুণির মত লাল-পদ্মের পাঁপড়ি গুলি দল মেলে তখনও চাইতে পারছে না—নববধূর মত ঘোমটা খুলে চাইতে তাদের আরক্ত লাজ-রক্তিম হয়ে উঠছিল। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—মনে হ'ল তাইতো—এটা যে বাড়ী—বাড়ী এসেছি। কলকাতার সেই ছোট্ট আবর্জ্জনা ভরা মেসের ঘরের দু'টো রাতের স্মৃতি আজকের কাশ-ফুলের দুধ সাগরের ঢেউ তোলা, মাঠে মাঠে ধানের শীষের সোণার মুকুট পরা ক্ষেতে ক্ষেতে, আর এই শিউলি ছাওয়া শান্তিভরা গ্রামের পথের স্নেহসুন্দর কোলটুকুকেও ভুলিয়ে দিতে পারছিল না। দু'টী দিনের মধ্যে এমন একটা নিশ্চিন্ত নিশ্চয়তা তাঁর উপর এসেছিল যে তিনি যে হঠাৎ দেখা দেওয়ার মত হঠাৎ অদেখা হ'য়ে যাবেন তা একবারও ভাবিনি।

তিনি আমার জন্যে যা ক'রেছেন তার তুলনা নাই কিন্তু তাঁর এই আন্তরিক সহৃদয়তা পূর্ণ মঙ্গল কামনা টুকু আজ আমায় স্নিগ্ধ শীতলতায় জুড়িয়ে না দিয়ে আগুনের মতই পুড়িয়ে দিচ্ছে। একটী শুভ ইচ্ছায় প্রণোদিত হ'য়ে মানুষ কেমন করে সমগ্র জীবনটাকে বলবতী ক'রে তুলতে পারে তা তিনি এই দু'দিনে অনেক রকমে বলতেন। আমাকেই সেই শুভ ইচ্ছার কেন্দ্র স্বরূপ ক'রে নিজের সমস্ত হিতানুষ্ঠানের উপর্য্যুপরি খ্যাতি ও যশের মনিময় মুকুটটা আমারই মাথায় পরিয়ে দিয়ে যেন নিষ্কৃতি পেতেন। বাস্তবিকতা যেখানে বাধ প'ড়ে গিয়েছে মহত্বের মহত্বটুকু যে সেইখানেই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে—মেঘ বিনির্ম্মুক্ত স্বচ্ছ আকাশে আত্ম গরিমা থেকে নির্লিপ্ত হ'য়ে ভালবাসা একের প্রতি তখনই সার্থক যখন তা বিশ্বের প্রতি উদ্ভাবিত হ'য়ে শুধু একের জন্য নয় বহুর জন্য পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে রেখেছে—তখনই আকাঙ্খিতের প্রতি দ্বন্দ্বহীন চেয়ে চোখ তুলে সে ব'লতে পারে—এই দেখো আজ তোমার প্রতি আমার এই প্রেমের উৎস ধারা অসীম সমুদ্রে এসে মিশে গেছে—অসী-মের ও সীমার তুমা ও ক্ষুদ্রের ভেদবিরোধ এখানে এবার একাকারে একীভূত। তিনিই যে এই সব কথা কত ভেবে কতবার আমায় বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। সেই কোন যুগ আগে সকাল হ'য়েছে কিন্তু সেই থেকে এই অবধি আমি আর কিছুই করতে পারিনি—শুধু তাঁরই কথা ভাবছিলুম। ঐ আবার চাঁদ উঠলো—সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্ত গেছেন। এখনও তাঁর লাল রঙের ছোপটুকু পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে। এক দিন এমনি সন্ধ্যায় তিনি বলেছিলেন এই যে চাঁদের আলোয় গানের মূর্চ্ছনা বেজে উঠে, ফুলের গন্ধে প্রাণের মধ্যে আবেশ আনে, এ শুধু স্মৃতি, ভালবাসার হোমকুণ্ডে বিগুণ আগুন জ্বালাবার জন্যেই কিন্তু সে আগুন শুধু একের গৃহের প্রয়োজনেই জ্বলবে না তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে পৃথিবীর সমগ্র গৃহে, সমগ্র সংসারে—তবে তো আরো মধুর আবেশ ফুলের সৌরভে বয়ে আনবে, আরো মধুর বেশ ললিত রাগিণীতে বেজে উঠবে চাঁদের আলোয়! কি আশ্চর্য্য! একদিন যারা সুখের সহায়তা করেছিল আজ তারাই দুঃখেতে বাধা হ'য়ে আমায় বরণ ক'রছে! কিনিস একই পার্থক্য শুধু মনে! বুকের ভিতর যেন চিতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে—যে এ আগুন জ্বেলেছে সেই কি ইহাকে নেভাবে না? যে পথে তিনি গেছেন সেই পথেই তো যেতে হবে—তিনি তো পথ দেখিয়েই চলেছেন এখন অনুসরণ করা! ঐ যে শোনা যায় ক্ষুধিত তৃষিত আর্ত্তের হাহাকার! দুর্ভিক্ষ পীড়িত নর নারীর কান্নার রোল! মা হারা ছেলের রোষ জীর্ণ কণ্ঠের মা মা ডাক! এই যে তাঁর জন্মের স্থান দেখা যাচ্ছে কেমন মাটিতে কেমন সুন্দর পরিষ্কার চাল পড়েছে! যদিও তিনি দূরে দূরে—সুদূরে—তবুও তাঁর কালো চোখের তারা দুটী ঠিক ঐ—সন্ধ্যা তারারই মত উজ্জ্বল ও স্থির হ'য়ে এখনো

যে আমারই দিকে চেয়ে আছে, ব'লছে "এসো, এসো, দেরি না—আর বড় ঘরের ভরসায়" অন্তরে তাঁর আহ্বান যথার্থই অনুভব ক'রছি তিনি যেন ব'লছেন—"এসো, এসো, এই যে পথ প্রশস্ত সুন্দর সুন্দর! এসো এ পথে আমি সারথী তখন আর ভয় কি।" সুখের সন্ধানে ঐ পথেই যেতে হবে বই কি! ঠিকানা মিলবে তখন যে আমার তাঁকে নতুন ক'রে পাবো—তিনি যে আমায় ব'লেছেন—এই আশ্বাসেই বুক বেঁধে তবে যে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি!

### আমার কথা

রাণীকে তার ভায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে একটা নিশ্চিন্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলুম। এখন বোধ হ'চ্ছে ভালো লাগারও একটা সীমা আছে। আমার আর কিছুই ভালো লাগে না। কিছুতেই আর প্রাণের সাড়া মেলে না—অসাড় নিষ্পন্দ হ'য়ে অন্ধকারে মরচে পড়া কলকব্জার মত তারা একেবারে নিরুপায় বলে ভিতে তাকে হারিয়ে ব'সে আছে। ছড়ান মন যেমন গুটোন যায় না তেমনি গুটোনও মনও ছড়ান যায়! প্রেম এমনি জমাট বেঁধে অন্তরাত্মার সঙ্গে লৌহার্দ্র স্থাপন করতে যায় যে তাকে তরল ক'রে ইন্দ্রিয় সংকীর্ণ রসাস্বাদনে প্রলোভিত করা দুরূহই বটে। কেউ হয়তো বিশ্বাস ক'রতেও না পারেন, কিন্তু এটা প্রত্যক্ষ সত্য যে পঞ্চভূতের সীমার মধ্যে অনন্ত লালসার বশে লালায়িত হ'য়ে ঘুরে বেড়ান যেমন মানুষের একটা চিরন্তন নেশা তেমনি মানুষের আর একটা ঠিক্ উল্টো দিক আছে যেখানে আকাশ বাতাস আগুন জল ও মাটির সংস্পর্শকে বাদ দিয়ে একেবারে নিষ্পৃহ নীরবতার মধ্যে মগ্ন হওয়ার যে নেশা সেও একটা বড় কম উন্মত্ততা নয়—আমাকে যেন সেই নেশাতেই পেয়ে ব'সেছে! চোখের সাম্নে শত শত রোগীর মৃত্যু যন্ত্রণা, পতিপুত্র শোকাতুরা অভাগিনীর আর্ত্তনাদ কিছুই আর এ বিভ্রান্ত চক্ষুকে সলিল স্নাত করাতে পারেনি! শ্মশানের পবিত্র চিতাধূমের ঊর্দ্ধগামী প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা যখন সেবা মণ্ডলীর সদস্যগণের হৃদয়কে দুঃখে মুহ্যমান ক'রে তুলতো আমি তখন স্থিরমুখে জীবনের অনিত্যতা ও সংসারের অচিরস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধির উপায় অনুষ্ঠানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতুম। সেবাশ্রমের পরহিতৈষী উদারচেতা যুবকদের অনেকেই আমার পাষাণ কঠিন হৃদয়কে—অনুপমের সৌরভে বিকশিত ক'রে তাহারা দিতেও পরাঙ্মুখ হ'ত না। আমি তাদেরই বুঝি জিতেন্দ্রিয় বিজিত রিপু আত্মার যথার্থ উপাধি! কিন্তু নিজের প্রতি এতটা নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, প্রকৃতির বিরুদ্ধে এতখানি অন্ধ অভিযোগ অমনি অমনি মেলো না—একদিন পরীক্ষার অগ্নিমুখে তার বিচার হ'য়ে গেলো!

* * * * *

তখনও অর্দ্ধেক তখন জলে ডুব্ ডুব্—ট্রেণের লাইন পর্য্যন্ত কাল রাত্রে ভেঙ্গে ছারখার হ'য়েছে। উন্মাদ নদীর সেই সর্ব্বাঙ্গে উদ্ভাল তাণ্ডব রূপ প্রতি-নিঃশ্বাসে ঘর দ্বারমানুষ গরু সব ভেসে চ'লেছে। আমরা যতদূর সাধ্য লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে-নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে অসহায় অনাথদের সেবাশ্রমের দ্বারে পৌঁছে দিতে চেষ্টা ক'রছিলুম কিন্তু সেই সর্ব্ব সিদ্ধিদার নিয়তির হাত থেকে কারও যে নিস্তার নেই! অনেক সময় বিনা আয়াসেই কত লোককে বাঁচিয়ে তুলেছি আবার অনেক সময় অনেক চেষ্টা ক'রেও হয়তো ক্ষুদ্র একটী প্রাণও বাঁচাতে পারিনি! আমাদের দেশ—যে দেশ মহা-শক্তিরূপিনীর প্রতিমূর্ত্তি সেই দেশেই কিনা এহেন শক্তির অভাব। মনে হ'লে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতে হয় যে এ দেশের—কিম্ ভবিষ্যন্তি! নইলে এই যে এতবড় একটা বিপদ হু হু শব্দে দেশের বুকের উপর দিয়ে ব'য়ে চ'লেছে এতে কারও তো বিশেষ হুঁস্ নেই! পায়ের উপর পা দিয়ে যারা ব'সে থাকেন—সেই রকম স্ত্রী পুরুষদের কই টনক্ নড়ল না তো? এ যদি আজ পাশ্চাত্য দেশ হ'তো তাহলে স্বামী স্ত্রী ভ্রাতা ভগিনী, পিতা কন্যা, কেউই এই বিপদ যজ্ঞে নিজেদের স্বার্থ আহুতি দিতে পিছিয়ে যেত না। সবাই প্রাণপণে হু হু শব্দে ছুটে আসতো ঠিক্ ঐ উন্মাদ বীচীবিক্ষোভের মতই! একটা বিরাট শক্তির আঘাত আর একটা বিরাট শক্তির প্রতিঘাতে তখনি যে নিস্তেজ হ'য়ে পিছিয়ে যেতো! মুষ্টিমেয় স্বেচ্ছাসেবক আর কি ক'রতে পারে? একটা বিপদের তোপা চাষায় কতটুকু শক্তি আছে? দেশের সমবেত শক্তির দরকার যেখানে—দেশের সমস্ত প্রাণের সাড়া মৃত্যুকে বাঁধাতে দরকার যেখানে—সেখানে এই দু'দশজনের লক্ষে ঝক্ষে কি হবে? আমরা তাবে তো নদীর তীরদেশের দিকে

চ'লেছি—দেখি—একটা কি পড়ে রয়েছে! প্রথমে মনে হ'ল যেন একরাশ শাদা ফুল কে স্তূপীকৃত ক'রে রেখে গেছে—তারপরে মনে হ'ল যেন একটী মস্ত শঙ্খ হবেতো নদীর ভিতর থেকে জলের তোড়ে ভেসে এসেছে! আরো কাছে গিয়ে দেখি————উঃ! এই দেখতে কি বেঁচে ছিলুম! রাত্রির মৃতদেহটা আঁকড়ে ধ'রে আমি অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলুম। যখন জ্ঞান হ'ল দেখলুম ক'লুন স্বেচ্ছাসেবক আমার মূর্চ্ছা ভাঙাতে চেষ্টা ক'রছে! আমি উঠে দাঁড়িয়ে ব'লুম—"এর সদ্গতির ব্যবস্থা ক'রতে হবে যে!" ছেলেরা ব'লে—"কাল রাত্তিরেই ইনি ট্রেণের লাইন যেখান থেকে ভেঙে গিয়েছে সেইখান থেকে হেঁটে হেঁটে এসে পৌছান্ আমাদের রামসিং ব'লছে ও দেখেছে!" আর সাম্লাতে না পেরে শিশুর মত কেঁদে উঠে ব'লুম—"আমায়—আনালে না কেন ভাই? তাহলে যে এ অমূল্য প্রাণ নষ্ট হ'ত না।" তারা সবাই অবাক্ হ'য়ে আমার দুঃখ বিচলিত অবস্থা দেখছিল—কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল আমি শোক দুঃখের বাইরে গিয়ে প'ড়েছি। সরকারী রিপোর্টার জিজ্ঞেস্ ক'রলেন "ইনি আপনার কে?" দু'চারবার ইতস্ততঃ ক'রে স্পষ্ট ব'লুম—"আমার স্ত্রী। আমি যে পথে এসেছি সেই পথে আমার সাহায্য করবার জন্যেই এসেছিলেন। আমাকে জানালে পাছে আমি বারণ করি তাই না জানিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে এমন স্ত্রীকে হারাতে হ'ল!"

আছে—আছে—এখনও মহাশক্তির অংশ এ বেশ থেকে লুপ্ত হয় নি—তার শিকড় বহুদূর অবধি রেয়েছে যে! এত পাপেও উপড়ে ফেলতে পারে নি—তাকে!

---

# পরিণয়

[ শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ]

বহুবার চিত্তখানি উজ্জ্বল করিয়া
জ্বলিতেছে নিশিদিন স্নেহের বর্ত্তিকা;
চকোরী ঘুরিছে তাই চন্দ্রের লাগিয়া,
তরুরে জড়ায়ে রহে লুব্ধ লতিকা।
মালতী মল্লিকা বেলী চারু ফুলহারে
বরিতে যুথিকা-কুঞ্জে আকুল—উল্লাসে,
তটিনী হিল্লোল তুলি অনুরাগ-ভারে
মিলিতে বাধিতে ছুটে পরম উল্লাসে।
তেমনি মানব-হৃদি শান্তির লাগিয়া
লভিতে মিলন-বঁধু—অবহার ভালি,
প্রেম-যজ্ঞ-পূত-যজ্ঞে অন্তর শোধিয়া
সে মহাযজ্ঞের যাজে দেয় প্রাণ ঢালি।
জীবনে বসন্ত-যোগ শুভ-পরিণয়,
পাণি দান ছলে যাহে প্রাণ-বিনিময়।

---


নব বসন্তে

প্রিয়জনকে উপহার দিতে; শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের ভ্যাইভিক্যাল ষ্টীমেরিফ্রিক্স এবং মেসিন প্রস্তুত—চন্দন, বকুল, মাস্ক ও ভায়োলেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী

৩৯।১এ বেন্টিঙ্ক বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।　　টেলিফোন ২৪২৬

# বিদেশের স্মৃতি

[ শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল ]

দুইটী ভদ্র কাপড় চোপড় পরা ভদ্রলোক আসিয়া উঠিলেন এবং পরের ষ্টেশনে নামিয়া যাইবেন বলিলেন। কি জাতি বুঝা গেল না, মনও স্থীর হইই খারাপ ছিল, জিজ্ঞাসাও করিলাম না।

চুপ করিয়া থাকিতে কষ্ট হইতে লাগিল, তখন তাঁহাদেরসহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিলাম। একটী উকীল আর একটি পুলিশ সব ইনেস্পেক্টর উভয়েই উড়িয়া। গঞ্জাম জেলায় প্রায় বার আনা লোক উড়িয়া অথচ মাদ্রাজীরা প্রায় সমস্ত ভাল ভাল চাকরী গুলিই গ্রাস করিয়া বসিয়াছে বলিয়া তাঁহারা দুঃখ করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য ইত্যাদি অনেক বিষয় আলাপ করিয়া আমাকে তাঁহাদের ঠিকানা ও নাম দিয়া তাঁহারা উভয়েই Berhampur এ নামিয়া গেলেন। Berhampur একটি বড় সহর। আমার আসি একেশ্বর। জলযোগ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রে আর কোন উৎপাত হয় নাই। ভোরে Vizanagram ষ্টেশনে আমার একেশ্বরত্ব ঘুচিয়া গেল। প্রথমেই মোট আসিতে আরম্ভ করিল। ট্রাঙ্ক, বোচ্‌কা প্রভৃতি হতে কামরা বোঝাই হইয়া উঠিল। অবশেষে মহুরের সমাপরেৎ ২টী বিরাট বক্তা আসিয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটী অযোধ্যা তাবার কথা বলিতে বলিতে ২টী ভদ্রলোক আসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে আরও ৪।৫টী লোক। আমি কেয়ার করিলাম না—চোখ পোরা হইয়া পড়িয়া রহিলাম। দুইটী কুলি মাল পত্র উঠাইয়াছিল, আমাদের হিসাব তাহাদিগকে অন্ততঃ ।৹ দেওয়া উচিত, কিন্তু ভদ্রলোকটী মাত্র /৹ দিলেন। ফলে সম্ভবতঃ হিন্দি ভাষায় একটী dialogue হইয়া গেল। কে হারিল, কে জিতিল বুঝিতে না পারিলেও এই বচসায় বেশ পরিশ্রম হইলাম। আর শুইয়া থাকা যায় না, উঠিয়া বিছানা বাঁধিতে বেশ একটু ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে হইল কারণ স্থানাভাব। জানালায় বসিলাম। এই সুন্দর 'তাল তমাল বনরাজী নীলা' বেশ ও ছোট বড় পাহাড়ের কোলে শ্যামল শস্য ক্ষেত্র এবং তদোপরি শ্যামল অধিবাসীদের উপর প্রভাত সূর্য্যের কিরণ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঘুচিয়। ঠিক আমাদের দেশের ধানের মরাইএর মত কিন্তু পাতা দিয়া ছাওয়া। চাল প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়াছে। প্রবেশ লাভের পথ কোথায় তাহা বুঝা যায় না। তার দিকে সুন্দর ছবির মত একটী খিল। অসংখ্য হাঁস তাসিয়া বেড়াইতেছে আর চারিদিকে লক্ষ লক্ষ তাল গাছের সারি। বাঁদিকে ষ্টেশনে লেখা রহিয়াছে সীমাচলম্ Shimachalam কি শান্তিপূর্ণ কি সুন্দর স্থান। মন পরিষ্কার হইয়া গেল। এইবার আগন্তুকদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলাম—অবশ্য ইংরাজীতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বন্ধুত্ব হইয়া উঠিল। তখন ট্রেণ ওয়াল্টেয়ার এ আসিয়াছে। কয়েকটী তীব্রাকৃতি কুলী নির্ব্বিবাদে জিনিষপত্র নামাইয়া ফেলিল। ষ্টেশনের বাহিরে আসিতেই কয়েকটী গাড়োয়ান টানা টানি করিয়া মালপত্র লইয়া গেল। আমি বাধা দিলাম না—যে সব চাইতে বলিষ্ঠ তাহার গাড়ীই ভাড়া করিতে হইল। ইতিমধ্যে 'জি' বাবু আসিয়া উপস্থিত! এগাড়ীর নাম "বাণ্ডী"। একটী করিয়া বলদে এই যান বহন করে। বেশ চতুর্দ্দোলার মত করিয়া পশ্চিমের টাঙ্গার মত আসন করা। তাহারই দুইখানায় আমরা উঠিলাম, আর এক খানা সাধারণ বাঙ্গালা দেশের মত গাড়ীতে মাল বোঝাই করিয়া রওনা হইলাম।

'ওয়ালটেয়ার' শুধু ষ্টেশনটীর নাম। সহর তাহাতাগা, পত্তনম্ এখান হইতে তিনটল দূরে। একখানি ট্রেণ আছে কিন্তু তাহারও অনেক বিলম্ব সুতরাং এই অভিনব রথেই চলিতে হইল। পূর্ব্বের বন্ধুগণ বলিয়া দিয়াছিলেন যে টার্নার হুজুর্" নামক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাইব সুতরাং সেই দিকেই রওনা হইলাম। আমাদের ২খানি ঘরের দরকার কিন্তু ধর্ম্মশালায় মাত্র একখানি পাওয়া যায়। ধর্ম্মশালার প্রাঙ্গণেই Rest house তনিলাম' যে সৈনিক। ভাড়া দিলে সেখানে ঘর পাওয়া যায়। অমনি হুকুম দিয়া দুইখানি ঘর স্থির করিলাম। বোধ হয় Rest house এ যাত্রী একটা বড়লোকের লক্ষণ। কয়েক পর মুহূর্ত্তেই দুধওয়ালী, দইওয়ালী, নাপিত, গাড়োয়ান, চাকর ভিখারী প্রভৃতি ছাইয়া ফেলিল। একদিন মাত্র

থাকিব কাজেই।০ আনার চাকর ঠিক করিলাম, দুধ দইও কিনিলাম এবং কৌর হইয়া গাড়োয়ানকে ১১টার সময় আসিবার জন্য বলিয়া দিলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া চা-পান শেষ করিলাম—এখন নিজে রান্না করিতে হইবে। "মি" বাবু কায়স্থ সঙ্গে পরিবার আছেন তাঁহারা পাক করিতে আসিয়াছেন, কাজেই প্রাণ গেলেও একজন সম্ভ্রান্তদের জাতি মারিতে পারিবেন না। নিজে ব্রাহ্মণ এ কথা প্রকাশ করিয়া কি অন্যায়ই না করিয়াছি। পৈতাতে তত ছিল না আজকাল কায়স্থেরা ও পৈতা ধরিয়াছেন আবার নমঃশূদ্রেরাও নাকি আরম্ভ করিয়াছেন। আর উপায় কি? শুধু ভাতই রাঁধিয়া লইব মনে করিলাম। দুধ, দই, ঘি আছে—যথেষ্ট! ভাবিতেছি এমন সময় হঠাৎ এক কর্ত্তী মাথায় জুটিল। অমনি "মি" বাবুকে ডাকিয়া বলিলাম—"আমি আপনাদের সঙ্গেই খাব" তিনি বলিলেন "সে কি, মেয়েরা যে রাজী নয়" আমি বলিলাম "বাঃ জগন্নাথে যে জাতি ভেদ নাই। 'পুরী' ওয়ালটেয়ার মদ্রাজ, ব্রাহ্মণ, এবে সবই এক," মেয়েদের তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া হইল। বাবু বাঁচা গেল।

---

## বিনিময়

[ শ্রীপ্রভাবতী দেবী ]

জীবন হোতো কত সুখের খেলা এ
দিতে যদি আঁখি আমার মেলারে;
না ছুটে আর আঁধার পাছে,
আলোর মাঝে—তোমার কাছে,
যেতাম ছুটে সকল কলম ফেলারে।

যদি কভু যেতে পারি প্রিয় গো,
আদর ক'রে কোলে তোমার নিও গো;
জ্ঞান, সম্মান, ধন—মধু,
চাইনা কিছু, আমার শুধু—
পরাণ ভরা ভালবাসা দিও গো!
কত সুখের! কত সুখের হবারব!
তোমার প্রেমে আমার প্রেমে বিনিময়!

---

বল দেখি কি তাড়িয়ে নিয়ে চলেছ? ভেড়া? না! অন্য কিছু!

Kerby in to N. Y. World.

৪৷৷ বিনামূল্যে ব্লকেটসহিত ফটো
ফটো এনলার্জ ইনিসসহ ১২×১০
ফটো সহ তদ্রূপ সিকি মূল্য পাঠান
কপি-টাইও, পেটিরও রবারষ্ট্যাম্প মেকার
৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

কথা ছিল, বেলা এগারটার সময় ডঃ লাহিড়ী আসিয়া মেয়েদের লইয়া যাইবেন সেখানে আমোদ-

চৌধুরীর অমায়ুষিক ওপাবলীর ব্যাখ্যা করিতে মন সংযোগ করিলেন। ডঃ লাহিড়ী অবশ্য ভাবল

প্রমোদের প্রচুর বন্দোবস্ত আছে, মিঃ লাহিড়ীর এক নিকট সম্পর্কীয় ভাই সম্প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন, মিমিক্রিতে তাঁহার তুল্য দক্ষ না-কি এদেশে নাই, তিনি ইঁহাদের সম্মুখে ক্রীড়াকৌতুক দেখাইতে পারিলে আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিবেন। বলা বাহুল্য মলয় সহজেই সম্মত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কামনা এই নিমন্ত্রণরক্ষা কাটাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহার মাতুলানী কিছুতেই ছাড়েন নাই। মাতুলানীর আদেশ পালন করিতে সে যখন লাহিড়ী-ভবনে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল, তখনও সে জানিত না যে এমন দুর্ভাগ্য ও তাহার জন্য এখানে অপেক্ষা করিয়া আছে! ডঃ লাহিড়ীর সম্পর্কীয় ভ্রাতা মিঃ জোসেফ চৌধুরী অতি শীঘ্রই এতটা আত্মীয়তা দেখাইয়া, ইহাদের আপনার করিয়া লইতে চাহিলেন যে মলয়ের মা কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই অ-দুষ্ট পূর্ব যুবকটির সারল্যে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া কামনা ও মলয়কে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—এমন ছেলে আমাদের সমাজেও খুব বেশী নেই। না কে? মলয় জোসেফ চৌধুরীকে লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই। কামনা পাইয়াছিল, পাইয়াছিল কেন, একটু বেশী করিয়াই পাইতে হইয়াছিল। আর সে পাওয়াটা এতই ঘন-ঘন ও তীব্রভাবে তাহার নিকট আসিয়া পৌঁছিতেছিল যে কামনা প্রতিমুহূর্তেই এই বাড়ীটা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেছিল। মাতুলানীর আর একটি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি প্রশ্ন করিয়া, উত্তরের বাকীটা প্রায়ই ভুলিয়া যাইতেন এবং আপনার মনেই প্রশ্নের সূত্র ধরিয়া অনেক দূর চলিয়া যাইতেন। তিনি যখন দেখিলেন, দুইটি অতিথি মেয়েই তাঁহার কথা সমর্থন করিল না, তখন তিনি একদিকে যেমন ইহাদের প্রতি কষ্ট হইলেন, অন্যদিকে তেমনি আপন-অন্তরের গুপ্তাহিতায় নিজেই লজ্জা হইয়া জোসেফ

দূর্বাচ্ছাদিত উদ্যানটিতে চেয়ার টেবিল সাজাইতেছিলেন, মলয় সেই দিকে মন দিয়াই মাতার কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিল, মা যখন বলিতেছিলেন—আমাদের ছেলেদের বিলেত না গিয়েই যে-রকম চাল দেখতে পাওয়া যায়...মলয় তখন হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—খুব ভাল মা! জননী গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন—কি ভাল, মলয়?—মলয় কামনার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল, সে-যে কিছুই শুনে নাই, কি বলিবে? কেবলই তার কামনার উপর রাগ হইতেছিল, কামনা ত এখনও তাহাকে বিপন্মুক্ত করিতে পারে সে যেন···কামনার মনের অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সে ভাবিতেছিল, ইহার চেয়ে অবাধা হইয়া সেদিন ঘরেও থাকিতে পারিত!···বিপদ কাটিয়া গেল, মিঃ চৌধুরীর আগমনে!

মিঃ চৌধুরী কামনার পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া, কহিলেন—একবার ওপরে চলুন! নূতন ধরণের একটা ফোটোগ্রাফী দেখাব!

মিসেস্ রায় সাগ্রহে উঠিয়া কহিলেন—আপনারই আবিষ্কার বোধহয় মিঃ চৌধুরী!

জোসেফ চৌধুরী সবিনয়ে কহিলেন—আজ্ঞে হাঁ, আমারই!—বলিয়া তিনি কামনার প্রতিই দৃষ্টি রক্ষা করিলেন। মিসেস্ রায় কামনাকে তখনও আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সুস্বরে কহিলেন—চল না কামনা!

কামনা নতমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—চলুন না আপনারা!

মিসেস্ রায়ের মনের ভাব বলা যায়, তিনি মলয়ের সহিত মৃদুকণ্ঠে কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইলেন—কামনা পিছনে পড়িয়াছিল, মিঃ চৌধুরী অতঃপর তাহার সঙ্গ গ্রহণ করিলেন।

জোসেফ চৌধুরী সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন,

সুন্দরী-শিরোমণি লেডী হ্যামিল্টন্।
[ হ্যাদম ব্রাশ অঙ্কিত চিত্রের এনাথেল প্রতিকৃতি হইতে ]

আপনাকে যে সন্তুষ্ট করতে পারব, সে আশা আমি রাখিনে, মিস্ মিত্র, তবু আমার মনে হয় যদি এতটুকু সন্তোষও আপনাকে দিতে পারি...

আরক্ত-নতমুখে কামনা এতখানি শুনিয়াছিল, ইহার পরে আর একটা শব্দ শুনিতেও তার প্রবৃত্তি হইল না, হয়ালভরে নম্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—আমি ও-সবের কিছু বুঝিনে মিঃ চৌধুরী, মনস্ব অনেক পড়েছে, অনেক জিনিষ নাড়ে চাড়েও, সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।—বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া একধারে চুপটি করিয়া বসিয়া পড়িল।

মিঃ চৌধুরী একটা বাক্স খুলিয়া কত কি বকিয়া যাইতেছিলেন, কত ইংরেজী টীকা টিপ্পনীসহ তাঁহার নবাবিষ্কৃত যন্ত্রটির গুণ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোত্রীবর্গের—বিশেষ করিয়া কামনার মনযোগ আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে-যে সেই একধারে বসিয়া সামনের খোলা দ্বার দিয়া কোন্ সুদূরের পানে তাহার মন ও দৃষ্টি দুইই পাঠাইয়া দিয়াছিল, চৌধুরী তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। দু'তিনবার সানুযোগ দৃষ্টির পরেও কামনার মন যখন ফিরিল না, তখন চৌধুরী হঠাৎ বক্তৃতার ব্যবধানে থামিয়া একমুহূর্ত্ত যন্ত্রটির পানে চাহিয়া বলিলেন—এই বার অন্ধকারেও কিরূপ ফোটো তোলা যায়; তাই আপনাদের দেখাই :—তিনি সন্তর্পণে সেই দ্বারটিই বন্ধ করিয়া দিলেন, যে পথে কামনা তাহার দৃষ্টি চালিত করিয়া তাঁহার এতখানি শ্রমও পণ্ড করিয়া দিয়াছিল!...কিন্তু এবারও বক্তৃতা শেষে যখন কামনার দিকে চাহিলেন, তখনও তাহাকে নিবিষ্ট চিত্তে অন্য এক দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া চৌধুরীর ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটিয়া গেল। তিনি অকস্মাৎ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, কামনার পার্শ্বে আসিয়া ডাকিলেন—মিস্ মিস্ মিত্র, আপনার একটি ছবি নিতে বোধ করি কোন আপত্তি নাই!

কামনা চমকিত হইয়া বলিল—আমার ছবি!

হোয়াই নট মিস্ মিত্র!

তাহার স্বামীও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন-কি হয়েছে কামনা! একটা নতুন রকমের...

না স্বামী, নতুনত্বে আমার কাজ নেই!—এই কথা কয়টিই কামনার গলার মধ্য দিয়া এমন এক তীব্র তীক্ষ্ণ-স্বরে বাহির হইয়া আসিল যে সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। মিঃ চৌধুরীই কেবল হাসিমুখে—ক্ষমা করবেন মিস্ মিত্র, আমি ভেবেছিলুম, আপনার আপত্তি নাই!—এই কথায় মিসেস্ রায় মিঃ চৌধুরীর প্রতি যে পরিমাণ সন্তুষ্ট হইলেন, কামনার অভদ্র রূঢ় আচরণ স্মরণ করিয়া তেতোধিক রুষ্ট হইয়া পড়িলেন। বোধকরি তৎসম্বন্ধেই কোন কথা বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কামনা দাঁড়াইয়া উঠিয়া অধীরকণ্ঠে কহিল—আমি বাইরে চল্লুম মামি!—বলিয়া সে আর একটি মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া সোজা দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে এই যে একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া গেল, কি জন্যেই না তাহার আরম্ভ হইয়াছিল; আর কত সহজেই না তাহা মিটিয়া যাইতে পারিত! কিন্তু যে নামদাইবে, যে মিটাইবে, বাহিরে আসিয়া ও সে যেন ঘরের গরম আবহাওয়াতেই কষ্টবোধ করিতেছিল। তাহার কারণ ছিল। কামনা এ-রকম পার্টিতে আদৌ অভ্যস্ত ছিল না। কোন একদিনের পরিচিত যুবক কোন রমণীর প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশ করিলেও যে তাহা হাসিমুখে এবং সানন্দে মানিয়া লইলেই আধুনিক হিসাবে গর্ব্বের ও গৌরবের বিষয় হয়, তাহা বুঝিবার মত শিক্ষা দীক্ষা তাহার ছিল না।

তাই যখন তাহার মাতুলানী ঘরের ভিতর মিঃ চৌধুরীর ম্লান মুখের দিকে চাহিতেও পারিতেছিলেন না, তখন বাহিরে আসিয়া কামনাকে ধরিলেন, এবং পষ্ট কঠোর স্বরে কহিলেন কামনা, আমাদের মুখ নিচু না করলে তোমার হচ্ছিল না?

কামনা অবাক মনোভাব গোপন করিতেই নিরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মাতুলানী পুনশ্চ কহিলেন ছি! ছি! এই যে কাণ্ডটি তুমি করলে...

কামনা ধৃতস্বরে কহিল—আমি ত আসতে চাই নি মামী!

যে অন্যায় করে সে যদি আবার এমনই বিদ্রোহ ভাব লইয়া আপন দোষ ঢাকনের চেষ্টা করে, তাহার প্রতি আর কাহার মন প্রসন্ন হয়! কামনার মামী কর্কশকণ্ঠে কহিলেন—তোমার বাবা ত তোমায় খুব সোস্যাল করেছেন কামনা!

কথাগুলা কামনার বুকে বাজিয়াছিল, সে তখন আর কোন উত্তর দেয় নাই। যখন বাগানে, সন্ধ্যার সময় সকলে ইতঃস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সকলের অজ্ঞাতে কামনা ফটকের ধারে আসিয়া একখানা চলন্ত ট্যাক্সি থামাইয়া উঠিয়া পড়িয়া বাড়ীর ঠিকানায় চালাইতে বলিয়া দিল।

# তারাপীঠ

[ শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু ]

তারাপুরের যাত্রা।

লুপ লাইনের রামপুর হাট ষ্টেশন থেকে আমাদের গরুর গাড়ী ছেড়েছে খুব ভোরে। দীর্ঘপথ : তাও সব জায়গায় ভালো নয়—কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও বর্ষার জলে এমন অবস্থা হয়েছে যে গাড়ীর চাকার আধখানা অনায়াসে কাদায় ডুবে যাচ্ছে। কোথাও রাস্তার মাঝখানে বড় বড় খানাখন্দ, গাড়োয়ানরা আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্ছে। এক গরুর গাড়ী ছাড়া, ভারতবর্ষের

মন্দির।

আর কোন যান বোধ হয় সে সব গর্ত নিরাপদে পার হতে পারে না। চাল ছাদের শক্ত ক'রে ধরে সবাই বসলো। গাড়ী নাচছে, উঠছে। বাবা চৌকাঠ কির সঙ্গে মনে হল, এটুকুর মধ্যে খানিকটা নারায়ণোলা, খানিকটা এলা, খানিকটা মোটরলরি চড়া হয়ে গেল! উনু মন্থ লাগছিল না; কারণ রাস্তার দুপাশের দৃশ্য যেন ছবিখানি। বীরভূমের নিসর্গলীন মাঠে নিম্ন সবুজ ধানের ওপর বেলা দিনের চিক্‌চিকে রোদ····খাপছাড়া বাদলার হাওয়া, পথের ধারে ছায়াচ্ছাদা কত না গাছ, গাছে কত না পাখী! বিচিত্র রঙীন কাপড় পরে কত না যাত্রী সেই পথে চলেছে তারাপীঠের মেলা দেখতে। তারিমধ্যে আবার কত লোক ঘরে ফিরছে।

মাঝে মাঝে মাঝারি রকমের গ্রামের মধ্য দিয়ে সঙ্কীর্ণ রাস্তা। দুধারে ছোট ছোট খড়ের ঘর, বড় বড় বাগান, দিঘি দোতলা বাড়ী, চণ্ডীমণ্ডপ। পূজোর সময় কোথায় বিয়েটায় হয়েছিল তার চিহ্ন রয়েছে, বারান্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কাদের বাড়ীতে কটা বেজেছে। পাঠশালার ছেলেরা মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখছে, কাছারির বাবুরা বেরিয়ে এসে উঁকি মারছে।

বেলা দশটায় সময় যখন বারকানদীর তীর পাওয়া গেল, তখন আশা হল এবার পৌঁছব। সেখান থেকে গরুর গাড়ীতে এক ঘণ্টার রাস্তা—তারাপুর। দুদিন আগে জল হয়ে গেছে, নদী কূলে কূলে ভরা। দুদিন পরে আবার বালি বেরিয়ে পড়বে, এদিককার নদীর ধরণ এই।

গাড়ী থেকে নেমে ভোঙায় ওঠা গেল। গরুগুলো খানিকটা সাঁতরে, খানিকটা হেঁটে গাড়ী টেনে নিয়ে ওপারে উঠল। নদীর ধারে ধারে পথ। কতদূর গিয়ে প্রথম যখন তারাদেবীর মন্দির-চূড় নজরে পড়ল, তখন থেকে থেকে এগারোটার বেলা বোঝা যাচ্ছিল না। দূর থেকে ভেসে একটা বিচিত্র কলধ্বনি আসছিল। থেকে থেকে সেই বাদলার হাওয়া, পথের ধারে সেই পাখীর ডাক।

পল্লীগ্রামের মেলা; আধ মাইল জায়গা জুড়ে বসেছে। পথের দুপাশে কাঁসার বাসনের, রঙীন খেলনার, কাপড় জামার, মিষ্টি সন্দেশের, বেগুনী পাপরভাজার সারি সারি দোকান বসেছে। কেনবার মধ্যে মেয়েরাই বেশী কিনছে, পুরুষরা শুধু বলছে, "চলে এস, ওগো চলে এস না!" রাখালের ছেলেরা কিনছে বাঁশের বাঁশী, মেয়েরা কাঁচের বেলোয়ারি চুড়ী।

পূজোর চতুর্দশীর দিন থেকে এই মেলা বসে, এক পক্ষ কাল থাকে। সেই সময়েই তারাপীঠের মন্দির দেখতে আসার সুবিধে, নইলে অন্য সময় বড্ড নির্জন। লুপ-লাইনের মল্লারপুর ষ্টেশন থেকে তারাপুর কাছে পড়ে,

সেই পথে বেশী লোক আসছে। কিন্তু সেদিকে গরুর গাড়ী ধরাবর যেতে পারে না।

দারকানদীর তীরে শ্মশান। ঘাট থেকে উঠে পথটি শেষ হয়েছে মন্দিরের দরজার কাছে। যেমন আদিগঙ্গার ঘাট থেকে কালীঘাটের মন্দিরের রাস্তাটি!

অনেকগুলো ধাপ উঠতে উঠে, মন্দিরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন। একদিকে ভৈরব, আর একদিকে তারাদেবীর মন্দির। মন্দিরের চাতাল থেকে নীচে সবুজ-শ্যামল ক্ষেত বহুদূর অবধি দেখা যায়। ৺তারাদেবীর মূর্ত্তি মা কালীরই মতন লোলজিহ্ব। দু চার পয়সা পাণ্ডাদের দিলে, লাল কাপড়ের নীচে আসল মূর্ত্তি দেখায়; কালো পাথরের প্রতিমা, সন্তানরূপে নগ্ন শিব মাতৃমূর্ত্তি দুর্গার কোলে

শ্মশান ঘাটের পাণ্ডা

শুয়ে স্তনের ক্ষীরধারা পান করছেন। বশিষ্ঠের তপশ্চরণে এই মূর্ত্তির উদ্ভব হয়েছিল। এইখানে নাকি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। পীঠস্থান না হলেও লোকে একে "তারা-পীঠ" বলে। মন্দির-প্রাঙ্গনের তিন দিকে, তিনটী দরজা, দুটি দুদিকের রাজপথে নামবার রাস্তা, একটি দিয়ে এক কালো মেয়ের জলে শেষ হয়েছে। সেই দিকটি ভারী মনোরম।

শ্মশান আঁতড়াটা নিস্তব্ধ জঙ্গল, নদীর ধারে ধারে তিন-বাইশ আয়গা জুড়ে আছে। আগে নাকি আরো বড় ছিল। এইখানে বামাক্ষেপা যোগাসন হয়েছিলেন, তিনি পরমহংসদেবের সমসাময়িক। দুজনকার উপদেশের ধারা প্রায় একই রকমের ছিল। রূপের মোহ, সম্পদের মোহ কাটিয়ে, বিবস্ত্র হয়ে তিনি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন, তাই বিদেশী লোকেরা সাধু বামাচরণের নাম দিলে—বামাক্ষেপা। সেই নামই সকলে আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে করে।

তান্ত্রিক মতে তিনি উপাসনা করতেন। যে শিমুল-গাছের তলায় তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন, সেইখানে একটা ঘরে, তাঁর ছবি, তাঁর পঞ্চমুণ্ডির আসন ইত্যাদি রয়েছে। বামাক্ষেপার জীবনী বাংলায় আছে, তাতে সম্পূর্ণ খবর না পাওয়া গেলেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানতে পারা যায়।

শ্মশানময় অস্থি কঙ্কাল ছড়ানো রয়েছে। চারদিকে কত যে মাথার খুলি প'ড়ে! শুধু সন্ধ্যায় মহাশ্মশানের সময়ও ভীষণতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নদীর জল এক কোমর, কিন্তু স্রোত খুব। অনেক যাত্রী স্নান করছে।

পাণ্ডাদের একখানি মাটির দোতলায় ঘর গেছে। সামান্য পারিশ্রমিক দিতে পাণ্ডার বাড়ীর মেয়েদের হাতে সুন্দর খিচুড়ী ভোগ তৈরী হল। এখানকার পাণ্ডারা অল্পে সন্তুষ্ট।

আশে পাশে ছোট একখানি পল্লী গড়ে উঠেছে, আগে ছিল না। তারাপুরের পথে দিন দুপুরে লোকে ভূত দেখত। এখন সে সব গেছে। মেলার সময়, ভবঘুরে সন্ন্যাসীরা ঘুরে চলে যান, মেলার পর আসেন। গভীর রাত্রে নদী তীরে, ঘন পল্লবের মাঝখানে তাঁদের হোমের আগুন দেখা যায়। ছবি তোলবার সময় একজন সন্ন্যাসী কাঁধের ওপর দা দিয়ে আসন ক'রে বসলেন।

শ্মশানের পথে পথে পল্লী বেশ্যারা আজ বাহার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবগারী বিভাগ এসেছে, কিন্তু এখানকার অনধিকার "মিত্তেনবাবু"—কলকাতার ডে, এল, ব্যানার্জির প্রতি শ্রদ্ধায় সেদিকে বেশী কেউ যাচ্ছে না।

বাড়ীর পথে, গরুর গাড়ী যখন চলিল, তখন আকাশের গায়ে সন্ধ্যা তারাটি ঝিকমিক্ করছে। পাখীর ডাক থেমেছে, কিন্তু বাদলার হাওয়া থামেনি।

# নারীর গৌরব

[ শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ]

জগতে চিরদিন সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ও সম্মান আছে, জগত যতদিন থাকিবে ততদিন সৌন্দর্য্য এ খ্যাতি ও সম্মান পাইবেই। জ্ঞানীর জ্ঞান, বীরের বীরত্ব, তপস্বীর তপস্যার সৌন্দর্য্যের পদতলে চিরকাল আত্মদান করিয়া আসিয়াছে। আজ আমরা এমন একজন সুন্দরীর পরিচয় দিব যিনি অতি সাধারণ লোকের কন্যা হইয়াও লেখা পড়া কলা-কৌশল কিছুই না জানিয়াও শুধু সৌন্দর্য্যের জন্যই একজন বিখ্যাত লোকের স্ত্রী, রাণীর সহচরী, এবং জগত-বিখ্যাত নৌ-যোদ্ধা নেলসনের আরাধ্যা দেবী হইয়াছিলেন। এই বিখ্যাত সুন্দরী এমি লায়নের চিত্র আঁকিয়া চিত্রকর রোমানি বিখ্যাত হইয়াছেন, সুন্দরীর সৌন্দর্য্যকেও অমর করিয়া গিয়াছেন। বহু বিখ্যাত লেখকই ইহার জীবনী লিখিয়াছেন—এমি লায়নের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সকলেই একমত। তবে কি করিয়া তিনি সে যুগের মহিলাদের মধ্যে এত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন কি করিয়াই বা সে প্রতিষ্ঠা গেল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে।

এমি একজন লোহার কামারের মেয়ে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পল্লিবাস ছেড়ে লণ্ডনে এসে ডাক্তার হাড্ড নামে এক ভদ্র লোকের গৃহে গৃহকার্য্যের জন্য দাসী রূপে নিয়োজিত হন। বালিকার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য ছিল অপরিসীম। সুন্দরীর বাল্য জীবন সম্বন্ধে বেশী কোন কথা জানা যায় না—তবে শোনা যায় তাঁর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত লণ্ডন সহর তাঁর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়েছিল। রোমান্স আসে এঁর জীবনে পরে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পরে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সার হ্যারী ফেঁথারষ্টোন নামে এক জন লোক এই সুন্দরীকে পরিত্যাগ করে যান। সুন্দরীর তখন বড় দুরবস্থা, একটি শিশু সন্তান নিয়ে চলবার কোন উপায় বা ব্যবস্থা নাই। অর্থহীন, সহায়হীন অবস্থায় এমি চার্লস্ গ্রেভেল নামে একজন বন্ধুকে লিখেছিলেন 'প্রিয় গ্রেভেল আমার, কাল তোমার চিঠিখানা পেয়ে, আমি হৃদয়ে একটু যেন বল পেয়েছি। আমার বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি—আমি একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেম। সার এইচ—র কোন খবর নেই। সাত সাতখানা চিঠি লিখলুম তাকে—নিরুত্তর। কি করি আমি এখন? ভগবান—কি করি বল। অর্থের অভাবে সহরে ও যেতে পারিনা···মনে হয় বন্ধু বান্ধবেরাও যেন আর সে চোকে আমায় দেখছেন না।...ভগবানের দিব্যি—তুমিও যেন আমার উপর নিদয় হয়ো না—পত্র পেয়েই উত্তর দিও—আর আমি কি করবো তাও বলে দিও। একটা যা-হোক পথ আমায় বলে দাও। আমি এক রকম পাগলের মত হয়ে গেছি। ঈ—আজ তবে বিদায়—তোমারী এমিলি—

গ্রেভেল চিরদিনই এমিলির রূপমুগ্ধ বন্ধু ছিলেন। এ চিঠির মর্য্যাদাও তিনি রক্ষা করেছিলেন। গ্রেভেলের ভালবাসায় ও যত্নেই এমিলির যা কিছু শিক্ষালাভ হয়েছিল। সুন্দরী এমিলি পাঁচ বৎসর কাল গ্রেভেলের সঙ্গে একত্রে ঘর-কন্না করেন। সুন্দরী এমিলি গরীব দু'তিনটি পরিবার ছাড়া সকলের সঙ্গে মেশা পছন্দ করতেন না। ঘর সংসার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও নিজের চেহারা সৌন্দর্য্য ঠিক রাখা এই ছিল তার প্রধান কাজ। এই কয় বৎসরের মধ্যে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য যেন আরও শত গুণে উথলে উঠিল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ চিত্রকর রোমনিকে তিনি প্রায় তিনশ' 'পোজ' দিয়েছিলেন।

গ্রেভেলের নিজের বাৎসরিক আয় 'পাচশ' পাউণ্ড পরিবার। এই আয়ে একা একজন পুরুষের বেশ চলে যেতে পারে বটে—কিন্তু একজন সুন্দরীকে নিয়ে বাস এ আয়ে চলতে পারে না। একটা বড় ঘর কন্না সংসার রেখে সুন্দরীর খেয়াল মিটিয়ে চলতে গ্রেভেল ক্রমেই মহা মুস্কিলে পড়ে যেতে লাগলেন। গ্রেভেল সুন্দরীকে ছাড়তেও পারেন না; রাখতেও পারেন না—এমন সময় ১৭৮৭খ্রীষ্টাব্দে গ্রেভেলের এক খুড়ো নেপেলসের সুচতুর রাজদূত সার উইলিয়াম হ্যামিল্টন ইংলণ্ডে এলেন।

সুন্দরী এমিলিকে দেখেই সার উইলিয়াম তাঁর মহা অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর উপর সার উইলিয়ামের মত অত বড় লোকের এই টান দেখে সুন্দরী মনে মনে খুসী হলেও এ কথা একবারও সুন্দরীর মনে হয় নাই যে এর

মধ্যে আর কোন ভাব থাকতে পারে। হ্যামিল্টন তখন এক রকম বুড়ো, বয়স তাঁর ষাটের কাছা কাছি। এমন লোকে আর সুন্দরীকে কি ভাবে দেখতে পারে?

এই সময় গ্রেভেল সুযোগ বুঝে এক রাজনীতিক চাল দিলেন। বৃটিশ রাজদূতের অতিথি হয়ে এমিলি আর তার মা নেপলসে গেলে তো মন্দ হয় না! সার উইলিয়ম এ কথা শুনেই মহা আনন্দে সম্মত। এ ব্যবস্থায় খুড়ো খুসী ভাইপোও খুসী। এমিলি আগে কিছু বুঝতে পারেন নাই—যখন বুঝতে পারলেন তখন দেখলেন যে তিনি বুড়ো হ্যামিল্টনের ফাঁদে পড়ে গেছেন। নেপলসে পৌঁছবার কিছুদিন পরে সুন্দরী এমিলি গ্রেভেলকে লিখলেন:—

লেডী হ্যামিল্টন।

তোমার জন্য আমি কি না করতে পারি। দুঃখ কষ্ট, অনাচার দারিদ্র্য সব আমি তোমার মুখ চেয়ে সইতে পারি। তুমি বললে আমি এমনি শুধু পায়ে হেঁটে স্কটলণ্ডে যেতে পারি তোমার কাছে'।—সার উইলিয়মকে আমি শ্রদ্ধা করি—তোমার খুড়ো ও আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলেই তিনি আমার শ্রদ্ধা পেতে পারেন কিন্তু তার বেশী নিকট সম্বন্ধ আর তাঁর সঙ্গে কি হতে পারে আমার? আমার...প্রেমিক তিনি কখনো হতে পারেন না।

পরে এক চিঠিতে সুন্দরী লিখলেন 'আজ সকালে সার উইলিয়মের কথা শুনে আমি পাগলের মত হয়ে গেছি। তিনি বলেন—না—না থাক্। কি যে কোরবো আমি বুঝতে পাচ্ছিনা।'

এর পরে আর এক চিঠিতে লেখেন 'তুমি আমায় পরামর্শ দিচ্ছ...কি যে হচ্ছে আমার মনে সে আর কি বলবো? অঙ্কের পানে চেয়ে একটু হাসলে যে ঈশ্বর জানে হয়তো সেই গ্রেভেল আমার উপদেশ দিচ্ছে কি না—। বেশ বেশ...তাই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সার উইলিয়মকেই আমি বিয়ে কোরবো।

তাই হোলো। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম বিদায় নিয়ে নবপরিণীতা পত্নীর সঙ্গে ইটালি ভ্রমণে গেলেন। লেডী হ্যামিল্টন হয়ে তিনি সব বড় বড় সামাজিক ব্যাপারে ও উচ্চ সমাজে মেশবার সুযোগ পেলেন। রাণীর সঙ্গেও তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য হোল। ফরাসী বিপ্লবের বন্যায় তখন সমস্ত ইউরোপ আলোড়িত। রাজা ফার্ডিনাণ্ড ছিলেন দুর্বল চিত্তের লোক, রাণীর উপরেই তাই এক রকম রাজ্য রক্ষার ভার ছিল। রাণী ছিলেন মেরী এণ্টয় নেটের ভগিনী, বুদ্ধিমতী। নেপলসে তখন ফরাসী প্রাধান্য খুব বেশী। সর্ব্বজয়ী ফ্রান্সকে বাধা দিবার সাহস ছিল তখন একমাত্র ইংলণ্ডের। কিন্তু রাণী মেরিয়া কেরোলাইন প্রকাশ্যভাবেও ইংলণ্ডের কাছে বা বৃটিশ রাজদূতের কাছে সাহায্য চাইতে পারেন না তাই রাজদূতের পত্নীর সঙ্গে ভাব করে রাণী নেপলসের উপর ইংরেজদের মনের ভাব কেমন তাই জানছিলেন। নেপলসের রক্ষণের জন্য লেডী হ্যামিল্টন কতটা কি করেছিলেন তা ঠিক জানা যায় না তবে তিনি যে অনেকটা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে নেলসনের সঙ্গে লেডী হ্যামিল্টনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। নেলসন তখন তরুণ যুবক, নৌবিভাগের অফিসার—সরকারী কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে নেপলসের রাজদূতের কাছে গিয়েছিলেন। এর পাঁচ বৎসর পরে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ—তখন উত্তেজনায় তিনি অধীর—নাইল সমরজয়ী নেলসনকে তিনি অভ্যর্থনা করেছিলেন।

লেডী হ্যামিল্টনের সঙ্গে এই সাক্ষাতের বিবরণ নেলসন লিখে গেছেন 'সে আমার বাহু বন্ধনে-জড়িয়ে পড়লো—যেন সে জীবন-হারা।'

১৮০০ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম ইংলণ্ডে ফেরেন। নেলসনেরও ভূ-মধ্যসাগরের কাজ হয়ে গিয়েছিল। দু'জনে তাঁরা একসঙ্গেই ফিরছিলেন। নেপলসে থাকতে

নেলসনের সঙ্গে লেডী হ্যামিল্টনের সম্বন্ধ কতদূর গড়িয়ে ছিল তা বলা যায় না তবে এই ভ্রমণে যে সম্বন্ধ খুব প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। নেলসন বিজয়ী বীর—তরুণ যুবক। লেডী হ্যামিল্টনও সৌন্দর্য্যের রাণী এদের দু'জনার ভালবাসা যে খুবই প্রগাঢ় হবে তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু নেলসন ও এমিলির এই বন্ধুত্ব বিষয়ে সার হ্যামিল্টন ও লেডী নেলসন দু'জনেই অন্ধ ছিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সার হ্যামিল্টনের মৃত্যু হয়। মরবার সময় সার হ্যামিল্টন তাঁর প্রিয়তমার হাত দু'খানি হাতে জড়িয়ে রেখে মারা যান। এমিলি স্বামী পেয়ে যথেষ্ট সৌভাগ্যবতী হয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে আবার নানা গুজব রাষ্ট্র হতে থাকে। এই সময়ে এমিলির হোরাশিও নামে এক মেয়ে জন্মে। এই মেয়ের সম্বন্ধেও নানা গুজব শোনা যায়। নেলসন এমিলিকে ও নিজেকে মিষ্টার ও মিসেস্ টমসন বলে লিখতেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে নেলসন এমিলিকে লেখেন 'প্রিয়তমে পত্নী আমার,—আমার চোখে ও ভগবানের চোখে তোমার আমার মধ্যে এই সম্বন্ধই। আমরা দু'জন আমাদের খুকীটিকে নিয়ে একত্রে থাকবার জন্য কি করতে না পারি।...এত ভাল আমি তো আর কাউকে বাসি না। তোমার ভালবাসা পাবার পূর্ব্বে আমি আর কাউকে ভালবাসি নাই—তুমিও আমার মতই আর কাউকেই তোমার ঐ সুন্দর হৃদয় ভরা প্রেমদান কর নাই।

এমিলি আর কাউকে ভালবাসেন নাই আর কারো সঙ্গে প্রেমে পড়েন নাই। হয় নেলসন প্রেমে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, আর না হয় তো অপূর্ব্ব চাতুরীর সঙ্গে এমিলি তার পূর্ব্ব জীবনের সব ইতিহাস বর্ত্তমান প্রেমিকের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন।

নেলসনের জীবন ছিল বিরাট কর্ম্মময় জীবন। কর্ম্মের অবসরে যে সামান্য অবকাশ তিনি পেতেন তা এই সুন্দরীর সঙ্গেই কাটাতেন। ইংলণ্ড আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা চলে গেলে নেলসন মার্টিনে এই সুন্দরীর গৃহে দীর্ঘ আঠার মাসকাল কাটিয়েছিলেন। এ ছাড়া নেলসন তাঁর জীবনে দীর্ঘ অবকাশ আর পান নাই।

লেডী হ্যামিল্টন নেলসনের অনুপস্থিতকালে প্রায়ই মার্টিনে থাকতেন। লণ্ডনেও তিনি প্রায়ই থাকতেন এবং সেখায় এলে প্রচুর সম্মান অভ্যর্থনাও পেতেন। তাঁর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হোত এমন কি নেলসনের মাতার মুখেও তাঁর যথেষ্ট আদর ছিল। সুন্দরীর উপর নেলসনের ভালবাসা ছিল অগাধ—যুদ্ধে বিগ্রহে—অতল অগাধ সমুদ্রের মধ্যেও এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি লেডী হ্যামিল্টনের মুখখানি তিনি ভুলতে পারেন নাই। নেলসনের বরাবরের ইচ্ছা ছিল লেডী হ্যামিল্টনকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি সুন্দরীকে লিখেছিলেন 'তুমি নরফোকে ভ্রমণে গিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছ, আমারও আশা আছে একদিন তোমায় আইন মত পাশে বসাবার অধিকারী হয়ে আমিও আনন্দিত হব। কিন্তু ভালবাসা বলুন তখন কি এখনকার চেয়ে বেশী হবে—বোধহয় না!

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নেলসন মার্টিনে এক পক্ষকাল লেডী হ্যামিল্টনের সঙ্গে ছিলেন এর পরে আর তাঁদের সাক্ষাৎ হয় নাই। শেষে তাকে নেলসন এই বলবার দেশকে রক্ষা করতে যান। ট্রাফালগার সমরে তিনি ইংলণ্ডকে বিজয়িনী করে বীর মৃত্যু আলিঙ্গন করেন।

শেষ চিঠি 'আমার প্রিয়তমে ভালবাসার এমা, হৃদয়ের বন্ধু আমার—সমর বাহিনী আসছে, ভগবানের ইচ্ছায় আমার চেষ্টা সফল হয়! যাই হোক আমার নাম তোমার ও হোরাশিওর কাছে যাতে চিরপ্রিয় থাকে সে আমি কোরবো। তোমাদের দু'জনকেই যে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি—যুদ্ধে যেখেছে—যুদ্ধের পর চিঠি শেষ কোরবো যদি ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন।'

নেলসনের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই এমার জীবনের গৌরব সূর্য্য অস্ত গেল। এর পর এমার বড় দুঃখে অধঃপতন হয়। জলের মত অর্থ সম্পত্তি ব্যয় করে ১৮১২ খৃঃ ইনি ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ হন। ১৮১৫ খৃঃ ক্যালেতে একান্ন বৎসর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়। বিপুল সৌন্দর্য্যের অধিকারিনী যাঁদের গৌরবে গৌরবান্বিতা ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ নেলসনকে যিনি সৌন্দর্য্য পাশে বন্দী করেছিলেন তেমন সুন্দরী রাণীর মৃত্যুতে এক কোঁটা চোখের জল ও কি কেউ ফেলেছিল।

পাপের সাজা। পাপকে যত সুন্দর করে, আর সোনা দিয়ে মুড়ে ঢেকে রাখ না কেন একদিন পাপ প্রকাশ হয়ে পড়বেই। পাপ পুণ্য দু'টোই প্রায় খানিক খানিক আগুনের মত, ছাই চাপা বেশীদিন থাকে না। লাহোরের আদালতের বিচারে মানকের মোহান্ত মহারাজ বলস্ত দাসকে গদীচ্যুত করা হইয়াছে। মোহান্ত মহারাজ নাকি গদীতে বসিবার যোগ্য ছিলেন না! প্রায়ই থাকেন না। এই ধরণের মহারাজদের মহারাণী ছাড়াও নাকি বহু উপরাণী থাকে, মোহান্ত মহারাজদের মদের বিল মিটাইতেও নাকি অনেক খরচ হয়। একজন না হয় গদীচ্যুত হইলেন, আর সব? বাঙ্গলা দেশেও মোহান্ত মহারাজের অভাব নাই এবং চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদের খ্যাতিও যথেষ্ট! তাঁহাদের কি হইবে? আর একজনকে গদীচ্যুত করিয়াও যে বিশেষ কাজ হবে, তা বলা যায় না। যে গদীতে বসবে, সেইযে রাক্ষস হইবে না, তার নিশ্চয়তা কি? গদী যদি কতক পরিমাণে মদমুক্ত করিবার উপায় করা যায়, তবেই কিছু উপকার হতে পারে। দেশের অনেক দিকে, অনেক কাজে অর্থের প্রয়োজন, দেবতার নামে যাহারা বিলাসে ও ভোগে বহু অর্থ অপব্যয় করিতেছে, সে টাকায় তাহাদের কিসের অধিকার?

কালা বাঙ্গালী। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত কালা বাঙ্গালী, রেলে বলা সাহেবের কামরায় প্রবেশ করার অপরাধে হাজতে পচিতেছেন। যে কর্মচারী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে সে না-কি বলিয়াছিল, ভূপেন্দ্রনাথের কালা অঙ্গে খদ্দর বেশ দেখিলে গ্রেপ্তার করার সাহস কাহারো থাকিত না! বাঙ্গালী বাবুরা এখনও বোধ হয় এই কারণেই খদ্দর বেশটা ছাড়িতে পারিতেছেন না! গ্রেপ্তারের করবার সময় ভূপেন বাবু জাতির পক্ষে অপমানজনক ব্যবহারে প্রতিবাদ করিতেই জামিন না দিয়া হাজতে আছেন, আরও ভাল! চিরদিন থাকুন (আসেওত পাঁচ বৎসর State prisoner ছিলেন) কোন ক্ষতি নাই, আমরা কিন্তু খদ্দর বেশও ছাড়িব না আর সেই বেশে, অস্ত্র ভিক্ষ দৈখিলে সাহেব হইয়া ভূভোগ করিতেও পরাঙ্মুখ হইব না—লাক কথা!

স্ত্রী শিক্ষা বনাম গহরজান। পরম ব্রহ্মের মূর্তির নাক সিটকানী দেখিলে হাসি পায়। এক পরম ব্রহ্ম লিখিয়াছিলেন,' স্ত্রীশিক্ষার জন্য এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইবে। উহার নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন। তাই গহরজান তাঁর থিয়েটারে নৃত্যগীত করিবেন...নারীরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে যে ঘৃণার সহিত বর্জন করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।" একে থিয়েটার, তায় গহরজান! ভবিষ্যদ্বক্তার আর রক্ষা আছে। এই রুচি পরায়ণাই বক্তার সময় পতিতাদের সংগৃহীত অর্থের নামে মূর্ছা গিয়াছিলেন, বক্ত যায় না কাটিতেই আবার এই shock, পুনঃ পুনঃ আঘাতে বিদুষীর মূর্ছারোগে অপমৃত্যু না ঘটে আমাদের সেই ভাবনা! দেশের লোক বক্তার সময়ই দেখাইয়া দিয়াছে, পতিতা যদি বিদ্যের জন্য পথে পথে ভিক্ষা করিয়া অর্থ আহরণ করিয়া আনে সে অর্থ অন্ন পতিত হয় না; এই বিশ্ববিদ্যালয়ও যে "পতিত" পরিত্যক্ত হইবে না, যদি কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয় উঠে, তাহা গোলদীঘির বিলাসিনী দেখিতে পাইবেন।

গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষিতা। বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে পাঞ্জাববিজয়ী বীর সার মাইকেল ওডায়ার শঙ্করণ নায়রের বিরুদ্ধে মানহানি ও ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিয়াছেন। সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রকাশ পাইয়াছে যে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট মাইকেল ওডায়ারের কথানুযায়ী কিছু কিছু খবর প্রভৃতি সরকারী কর্মচারী সংগ্রহ করিয়াছেন, কোন কোন কাগজপত্রও যোগাড় করিয়াছেন—অবশ্য গবর্ণমেণ্ট এখনো অর্থব্যয় করেন নাই। সদ্যোপনে বাহীকে এইরূপ করা নিশ্চয়ই ন্যায় ও শৃঙ্খলার বাহিরে নয়! অন্ততঃ এইটুকু মনে না করিয়া পারা যায় না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতে আজকাল আইন ও শৃঙ্খলার গর্বটাই নাকি বেশী খুব করিতেছেন, কাজেই এখন যটিবে তাহাই আইন ও শৃঙ্খলানুমোদিত বলিয়া যাহা-কিছু বোকা ছাড়া—উপায় নাই।

# দেশ-বিদেশ

গত রবিবার ৬ই মার্চ সমগ্র দেশে শান্তিপূর্ণ হরতাল হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র নামের এমনি মহিমা!

---

বাঙ্গালার মন্ত্রীদের মাহিনা ঠিকই রহিল। অধিকাংশ মন্ত্রীদের অবশ্য তাহাতে বৃত্তা করিতে পারুন, এজন্য ৫০০৲ টাকাই মঞ্জুর করিবে।

---

দিল্লীর স্বরাষ্ট্রসচিব সভায় বিহার বাদল বলিয়াছেন, এদেশে ব্রিটিশ সৈন্য মোট ৫০০০ কমাইয়া দেওয়া হইবে। বোম্বাইয়ে বিমানঘাঁটিতে একটি ব্রিগেড রাখিয়া দেওয়া হইবে। ব্রহ্মদেশের সৈন্যদলের বিষয়ও বিবেচনা করা হইতেছে।

---

'টাইমস' পত্রের ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, কয়লাখনির মালিকেরা ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১লা এপ্রিল হইতে খনিশ্রমিকদের মজুরি কমান হইবে না বরং, তাহাদের সপ্তাহিক মজুরি বৃদ্ধি করা হইবে। ইহা সত্ত্বেও যদি ১লা তারিখ মধ্যে তাহারা চুক্তি সম্পাদন না করে, তাহা হইলে খনির বিষয়ক ইহা কংগ্রেসকে মার্কিন-আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে। ঘোষণাদাতা কয়লাখনির মালিকদের মধ্যে দুইজন বৃহৎ কর্মকারী। গত বৎসরের কয়লাখনির ধর্মঘটের সময়, ইহারা কয়লাখনির আইনের বাদ অমান্য করেন।

---

আগামী ২৪শে মার্চ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কনভোকেশন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানের জন্য লর্ড মেঘনাদ দেশাই মনোনীত করিবেন।

---

কবিবর রবীন্দ্রনাথ আমেরিকাতে গুজরাটী সাহিত্য সভার বক্তৃতাকালে বলেন যে, বিদেশ ভ্রমণকারী পরিব্রাজকদিগের জন্য বহুদিনই নাম ধরা একটী অভিধানমালা পুঁথিবদ্ধ করিয়াছেন: রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, পাশ্চাত্য জগত বর্ণনাকে পরিত্যাগ করিয়া, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির মধ্যেই বিশ্বের তাহার নীরসের সুন্দর ধারার জন্য আকর্ষণের দিকে চাহিয়া থাকে। এখন কি আমরা আমেরিকার সুন্দর ধরণ বর্ণনা করিতে পারি!

---

স্যার চার্লস ইগেন্টন্ ইংলণ্ডের অধ্যক্ষ উপরে লর্ড ইগেন্টনকে বলেন যে, ভারতে ব্রহ্মদৈনিক কর্মচারীর বৃদ্ধি দেওয়া ঠিকই হইয়াছে। লর্ড সীমান্ত গভর্ণমেণ্টের সহিত একমত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে আরও আর কোন কাজ কি না, সে বিষয়ে লর্ড সীমান্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

---

১৯শে ফেব্রুয়ারীর দেশের বাণীতে" আই সভায় নিখিলেশের মজুরদের কন্ট্রাক্টরদের বিরুদ্ধে মজুরের হইয়াছে নিখিল সার্কাস কি সাহায্যের আশ্বাস করেন। তখন সাই করিয়া সীমার করিয়া হইয়াছি। অতঃপর কন্ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সভাপতি নির্বাচন করিবার জন্য উপরোক্ত হইতে এরূপ ভাবে পরিচয় আরও পরিচয় দেখের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী করিয়াছেন বলিয়া তখন যায় নাই। আন্দোলনের অধ্যক্ষদের প্রশ্নের করিয়া তাহার যে অবস্থাটা ছিল—ইহা পরীক্ষা করিবার একটা সম্ভবতঃ সে বিষয় নির্দেশ তাহা আমাদের জানার অতীত। এখনে ব্যাপার সম্বন্ধে তবু প্রকাশ করিয়া কাজ হল নাই. পিটিচারের সাধারণ বিধি লঙ্ঘন করিয়া decency বা স্বাভাবিক সীমা ছাড়াইয়া তিনি বিদেশের সে অভাব তাহা পরিপূরণ করিয়াছেন। চিকিৎসক দোষ চিকিৎসার দ্বারা রোগীর পরীক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু রোগীর একটা সামান্য উদ্বেগের সন্তোষজনক নির্দেশের জন্য অধঃপতনোন্মুখী ইহার পরীক্ষা করা চা-বাগানের সাহেবের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের, একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পক্ষে কি করিয়া যে সম্ভব তাহা আমরা আজও বুঝিতে পারি নাই।

---

যাহাহউক, দেশের রীতি-নীতি জানিয়া বিধি এরূপ ভাবে ভঙ্গ করিলে অপরাধের মর্যাদা খুব কমিতে পারেন, তিনি কি করিয়া এরূপ হাস্যকর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন জানি না। সিভিল সার্জনের ন্যায় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর এরূপ আচরণে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট হানি হইয়াছে। ফৌজদারি আইনে পর্যন্ত বাকি এরূপ বিধি আছে যে, স্ত্রীলোকের ধর্মনাশকারী করিতে হইলে পুরুষ কর্মচারীকে অপর স্ত্রীলোককে দিয়া তাহা করাইতে হয়। যদি ডাক্তার সাহেব কন্ট্রাক্টারদের উচিত সত্যাসত্য নির্ণয় করা একটা প্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন, তবে তিনি নেতে ডাক্তারকে (Lady doctor) সঙ্গে করিয়া তাহা তদন্তে পাঠাইতে পারিতেন। অবশ্য ঐরূপ কার্যও অনেক-সময় ও অসুবিধার হইত কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। তথাপি ঐরূপ কার্য তবুও সোজাসুজি হইত না।

---

উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অধীনস্থ কর্মচারীর উপর গা-ঢাকা ব্যবহার করিবার অধিকার এ দেশে আছে। তাহার এ দেশের লোক সেই ব্যবহারের অর্থের জন্য যে কোন হীনতা সহিয়া থাকে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে অধীনস্থের উপর এরূপ পরীক্ষা চালানো বোধ হয় এ দেশের নূতন ব্যাপার। সেখানে অনেক কিছুই হয়ে এ আর সমাজ আমেরিকার দেশে—কিন্তু এ ব্যাপারটি কি সেখানে বা প্রকাশ্যে ঘটিয়াছিল? এ সম্বন্ধে পরীক্ষক সিভিল সার্জন ও তাহার সাহেবের মত আমরা দেশের জ্ঞানীর মাতব্বরদের জানিতে চাহি।

---

গত পরিষদের অধিবেশনে বাঙ্গালী মোট ছাঁটাই ও ব্যবস্থার এই বিষয়ে মোড়ে এক বক্তৃতাতে আক্রমণ করিয়া অনেকগুলি ভুল ১০০৲ টাকার সেই ব্যাপারটি করিয়া ফেলিয়াছে। মোড়ার মতো পুলিস তাহা করিতেছে, তাহা কিন্তু আছে ত।

---

গত পরিষদের অধিবেশনে বাণী প্রদেশের নৈতিক কাজগুলিই মহাত্মার কথার পূর্ণ ছিল। আমাদের বাঙ্গালাদেশের কয়েকজনের মেরিক মহাত্মার কীর্তিগাথা গাহিয়া বক্তৃতা হইয়াছে। সংযোগী আন্দোলনের মহাত্মার কারাগারিণী ছিনে বিশেষ করিয়া মহাত্মা দিবার করিয়াছিলেন। এই বিশেষ সংযোজনি দেখিতেও যেন মহাত্মার ফেলানি মহাত্মার সম্বন্ধে সাধ্য অংশ পূর্ণ। মহাত্মার বিভিন্ন সম্প্রদায় অভিযুক্তি ও উন্নতির সম্বন্ধে উপায় হইতে আরও করিয়া মহাত্মা-আন্দোলন বিশ্বাস দেশের সমস্যার সংযুক্তিও হইয়াছে। সংযোগীর ও প্রদেশী কর্মচারী—দেশের সমুদয় মহাত্মার ক্ষমা এরূপে মহাত্মা সম্বন্ধে সংযোগী দেশকর্মীর করিবার।

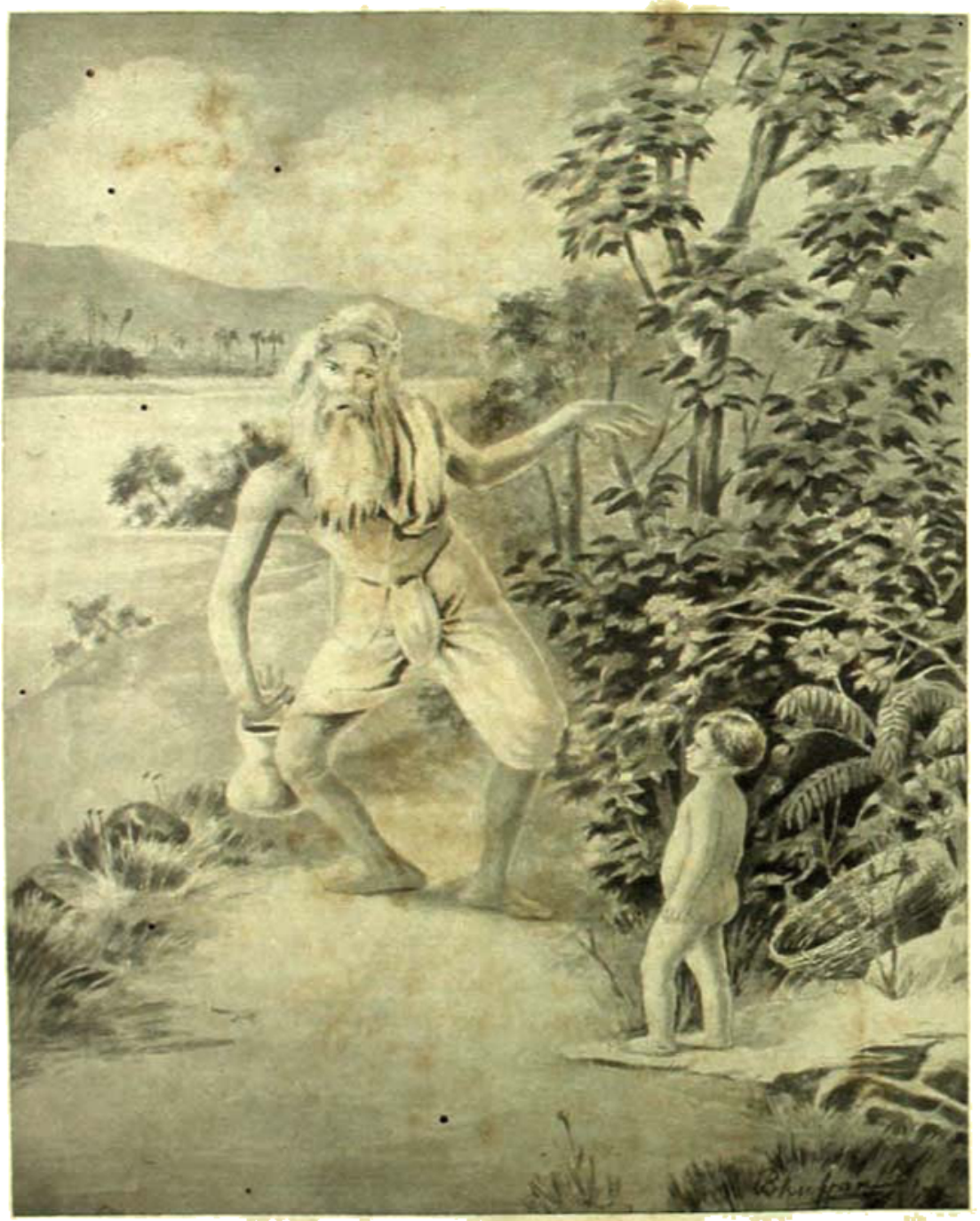

অষ্টাবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান।
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন॥
অষ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার।
দাণ্ডাইল উঠিয়া সে রাজার কুমার॥—রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

১ম বর্ষ ] ১৭ই চৈত্র শনিবার ১৩২৯, ইং ৩১শে মার্চ। [ ৩৫শ সংখ্যা

## পোষ্যাক মাহাত্ম্য

[ চিত্রবিকাশী—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার, বি-এ ]

ভট্টাচার্য্য। ওটা ছোটলোকের আশীর্ব্বাদ বেরেছে, গায়ের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে! বেটা যেন লাটসাহেবের নাতির; যাচ্ছা!

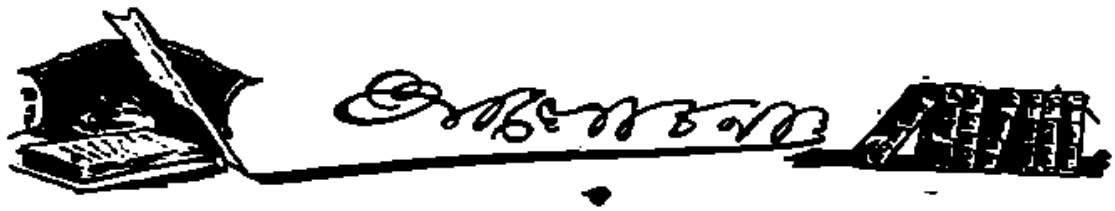

মহাত্মার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইতে হইলে মহাত্মার কর্ম পদ্ধতি অনুসারে দেশকে চলিতে হইবে। মহাত্মার বাক্যের ও কর্মের মর্মই ছিল এই যে দেশকে ও জাতিকে আবার আপনার কর্ম মহিমা দেখাইয়া দাঁড়াইতে হইবে—জাতি আপনার অভাব আপনি মোচন করিবে—সেজন্য পরের দ্বারস্থ হইবে না, আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে এই স্বপ্রতিষ্ঠতার মধ্যেই স্বরাজের বীজ ও সার মর্ম নিহিত রহিয়াছে। যতদিন আমাদের জীবনের সর্ব কার্যে পরবশতা থাকিবে ততদিন স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া হাজার হাহাকার করিলেও সে স্বরাজ আমাদের মিলিবে না। আত্ম-ক্ষমতাই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। তাই দেশ ও জাতিকে আজ পরের ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে বেশী মনোযোগ না দিয়া আপনাদের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের দিকেই বেশী মন দিতে হইবে। আপনার কর্মক্ষমতা দ্বারা কর্মক্ষেত্র গুলি অধিকার করিতে হইবে।

• • • •

আমরা সাধারণত নিজের অর্থের হিসাব রাখিতে ও সেই অর্থ অপব্যয়ের হাত হইতে বাঁচাইতে যে রকম চেষ্টা করি পরের অর্থের হিসাব রাখিতে ও তাহার অপব্যয় নিবারণ করিতে সেরূপ চেষ্টা করি না। দলের শারীরিক মানসিক ও আর্থিক সাহায্য না হইলে জগতে কোন বড় কার্যই হইতে পারে না। কিন্তু দলে মিলিয়া কোন বড় কাজ করিতে গিয়া আমরা যদি ক্রমাগত দলের জিনিসের অপব্যবহারই করিয়া যাই তবে বড় কাজের সম্ভাবনা তো দূরে চলিয়া যায়ই—তা ছাড়া আরও নানা-রূপ অশান্তি ও বিক্ষোভ আসিয়া জুটে। তাই দেশের ও দলের কাজে অগ্রণী হইয়া যাঁহারা কর্মক্ষেত্রে আছেন তাঁহাদের সর্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন যাহাতে দলের গচ্ছিত জিনিস যাহা তাঁহাদের হাতে দলে দলের কার্যের জন্য বিশ্বাস করিয়া ন্যস্ত করিয়াছে তাহার কিছুমাত্র অপব্যবহার না হয়।

আমাদের দেশের উন্নতির জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থ না হইলে কোন কার্যই আধুনিক কালে সম্ভবপর নহে। ইহা সত্য কথা—এবং সেজন্য অর্থও যথা সম্ভব আসা প্রয়োজন। দেশের জনগণ অগ্রণী কর্মীদিগের আত্মত্যাগে ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহাদের হাতে বহু কষ্টে অর্জিত অর্থ ছাড়িয়া দেয়। সে অর্থের তাহারা সদ্ব্যবহারই দেখিতে চাহে—সে অর্থের ছিনি-মিনি খেলা দেখিতে তাহারা চাহে না। ভোগ বিলাস ও ব্যক্তিগত খেয়ালেও তাহার অপব্যয় হওয়া তাহারা পছন্দ করে না। আমাদের দেশের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার বহু অপব্যবহার বিপথে চলিয়া হইয়াছে। তাহা লোকে সহিয়াছে—পথভ্রষ্ট হইয়া সাময়িক উত্তেজনায় অর্থও বহু অপব্যয়িত হইয়াছে—ইহাও সত্য কথা। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল ও ভোগ বিলাস চরিতার্থতায় জন্য এ ভাবে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে সেইটাই সব চেয়ে লজ্জার ও ক্ষোভের কথা। বিলাফতী দল কিম্বা কংগ্রেসী দল ইহারা সকলেই দেশের কার্যে নিযুক্ত। অর্থও ইহারা যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন সে মহাত্মার নামের প্রভাবে দেশের কার্যের জন্য। কিন্তু ইহারা সাধারণের গচ্ছিত—দেশের কার্যে ন্যস্ত অর্থের অপব্যবহার যেভাবে করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আমরা পাইতেছি, ইহা দেশবাসীর পক্ষে মোটেই প্রীতিকর নহে। দেশের কার্যের অগ্রণীদের এ সমস্ত দুর্বলতার কথা লিখিতেও আমাদের লজ্জাবোধ হয়। তাই এ সমস্ত বিভাগের কর্ণধার হইয়া যাঁহারা আছেন তাহাদের উচিত এখন হইতে প্রতিমাসে তাঁহারা প্রাপ্ত অর্থ ও কিভাবে সেই অর্থের ব্যয় হইতেছে তাহা দেখাইবেন। সংবাদপত্র সমূহে সেগুলি বাহির হইলে লোকে অর্থের ব্যয় অপব্যয় নিরূপণ করিতে পারিবে—এবং কিভাবে দেশের কর্ণধারা চলিতেছে তাহাও বোঝা যাইবে। কাকের বাসে কাকে খাওয়া—দুঃখের হাড়ভাঙা শ্রমের অর্থ ও হিসাবের অপব্যয়ের অপবাদ যেন আর জাতীয় কর্মীদের কলঙ্কিত করিতে না পারে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ কিম্বা প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলি জনমতের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্মের সপক্ষে কৌন্সিলে ভোট দিলে আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করি। কিন্তু রাষ্ট্র পরিষদের ইহার কাছে এই সংস্কার যুগেও ব্যবস্থা পরিষদের মূল্য যে অতি সামান্যই আছে ইহা আমরা অনেকেই বুঝিয়াও বুঝি না। লবণ করের দ্বিগুণ বৃদ্ধি লইয়া সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভা এক বাক্যে ইহা না মঞ্জুর করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদ সরকার পক্ষের কোটি কোটি টাকার ঘাটতি মিটাইবার একমাত্র অবলম্বন—লবণ কর বৃদ্ধিকে কোনমতেই সমর্থন করিতে পারেন নাই। কারণ ইহাতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ মারা যাইবে। কিন্তু গরজ বড় বালাই—দেশের লোক বাঁচুক আর মরুক সরকার পক্ষের ঘাটতি মেটান চাই-ই। তাই দর্শনধারী ব্যবস্থাপক সভা তীব্র আপত্তি ও অমত করিলেও রাষ্ট্র পরিষদ হইতে লবণ কর দ্বিগুণ করাই ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং ভারতবাসীকে লবণ খাইবার ইজ্জা বজায় রাখিতে হইলে এখন হইতে অবিচলিত চিত্তে দ্বিগুণ করই বহন করিতে হইবে। আমরা জানি কর্ত্তার ইচ্ছাতেই কর্ম্ম হইবে—যেমন বরাবর হইয়া আসিতেছে। ইহাকেই লোকে বলে ও সব শাসন সংস্কার—ব্যবস্থা পরিষদ—জন মত সব ভুয়ো কথা। প্রমাণ স্বরূপ তাহারা রাজস্ব রক্ষা আইন ও লবণ কর পাশ হইবার কথা নজীর-রূপে উল্লেখ করিতে পারে স্বচ্ছন্দে।

• • • •

তবে এ সব উল্লেখ করিয়াই আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। আমাদের প্রবল ইচ্ছানুসারেও কাজেই হাতী পুষিবার সখ যাইবে না। সৈন্য ব্যয় কমিবে না—রেল খরচও কমিবে না সব থাকিবে। এ সব পুষিবার জন্য প্রয়োজন হইলে আগামী বৎসরে আরও কোন অতি প্রয়োজনীয় প্রাণধারণের জিনিসের উপরও কর বসিতে পারে। তাই দেশকে নূতন কর দিবার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকিতেই হইবে।

• • • • • •

দিনের দিন আমাদের রেশের অভাবও যেমন নিত্যই বাড়িয়া চলিয়াছে দেশের লোকের স্বাস্থ্য শক্তি ও বল বীর্য্যও তেমনি হ্রাস পাইয়া যাইতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলে ও অন্যান্য বিভাগে যেরূপ সুস্থকায় ও তেজবান ছাত্র দেখিতে পাইতাম এখন আর তাহা দেখা যায় না। গ্রামে গ্রামে মধ্যশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর যেরূপ সুস্থ ও তেজী লোক দেখা যাইত এখন আর তেমন দেখা যায় না। বাঙ্গালীর জীবনী শক্তির হ্রাসের দৃষ্টান্ত আমরা যে শুধু বৃত্তের সংখ্যাধিক্যে দেখিয়াই পাইতেছি তাহা নহে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের জীবনের মধ্যেও মরণ যেন অতি সুপ্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এইভাবে যদি আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালী চলিতে থাকে তবে আর কিছুকালের মধ্যেই আমরা হয়তো দেখিয়া যাইতে পারিব যে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা মহা উল্লাসে আকণ্ঠী গিঁলা বেতন গাছ হইতে বেতন পাড়িতেছে।

• • • •

প্রশ্ন হয়—কেন এমন হইল—দিনের দিন কেন এমন দুরবস্থা—জাতীয় জীবনের এমন অধঃপতন এমন মরণোন্মুখ অবস্থা আরও প্রকট হইয়া পড়িতেছে? দেশ জীবন বহুদিন পরাধীন অবস্থায় আছে। কোন অতীতে এ জীবন স্বাধীনতার গর্ব্বে ও উল্লাসে অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি লইয়া বিচরণ করিত সে অতীত এখন স্বপ্নের মতই মনে হয়। কিন্তু পরাধীন জীবন খতাইয়া দেখিলেও তো অতীতে এ অধঃপতন—এই জীবন্মৃতের অবস্থা ছিল না। বর্ত্তমান সভ্যতা, ভব্যতা, নীতিজ্ঞান—আমাদিগকে একেবারে মোহে অন্ধ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। এ মোহ আমাদের দিনের দিন অজ্ঞাতসারে মরণের মুখে লইয়া ফেলিতেছে। জাতীয় জীবনের এ নিরানন্দ প্রাণহীন অবস্থার প্রথম ও প্রধান কারণ অভাব। অভাবের পেষণ জ্বালায় অস্থির হইয়াই আমরা মরিতে বসিয়াছি। দিনের দিন আরও হীন হইয়া পড়িতেছি।

• • • •

আমাদের নিজেদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই। ধন সম্পত্তি—স্ত্রী পরিবার সর্ব্বস্বও যদি ক্ষমতাশালী কেহ লুটিয়া লইয়া যায়—আমাদের তাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা নাই। আত্ম-সম্মান ও আত্মপ্রাণ রক্ষার যে সাধারণ ও অতি স্বাভাবিক অধিকার—যাহা সভ্যতা বিহীন অতি আদিম যুগ হইতে এই পরম সভ্যতাময় আলোর যুগেও মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসি-

তেছে—তাহা হইতে দিনের দিনই আমরা বঞ্চিত হইতেছি। এ অধিকার বোধ জগতের মানব সমাজের সকলের তো আছেই—তা ছাড়া মানবেতর প্রাণী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের পর্য্যন্ত এ বোধ অতি তীব্রভাবে আছে। এ বোধ শক্তি হারাইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না—জীবন থাকিতেও সে জীবনহীন। জীবন তাহার কাছে ভার—দুর্বহ জঞ্জাল মাত্র বিবেচিত হয়। এ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ না পাইলে জাতির মুক্তি নাই।

• • • •

বাহির হইতেও আমাদের যেরূপ নানা কুগ্রহ আক্রমণ করিয়া অষ্টে পৃষ্ঠে নানা বন্ধনে জড়াইয়া ফেলিয়া প্রাণশক্তি চুষিয়া লইতেছে ভিতর হইতেও আমরা তেমনি নানা কু-অভ্যাসের দাস হইয়া ভিতর ও বাহির দু'দিকেই মরিবার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিতেছি। আমাদের দেশের ছাত্রদের বালক ও যুবকদের স্বাস্থ্য অতি খারাপ। শতকরা দুচারিটি ছাত্রের স্বাস্থ্যও সম্পূর্ণ সুস্থ পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। ইহার অপরাপর পারিপার্শ্বিক আরও নানা কারণের মধ্যে বাল্যকাল হইতেই আমাদের দেশের সন্তানেরা যে কু-অভ্যাসের বশীভূত হয় তাহাও একটি অন্যতম প্রধান কারণ। বাল্যের এই অভ্যাসে শরীরকে একেবারে জরাজীর্ণ উৎসাহীন করিয়া যৌবনাগমে অনেকেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অস্থান কুস্থানে যাতায়াত আরম্ভ করে। ইহা হইতে কবে তাহারা নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগের পরিণামে তাহাদের স্বাস্থ্য সামর্থ্য, বল বীর্য্য তো চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়ই তা ছাড়া এই সব ব্যাধির প্রকোপ ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উপরেও বিশেষভাবে প্রকাশ করে। জাতীয় জীবনের অধঃপতনের ইহাও একটি বড় কারণ।

• • • •

ইন্দ্রিয়গ্রামের ভোগ লালসা—রক্ত ও মাংসের উত্তেজনা মানব সমাজে চিরদিন ছিল—থাকিবেও। এই উত্তেজনা হইতেই মানব সমাজের জন্ম—বিশ্বের প্রধানতম রহস্য সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। জনন বিজ্ঞান, যৌনজনন রক্ত ও মাংসের উত্তেজনাকে সুপ্রযুক্ত করিয়া ব্যাধি পীড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জাতিকে সুস্থ সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় আজকাল জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রাজনায়িক সাহিত্যিকেরা চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে রাখি ঢাক ছাপি ছাপি নীতি যাহা লীলতার খাতিরে এতদিন চলিয়া আসিতেছিল—জাতি ও দেশ ধ্বংস হইয়া যায় দেখিয়া উন্নতি কামী জাতিরা এ লীলতার মোহ বর্জ্জন করিয়া জাতি কি উপায়ে রক্ষা পাইবে সেই চিন্তায় ব্যস্ত। আমাদের এই শ্রীমন্তধান, আলস্যপরায়ণ নিষ্কর্মার দেশে এ ব্যাধির প্রকোপ আরও বেশী। অথচ জাতি ধ্বংসকর এই সব ব্যাধি নিবারণ সম্বন্ধে আমাদের না আছে কোন বৈজ্ঞানিক উপায়—না আছে তেমন সাহিত্য না আছে কোন কিছু। আজকাল দেশের নারীরা পর্য্যন্ত স্বামীদের দ্বারা কিরূপে এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ঘটিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিতেছেন—সন্তান প্রসব করিয়াও অকালে তাহা হারাইতেছেন তাহা অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ( বিজলী, সঞ্জীবনবাদ ) ৯-১২-২৯

• • • •

মিথ্যা লজ্জা ও সঙ্কোচে আমাদের সমাজে নানা কত ও গলদ দিনে দিনে অজ্ঞেয় আত্মবিকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া জাতির ও দেশের আত্মহত্যার পথ জমেই প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। অথচ এ গলদ এ ক্ষতের প্রতিকারের উপায় আমরা করিতে পারি না। কারণ আমাদের দুর্ব্বলতা বাহিরে প্রকাশ পাইবে—নারীর চেয়েও লজ্জা বেশী আমাদের—সেই লজ্জায় আঘাত লাগিবে। তুলকো লজ্জায় লজ্জাবতী লতা চলিয়া পড়িবে যে! অথচ আজ দেশে লজ্জাবতীরাই—পুরুষ সমাজের এ ঘৃণ্য রাখি ঢাকি ছাপি ছাপির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য লজ্জার ঘোমটা খুলিয়া প্রকাশ্যে প্রতিকার চাহিতেছে। ভয় পাও, বেরসিকহীন এদেশের পুরুষেরা কি ভাবে নারীর ও দেশের ভবিষ্যৎ সন্তানদের মরণের মুখে পাঠাইবার সাহায্য করিতেছে দেশের নারীরাই সেজন্য আজ দাঁড়াইতেছেন। এত শিশু সন্তান দেশে মরে কেন—এত নারী স্বাস্থ্যহীন কেন—মুক্তিতেই এদেশের নারীরা সুখী হয় কেন—যৌবনে পা দিতেই এদেশের পুরুষদের বল বীর্য্য থাকে না কেন? অভাব ইহার মূল কারণ হইলেও আমাদের মনে হয় পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কারণ গুলির মধ্যে ইন্দ্রিয় ঘটিত ব্যাধিই ইহার প্রধানতম কারণ। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে দেশের যখন চাহিদে এই সব ব্যাধি উপসর্গ দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে নিরাময় করিতে

হইবে। প্রাণহানীকর যে লজ্জা যে লজ্জা সঙ্কোচ জাতিকে ঘুরে সরাইয়া সত্য জীবনের অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য যে পন্থা প্রয়োজন, তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে।

• • • •

আমাদের মত একটা রোল দাঁড়াইয়াছে—আমরা হুজুগ করিয়া আসর সরগরম রাখিতে চাহি। সম্প্রতি বাংলা কৌন্সিলের কোন একজন সভ্য বাংলা দেশের প্রচার বিভাগের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনিয়াছিলেন। অভিযোগ ছিল এই বিভাগ নাকি অ-সহযোগ ও অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেছে—কতকগুলি সংবাদপত্রকেও নাকি এই বিভাগ হইতে অর্থ সাহায্য করা হয়। প্রচার বিভাগের অন্যতম কর্ত্তা শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র চন্দ্র অভিযোগকারী সভ্যকে তাঁহাদের বিভাগীয় কাগজপত্র সব দেখাইয়াছেন,—হিসাব ও দেখাইয়াছেন। অভিযোগ প্রমাণ করিতে বলিয়াছেন। যাহা সত্য ঘটনা তাহা প্রমাণ করা চলে কিন্তু যাহা বাস্তবিক ঘটে নাই তাহা প্রমাণ করা কিরূপে চলে! তাই সত্যের মুখে আর কথা নাই। প্রচার বিভাগ তাঁহাদের হিসাবপত্র দেখিবার জন্য, সংবাদপত্র সম্বেলনের অধ্যক্ষদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সব দেখিয়া সত্যের আনীত অভিযোগের কোন প্রমাণ পান নাই।

• • • •

শুনিতেছি এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হইবেন। সার আশুতোষের কার্য্যকাল ফুরাইলে ও পদে বসিতে আর কেহ সাহস পান নাই। সতীশরঞ্জন কৃতিপুরুষ কার্য্যকরী শক্তি ও সাহস তাঁহার আছে। দেশের ও জাতির শিক্ষায় তিনি যদি তাঁহার কার্য্যকরী ক্ষমতা ও সাহসকে সুপ্রযুক্ত করিতে পারেন তবে আমরা সুখী হইব।

• • • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর রেক্টর প্রভৃতি এতদিন দেশের বড় বড় রাজপুরুষেরাই ছিলেন এবং এখনও তাহাই আছেন। কিন্তু বড় রাজকর্ম্মচারীরা এতদিন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আসিতেন না। 'সো' হিসাবেই থাকিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া জলদমন্দ্রী চীৎকার করিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের রশ্মি যে এইবার হইতে বাংলার গবর্ণর—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মহাশয়ই বিশেষভাবে চালাইবেন ও সংযত রাখিবেন তাহা গবর্ণর লর্ড লিটন মহোদয়ের বক্তৃতাই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। যে শিক্ষায় জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও সুদূরপরাহত করিয়া ফেলিয়াছে সে বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষা কুরি কুরি তথ্য কথা প্রলাপ করিলেও মানুষকে অমানুষ করিবার সাহায্যই বেশী করিতেছে—সে শিক্ষার সহিত জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ যত বেশী কমে তাই ভাল।

• • • •

শুনিতেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল অত্যন্ত উদার ভাবে পাশ করা হইবে। এবং এই বিলের কার্য্য লইয়াই ভারতীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিতেছেন। স্যাডলার রিপোর্ট অনুযায়ী দেশকাল পাত্রোপযোগী করিয়া উন্নত বিধানে যদি এই বিলের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে দেশবাসী সুখী হইবে।

• • •

প্রসিদ্ধ তামিল অ-সহযোগী ডাঃ ভরদারাজুলু নাইডু সরকারের ট্রাষ্ট দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার মোটরখানি প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মহাত্মাজী জেলে থাকিতে তিনি আর ট্রাষ্ট দিবেন না এ স্থির। তিনি বর্ত্তমানে দেশের কার্য্যের জন্য তিলক ভাণ্ডারে টাকা সংগ্রহ করিতেছেন। ২৫০০০ টাকা সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সালেমের নিজ গৃহে প্রবেশ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দেশপ্রাণ ভরদারাজুলু এ টাকা সহজেই তুলিতে পারিবেন। এমন মনের বল ও সাহস যাঁহার তিনি দেশের বন্দনার ভাজন।

• • • •

দেশের কার্য্যে খরচ বিভাগে যথা সম্ভব কাঁচি চালাইয়া লর্ড ইরুকেশ শীঘ্রই এদেশ হইতে বিদায় লইতেছেন। এই দেশ হইতেই লর্ড ইরুকেশ তাঁহার অগাধ বিত্তের ভিত্তি স্থাপনা করেন, তিনি যে সব বিভাগে কাঁচি চালাইয়াছেন তাহা দেশের মঙ্গলের জন্যই। যে সব বিভাগে তেমন ভাবে পারেন নাই—সে নিজের দেশাত্মবোধের জন্যই।

তাঁহার নিজ দেশের স্বার্থ তাঁহাকে আগে দেখিতে হইবে। পরে এ দেশের স্বার্থ সুতরাং তাঁহাকে দোষ দিবার আমাদের কিছু নাই।

• • • • •

দেবকার্য্যের নামে বিপুল সম্পত্তি কোপী হইয়া অনেক মোহান্ত বিপুল সুখে ও বিলাসে জীবন যাপন করিতেছেন। এই মোহান্তদের মোহান্তত্বকে সায়েস্তা করিবার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাশ হইবার কথা। বাংলার মোহান্তদের সায়েস্তা করিবার জন্যও এমন আইনের প্রয়োজন। এক এলোকেশী ও নবীনের ব্যাপারেই ইহাদের অবশ্য লালসা বৃত্তির পরিসমাপ্তি হয় নাই। দিনের দিন ইহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। মোহান্তদের ভোগ লালসা একটুও কমে নাই। দেবকার্য্যের নামে দেশে দুর্নীতির এই প্রাবল্য আর যাহাতে বাড়িতে না পারে সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি পড়া উচিত। দৃষ্টি পড়িয়াছেও বহু-লোকের, অনেকেরই কিন্তু ইহার প্রতিকারের উপায় কি!

• • • •

বর্ণা জমির ব্যাপার লইয়া দেশে বিপুল বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামবাসীদের মধ্যেই এ ভয় বেশী হইয়াছে। বছরের পেটের ভাত যাহা হইতে চলিবে অনেক মধ্যবিত্ত লোক সেই জমিও ভয়ে বর্গা দিতে পারিতেছেন না। এ সম্বন্ধে নানা গুজব রটিতেছে। পল্লীবাসীদের ধারণা হইতেছে গবর্ণমেণ্টই এই সমস্ত অন্যায়ের চাবিকাটি নাড়িতেছেন। যাহা লইয়া দেশে এত আলোচনা, ভীতি উৎকণ্ঠা তাহার সত্য স্বরূপটা কি এসম্বন্ধে দেশের প্রচার বিভাগ যদি জনসাধারণকে সব জানান তবে বড় ভাল হয়। দেশের জনমত কি—দেশের জনসাধারণ ইহাতে কতটা ভীত সম্ভ্রস্ত প্রচার বিভাগ সে সম্বন্ধে সরকারকেও সব জানাইয়া সরকারের মত জনমতের অনুকূল করিতে পারেন।

• • • •

গত ২৩শে মার্চ্চ সকাল বেলায় জগদ্বিখ্যাত অভিনেত্রী রাণী সারা বার্ণার্ডের মৃত্যু হইয়াছে। জীবনে চিরদিন ইনি মৃত্যু ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়স সাতাত্তর বৎসর হইয়াছিল—কিন্তু ইহার ইচ্ছা ছিল ইনি একশ বৎসরের উপরেও বাঁচিবেন। মাতৃভাষা ফরাসীকে ইনি জগতের সমক্ষে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। সারার অভিনয়ে ফরাসী ভাষা ও নাট্য সাহিত্যের যথেষ্ট সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত জগতের কোন অভিনেত্রীই বোধ হয় সারার মত খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। যখন যে চরিত্রের অভিনয় ইনি করিতেন সেই চরিত্রেই একটা নূতন জীবন ও প্রাণের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার অভিনয়ের সময়ে লোকে বিখ্যাত সারার কথা ভুলিয়া যাইত—অভিনয়ের চরিত্রই তাহাদের প্রাণে জীবন্ত হইয়া উঠিত। মৃত চরিত্রের জীবনদাত্রী—আনন্দময়ী চিরযৌবনা সারা আজ চির আনন্দের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। জগতে যতদিন নাট্য ও সাহিত্য থাকিবে—যতদিন লোকে প্রাণের নিত্য নূতন খেলা দেখিয়া উল্লসিত হইবে ততদিন সারার নামও অমর থাকিবে।

• • • •

৩য় আশুতোষ সরস্বতী সে দিন গোলদীঘির গোলাম খানার অনেক স্বাধীনতার গুণগান করিয়াছেন। স্বাধীনতারই যদি আস্তানা ওটা তবে আর ওর বাড়ি থেকে অত গোলাম বাহির হয় কেন? বাংলার সমাজ, সাহিত্য, রীতিনীতির - কোন ধারই ধারে না এ বিশ্ববিদ্যালয়—শুধু স্বকর্ম্ম উদ্ধারের বেলাই গায়ে জয় স্বাধীনতার জয়। ডিগ্রেটারী হিসাবে বক্তৃতাটি বেশ উপভোগ্য—কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ডিগ্রেটারী রঙে আর বেশ ভুলিবে না। দেশের কোন আকাঙ্ক্ষা যে বিদ্যা মন্দির পুরাইতে পারে নাই—তাহার প্রতি দেশবাসীর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। যদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কোন দিন দেশে সত্য শিক্ষা আনিতে পারে যদি দেশে মানুষ গড়িবার সাহায্য করিতে পারে তবেই এ বিশ্ব বিদ্যালয় গোলাম খানা দেশবাসীর প্রীতি পাইবেন—তুষা আর নহে।

• • • •

৪৷৷ বিনামূল্যে লুকেটসহিত ফটো
ফটো এনলার্জিং ১২×১০
ফ্রেম সহ ভারতীয় সিকি মূল্যে পাঠান
কলিকাতা ফটো ও রবার ষ্টাম্প সেকার
৩৩নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

# মাতৃস্নেহ

কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে গত সপ্তাহভোর "মাতৃস্নেহ" প্রদর্শিত হইয়াছিল। ন্যাশান থিয়েট্রিকাল কোম্পানী লিঃ কর্তৃক গৃহীত একখানি সামাজিক চিত্র। এই নাটকখানির চিত্রগুলি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দানুভব করিয়াছি। ইংলণ্ড আমেরিকা অঞ্চলে গৃহীত ফটোগ্রাফ যেমন সুন্দর স্বাভাবিক হইয়া উঠে, মাতৃস্নেহের চিত্রও তেমনই সুন্দর, স্বাভাবিক উঠিয়াছে এবং দর্শকদের সমক্ষে শোভন হইয়া দেখা দিয়াছে। এদেশজাত যতগুলি নাটকের চলচ্চিত্র আমরা দেখিয়াছি, শিল্পকলা হিসাবে ( Photography ) ইহার স্থান যে সর্ব্বোচ্চে, তাহা দ্বিধা দ্বিধায় বলিতে পারি। ছায়াচিত্রের ক্রমোন্নতি আমাদের দেশে যে বেশ দ্রুতগতিতেই সাধিত হইতেছে, "মাতৃস্নেহের" অভিনয় দেখিয়া তাহাও বলা যায়। এই নাটকে প্রধান চরিত্র কয়টিতে যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। বিশেষ করিয়া মিসেস্ কুপার, শ্রীমতী প্রভাবতী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, মিঃ মেয়ার্স প্রভৃতির অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অতি উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছিল। নাটকখানিতে কতকগুলি অবান্তর ভূমিকার—যথা পাগল—কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। নাটকের প্রথম কয়েকখণ্ড যেমন হৃদয়গ্রাহী ও স্বাভাবিক হইয়াছিল, শেষের দিকটা তাহা হয় নাই। ঘটনার সমাবেশও স্থানে স্থানে খাপছাড়া ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে কিছু রস-ভঙ্গ হইয়া থাকে তাহা সত্ত্বেও মোটের উপর এই চিত্রখানি দর্শকদের ভাল লাগিবে বলিয়াই মনে হয়।

---

# মান-ভঞ্জন

আর একখানি বাঙ্গলা নাটকের ছায়া-ছবি দেখিয়া আসিলাম। সেখানির নাম—মানভঞ্জন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি মনোমুগ্ধকর গল্পকে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশ চন্দ্র মিত্র বি-এল চলচ্চিত্রের অভিনয়োপযোগী করিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্র নাথের গল্পের পরিচয় কোন পাঠককেই দিতে হইবে না তবে এই ছায়াচিত্রের দু' এক কথা বলা দরকার মনে করি। এই চিত্রে যাঁহাদের অভিনয় দেখিলাম, তাঁহারা জনে-জনেই যে বাঙ্গালীর নূতন প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়িত্ব দিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা বেশ বুঝা যায়। নরেশ বাবুর গোপীনাথ, ঝিনুকদি বাবুর গোমস্তা, ইন্দুকান্ত বাবুর প্রেমিকানন্দ ( সরফলতার গোপন প্রণয়ী ) ও নবীনা অভিনেত্রী নীলিমা সুন্দরীর গিরিবালার অভিনয় প্রথম শ্রেণীরই হইয়াছে। সরফলতার অভিনয়ে নীলাবতীও বেশ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে বায়স্কোপ অভিনয়ের আজও শৈশবাবস্থা। এই অত্যল্প কালের মধ্যেই এই শিল্পরাজ্যে যে উন্নতির সূচনা দেখা গিয়াছে তাহাতে খুবই আশা হয় যে শীঘ্রই প্রতিযোগীতায় আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ যোগ্যতা দেখাইতে পারিবে। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর প্রথম চিত্র "আঁধারে আলো" জন সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাঁহাদের এই নূতন চিত্রও যে সকলের হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহা অসঙ্কোচে বলিতেছি। এই চলচ্চিত্রের ফোটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত ননী গোপাল সান্যাল চিত্র গ্রহণে যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই প্রশংসার্হ!

আমরা স্থানান্তরে- "মানভঞ্জনের" গল্পাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি।

---

পোষাক মাহাত্ম্য

[ চিত্রাধিকারী—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার, বি-এ ]

সেই লোকই বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছে।

ভট্টাচার্য্য। সেলাম হুজুর, সেলাম!

---

## ভ্রম সংশোধন

৩৪ সংখ্যার "বাসন্তীতে" প্রকাশিত "জল ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা" প্রবন্ধে একটি মারাত্মক রকমের ভুল থাকিয়া গিয়াছে। ২৩৮ পৃষ্ঠার, ২য় পংক্তির ১৬শ ছত্র হইতে ২৩৯ পৃষ্ঠার মুদ্রিত প্রবন্ধের শেষাংশ, ২৩৭ পৃষ্ঠার ১৯ শ ছত্রে বসা উচিত ছিল। এই মুদ্রাকর প্রমাদের জন্য আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট লজ্জিত আছি।—সঃ—বাঃ।

---

# প্রায়শ্চিত্ত।

[ শ্রীসুধা দেবী ]

ডাইরী থেকে

২রা শ্রাবণ।

শ্রাবণের সাদা আকাশ। প্রকৃতি একেবারে শান্ত। ঝুপ্ ঝুপ্ করে শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা ঝরে পড়ছে ভাবল ধরণীর বুকে। হাসপাতালে থেকে ফিরে এসে বারান্ডার একটা কৌচের উপরে বসেছিলুম। সুমুখের বাগান থেকে বৃষ্টির জলে ভিজে আসা হাসনুহানা ফুলের গন্ধ আমার চারদিকে ভরে উঠছিল ধীরে ধীরে, আমার সমস্ত দিনের ক্লান্তি আস্তে আস্তে ঐ শ্রাবণ ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে যেতে উঠছিল চারার গন্ধে। বৃষ্টি একটু জোরে নামতেই আমি র‍্যাগটা বেশ করে গায়ে টানা দিয়ে ঐ পাশের বাড়ীর বাঙ্গালী বউটির কথা ভাবছিলুম। কি সুন্দর তার মুখের হাসি। কি মিষ্টি তার চোখের চাউনি। আর সব চেয়ে সুন্দর হচ্ছে তার স্বামীকে হর করা। সারা দিন এক ভাবে গৃহের কাজ করে তবুও মুখে হাসির রেখা সদাই ফুটে আছে। কি সুখী ওরা দু'টিতে। যখন এই কথা ভাবছি বসে বসে এমন সময় মিষ্টার মুখার্জী তাড়া তাড়ি আমার কাছে ছুটে এসে বল্লেন "তোরা শীঘ্রি এস অমোর স্ত্রী বিষ খেয়েছে।" তিনি আর বেশী কিছু বলতে পারলেন না শুধু আমার হাতখানি ধরে বল্লেন—প্লিজ তোরা আর দেরী কর না, দেরী হলে হয়ত তাকে বাঁচানো যাবে না। আমি মোটর এনেছি তুমি তাড়া তাড়ি এস। আমি উঠে পড়লুম, কাছে কোন আলো ছিল না তাই তার মুখ খানা ভাল করে দেখতে পেলুম না। তবুও যা দেখেছিলুম তা এ পর্য্যন্ত কোনদিন দেখিনি।

মিঃ মুখার্জী হচ্ছেন আমাদের হাসপাতালের হাউস সার্জেন। এসে দেখি একটী বর্ষার জলে ভেজা আধ কোটা সেফালি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে আছে। তার সারা দেহে নারীত্ব নারীত্ব ফুটে উঠেছে। তার সমস্ত চুল শিথিল হয়ে পড়েছিল, তাতে তার সুন্দর মুখ খানিকে আরও সুন্দর শ্রী করে তুলেছিল। হায় নারী তুমি সমস্ত অত্যাচার নির্বিবাদে সহ্য করে যাও তবুও প্রাণান্তে তার প্রতীকারের চেষ্টা কর না। হাসি মুখে মৃত্যুকে তুমি বরণ কর তবুও স্বামীর বিরুদ্ধে একটীও কথা বল না। তোমাদের বুক ফাটে তবুও মুখ ফোটে না। তাই সমস্ত অত্যাচার মাথায় পেতে নাও কারণ সে তোমার স্বামী, দেবতা। মরছে ও, কিন্তু কি শান্তির মরণ ওর! কি মিষ্ট উজ্জ্বল মুখ তার! একি আত্মোৎসর্গ! পৃথিবীতে একি স্বর্গের ছবি!

ওগো প্রভু আমার, যদি বাঙ্গালায় জন্মালুম তবে কেন এদের ঘরের মেয়ে করে আমায় পাঠালে না।

৩রা শ্রাবণ।

কাল রাতে মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে হাসির জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এখনও ভয় যে নেই তা ঠিক বলা যায় না। আর মরণ বাঁচন ভগবানের হাত

সকালে চায়ের টেবিলে চা খেতে খেতে মিঃ মুখার্জী আমাকে বল্লেন—তোরা আজ যদি হাসি মেয়ে যাস তবে সে শুধু তোমার সেবার জন্যে। আগে আমি ভাবতুম তোমরা শুধু অর্থের জন্যে যা দরকার তাই করতে কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভেঙ্গে দিয়েছ তুমি। আজ পর্য্যন্ত আমি তোমার মত স্নেহময়ী নারী দেখিনি। শীঘ্রিতের জন্যে প্রাণ কাঁদে যার এমন নারী তোমাদের আমি দেখলুম। তুমি যে আমার কি উপকার করেছ আমি তা আর কি বলবো। এখন আমি তোমার শোধ করতে পারবো না। তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন আমি কিন্তু সেখা ঘর থেকে চলে এলুম।

* * *

হাসি যে কেন বিষ খেয়েছে তা কেউ জানে না। মিঃ মুখার্জী যে হাসিকে খুবই ভাল বাসেন তার প্রমাণ আমরা অনেকই পেয়েছি। কাল সারারাত আমি শুধু ভেবেছি এই কথাটাই, কিন্তু ভেবে ঠিক পাই নি। আজ দুপুরে মিষ্টার মুখার্জীকে একটা পাশের ঘরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আচ্ছা আপনি সত্যি করে বলুন ত হাসিকে কি আপনি ভাল বাসতেন না? আমার কথা শুনে তিনি বল্লেন—খুবই ভাল বাসতুম তোরা, খুবই ভাল বাসতুম। সেও আমাকে খুব ভাল বাসতো। সে যে কেন এমন ধারা করলে তা আমরা কিছুই জানি না।

মায়ের কথা মনে হল. হাসি না হলে মায়ের আমার এক-দণ্ড চলে না। মাকে সেও খুবই ভাল বাসে। তবে খুব লক্ষ্মী মেয়ে ছিল বোধ।

৬ই শ্রাবণ।

সন্ধ্যা হয়েছে। দূরে—অনেক দূরে আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলা সবে মাত্র শেষ হয়েছে। প্রকৃতির বুকে গভীর নীরবতা বীর বাতাসে কালো আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। একা আমি হাসির শিয়রে বসে আছি। মনে আমার বিরাট অন্ধকার স্তরে স্তরে জমা হয়ে উঠছিল। এমন সময় হঠাৎ হাসি অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো—আমি কোথায়? আমি তার হাতটীকে নিজের হাতের মধ্যে রেখে বল্লুম—তুমি যে তোমার ঘরেতেই আছ ভাই হাসি, কিছু ভয় নেই তোমার। আমার কথা শুনে সে শিউরে শিউরে উঠলো; তারপর আবার বল্লে—তুমি কে ভাই? তোমায় আমি কি করেছি যে তুমি আমায় মরণে বাধা দিলে। বেশ ত যাচ্ছিলুম। মরণ ছাড়া যে আমার উপায় নেই। উঃ আর যে—। হাসি এই পর্য্যন্ত বলেই চুপ করলো আর কিছু বলতে পারলো না। শুধু আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তখন আমি তার মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লুম—তুমি আমায় চিন্‌তে পারছো না হাসি, আমি যে তোমার। আমাকে তখন সে বল্লে—তুমি কবে এলে ভাই? তোমায় কে আনলে? আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লুম—আচ্ছা হাসি, তুমি বলতে পার, কি খেয়েছিলে তুমি? সে আমার মুখের পানে চেয়েই পাশে ফিরে শুলো—তার চোখ দুটী জলে ভরে উঠলো। আমি তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লুম—লক্ষ্মীটী বলনা ভাই কি খেয়েছিলে? হাসি তখন চোখ বুজিয়ে বললো—বিষ। আমি বল্লুম—কেন? সে বল্লে, না, তা আমি বল্‌তে পারবো না। সে কাহিনী তোমার শুন্‌তে নেই। শুধু তোমার কাছে আমার এই মিনতি যে আমি এখনও মরবো কিনা তা বল।—তারপর সে শিশুর মত কেঁদে উঠলো।

হঠাৎ আমার হাতদু'খানি সজোরে চেপে ধরে বল্‌লে কেন যে খেয়েছিলুম তা শুনবে? আর না বলেও যে আমার শান্তি নেই ভাই। হয়ত মরণের পরও আমাকে এইজন্যে অশান্তি ভোগ করতে হবে। তখন মরণেও আমার সুখ হবে না। তাই বোন তুমি আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাওনা ভাই আমার বুকটা কেমন করছে। —বলেই সে চোখ বুজিয়ে পাশ ফিরে শুলো।

সে কিছু বাদে বলতে সুরু করলো।

সে আজ কতদিনের কথা নয়, এক বৎসরের। সে দিনটী আজও আমার বেশ মনে পড়ে যেদিন আমি প্রথম নব বধূর বেশে আমার স্বামীর ঘরে এলুম। তখন সবে মাত্র আমার কচি বুকে প্রথম ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া এসে পড়েছে। ও সে কত সুখে দিন গিয়েছে। যাক্ সে কথা আমার আর ভাববারও অধিকারটী পর্য্যন্ত নেই, মুখে বলাত দূরের কথা। বেশ সুখেই দিন যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন আমার সুখের পথে কাল বৈশাখীর একখানা কাল মেঘ ভেসে এলো। অরুণ ছিল আমার স্বামীর বাল্যবন্ধু।" হঠাৎ হাসি থেমে গেল; অল্পক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—বোন, তুমি অরুণকে জান?

বল্লুম, জানি বৈ-কি হাসি। তাঁর সেন যখন হাওড়া ইসপাতালে ছিলেন, তখন থেকেই আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল। বিলেত থেকে প্রথম প্রথম আমি তাঁর ক'খানা চিঠি পেয়েছিলুম।

হাসি বল্লে—অরুণ আসছে, জান?

বল্লুম—শুনেছি।

হাসি করুণ সুরে বলে উঠ্‌লো—পরশু তার আসবার দিন, বৌদি, তার আগেই—আমি" সে দু'হাত আস্তে আস্তে মুখের ভেতর পুরে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আমি কিছুক্ষণ তার পাশে চুপ করে বসে রইলুম। একটা কথা বলেও তাকে সান্ত্বনা দিতে পারলুম না, আর কি সান্ত্বনাই বা দেব? সে ভালবেসেছে, সে ভালবাসার এই পুরস্কার, এই আত্মদান। কি কথা বলব তাকে?

দেখি, তার চোখ মুদে আসছে, জিজ্ঞাসা করলুম—ঘুম পাচ্ছে হাসি?

সে—যেন মাথা নেড়েই জানালে—হাঁ।

বাইরে এসে দেখি আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। বোধ হয় এখুনি বৃষ্টি নেমে এসে ধরণীকে ভাসিয়ে দেবে। রাত্রি নীরব।

হঠাৎ সমস্ত আঁধার জগতে আলোকিত করে তীর বেগে একটা আলো আকাশে উঠেই মিলিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই সে কি ভীষণ শব্দ! ছুটে হাসির ঘরে ঢুকে পড়লুম! বড় ভয় হয়েছিল, হাঁসির যে প্রাণটুকু বাতাসের ভরে কাঁপছে, এ অশনি-শব্দ সে সহ্য করতে পেরেছে ত! ঘরে ঢুকে দেখি বুকের উপর শীর্ণ হাতদু'টি রেখে সে চুপ করে শুয়ে আছে। বিরক্ত করব না ভেবে বাইরে এসে বসলুম। আকাশে তেমনি বজ্রলীলা চল্‌ছিল, আর কোথাকার একটা জোলো হাওয়া হু হু করে' এসে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। চোখবুজে শুয়ে রইলুম, তা'ও পারলুম না।

মনে হলো যেন বাতাসে কার বুকভাঙা কান্না ভেসে এসে আমার বুকের দ্বারে ঘা দিয়ে বারে বারে ফিরে যাচ্ছে। ঘরে এসে দেখি হাসির মুখে মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ফুটে উঠেছে। তার প্রাণহীন দেহখানি বিছানায় পড়ে আছে।

---

# পাঁচমিশেলী

[ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত ]

একজন মানুষের শরীরে মোট ২৪০ খানি অস্থি বা হাড় আছে।

মানুষের শরীরে হৃৎপিণ্ড ( heart ) বলিয়া একটা জিনিষ আছে, আমরা জানি। ঘড়ির কাঁটা যেমন দিন-রাত টিক্ টিক্ করিতে থাকে, আমাদের ভিতরেও ঐ জিনিষটা অবিশ্রান্ত টিক্ টিক্ করিয়া নড়িতেছে। জানা গিয়াছে, উহা দিনে ২২১৩০ বার নড়ে-( beats )।

একজন স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক ( brain ) রীতিমত পরিপুষ্টতা লাভ করে প্রায় ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে; কিন্তু পুরুষমানুষের মস্তিষ্ক পূর্ণমাত্রায় পুষ্ট হয় তারও প্রায় ১০ বৎসর পরে।

যাহাদের শ্রবণশক্তি কিছু কম তাহারা সাধারণতঃ রেলওয়ে ট্রেণে বেড়াইবার সময়ে বেশ ভাল রকম শুনিতে পায়। লোহার রাস্তায় গাড়ীর চাকাগুলির সংঘর্ষণে যে ভীষণ শব্দ হয় তাহা কাণের ভিতরে যাইয়া খুব আঘাত করে, এবং তাহাই শ্রবণশক্তি বাড়াইয়া দেয়।

একটী গরু রোজ প্রায় ১০০ পাউণ্ড ঘাস খাইয়া থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে জাপানেই ডাক খরচ সর্ব্বাপেক্ষা কম। একপেনির ষ্টাম্পের সাত ভাগ ব্যয়েই সেখানে চিঠি পাঠান যায়।

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুতরকমের একটী গির্জ্জা আছে নরওয়ে দেশে। উহা তৈরী করিতে যে সমস্ত জিনিষ লাগিয়াছে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। চুণ, ঘি এবং সেই সঙ্গে হাজার হাজার ডিমের সাদা অংশ মিশ্রিত করিয়া কাগজে মাখান হয়, পরে সেই কাগজ দ্বারা ঐ গির্জ্জা নির্ম্মিত করা হইয়াছে। গির্জ্জাটীতে ১০০ জন লোকের বসিবার স্থান আছে।

---

# চাকরী

[ শ্রীকালিদাস রায় বি-এ কবিশেখর ]

( প্যারডি—জগৎ তোমাতে তোমারি )

চাকরি তোমাতে　　তোমার মায়াতে
মোহিত বাঙালিজন,
যেন সাধ্যকার　　তোমারি মায়ার
বাঁধন করে বিচ্ছেদন।
দুখার পাতান দায়ে মুক্ত নিয়ে
তুমি না থাকিলে পুষিব কি দিয়ে
তুমি দিতেছ যে ঠেলা　　ঠেলি তা দু'বেলা
তুমিই আমার নিত্যধন।
তোমারি ইচ্ছায়　　কাচ্চা বাচ্চা বাঁচে
হাড়ে হাড়ে বুঝি তোমার মহিমা,
তুমি—নিয়ে যাও যে যেখে যাব গো সে যেখে
পাই না পাই প্রোমোশন।

---

# স্মৃতি মন্দির

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কামনার মাতুলানীর মনটা কামনা হইতে এতই বিমুখ হইয়াছিল, যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাহার কোন সন্ধানই করেন নাই কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিটা মলয়কে যেন করিয়াই বিঁধিতেছিল। ডঃ লাহিড়ী উদ্যান মধ্যে তাহাদের নিকটে বসিয়া নানা গল্প গুজবে ইহাদের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন, কামনা তাঁহাকেই এক সময়ে এক ফাঁক হাসমুহানার তলে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসিল —একবার কামনাদিদির খোঁজ করলে হত না?

ডঃ লাহিড়ী অতিশয় বিস্ময়ে কহিলেন—তিনি কি বৈঠকখানায় নাই? আমি এখনই দেখে আসছি।

মলয় বলিল—কামনা বৈঠকখানায় নিশ্চয় নেই। আমার মনে হয়...

ডঃ সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন—কি মনে হয় মলয়?

আমার মনে হচ্ছে আপনি···না চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি. বাগানের ঐদিকটা একবার দেখতে হবে। সেইখানেই সে বসেছিল. আমরা কথা বলতে বলতে চলে এসেছি।

ঠিক ত' বলিয়া ডঃ লাহিড়ী মলয়ের সঙ্গে সেই-দিকেই ছুটিলেন. সারা বাগান পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করা হইল, কামনার দেখা পাওয়া গেল না। মলয়ের সত্যই কেমন একটা শঙ্কা হইয়াছিল। এই যে একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, যাহার জন্য প্রকাশ্যভাবে কামনা তিরস্কৃতও হইয়াছিল, সেই অভিমানে চলিয়া যাওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয় কিন্তু এই যা কিরূপে হয় যে এক বন্ধুর বাড়ী হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া কামনা সঙ্গোপনে চলিয়া যাইবে? এতটা ভদ্রতা আছে ত! শিষ্টাচারের দাবী-আছে ত!

প্রথমটা মলয়ের ভারী রাগ হইল! শুধু রাগ নয় দুঃখও হইল! রাগে অভিমানে তাহার চোখদুটা কেবলই ঝুলিয়া ঝুলিয়া আসিতেছিল, সে চক্ষু মেলিয়া ডঃ লাহিড়ীর দিকে চাহিতেও পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, তাঁহার লাহিড়ী কি মনে করিবেন যখন তিনি শুনিবেন যে কামনা কাহাকেও কিছু না বলিয়া অভদ্র বর্বরের মত হোতার অনুমতিটি পর্য্যন্ত না লইয়াই চলিয়া গেছে, তখন তিনি কি তাহাদের উপরও বিরক্ত হইবেন না? তখন কি তিনি তাহাদের প্রতিও অসন্তুষ্ট হইবেন না?

মানুষের স্বভাবই এই তাহারা নিজের মনের ভাব লইয়াই অপরের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়: অপরাধী যে, তাহার ভাব বিচারকের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। মলয় যতই কামনার কথা ভাবিতে লাগিল ততই দুর্বিষহ ক্রোধে তাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। একটা বকুল গাছের তলে অন্ধকারে বেঞ্চে বসিয়া সে যখন এই কথাই ভাবিতেছে. ডঃ লাহিড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে আসিয়া বলিলেন—মলয়! বাড়ী-তেও ত দেখলাম না।

মলয় নিরবে, নতমুখে বসিয়া রহিল।

ডঃ লাহিড়ী একটু নত হইয়া মলয়ের কৃশ হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—মিসেস সেন্‌কে ত বল্‌তে হয় এখনি।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই মলয়ের মন হইতে কামনার প্রতি যত বিরুদ্ধতা জমিয়া উঠিয়াছিল, এক মুহূর্ত্তে সব দূর হইয়া গেল। মা যে একেই তাহার প্রতি কিরূপ অপ্রসন্ন হইয়া আছেন, তাহা ত মলয়ের অজ্ঞাত ছিল না. তার উপর মা যখন এই কথা শুনিবেন তখন অবস্থাটি যে কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহাও মায়ের-মেয়ে মলয় ভাল করিয়াই জানিত, তাই এই কথায় সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সমবয়স্ক সখীর কাতর ম্লান মুখখানি কল্পনা করিতেও মলয়ের মনখানি অবসন্ন হইয়া পড়িল।

ডঃ লাহিড়ী বলিলেন—মিস্ ঝিল্লি কি বাড়ী গেছেন বলে মনে হয় মলয়?

আমার ত তাই মনে হয়—বলিয়া মলয় দুহাতে মুখ ঢাকিল! এতক্ষণ সে এই ভয়ই করিতেছিল!

ডঃ লাহিড়ী এক মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন—তাঁকে জোর করে আনাই আমার অন্যায় হয়েছিল।

মলয় চুপ করিয়া রহিল। ভাবী পতির মুখের এই অনুশোচনাপূর্ণ কথা কয়টিতে মলয়ের মন আবার গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল।

ডঃ লাহিড়ী আপন মনেই বলিতেছিলেন—কিন্তু মনে কর না মলয়, মিস্ মিত্র—সেই-কি-বলে, আমাদের পাড়া-গাঁয়ের মা-মাসীর অঞ্চলের নিধি, ঠিক তাই। অবশ্য জোরের কথা সে কিছুতেই নয়। সবাইকেই যে বিলিতি ধরণে শিক্ষিতা হয়ে উঠ্‌তে হবে তার কি মানে আছে! কিন্তু তিনি—যদি তিনি অনিচ্ছার কারণটি সকালে খুলে বল্‌তেন, আমি কখনই তাঁকে পীড়াপীড়ি করতাম না। আমিও তার কারণ খুঁজতে চেষ্টা করিনি, আমারই তা করা উচিত ছিল—দোষ আমারই, মলয়!

না, না, আপনার দোষ কি!—বলিতে বলিতে কামনার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ডঃ লাহিড়ী সস্নেহে তাহাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া একটি কুঞ্জতলে আসিয়া বসিলেন। তখন উভয়ে মিসেস্ সেনকে কি করিয়া কথাটা বলা যায়, তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

মিঃ জোসেফ চৌধুরী এতক্ষণ মিসেস্ সেনের সঙ্গেই তাঁহার প্যারী সহরের অভিজ্ঞতার কয়েক পৃষ্ঠা যোগন করিতেছিলেন, হঠাৎ এক সময়ে তাঁহার মনে পড়িল, তিনি এ যাত্রা ধরগোস কচ্ছপের যুদ্ধে ধরগোস হইয়া গেলেন, লাহিড়ী কচ্ছপ হইয়াও বাজী জিতিয়া ফেলিল। মেয়ে দু'টা যে ডঃ লাহিড়ীর সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, চোখে না দেখিলেও এই ভীষণ সত্য তাঁহার অগোচর রহিল না। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ ও সৌভাগ্যবতী নগরী প্যারীর নাম বলিতে বলিতে কখন যে তিনি তাঁহার মানীর রাবেয়ের যাত্রার বিপদবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, নিজেই জানিতে পারেন নাই, মিসেস্ সেন তাঁহার ভুল ভাঙিয়া দিতে যখন বলিলেন—আপনার মানীও আপনার সঙ্গে ফিরেছেন না কি মিঃ চৌধুরী?—তখন চৌধুরীর লজ্জা রাখিবার আর স্থান ছিল না।

আবার ক্ষমা করুন, মিসেস্ সেন, আমি মনে করিয়াছিলাম, মানীমারা রাবেয়র যাইতে দিল্লীর গাড়ীতে চড়িয়া বসায়...

মিঃ মিঃ চৌধুরী, এরা কোথা গেল বলতে পারেন?

এই যে দেখ্‌ছি—জোসেফ চৌধুরী লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ইহাদের ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কামনাকে না দেখিয়া তাঁহার ভয়-কাতর দেহ হইতে প্রবলবেগে ঘেম-ধারা বাহিরিয়া পড়িল।

এক মুহূর্ত্ত পরে মলয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মাপ করবেন মিস্ সেন, আপনাদের বিশ্রাম্ভালাপে বাধা দিতে বাধ্য হলাম; মিসেস্ সেন আপনাদের ডাক্‌ছেন।

ডঃ লাহিড়ী উঠিয়া পড়িলেন, মলয়ও আস্তে আস্তে আসন ত্যাগ করিল। উভয়ে একবার উত্তরের দিকে এক নিমিষের জন্য চাহিয়া লইলেন, তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

জোসেফ চৌধুরী অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তিনি কতকটা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, কামনাকেও এইখানেই দেখিতে পাইবেন। তা যখন পাইলেন না, তখন বিস্ময়ও যেমন হইল, আবার কামনার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতেও তাহার চেয়ে বেশী কুণ্ঠা জন্মিয়া উঠিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া ডাকিলেন—লাহিড়ী!

লাহিড়ী ফিরিয়া বলিলেন—এস!

এখনও তাঁহার কৌতূহল নিবারিত হইল না।

মিসেস্ সেন মলয়ের শুষ্ক মলিন মুখের পানে চাহিয়া উদ্বেগাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কামনা কোথায় মলয়!

মলয় কোন উত্তর দিতে পারিল না।

ডঃ লাহিড়ী বলিলেন—তাঁর বোধকরি এখানে ভাল লাগছিল না মিসেস্ সেন, তিনি সম্ভবতঃ বাড়ী চলে গেছেন।

মিসেস্ সেন, আর অদূরে দাঁড়াইয়া মিঃ জোসেফ চৌধুরী উভয়েই একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। মিসেস্ সেন অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। কথাটা এমনই অবিশ্বাস্য যে ইহা যে কখনও সম্ভব হইতে পারে বা হয় তাহাই তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

কিয়ৎ পরে তিনি ডঃ লাহিড়ীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন—সে নিশ্চয় তোমাকে বলে যায় নি, লাহিড়ী?

ডঃ লাহিড়ী উত্তর দিতে পারিলেন না।

মাতা বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন, তিনি

বিশ্বা অনুমান করেন নাই। তাঁহার মুখভাব প্রলয় প্রভঞ্জনের পূর্বকালের আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কামনার সম্বন্ধে কোন কথাই আর বলিলেন না, একেবারে সোজা চলিতে চলিতে কহিলেন—এবার বাড়ী ফেরা যাক্—চল—তোমার বাড়ীর কথা বলছি, লাহিড়ী!

লাহিড়ী সন্ত্রস্তচিত্তে কহিলেন—আজ্ঞে হাঁ—চলুন।

বাড়ী আসিলে কি হইবে, সান্ধ্য-ভোজনের টেবিলে কচিৎ কখনও ছুরী কাঁটা—চামচেরই যা মৃদু শব্দ উঠিতেছিল, কেহ কোন কথাই কহিতে পারিতেছিলেন না। সান্ধ্য-সম্মিলন ব্যর্থ-বিফল হইয়া গেল।

অথচ প্রণয়ী-কবি লাহিড়ী এই সান্ধ্য-সম্মিলনের কত আশাই না করিতেছিলেন! কতখানি উদ্বেগ, কতখানি উৎকণ্ঠা, আশা, ভরসা লইয়া যে তিনি এই সন্ধ্যার প্রতীক্ষাতেই বুক বাঁধিয়া ছিলেন, তাহা বলা যায় না। জীবনের আকাঙ্ক্ষার বস্তুটি আজ তিনি এই সান্ধ্য-সম্মিলনেই প্রার্থনা করিবার আশায় সারাদিন কত জল্পনা কল্পনাই না করিয়াছেন! আশার অন্তহীন কত তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়তটে আঘাতিত করিয়া ফিরিয়াছে, কত কামনা, বাসনা তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে দুলিয়া দুলিয়া উঠিয়াছে তাহার কি সংখ্যা ছিল? আর একি অঘটন ঘটিয়া গেল! একটী কথাও বলিবার সুযোগ পাইলেন না! শত আশা, শত আকাঙ্ক্ষা উঠিল আর বুদ্বুদের মত মিলাইয়া গেল।

মিসেস্ সেন্ মোটরে উঠিবার বিশেষ কিছুই বলিলেন না, কেবলমাত্র একটা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার লাহিড়ীর দিকে চাহিয়া চালককে মোটর হাঁকাইতে আজ্ঞা দিলেন।

অদৃষ্টের পরিহাস! জোসেফ্ চৌধুরীও ম্লানমুখে তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া! মোটর অদৃশ্য হইতেই ও লাহিড়ী গৃহে ফিরিলেন। জোসেফ কোথায় গেল, কি করিল—কে জানে!

( ক্রমশঃ )

---

## পরশ

[ শ্রীশ্রীপাতপ্রসন্ন ঘোষ ]

তরুণ রবির পরশ লভি কমল কলি ফুটল গো,
ভুবন খানি উজল করি রূপের জোয়ার ছুটল গো।
এ কি পরশ হে প্রিয়তম,
লুকাল সব লজ্জা-সরম,
বন্ধে রচা ঘোমটা খানি নিমেষ মাঝে ছুটল গো!
কোন্ অধিরার রসে আমার কমলে এত ভোর,
ওগো আমার বাঞ্ছিত ধন—ওগো মন-চোর।
এ নহ ক্ষণিক জানাজানি,—
হৃদয় সাথে হৃদয় আনি
সৃষ্টি সুখের প্রথম দিনেই বেঁধেছিনু ডোর।
বিশ্বভরি এমন করি প্রেমের খেলা চলছে গো,
শুভ্র নদীর বক্ষে আবার পূর্ণ জোয়ার ছুটছে গো।
হৃদয়খানি রঙীন করি
রসের ধারা পড়ছে ঝরি,
দুঃখ-বেদন সকল কাঁদন সেই রসেতে ডুবছে গো।

---

নব বসন্তে
[প্রিয়জনকে উপহার দিতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের অ্যাইডিয়াল ব্রীজেনিয়েল এবং মেসিন প্রস্তুত—চন্দন, মরেল, বকুল, যাস্ত ও অন্যান্য সাবান ব্যবহার করুন।
ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী
৬৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

# বিদেশের স্মৃতি

[ শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল ]

তখন আমি সমুদ্রস্নানের প্রস্তাব করিলাম। তখনই তেল মাখিয়া গামছা কাঁধে করিয়া বাহির হওয়া গেল। কিছুদূর গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"সমুদ্র কই?" অমনি একজন রাস্তা দেখাইয়া দিল। ছেলেদের ভাষায় যথোপ-কথনের এই প্রথম চেষ্টা। রাস্তাটিতে ক্রমে up-hill উঠিতে লাগিলাম। ২ পার্শ্বে ছোট ছোট বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। খানিকটা উঠিয়াই আবার নীচের দিকে নামিতে আরম্ভ করিলাম। ২ দিকেই ঢাল, তাহাল ও খেজুর গাছ জঙ্গলের মত হইয়া উঠিয়াছে—কি সুন্দর দৃশ্য! হঠাৎ কল্লোল ধ্বনি শুনিয়া সমুদ্রের সান্নিধ্য বুঝিতে পারিলাম। পরক্ষণেই মুক্তাস্তরালে প্রসারিত নীলাম্বুরাশি দৃষ্টি পথে পতিত হইল।

Beachএর পাশ দিয়াই একটী বাঁধান রাস্তা। এ পুরীর মত শুধু গম্ভীর দৃশ্য নয়—নীল জলের পাশে নীল পাহাড় আর তীরে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজী—সে যে কি সুন্দর তাহা বর্ণনা করা যায় না। দূরে ২খানা জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। জেলেরা ডিঙ্গি লইয়া মাছ ধরিতেছে। একটী জেলে আসিয়া অনেক কৌশল করিয়া ২।৩টী পয়সা আদায় করিল। স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলাম, দেখি আহার্য্য প্রস্তুত। তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া উঠিলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া কয়েকখানি চিঠি লিখিলাম। ইহার মধ্যেই ২।৩ জন গাড়ীওয়ালা আসিয়া কখন গাড়ী লইয়া আসিবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ১টার সময় আসিতে বলিয়া দিলাম।

কাপড়-চোপড় পরিয়া "জি" বাবুর সহিত বাহির হইলাম। দরজায় ২জন গাড়োয়ান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। খানিকটা বাক্‌যুদ্ধের পর অবশেষে একজন অপরের গাড়ীর গরুর শিং ধরিয়া টেচাইতে আরম্ভ করিল—একজন "গাড়ীওয়ালা" বুঝাইয়া দিল যে সে বলিতেছে আমরা নাকি তাহারই প্রাপ্য। "ধীর ভোগ্যা বসুন্ধরা," জি বাবুকে বলিলাম "বুঝিয়া পড়া যাক্।" উভয়ের এই অপূর্ব্ব রথারোহণে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। সহরটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, একটী লম্বা রাস্তার দুই পার্শ্বে কতকগুলি দোকান। শেষপ্রান্তে একটী Mission School একেবারে সমুদ্রের ধারে। এখান হইতে সমুদ্রের দৃশ্য অতি চমৎকার। কয়েকটী দোকানদারের সহিত কাজ ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহই তখন উপস্থিত ছিলেন না। নিম্নশ্রেণীর বালিকারা নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীন-ভাবে রাস্তায় বেড়াইতেছে। মহারাষ্ট্রীয় বালিকাদের মত সুন্দর সহজ স্বাধীনতা নয় এ যেন একটু বেশী নির্লজ্জ ভাব। একটী ছোট বাজারে ঢুকিয়া দেখিলাম—সমস্ত জিনিষই অগ্নিমূল্য। এমন যে নারিকেলের দেশ তাহাও অগ্নিমূল্য। চতুরো বিদেশী দেখিয়া তাহারা প্রকৃত মূল্যের চতুর্গুণ চাহিতেছে. বিবেচনায় কিছু না কিনিয়া উভয়ে বাসায় ফিরিলাম।

একদিনের জন্য যে চাকর ঠিক করিয়াছিলাম সে যেন কিছু বেশী মনযোগ দিয়া কাজ করিতেছে। অবশেষে বুঝিলাম যে আমাকে একটী খুব বড়লোক সাব্যস্ত করি-য়াছে এবং আমার গা, হাত, পা টিপিয়া দিয়া, জুতা বুরুষ করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়া একটী জমো রূপসিল্ পাইবার প্রত্যাশা রাখে। এ দুর্দ্দিনে বিশেষতঃ রাস্তায় একখানি হাড় ছাড়া যায় কিন্তু আমা ছাড়া যায় না। যাহা হউক কিছু বখসিস্ দিতে রাজী হইলাম, সে বেশ করিয়া হাত পা টিপিয়া দিল। বৈকালে ৪-৩০টায় আবার বাহির হইয়া হাঁটিয়া "ওয়ালটেয়ারএর" দিকে চলিলাম। সুন্দর রাস্তা ঠিক বোম্বাই "হাজেরেন্ট" কথা মনে হইতে লাগিল। তেমনি শ্যামল ছোট ছোট পাহাড় ২।১ খানা বাড়ী আর অসংখ্য তাল গাছ। একটী ছোট হ্রদের মত জলাশয় হইতে বালিকারা পূর্ণ জলের কলস মাথায় করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। প্রায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাঁদিকে ৩।৪ মাইল দূরে একটী দীর্ঘ ও উচ্চ পাহাড়; জিজ্ঞাসা করিয়া অতিকষ্টে জানিতে পারিলাম যে ওটী "সীমাচলম" বা "সিংহাচলম।" ওখানে একটী মন্দির আছে এবং পর্ব্বতে উঠিবার সিঁড়িও নাকি আছে। পর্ব্ব উপলক্ষে ওখানে বৎসর বৎসর মেলা বসিয়া থাকে এবং বহু যাত্রীর সমাগম হয়। অনেক ভ্রমণকারী ওখানকার বনশ্রী বৃক্ষরাজী দেখিবার জন্যই ওখানে গিয়া থাকেন। সে দৃশ্যের একটু নমুনা আসিবার পথে পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

যাহা হউক অতদূর গিয়া মন্দির দেখিবার সময় ও সামর্থ্য তখন ছিল না সুতরাং দূর হইতে নমস্কার করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। একটী সুন্দর রাস্তা ক্রমে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে, সেইটী ধরিলাম। চারিদিকে অসংখ্য বড় বড় পাথর আর গাছপালাতে স্থানটী বড়ই তৃপ্তিপ্রদ বোধ হইতেছিল। কতক কাকে সুন্দর বাড়ী-গুলি। হঠাৎ কে যেন ডাকিতেছে বোধ হইল। নির্জ্জন পথ। সেদিকে তাকাইয়া দেখি—যে কিছুদূরে পাহাড়ের উপর একখানি বড় পাথরের উপর বসিয়া কে হাত ছানি দিয়া আমাকেই ডাকিতেছে। প্রথমে মনে হইল যে কোন বন্ধু হয়তো ওয়াল্টেয়ারে হাওয়া খাইতে আসিয়া-ছেন এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া ডাকিতেছেন। থামিয়া সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলাম। মূর্ত্তিটী দাঁড়াইয়া উঠিয়া সঙ্কেত করিতে লাগিল। দেখিলাম এতদ্দেশীয় একটী রমণী! এমন সময় ভীষণ শব্দে এক-খানি Motor Car পাশ দিয়া চলিয়া গেল, রমণীও বসিয়া পড়িল। আমার সেই সঙ্কেত। আর বুঝিতে বাকী রহিল না। কি ভয়ানক স্থান! বিদেশবেলায় অপরিচিত ভদ্রলোককে এইরূপ কুৎসিৎ আহ্বান। সোজা চলিয়া গেলাম। কিছুদূর গিয়া পিছন ফিরিয়া দেখি যে সে একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং সেইরূপ সঙ্কেত করিতেছে। তখন আমি অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি। ক্রমে বড় বড় Compound ওয়ালা সুন্দর বাড়ী পার হইয়া চলিলাম। এই ওয়াল্টেয়ার্। কি সুন্দর স্থান! স্বর্গের সৌন্দর্য্য সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। অধিকাংশই সাহেবদের বাড়ী। ক্রমে সমুদ্রগর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত প্রসারিত সেই চির পরিচিত নীলাম্বুরাশি আমার চির সৌন্দর্য্য-পিপাসু নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

মনে করিলাম যে Beach ধরিয়া ক্রমাগত চলিলেই Vizagএ পৌঁছিব। ইহা সম্ভব কিনা এবিষয় অন্যান্য ২।৩টী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া কল হইল না। কারণ কেহই আমার ইংরাজী অথবা হিন্দি বুঝিতে পারিল না। অবশেষে একটী বাসিত ও এক বৃদ্ধা ভিখারিণী ইংরাজীতে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে সে সকল আমার পরিত্যাগ করাই উচিত এবং ফিরিয়া বাঁ দিকের রাস্তায় গেলেই আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব। ভিখারিণীকে একটী পয়সা দিয়া আরও একটু গিয়া সুন্দর Brighton Hotel, Season Hotel প্রভৃতি অতিক্রম করিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ফিরিলাম। বাঁদিকের রাস্তা ধরিয়া অনেকটা আসিয়া দেখিলাম যে Spencer Co. Ltdএর পাশে আসিয়াছে। দূরে Bandএর শব্দ শোনা যাইতেছে। একটী দেশীয় ভদ্রলোককে ইংরাজীতে Vizagএর রাস্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ "Yes, Sir, certainly Sir, Good evening Sir" বলিয়া উত্তর করিলেন। বড় হাটকোট তুমি নিগ্রোকেও ইহদী করিতে পার আমিতো সবে আছি।

সন্ধ্যার বাসায় ফিরিয়া দেখি, চা প্রস্তুত। চা পান করিয়া শরীর বেশ সুস্থ বোধ হইল। রাত্রে খিচুড়ী ও আলুর দম—অমৃতে এ সুখ আর নাই ভাবিয়া বড়ই কষ্টবোধ হইল। এই পরিবারটী বিশেষ শিক্ষিত বা Enlightened না হইলেও এমন উদার ও আমায়িক ভাবে উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যেও অতিমাত্র বিরল।

---

## মানুষের জ্ঞান

[ শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ]

(সংস্কৃত হইতে)

কতকটা জ্ঞান পণ্ডিতে দেয়;
কতকটা আসে শাস্ত্র পড়ে;
কিছু মিলে দূরোদর্শন বলে;
কিছু বা ভাবনাসুত ঘরে।—
কোঁটা কোঁটা জলে নদীর সৃজনা,
বহু নদী মিলে সাগর গড়ে।

# মান-ভঞ্জন

## প্রেমের জয়।

বিশ্বজগতে প্রেমের জন্য এমন কোন অসাধ্য কর্ম নাই, মানুষ যাহা করিতে না পারে। প্রেমে মানুষ আপন-হারা হয়, প্রেমে মানুষকে স্বর্গীয় ভাব-ভূষিত করে, যাহার হৃদয়ে প্রেমের আলোক জ্বলিয়াছে, কোন অন্ধকারই আর তাহার চোখে অন্ধকার নয়। রমণীর প্রেম, রমণীকে কত উচ্চ স্থানে লইয়া যায়, মান-ভঞ্জনে তাহাই চিত্রিত হইয়াছে।

গিরিবালা স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত, বুঝি একদিন গোপীনাথ—তাহার স্বামীও গিরিবালাকে ভালবাসিত। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলি জ্যোৎস্নাস্নাত শরত কালের ন্যায় কাটিয়া গিয়াছিল। তারপর একদিন কোথাকার কালো মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল, দিক অন্ধকার হইয়া গেল। গোপীনাথ ছিল একজন ধনীর সন্তান, পিতৃমাতৃহীন গোপীনাথ পিতৃপরিত্যক্ত অঢেল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। মধুলোভে প্রমত্ত মধুপের মত, গোপীনাথের অর্থের সন্ধান পাইয়া অনেক "বন্ধু" আসিয়া জুটিল। তাহারা একদিন গোপীনাথকে থিয়েটারে লইয়া গেল।

নর্ত্তকী সরযূলতা ছিল এই বন্ধুদের হাতের ক্রীড়নক। বন্ধুরা সরযূকে জানাইয়া দিল, আমরা একটি স্বর্ণমৃগকে আনিয়াছি, জালে ফেলিতে পারিলে বহুকাল নিশ্চিন্তে কাটিবে।

সরযূ হাবে ভাবে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, গোপীনাথকে তাহার আকুল অসীম 'প্রেম' জ্ঞাপন করিতে লাগিল। গোপীনাথ এ সকলে অভ্যস্ত ছিল না, কোন রমণী যে অপূর্ব্বপূর্ব্ব কোন পুরুষের প্রতি এমন ভাবে প্রেমজ্ঞাপন করিতে পারে তাহা সে জানিত না। গোপীনাথের বন্ধুগণ বুঝাইয়া দিল যে এ প্রেম! সরযূলতার চাতুরী, বন্ধুর কৌশল, ভুক্তভোগী গোপীনাথ কিছুই বুঝিল না। দিনের পর দিন মোহ-জাল গোপীনাথকে বেষ্টন করিয়া ধরিতে

ছিল। শেষে এমন দিনও আসিল, লবঙ্গ যখন তাহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিত, তখন গোপীনাথের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কোথায় যেন ব্যথা বাজিয়া উঠিত, লবঙ্গ যখন তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া হতাশার অভিনয় করিত গোপীনাথের বুকটি ভাঙিয়া যাইত! এমন শুষ্ক হৃদয়, আকুল হৃদয় বেশ লইয়া কতদিন কাটে! গোপীনাথ লবঙ্গলতা ছাড়া আর সব ভুলিয়া গেল। তাহার প্রাণসমা পত্নী গিরিবালাকে ভুলিল, বংশ মর্য্যাদা, আত্ম-মর্য্যাদা সব ভুলিল। দিগন্তবিস্তৃত জলধির উপর একখণ্ড দ্বীপের মত জাগিয়া রহিল, লবঙ্গলতা!

আর গিরিবালা! সরলা প্রেমবিহ্বলা বালা অনেক দিন পর্য্যন্ত অবস্থাটা বুঝিতে পারিল না। স্বামী প্রেমে বঞ্চিত হইয়া গিরিবালা সংসারে কিছুতেই মন দিতে পারে না। ধনী গৃহের বধূ হইলে কি হয়, সে ত রমণী! স্বামীর চেয়ে বড় সম্পৎ আর কি আছে? গিরিবালা অশ্রুজলে বুক ভাসায় আর চায়ে, কি পাপে সে স্বামী-ধনে বঞ্চিত হইল!

অমন স্বামী, অত ভালবাসা, তবু কেন এমন হইল? গিরিবালার দিবসের কর্ম্ম অসমাপ্ত রহিয়া যায়, অতীতের মধুর স্বপ্নে তাহার রজনী বিনিদ্র অতিবাহিত হয়, গিরি-বালা জগন্মাতা কালীকে ডাকিয়া বলে, মা-গো! আমার এ কি করিলে মা? আমার সেইদিন আনিয়া দাও মা!

গিরিবালা ক্রমশঃ সব শুনিল। শুনিল তাহার স্বামী গন্ধর্ব থিয়েটারের কোন এক নর্ত্তকীর প্রেমে বাঁধা পড়িয়াছেন। গিরিবালার বড় ইচ্ছা হইল, একবার তাকে দেখিয়া আসে! একবার দেখিয়া আসে সেই রূপ, যে রূপের মোহে তাহার স্বামী তাহাকে চরণে ঠেলিয়া দিয়াছেন! গিরিবালা স্থির করিল সে থিয়েটারে যাইবে, তাহার স্বামীর প্রণয়িনীকে দেখিবে। তাহার শ্বশুরকুলের অভিভাবক বৃদ্ধ ভোলানাথ বৃথাই বাধা দিলেন, গিরিবালা কৃত সঙ্কল্প।

ঘড়িমাখা, কাজল পরা সুন্দরী রূপসীকে দেখিয়া লালসাময় পুরুষ ভুলিতে পারে, মোহ-কাম, লালসা প্রভৃতি কিছুরই উন্মাদনা নাই সে 'সে সৌন্দর্য্য' অতি সহজেই চিনিয়া লইতে পারে। রমণীর চোখে রমণীর সৌন্দর্য্য তখনই ধরা পড়িল। গিরিবালা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে এই সেই-রূপসী, যে তাহাকে স্বামী-ধনে বঞ্চিত করিয়াছে! সে কিছুতেই ভাবিতে পারিতে-ছিল না যে ইহারই রূপের মোহে পড়িয়া, ইহারই বাহুর বেষ্টনে বদ্ধ হইয়া তাহার স্বামী তাহাকে ভুলিয়াছেন!

এদিকে গোপীনাথের নিদ্রা ঘোর ধীরে ধীরে অপসৃত

হইতেছিল! নিশাশেষে গাঢ় নিদ্রা যেমন আপনা হইতেই তরল হইয়া আসে, গোপীনাথের প্রগাঢ় প্রণয়-বেগও তেমনি মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল. হঠাৎ একদিন কোথাকার এক ভীষণ নির্ম্মম আঘাতে সুপ্তি ভঙ্গ হইয়া গেল। একদিন লবঙ্গ তাহার নিকট হঠাৎ নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার চাহিয়া বসিল। গোপীনাথ তখন প্রেমরাজ্যের প্রজা, এ-সব পার্থিব সম্পত্তিতে মন দিতে পারে না। কিন্তু লবঙ্গ তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। গোপীনাথ অবশেষে বিরক্ত হইয়া টাকা আনিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

গিরিবালার চক্ষে নিদ্রা ছিল না, সে আকুল দৃষ্টি মেলিয়া, আশা-পথ চাহিয়া বসিয়াছিল, বুক ভরা কত আশা, কত উদ্বেগ কর্ত্তব্যাকুলতা তাহার সে দুটি নয়ন-পথে বাহির হইয়া আসিতেছিল! সে এই শূন্য গৃহে শূন্য প্রাণে নিশা জাগিতেছে, আর তাহার স্বামী! দেবতা তাহার! ও কে? তিনি না? গিরিবালার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। আবার তখনই—এক নিমিষের মধ্যেই—তাহার সকল আনন্দ নিরানন্দ হইয়া গেল। স্বামী চলিতে চলিতে তাহার আঁচল ধরিয়া লোহার সিন্দুকের চাবি চাহিল। কত কাকুতি, কত মিনতি, কত অঞ্চজল, রাত্রিটা গৃহে থাকিবার জন্য সে কত অনুরোধ—হায়ে, সব ব্যর্থ হইয়া গেল। নাতাল স্বামী কোন অনুরোধই রাখিল না, চরণাঘাতে স্ত্রীকে ভূপাতিত করিয়া, চাবি লইয়া সিন্দুক খুলিয়া যাহা পাইল লইয়া—লবঙ্গর উদ্দেশে ছুটিল।

সেখানে গিয়া যা দেখিল, তাহাতে তাহার মদের নেশা, রূপের নেশা, প্রেমের নেশা এক মুহূর্ত্তেই শূন্যে লীন হইয়া গেল। তাহার প্রণয়িনী লবঙ্গ তখন তাহার গোপন প্রণয়ীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সুখ নিদ্রামগ্ন। গোপীনাথের পা টলিয়া গেল, মাথা ঘুরিয়া গেল, সে স্বর্ণালঙ্কার, পাঁচ হাজার টাকা সবই ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া—চিরদিনের জন্য লবঙ্গর গৃহ ত্যাগ করিয়া যম-যমার বাগান-বাড়ীতে আত্মগোপন করিল।

বৃদ্ধ ভোলানাথের সেবা যত্নে গিরিবালা সুস্থ হইয়া উঠিল। গিরিবালা সুস্থ হইতেই ভোলানাথ সেষ জীবনটা কাশীবাস করিয়া কাটাইতে সহর ত্যাগ করিলেন—সতী-সাধ্বীর লাঞ্ছনা, তাহার মর্ম্মবেদনা বৃদ্ধের হৃদয় পিষিয়া ফেলিতেছিল—বৃদ্ধ সজলচোখে ততোধিক সজল অন্তঃকরণে গৃহত্যাগ করিলেন। এবার গিরিবালা স্বামীকে

কিরিয়া পাইবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতেও প্রস্তুত হইল।

কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, গন্ধর্ব থিয়েটারে একটী নায়িকা-পদ খালি আছে···গিরিবালা জানিত সে কোন্ থিয়েটার! সে জানিত, সেইখানেই তাহার স্বামী আছেন! গিরিবালা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করিল। থিয়েটার—যেখানে চরিত্রহীনা অভাগিনীরা লীলা করে, সেইখানে—সেই নরকে অবতীর্ণ হইতেও গিরিবালা আপনাকে প্রস্তুত করিল! তাহার মনে হইল, তাহার চেয়ে বড় অভাগিনী আর কে আছে? স্বামী প্রেম বঞ্চিতা রমণীর চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্য আর কার?

যে গন্ধর্ব থিয়েটারে এক অলোকসামান্যা সুন্দরী অভিনেত্রী আসিয়াছে। গোপীনাথ নবনব প্রেমে দাগা পাইয়া রমণীর সংস্রব ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল কিন্তু মদের নামে মদ্যপের যে দশা হয়, অভাগিনীর সুন্দরীর নাম শ্রবণে গোপীনাথেরও সেই দশা ঘটিল। গোপীনাথ একবার সেই সুন্দরী শিরোমণিকে চোখের দেখা দেখিতে আসিল। কিন্তু যখন দেখিল, তখন তার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কিছুক্ষণ তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না! এই সুন্দরী অভিনেত্রী! এ যে তাহার গিরিবালা! আর কেহ নয়, তাহার গিরি, তাহার

গিরিবালা রাধিকার ভূমিকা লইয়া নরকে অবতীর্ণ হইল। এবং অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকগণকে মুহূর্ত্তে বিস্মিত ও উত্তেজিত করিয়া দিল।

গোপীনাথ দরদালান বাগানে বসিয়াই শুনিতে পাইল পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা পত্নী গিরি। গোপীনাথ বক্ষ হইতে উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল—গিরি! গিরি! তুমি এখানে! তুমি—!

মাতাল-জ্ঞানে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ ঘাড় ধরিয়া গোপী-নাথকে পথে বাহির করিয়া দিল। উন্মত্তের মত গোপী-নাথ গৃহের উদ্দেশে ছুটিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, গিরিবালা

নাই। চাকর বাকরের মুখেও কোন সংবাদ পাইল না। তখন গোপীনাথ বুঝিল, গিরিবালা এখন যেখানে আছে, সেখান হইতে আর এখানে ফিরিতে পারিবে না, ফিরিবার পথও তাহার নাই! এই 'নাই' যে কি, তাহা আর কেহ বুঝিবে না, সে-যে কি ব্যথা, কি দুঃখ, সেই বুঝিল, সেই জানিল!

গিরিবালা সত্যই গৃহে ফিরিল না, দহরের অন্য এক অংশে তাহার শ্বশুরালয় গৃহে আসিয়া রহিল। শ্বশুরালয় মহাসমারোহ করিল, জামাতা যদি খুঁজিতে আসেন, তাঁহারা যেন গিরিবালার সংবাদ তাহাকে না দেন। শ্বশুর ও শ্বশুরাল পত্নী একটু হাসিলেন, বোধকরি অতীত দিনের কোন দৃশ্য তাঁহাদের মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

কিন্তু গিরিবালা সেখানে থাকিতে পারিল না। গোপীনাথের অসুস্থতার সংবাদ শুনিবামাত্র—এতদিনের অন্তর, অনাদর সব ভুলিয়া—সেই মুহূর্তেই গাড়ী ডাকাইয়া চলিয়া গেল।

গোপীনাথ চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়া দেখিল, তাহার শিয়রে বসিয়া, গিরিবালা! ক্লেশের অর্দ্ধেক যাতনা তাহার উপশম হইয়া গেল। গিরিবালা! সতীসাধ্বী গিরিবালা! তাহার প্রাণের গিরিবালা কি কখনও থিয়েটারের অভিনেত্রী হইতে পারে? অসম্ভব! তাহার মনে হইল সে যেন এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল, স্বপ্নের ঘোরে তাহার প্রিয়তমাকে হারাইয়া বসিয়াছিল। তখন হইতেই বক্ষ্যা আরম্ভ হইয়াছিল—স্বপ্ন শেষে সে চোখ মেলিয়া জাগিয়া উঠিল, প্রিয়তমাকে শয্যাপার্শ্বেই দেখিতে

পাইল, তখন তাহার মুখমণ্ডল বড় হইয়া গেল। হৃদয় মন এক অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল।

ধীরে ধীরে গোপীনাথ গিরিবালা একদিন তাহাকে জানাইল, গর্ভধারিণীর রাধিকার ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, সে সত্যই গিরিবালা!

তখন গিরিবালা একে একে সব কথাই খুলিয়া বলিল। বলিল যে সেখানে গিয়া সে স্বামীকে ফিরাইয়া পাইতে চাহিয়াছিল, সেখানে গিয়া সে একবার স্বামীকে দেখিতে চাহিয়াছিল। গোপীনাথ ভুল বোঝে নাই।

আবার সংসারকাননে সুখলতিকায় সুখ-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল; আবার সংসার অঙ্গণে সুখ শরতের শান্তিধারা ছড়াইয়া পড়িল। সুখ ভোলানাথ কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আবার এই সুখ-তরণীর হাল ধরিলেন, বলিলেন—কাশীতে

গোপীনাথ সব শুনিল। গিরিবালার অগাধ প্রেমই যে তাহাকে আবার গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছে—তাহাও বুঝিল। আর কোনদিন সে ভুল করিবে না, তাহাও স্বীকার করিল।

হাতে রেখালুম, বয়ে এখনও অনেকদিন পরমায়ু, তাই ফিরে এলুম! বুড়ো হলে তখন যাওয়া যাবে! *

---

* আমরা এই ছোটগল্পটি-রচক গৃহীত স্বনীয় রবীন্দ্রের "মান-ভঞ্জন" গল্পের।

# দেশ-বিদেশ

চাঁদপুরে শ্রীহরিসভক্ত সমাজের চেষ্টায় দুইটী অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় দুইটীর মধ্যে একটী চাঁদপুরে এবং অপরটী চাঁদপুরের সন্নিকটবর্ত্তী বদুয়াটী নামক গ্রামে স্থাপিত হইয়াছে। প্রকাশ, অনুন্নত শ্রেণীর বালকদের শিক্ষা উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয় দুইটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

---

গত ২৩শে তারিখে যে মর্দ্দন সম্পাদক হার সিটনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাকে কোলন সহরে প্রেরণ করা হইয়াছে। সে একজন ব্যবসায়ী বলিয়াছে, তাহার সম্মুখে বাড়ি আরও অনেকগুলা মালিশ মুলিতেছে। সে বলিয়াছে,—আমি ইহা-চেষ্টা করি নাই। কিন্তু অনেক লোক তাহাকে সাহায্য করিয়াছে।

---

তৃতীয় কলমে এক ভদ্রলোক লেখেন বলিতেছেন,—ভাটীয়ারকোর্ট ও তর্কের উপকূলে যাইবার ও আসিবার ষ্টীমার হইতে কিছু দূরে সমুদ্রে তিনটী 'মাইন' ভাসমান অবস্থায় তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। আইরিশ রি-পাবলিক বা মাইন সমুদ্রে পাতিয়া রাখাই যথেষ্ট হয়।

ডাবলিনের কাস্টম্‌স হিসেবে ভবনের তলে অনেকগুলা "মাইন" পুতিয়া রাখিয়াছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে তাহা ফাটিয়া যায় ও সিনেমা হাউসের পার্শ্বিকটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। দুইজন লোক 'মাইন' পুতিয়াছিল, সৈন্যেরা তাহাদের গ্রেপ্তার করে, তাহাদের মধ্যে একজন নিহত হইয়াছে।

---

'টাইমস' পত্রের রীফ-হিল সংবাদদাতা জানাইতেছেন,—৮ জন বিদেশী ডাক্তার এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম যে মেক্সিকোর রোগ অতিশয় এবং খুব সম্ভব তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।

---

শ্রীযুক্ত নিত্যরঞ্জন ধাম আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, কার্সিয়াংএ বিখ্যাত ঔষধ আমন নামে যে একটী আমন আছে তাহার সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই এবং তাঁহার নাম দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে তিনি কাহাকেও কোন অধিকার দেন নাই।

---

সহযোগী জ্যোতি বলিতেছেন—এক সময়কার, তাহে পৌষমাসীর জোছনা, সর্ব্বোপরি শ্রীজলধরের দোল, জোড়ি উৎসব, এমন সময়ে কেহ ঔষধালয়ে বিষ প্রয়োগ করিতে চাহিলে যে আপত্তি করে সে পাষণ্ড। কিন্তু শ্রীযদুনাথ মজুমদার মহাশয়কে আপত্তি করার অধিকার আমাদের ছিল না। তবু শ্রীযদুনাথ মজুমদার নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে অমনুষ্যক ভাষায় সিরাজদ্দৌলা বলিয়া সম্বোধন করায় শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে অভিযোগ আনিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখন হাজতে আছেন। সোমেন মহাশয়ের অপরাধের মধ্যে তিনি নাকি অবজ্ঞা করিতেছেন। তথাপি শ্রীযদুনাথের নামে লিখিতেছিলেন ও সেজন্য জেলার জীবনযাত্রা উপলক্ষে মাজিষ্ট্রেট ও পাষণ্ডের একজনের উপর হুকুম দিয়া বিদুষক পাঁচশত টাকা জেল ফোপাইতে বিধান। আর সেই জীবনী এই সময়। এভিডেন্স-কমিশনের জন্য কি কেহ নাই?

---

গত ২৭শে মার্চ আমেরিকান মার্কিণ পর্যটক ফলিকাতায় আসিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে ৮০ জন সেইদিন রাত্রেই আমার জাপী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা আগামী ২৮শে মার্চ আবার কলিকাতায় ফিরিবেন। বাকী সকলেই গ্রাণ্ড-হোটেলে অবস্থান করিতেছেন।

---

"দে দে ক্রনিকেল" পত্রিকার সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, ফেডিয়ার সুপ্রিম কোর্ট মুসলমান, সোমালী, আরব এবং ভারতবর্ষ বিবাদী মুসলমানদের একাধিক প্রতিনিধি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় ইসলাম ধর্ম্মের দুর্দ্দশা ঘটাইয়া, এবং কি মুসলমানদের ধর্ম্মগুরুকে "বোগিলাল" বলিয়া এবং তাঁহাদের ধর্ম্মের বিবিধ ভ্রান্ত আখ্যা এইরূপ ভারতবাসীয় ফেডিয়ার ফৌজদারের সহিত সমান অধিকার দাবী করিতে পারেন না, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ভারতবাসী এবং বিশেষতঃ মুসলমানদের উপর ইয়োরোপ বেশবাসীদের বিরাগ বিশেষভাবে জাগাইয়া দেওয়ার বিভিন্ন রেশের প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিপাত করিতেছেন বলিয়া "ইণ্ডিয়ান পিনাল কোর্ডে। ১৫০ (ক) ধারা অনুসারে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। ফেডিয়ার গভর্ণর মহাশয় সম্পাদক বিরুদ্ধে এজাহারের কারণ দর্শাইতে বলিয়া কিছু দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে আদালতে সোপর্দ্দ করিতে বিধান দিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে মুসলমান মহলে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।

(বাসক)

---

ফ্রান্সে ভবন যে জার্মানীর আক্রমণশীলতার আর বিশ্বাস নাই। ইংলণ্ডে এই লইয়া খুবই জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। কিন্তু ফ্রান্স এখনও কিছু পাওয়া যাইতেছে না। "টাইমস" বলিতেছেন,—ফ্রান্সের অস্ত্রাদি পূর্ব্ববৎ, কারখানা একরূপ বন্ধ। দুই পক্ষেই সমান [illegible]—কেহই হারিতে চাহে না।

ফ্রান্সরাজ্যের ফেডারী রাষ্ট্র [illegible] বলিয়াছে যে, ৩১শে মার্চ তারিখে বিরাম সংঘটিত হইবে, আমরা সেইদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব।

ফ্রান্সিস মিথিউরাঁ এইরূপ আশার বিরাগের যে, হিটলারের সেই-দিন বিপ্লব ঘটাইবে। তিনি আরও বলেন যে, এজন্যেরা সুদেতেনের ব্যাপারটা বড়ই সাংঘাতিক। যদি জার্মানীর "আয়রণ সল্ট"গুলি তাহাদের কার্য্যকলাপ বন্ধ না করে এবং অবশ্যম্ভাবী তাহাদের বিপক্ষতা করে তাহে হইলে যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী।

বিমানের বৈঠকে যুদ্ধের সন্ধি-প্রস্তাবের আলোচনা বিভিন্নের প্রতিনিধিবিগ্রহ অনুরূপ হইয়াছে। সেই কারণে প্রতিনিধিবিগ্রহকে লক্ষ্যযোগ করাইয়াছেন।

## ৺জ্যোতিশ্চন্দ্র সে

আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সাধন-সমিতির [illegible] জ্যোতিশ্চন্দ্র সে গত পরিষদ (ইংরেজী ২৩শে মার্চ)-রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় ইহধামত্যাগ করিয়াছেন। পরিষদের উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি কথাপ্রসঙ্গে পরিষদ করিয়াছেন—তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

১ম বর্ষ ] ২৪শে চৈত্র শনিবার ১৩২৯, ইং ৭ই মার্চ। [ ৩৬শ সংখ্যা

লবণ-কর বন্ধ কেন দরকার ?

# ১লা বৈশাখ ১৩৩০

বর্ত্তমান সংখ্যায় "বাসন্তী"র ১ম বর্ষের ৩য় খণ্ড সম্পূর্ণ হইল। অনেক দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও বাসন্তী যে সুধী পাঠক-পাঠিকাগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছে, তজ্জন্য আমরা দেশবাসীর নিকট কৃতজ্ঞ।

আগামী সংখ্যা ( ১লা বৈশাখ ১৩৩০ ) হইতে বাসন্তীর আকার যৎসামান্য পরিবর্ত্তিত হইবে। পৃষ্ঠা যা ছিল, তাহাই থাকিবে, প্রস্থেও যা ছিল, তাহাই থাকিবে, দৈর্ঘে যৎকিঞ্চিন্মাত্রায় ক্ষুদ্র করা হইতেছে। যে আকারের বাসন্তী এতদিন বাহির হইতেছিল, তাহার অনুরূপ কাগজ আজকাল বাজারে আদৌ পাওয়া যাইতেছে না, সে কারণে অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া আমাদের খারাপ কাগজও দিতে হইয়াছে। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ এই সামান্য পরিবর্ত্তনটুকু করিতে হইল।

আগামী সংখ্যা হইতে বাসন্তীর আকার যেমন পরিবর্ত্তিত হইবে, ইহার সৌষ্ঠবাদিও তেমনি আশাতীত রূপে বর্দ্ধিত করা হইতেছে। সে সম্বন্ধে আজ আমরা কিছুই বলিব না, মাত্র ১সপ্তাহ পরেই ১লা বৈশাখের সংখ্যা প্রকাশিত হইবে, দর্শনমাত্রেই আপনি নিজে সে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিবেন। বাসন্তীর স্থান যাহাতে অন্যান্য সমস্ত সচিত্র সাপ্তাহিকের উর্দ্ধে হয়, তাহার জন্য আমরা অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছি। ফলাফল অবশ্যই শ্রীভগবানের হাতে, আমরা চেষ্টা করিতে পারি, এই মাত্র।

১লা বৈশাখের আর দেরী নাই, এই কয়দিন বাদেই আপনার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিবেন।

পরিচালক, "বাসন্তী"

# নূতন গ্রাহকগণের প্রতি—

১৩২০ সালের বৈশাখ মাসের মধ্যে যাঁহারা "বাসন্তীর" নূতন গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা, ইচ্ছা করিলে ৩৭শ সংখ্যা ( ১লা বৈশাখ ) হইতে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক অথবা বাৎসরিক মূল্য দিয়া গ্রাহক হইতে পারেন। বৈশাখ ১৩৩০ হইতে চৈত্র ১৩৩০ পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হইবে। যাঁহারা ১ম বর্ষের ১ম তিনখণ্ড একত্রে লইতে চাহেন তাঁহারা ৪৸০ টাকা মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলেই বাঁধান "বাসন্তী প্রেরিত হইবে। যাঁহারা ১ম—১২শ ; ১৩—২৪শ ; ২৪—৩৬শ পৃথক পৃথক লইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের প্রতি খণ্ডের জন্য ১৸০ পড়িবে।

বাসন্তীর ৩৭শ সংখ্যা, অর্থাৎ ১লা বৈশাখ সংখ্যা আমরা বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে দশ-হাজার খণ্ড মফঃস্বলের দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে উপহার দিতেছি। মফঃস্বলের অধিবাসীগণের এ সুযোগ ইতিপূর্ব্বে আর কেহই দিতে পারেন নাই।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা :—

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র,
বাসন্তী সাহিত্য-মন্দির, গড়পার,
কলিকাতা।

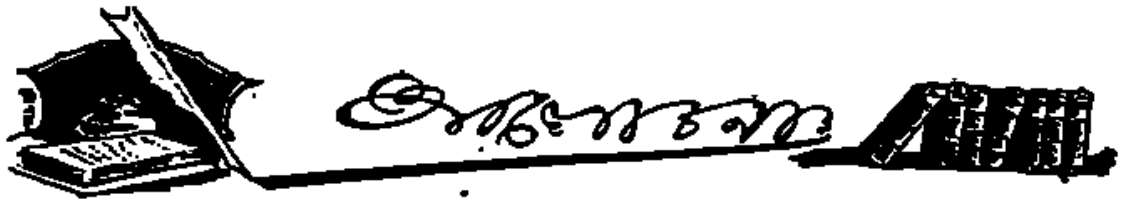


লাহিড়ি নির্য্যাতিত অন্যান্য কর্ম্মী দেশসেবক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী যশোহর প্রাদেশিক সম্মেলনের নেতৃত্ব-পদে বৃত হইয়াছিলেন। নিজ জীবনের দেশসেবার কথার মধ্য দিয়া শ্যামসুন্দর প্রপীড়িতা মাতৃভূমির অবস্থা ও সন্তানগণের সত্য স্বরূপ বিবৃত করিয়াছেন। হৃদয়ভরা পরিপূরিত উদ্ধাস, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার দ্বারা কেহ দেশমাতার পূজা করিয়া আনন্দ পান। শ্যামসুন্দর সেই শ্রেণীর প্রাণঢালা কর্ম্মী। ওজন করিয়া রাজনীতিক চালে কথা কহিবার ভঙ্গী তাই তাঁহার অভিভাষণে নাই। প্রাণের খেলা—প্রাণের স্পন্দন এ অভিভাষণে আছে। প্রাণহীন রাজনীতিক নীতি সূত্রের বাঁধা গৎ ইহাতে নাই—বাংলার প্রাণের পরিচয়—তাহার আশা নিরাশা, ত্রুটী বিচ্যুতির পরিচয় ইহাতে আছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের যশোহর অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর জাতীয় মুক্তি সম্বন্ধে বলিতে-ছেন হিন্দু বা মুসলমান রমণী সতীত্বধন রক্ষা করিবার জন্য যেমন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, ভারতবাসী তাহার জাতীয় মুক্তিকে সেইরূপ তীব্রভাবে তাহার ধর্ম্মসর্ব্বস্বরূপে অনুভব করিতে না পারিলে আমরা যে পন্থাই অবলম্বন করি না, স্বরাজ লাভের চেষ্টা সেইরূপ 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথার' মতই দাঁড়াইবে। Who lives in England dies? বলিয়া ইংরেজ কবি যুদ্ধের সময় তাঁহার দেশবাসীর মনে যে আবেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়াছিলেন আমরা তাহার শতাংশের একাংশ করিয়া থাকিতে পারিলেও আজ জাতীয় আন্দোলনের গতি এরূপ মন্থর হইত না। আর সত্য সত্যই বা আমরা করিয়াছি কি! কোন জাতি আপনার মুক্তির চেষ্টা না করে! তাহা হইলে তাহাদের মনুষ্যত্ব কি! জাতিত্ব কি! অন্য দেশে মুক্তির জন্য কি মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরের পতনের প্রতিজ্ঞা।

হিন্দু মুসলমান মিলন সম্বন্ধে শ্যামসুন্দর বলিতেছেন—'হিন্দু মুসলমান এখনও তোমরা এক হইতে পারিলে না। তোমাদের দুই সম্প্রদায়েরই যাঁরা যাঁরা লোক কত ত্যাগ করিল কত ক্লেশ পাইল তবু যদি তোমাদের হৃদয় দ্রব না হয় তবে আর তোমরা চির দাসত্ব ছাড়া কি আশা করিতে পারে?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর যশোহর অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বলিতেছেন 'মফস্বল হইতে কলিকাতা আসিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ড দেখিয়া আমার চক্ষু পুরা-পুরিই ফুটিল।...কতই আস্ফালন দেখিয়াছিলাম এই বিদ্যায় আমরা মানুষ হইতেছি, এরি বলে দশের মধ্যে মাথা তুলিবার আমাদের একটা জোগাড় হইতেছে। কিন্তু যখন একেবারে পীঠস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তখন দেখি যাঁরা স্বাধীন চিন্তার দাপটে মনু পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ভারতবর্ষের আপদ বালাই বলিয়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন সেই সকল বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিতদের টিকিগুলি Eximnershipএর হাঁড়ি কাঠে বাঁধা। এই বিদ্যার কারখানায় কেবলই কুদুলের আছাড়িই তৈয়ার হয়। সেগুলির মধ্যেও কোন ছাঁদছিরি নাই কোন সভ্যতা ভব্যতা নাই। তারপর যখন ক্রমেই এই বিদ্যার যাই-নাড়ার মতই জানিতে লাগিলাম তখনই আমার চক্ষু চড়কগাছ হইতে লাগিল। এই বিদ্যা দেশের কার্জে লাগিবে কি অকাজে লাগিবে, সে ত পরের কথা।... তখন এই যে শিক্ষা পদ্ধতির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ ঝুলিতেছে বলিয়া শুনিতে পাই তাহার স্বরূপটা সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে ধরিবার জন্য আমি একখানা বাংলা কাগজ বাহির করি। ...আজ কালালের কথা বাসি হইয়া কাজে লাগিয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া নাড়াচাড়া চলিয়াছে।

আধুনিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টা বলিয়া গৌরবান্বিত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী বলিয়াছেন—বংশের পর বংশ আসিবে ও যাইবে, রাজনীতিক দল উঠিবে ও ডুবিবে; মানুষের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিন সত্য ও জ্ঞানের মর্য্যাদা লইয়া জীবন্ত স্বাধীন স্রোতস্বতীর মত

প্রবাহিত হইয়া যাইবে। কাউন্সিল আসিবে ও যাইবে, মন্ত্রী সমাজ বিকশিত হইবে ও ঝরিয়া পড়িবে, দল গঠিত হইবে—আবার যাইবে কিম্বা দেশকালোপযোগী হইয়া চলিবে। কিন্তু তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমার বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানগণ হাজারে হাজারে লাখে লাখে দুদিনে ও দুর্দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভক্ত ও অনুগত থাকে!

• • • •

নিজের দিক হইতে স্যর আশুতোষ সরস্বতী ঠিক কথা বলিতে পারেন কিন্তু তোমাদের বলিয়া যাহাদের সম্বোধন করিয়াছেন তাহারাও কি ইহাই পরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারে? সব উঠিবে ও ঝরিয়া পড়িবে কিম্বা দেশ কালের উপযোগী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ই কি শুধু যেমন গোলাপের ফল প্রসব করিতেছে তেমনি আবহমান কাল প্রসব করিতে থাকিয়া নিরঙ্কুশ অবস্থায় দেশের ও জাতির অকল্যাণ করিয়া যাইবে? দেশবাসীর সে মত নহে—দেশবাসী একথায় সায় দিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলিত শিক্ষা নীতির পেষণে জাতি ও দেশ মরিতে বসিয়াছে। দেশ এ অবস্থা হইতে মুক্তি চাহিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থার ধ্বংসই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যদি তাহা হয়—তবে তাঁর অভিভাষণের কথিত অন্যান্য জিনিষ গুলি যাহা ধ্বংসের প্রার্থনা তিনি করিতেছেন তাহারও ফের বদলাইবে—দেশকাল উপযোগী হইয়া সে সব হল, মন্ত্রীসমাজ, বল সবই চলিবে। কিন্তু সোজার গলদ হইয়াছে এই বিশ্ববিদ্যালয়—তাই দেশবাসী নিজেদের ও দেশের মঙ্গলের জন্য ইহারই আমূল সংস্কার চাহে। এবং তাহা না হইলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসই সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। সত্য ও স্বাধীন জ্ঞানের মর্য্যাদা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেশে জীবন্ত স্বাধীন স্রোতস্বতী যদি সত্যই আনিতে পারে তবে দেশবাসী তাহা সানন্দে বরণ করিবে।

• • • •

আচার্য্য হাক্সলি ইংরেজদের শিক্ষা প্রথা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "We study in these days not to know but to pass, the consequence being that we pass and don't know." অর্থাৎ আমরা শিখিবার জন্য পড়ি না—পাশ করিবার জন্যই পড়ি—ফলে আমরা পাশই করে যাই অথচ কিছুই জানি না। ইংরেজদিগের শিক্ষা পদ্ধতি আমেরিকা এবং অন্যান্য উন্নত দেশের শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে তুলনায় আলোচনা করিতে গিয়া ইংলণ্ডের কোন বিচক্ষণ শিক্ষা পণ্ডিত বলিতেছেন The English educational system is grossly inefficient. It does not adequately prepare the people for the struggle of life. It creates enefficient leaders and an equally inefficient rank and file. That is unfortunately still true. British education is largely a sham which creates sham experts and sham leaders.

• • • •

বিশ্ব পণ্ডিত যাহারা আপনার দেশের শিক্ষা পদ্ধতিরই এইরূপ তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন সেই শিক্ষা পদ্ধতিরই অতি অপকৃষ্ট অংশ ভোগী হইয়াছি আমরা। এই শিক্ষা যন্ত্রের পেষণ হইতে পরীক্ষায় পাশ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছি বটে আমরা কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব ও কর্ম্মক্ষমতা যাহা তাহাও সঙ্গে সঙ্গে পাশের বিনিময় স্বরূপ শিক্ষা মন্দিরের চত্বরেই রাখিয়া আসিতেছি। কারণ তখন পাশের আনন্দের আতিশয্যে আমরা ভুলিয়া যাই যে ভবিষ্যৎ জীবনেও ওগুলির আমাদের প্রয়োজন হইবে কি না। কিন্তু সত্য জীবনে দাঁড়াইয়া শিক্ষার ও পাশের ভারে যেমনও ভগ্ন হইয়া যখন একেবারে সহায়হীন হইয়া পড়ি তখন আমাদের মনে পড়ে—হায় কি মোহময় শিক্ষাজালে বদ্ধ হইয়া মানুষের জীবনের কি অমূল্য সম্পদই না হারাইয়াছি। জীবনের অবলম্বন তখন থাকে শুধু অবসাদ নৈরাশ্য—দুঃখ বিষাদ—আর দুর্ব্বহ ভার জীবন—অন্ধ ও হাহাকারে তাহা ভরপুর। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ—তাহার শিক্ষা পদ্ধতির অপকারীতা সে সামলাইয়া লইয়াছে—কিন্তু পরাধীন আমরা সেই শিক্ষার পেষণেই পিষ্ট হইয়া মরিতেছি। তবু এই শিক্ষার জয় আমরা গাহিবই।

• • • •

শিক্ষার ব্যতিক্রম হইলে ও শিক্ষাধারা বিপথে চলিলে জাতি কোন দিন কোন বিষয়ে উন্নতি করিতে পারে না।

শিক্ষার জন্যই শিক্ষা—এ একটা অত্যন্ত ফাঁকা কথা। আমাদের দেশের সুকর্ণধার-প্রসবকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকগণ এই অজুহাত দেখাইয়াই বিশ্ববিদ্যালয়িক (এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রথা চলিতেছে) শিক্ষা প্রথার সমর্থন করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেন **Education is the chief industry of the nation.**

• • • • •

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি জাতীয় কর্মক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থা উন্নত না হইল তবে সে শিক্ষার মূল্য কি? বৈদেশিক শিক্ষা প্রথা লইয়াই আমাদের দেশের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়িক এই শিক্ষা প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিদেশী শিক্ষাপ্রথা এমন অকর্ম্মা ও দরিদ্র প্রসবিনী হইলে সে শিক্ষা দু'দিনও সে সব দেশে চলিতে পারিত না। এবং তাহার সমর্থন করিতে কেহ উঠিলেও তাহার মস্তক লজ্জা ও ঘৃণায় নোয়াইয়া পড়িত। আজ দেশের শিক্ষা মস্তিষ্কের বাহিরে আসিয়া হীন স্বাস্থ্য, হীন বল যুবকের দলের একমাত্র পেশা ও অবলম্বন হইয়াছে ঘোরে ঘোরে ঘুরিয়া তাহারা চাকুরীর উমেদারী করিবে। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য দাসত্ব করিবে। কেহ দাসরূপে ক্রীত হইতে পারিলে ভাগ্যবান মনে করে। যে সে সুযোগ পায় না—সে আপনাকে দুর্ভাগ্য মনে করে ও অর্থের অভাবে জীবন আর কি ভাবে দাসত্ব করিয়া চালাইবে তাহাই ভাবিয়া ব্যস্ত হয়।

• • • •

দেশের বিশেষ বুদ্ধি বৃত্তি সম্পন্ন, উন্নত ভবিষ্যৎ প্রয়াসী বালক ও যুবকেরাই দেশের বিদ্যামন্দিরে বহু আশা ভরসা লইয়া প্রবেশ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষা যদি ভাল ও দেশের মঙ্গলকর হইত তবে আমাদের দেশের এই হীন মরণাপন্ন অবস্থা আজ থাকিতে পারিত না। দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইত। দেশ নূতনভাবে ভাবিতে ও চলিতে পারিত। আমাদের দেশের খনিজ সম্পদ কৃষি সম্পদ লইয়া বিভিন্ন দেশবাসীরা আজ দুইহাতে অর্থ ছড়াইয়া জীবনের আনন্দ লুটিতেছে—জীবন পূর্ণভাবে উপভোগ করিয়া লইতেছে—আর দেশের সন্তান যাহারা তাহারা অ-কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সেই লুণ্ঠনকারীদের দুয়ারে দু'মুঠো অন্ন পাইবার আশায় হাত পাতিয়া পড়িয়া আছে। বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষার এই কল হইতে মুক্ত না হইলে জাতির আর মঙ্গল নাই। বৈদেশিকেরা যাহারা বড় হইয়াছে—অর্থ ও প্রতিপত্তি যারা যাহারা জগৎ কিনিয়া রাখিয়াছে তাহারা তাহাদের দেশ চলিত শিক্ষার প্রভাবেই উৎসাহী ও কর্ম্মক্ষম হইয়া প্রকৃতির সম্পদ দু'হাতে আহরণ করিয়া আনিয়াই জাতির ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে। আমেরিকা আজকাল জগতের মধ্যে সব চেয়ে ধনশালী দেশ। জগতের অন্যান্য জাতিদিগের ক্ষমতা ও শক্তিকে সেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহার শিক্ষাপ্রথা কিরূপ তাহার সামান্য পরিচয় দিতেছি।

• • • •

"The energy and ability of the American people are very largely due to the practical and thorough education and training which they have received. Their abilities are rather acquired than inborn. **America's economic success is largely due to the fact that, education is the chief industry of the nation.**" আমেরিকার চেয়েও বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যান্য জাতিদের আছে—কিন্তু তাহাদের শিক্ষাপ্রথা আমেরিকার মত কার্য্যকরী, জীবন পথের উপযোগী করিয়া চালিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা আমেরিকার মত সম্পদশালী নহে। তাই আমেরিকার কাছে তাহাদের মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হয়। তাই দেশের উন্নতির জন্য—কি অত বড় কথা না বলিয়া—শুধু প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবার—আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষাপ্রথার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এখন যে শিক্ষাপ্রথা দেশে চলিতেছে ইহার যাহারা যেন তাহারা যেমের ঝিউ হো নহেনই—শিক্ষার উদ্ভব নামের প্রয়োজন দেখাইয়া তাহারা দেশ ও

৪৷৷০ বিনামূল্যে লকেটসহিত ফটো
ফটো এনলার্জিং ১২×১০
ফটো সহ অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠান
কলিকাতা ফটো ষ্টুডিও, পেটেন্ট রবারষ্ট্যাম্প মেকার
৬৬নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

জাতিকে আরও দ্রুত অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতেছেন বলিতেই হইবে।

• • • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার লইয়া চ্যান্সেলার লর্ড লিটন ও ভাইস চ্যান্সেলর সার আশুতোষের মধ্যে যে পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল সে পত্রগুলি ঠিক সাধারণে প্রকাশযোগ্য কি না সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও (কারণ পত্রগুলি ঠিক অফিসিয়াল ও প্রকাশযোগ্য হইলে তাহা ঊনিভার্সিটির ঠিকানাই লিখিত হইত, সার আশুতোষের বাড়ীর ঠিকানায় লিখিত হইত না—বলিয়া মনে হয় আর ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে চ্যান্সেলারের ঠিক অফিসিয়াল ও সাধারণে প্রকাশযোগ্য সম্বন্ধই যে বরাবর ছিল ও এতাবৎকাল তাঁহাদের এ সম্বন্ধে যাহা হইয়াছে তাহা সবই যে সাধারণে জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে ইহার খবর আমরা জানি না) পত্রগুলি সাধারণে প্রকাশ করিয়া সার আশুতোষ দেশে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, রাজনৈতিক হিসাবে এবং জনসাধারণকে স্বমতে আনিয়া নিজ দল পুষ্টি করিবার কৌশল এ স্বাধীন চিন্ততা প্রদর্শনে যথেষ্ট আছে সন্দেহ নাই। আজ চ্যান্সেলর রূপী হুবে বাংলার লাটসাহেবকে মুখের মত জবাব দিয়া তিনি বাহুবের মত কাজ করিয়াছেন। অনেকে বলিতেছেন তবু বাংলা দেশে একটা লোকও এমন আমরা পাইয়াছি। বাংলাদেশের লাট সাহেবকে চোখা উত্তর শুনাইবার মত লোক একমাত্র সার আশুতোষই। আবার এই সার আশুতোষই অ-সহযোগনীতি ও মহাত্মার আন্দোলনকে একদিন সরকার পক্ষ হইতেই এমন ধাক্কা দিয়াছিলেন যে জনসাধারণ তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছিল। অসহযোগী ছাত্রদের চরণে দলিত করিয়া ভিক্ষাইয়া দিয়া অ-সহযোগের শ্রাদ্ধ করিতেও আজিকার স্বাধীনচেতা সার আশুতোষ দ্বিধা করেন নাই। আশা যতদিন থাকে ততদিন শুধু কথা লোকে ভাবে না—আশাহীন হইলেই শুধু কথা ভাবিয়া লোকে স্বাধীন হয়ে, তাই সাময়িক হিসাবে এ স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসের মূল্য আছে বটে। এ উচ্ছ্বাসকে স্থায়ী উচ্ছ্বাস হিসাবে না ধরিয়া কেহ যদি বাস্তার বাৎ করা বহুল উচ্ছ্বাস বলিয়া গ্রহণ করে বর্ত্তমানে, তাহাতে দোষ ধরিবার কিছু থাকিতে পারে কি?

• • • •

সার আশুতোষের বর্ত্তমান উচ্ছ্বাসে তিনি ভাইস চ্যান্সেলারদের সরকারের স্পাইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব কি যে বর্ত্তমান বিক্ষোভ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারী পদ তাঁহার পক্ষে বিষবৎ হইয়া উঠিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনিও সরকারের একজন গুপ্তচরই ছিলেন! বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারের ক্ষমতা চিরদিনই আছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যে আধী জনই সরকারের মনোনীত—নূতন বিলে তাহার বেশী আর কি করিবে?

• • • •

শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। সার আশুতোষ পূর্ব্বতন ভাইসচ্যান্সেলর সার দেবপ্রসাদ ও আরও কয়েকজনকে যেমন শাসাইয়াছিলেন নূতন ভাইসচ্যান্সেলারকেও তেমনি শাসাইয়াছেন। দল পুষ্ট করিয়া লোককে নাকানি চোবানি খাওয়াইবার ক্ষমতা তাঁহার আছে বেশ জানি। বর্ত্তমান 'ইনট্রিগ' সাফল্যও অদূর ভবিষ্যতেই দেখা যাইবে। কিন্তু এগুলি সবই পরাধীন দেশের ঘুরো রাজনীতির চাল—আপন প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার কলা কৌশল-মাত্র। এ চালে তিনি জয়ী হইয়া নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারেন বা হারিয়া গিয়া নাকাল হইতে পারেন। কিন্তু দেশ ও জাতি এ চালের খেলায় বিন্দুমাত্র লাভবান হইবে না।

আগামী সংখ্যায়
সুপ্রতিষ্ঠ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ মজুমদারের একখানি—কি, দেখিলে বুঝিবেন?

• • • •

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় সার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে প্রতি তিনজন ছাত্রের মধ্যে দুইজন ছাত্রের স্বাস্থ্যই অতি খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যখন থাকে তখন তাহাদের ভাবনা চিন্তা বড় বেশী থাকে না। পরের পয়সায় তাহারা খায় দায়—বড় বড় তেতলা চারতলা বাড়ীতে বাস করে, বিদ্যুৎ আলোর নীচে পড়ে। কলেজে ..

বিদ্যুৎ পাখার হাওয়া যায়—শুধু থাকে তখন এক পাশের চিন্তা। কিন্তু পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে আসিবার পরে যখন সংসারের আরও শত চিন্তা আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তাহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা যে আরও কত ভীষণ হইয়া পড়ে তাহা সহজেই অনুমেয়।

• • • •

আজ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বাসের জন্য প্রাসাদের মত অট্টালিকা করিয়া দিতেছে—ছাত্রেরা সেখানে বেশ থাকিতেছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পাশ যন্ত্র হইতে বাহির হইয়া ওদের দালান তাহাদের কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়। দেশের কুঁড়ে ঘরখানিকে বাঁচাইয়া রাখিবার যোগ্যতাও তাহাদের নাই দেখিয়া তাহাদের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত তাহারা পরিচিত হয়—তাহাদের সুখ ঐশ্বর্য্যময় জীবনের সঙ্গে নিজেদের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ অশান্তিময় জীবনের তুলনা করিয়া তাহারা অশান্ত অস্থির হইয়া উঠে। কিন্তু শিক্ষায় যেটুকু তাহিয়া দিয়াছে তাহাদের—পাশ শেষ দিয়া জীবনের মধ্য পথে আসিয়া আর জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা থাকে না তাহাদের।

• • • •

সমগ্র ভারতের কোটি কোটি নগ্নগাত্র, শাকভাত সম্বল অধিবাসীদের সহস্র আপত্তি, আবেদন সত্ত্বেও বড়লাট বাহাদুর এক কথায় লবণ কর তখন বাড়াইয়া দিলেন। গরীবের মুখের গ্রাস, প্রাণ ধারণের সম্বল লবণের উপর এ নেক নজর কর্ত্তাদের কেন যে পড়িল তাহা বুঝিয়া উঠা ভার। দেশবাসীর দুর্ভাগ্য দুঃখ-কাহিনীকে এমন ভাবে চরণে দলিত করিবার অধিকার কত কাল আর এ দেশে চলিতে থাকিবে? দেশ নাই—জাতি মরিয়াছে তাই দেশবত এভাবে লাঞ্ছিত হয়, তাই দরিদ্রের জীবন সম্বল মুখের গ্রাসে রাজকোষের নানা অনাবশ্যক বিলাস ব্যসন ব্যয় পূরণের ব্যবস্থা হয়। দেশবাসী অশন বসন অভাবে মরিয়াও সে ব্যয়ের জোগান দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু—কিন্তু জাতি মরিয়াও এ বড়র খেয়ালের তৃপ্তি বিধান আর কত দিন করিবে। লবণ বর্জ্জিত শুধুভাত খাইতে খাইতে দেশবাসীর যে অশ্রু ও হাহাকার হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিবে—সে হাহাকার অশ্রুজল কোন পথে মিলিবে?

• • • •

বিশ্বের নেতা অগত্যা পাশার নির্ব্বাসন দণ্ড রহিত করিতে হইল। স্বাধীনতা ও স্বরাজের ইচ্ছা যখন দেশবাসীর প্রাণে সত্য হইয়া জাগিয়া উঠে দেশের আবাল বৃদ্ধ নরনারী যখন ইহাকেই জীবনের প্রধানতম কার্য্য বলিয়া মনে করে তখন জগতের কোন বাহুশক্তিই ইহাকে বাধিত করিতে পারে না। বিশ্ববাসী দুঃখ সাধনা করিয়া স্বাধীনতাকে বরণ করিতে পারিয়াছে। ভিক্ষার ও স্তুতিতে স্বরাজ মেলে না, আত্মশক্তিতেই স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়। আজ ইংরেজরাও মিশর বাসীর স্বাধীনতা লাভের উগ্র আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—তাহাদের নাকি রাজনীতিক জ্ঞানও জন্মিয়াছে। স্বাধীনতার ইচ্ছা তেমন ভাবে জাগ্রত হইলে সাময়িক শাসনের ভয় আর জাতির আশা ও উচ্চ প্রবৃত্তিকে চিরকাল দমন করিয়া রাখিতে পারে না। আজ তাই মিশরের ইংরেজ শাসক অস্ত্রের অধিকারের চেয়ে হৃদয়ের বাস্তবতা লইয়াই মিশরে থাকিতে চাহেন। মিশর ও ভারতের রাজনীতিক অবস্থা অনেকটা এক—কিন্তু দেশবাসীর পার্থক্য বোধহয় যথেষ্ট—তাই ভারতের রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা আজও কারারুদ্ধ—অথচ ভারত নাকি জীবনের দীপক রাগিনী শুনিতে চাহে—ভারত নাকি নূতন সূর্য্যের আশার আলো দেখিতে চাহে!

• • • •

পাঠপাঠিকাগণ দেশ-বিদেশের সংবাদ শুদ্ধে বোমহর্ষণ দেবী নির্য্যাতনের সংবাদ পাঠ করিবেন। গত রবিবার হরিঘোষ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য শীতলাদেবীকে পাড়ার কোনস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা। উদ্দেশ্য সাধু—সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা এই যে, যেখানে দুর্ব্বল প্রতিবেশীকে চিরদিন প্রবলের মুখাপেক্ষী হইয়া, তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয় সেখানে দেবী নির্য্যাতনকারী জমিদার বাবুর বিপক্ষে বলিবার মত কিছুই থাকিতে পারে না। কলিকাতা সহরের জমির ব্যবসা যেরূপ লাভবান ব্যবসা, দেবী ভক্তির প্রাবল্য কখনই তাহাকে ছাপাইতেও পারে না, তবে এ কথা যদি সত্য হয় যে পাড়াপ্রতিবেশীগণ উক্ত জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে জমি-খণ্ডটুকু কিনিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন ও তজ্জন্য কিছুদিনের সময়ও চাহিয়াছিলেন, জমিদার বাবু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া নির্দ্দিষ্টকালের পূর্ব্বেই দেবীকে "পথে" বসাইয়াছেন ও দেবী-গৃহ ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা হইলে অবশ্যই পাড়ার ভদ্রব্যক্তিগণের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের কারণ হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। জমিদারবাবুর যতখানি স্বার্থ তাহা যদিই পাড়াপ্রতিবেশীগণের মিলিত চেষ্টায় সুরক্ষিত হইবার আশা ছিল, তাহা হইলে তাঁহার হঠকারীতার সমর্থন করা যায় না। তিনি নিজে হিন্দু, ব্রাহ্মণ, হিন্দুর হিন্দুত্ব, তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকাই সম্ভব, সে জ্ঞান নাই বলিলে তাঁহার অপমান করা হয়,—কাজেই তাঁহার দেব-দেবী বিশ্বাসী প্রতিবেশীগণের—অন্য কিছুর না হোক্—ধর্ম্মের মর্য্যাদাটা রাখিলেই ভাল করিতেন।

শ্রী

# গ্রন্থ আলোচনা

স্বরাজ কোন্ পথে? শ্রীহেমন্তকুমার সরকার রচিত। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। 'আমাদের সাধনা' 'কৃষিজীবী' 'শ্রমজীবী সমস্যা' 'নারী জাতির কর্তৃত্ব' প্রভৃতি তেরোটি প্রবন্ধ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সবগুলি প্রবন্ধই সুচিন্তিত ও সুলিখিত। পাঠকেরা প্রবন্ধগুলিতে ভাবিবার কথা যথেষ্ট পাইবেন।

---

নূপুর শব্দ। শ্রীহেমন্তকুমার সরকার রচিত। মূল্য দুই আনা। এই গ্রন্থখানিতেও দু'টি প্রবন্ধ আছে। ভাবে ভাষায় প্রবন্ধগুলি সুন্দর।

---

পাঁচ কথা। মূল্য পাঁচ আনা। এখানিও উক্ত গ্রন্থকার রচিত প্রবন্ধ পুস্তক। ইহাতে 'আধ্যাত্মিক হওয়া,' 'ইংরেজীর বহুত্ব', 'সমাজের চৌপায়ানা,' 'ভিতরের গোলামী,' 'আমাদের স্বদেশ,' 'বাঙালীর ব্যবসাদারী' 'গোলাম-খানার শিক্ষা' এই সাতটি প্রবন্ধ আছে। এই গ্রন্থখানির সবগুলি প্রবন্ধই আমাদের ভাল লাগিয়াছে—বিশেষ করিয়া বাঙালীর ব্যবসাদারী ও গোলামখানার শিক্ষা। ছোট ছোট প্রবন্ধগুলির মধ্যে যেন গুছাইয়া ভাবিবার ও জানিবার কথাগুলি বলা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির সুরেও অভিনবত্ব আছে। প্রবন্ধগুলি দেশের প্রতি মমত্বে ও ভালবাসায় উজ্জ্বল।

ছায়াবাজি। শ্রীহেমন্তকুমার সরকার রচিত গল্প পুস্তক। মূল্য আট আনা। এগুলি আমাদের দেশের চলিত মামুলি প্রেমের গল্প নহে। সমাজের অন্ধকার দিকের উপেক্ষিত অনাদৃত মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনী লইয়াই এ গল্পগুলি রচিত। ইহাও বর্তমান সমাজের একটা বড় সমস্যা। কারণ সমাজ জীবন ও জাতীয় জীবন ক্রমেই বেশী আঁধারে ছাইয়া ফেলিতেছে। ছায়াবাজি আশা করা যায় পাঠকের মন হইতে সরিয়া যাইবে না। দু'দণ্ড আলোর কথাও জাগাইবে।

---

উল্টা কথা। শ্রীহেমন্তকুমার সরকার রচিত। মূল্য আট আনা। এ বইখানিতেও সাহিত্য, শিল্প, আলোচনা, ভাষা, রাজনীতি প্রভৃতি বারোটি প্রবন্ধ আছে। লেখক আশা করিয়াছেন উল্টা কথা যদি কেহ সোজা বোঝে—কারণ আজকাল সোজা কথাই লোকে সাধারণতঃ উল্টা বোঝে। এই প্রবন্ধের বাঙালীর আত্মোন্নতি, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের স্থান, ভারতের সাধারণ ভাষা, বিশ্বের দরবারে ভারত, বর্তমান বাঙলা সাহিত্য, আর্ট ও জীবন প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি অতি সুন্দর। অভিনব কথা ও নূতন সুরের চিন্তাধারা দিবার চেষ্টায় প্রবন্ধগুলি চিন্তাশীল পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে সন্দেহ নাই। নব নব চিন্তায় ও কর্মে ক্লান্ত দেশের উপর কর্মচাঞ্চল্য ও নূতন প্রাণের সাড়া আনিয়া দেবার চেষ্টাও প্রবন্ধগুলির সর্বত্র দেখা যায়। দেশানুরাগে উজ্জ্বল প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

দ্বিতীয় 'হরিনাথ'
প্রথম হরিনাথ শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল—

উপাসনা।

শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়।

# শেষ চুম্বন।

[ শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী ]

(১)

তিন চার মাস পূর্ব্বের কথা; কয়েকজন বন্ধু রমেশকে কলিকাতার এক কদর্য্য স্থানে লইয়া গিয়াছিল। ১৯ বৎসরের যুবক, জীবনে প্রথম নারীর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিল। প্রথম প্রণয়ের পরিপূর্ণ উদ্দাম আবেগ তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। বংশমর্য্যাদা, চরিত্র, শিক্ষা সমস্ত ভুলিয়া রমেশ বারবণিতার রূপের বাত্যায় নিরীহ হরিণের মত বন্দী হইল। হাবভাব, কটাক্ষ, মধুর সঙ্গীত, অকুণ্ঠ মিলন—তাহাকে আজন্ম-অভিভূত করিয়া ফেলিল, নিরীহ শান্ত সুন্দর বালক অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রকৃতিগত স্থির সংবর্ত্তভাব হারাইয়া ফেলিল,—সর্ব্বদাই সে উত্তেজিত থাকে, বেশী কথা বলে না। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতে দেরী দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রুক্ষ উত্তর দেয়। জননী, সন্তানের ভাবান্তর দেখিয়া চিন্তিতা হইলেন,—বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

রমেশের হাতের টাকা শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। টাকা পরিমাণে যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, রমণীর প্রণয়াবেগও ততই শীতল হইতে লাগিল। রমেশ প্রথম কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে অবসর পাইলেই ছুটিয়া যাইত, রমির হাস্য আদরের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া কৃতার্থ হইত।

রমেশের আশাযুক্ত সুন্দর কল্পনায়—যে অবাধ প্রণয়ের, মুক্ত মিলনানন্দের অপরূপ ছবি আঁকিয়াছিল, কঠিন বাস্তবের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। একদিন রমণী সত্য সত্যই বলিয়া উঠিল,—না বাপু, তোমার ন্যাকামোপানা আর ভাল লাগে না। খালি পেটে কি আর প্রেম হয় বাপু। যে টাকা দেবে আমরা তার, তোমার কথা তোমার মনে দিলুম হ্যাঁ—ফিরক করো না।

রমেশ সুরমণে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল। টাকা? আর টাকা সে কোথায় পাইবে? কি হইবে? তাহাকে না দেখিলে সে বাঁচিবে কেমন করিয়া?

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সে পুনরায় সেই সুন্দরীর ভবনে উপস্থিত হইল। দ্বার রুদ্ধ ছিল, করাঘাত করিতেই, রমণী দ্বার খুলিয়া দিল। ফুলহারে সজ্জিতা অর্দ্ধবনাবৃতা, সুরাবিহ্বলা রমণী কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—আবার এসেছ যে?

রূপমুগ্ধ যুবক কথা বলিতে পারিল না। প্রাণের তৃষায় দুইচক্ষু ভরিয়া সেই রূপ পান করিতে লাগিল। —এক আকুল আবেগে সে অকস্মাৎ অগ্রসর হইয়া রমণীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। রমণী বিরক্তিভরে উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার দিয়া নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"চলে যাও এখান থেকে, ভালয় ভালয়, নইলে ভালো হবে না—বলে দিচ্ছি।"

বিহ্বল ভাবে রমেশ বলিল,—"তবে কি সব মিথ্যা! না, না, তা হ'তে পারে না, এত সুন্দর তুমি,—তুমি কি এত নির্দ্দয় হতে পার? তুমি—

এমন সময় পেছন হইতে এক কদাকার যুবক আসিয়া তাহার গলা ধরিল,—রমেশ ফিরিয়া চাহিতেই সে ইতরের মত গালাগালি করিয়া বলপূর্ব্বক রমেশকে বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইল। পলকের মধ্যে অপমানাহত রমেশ গর্জ্জিয়া উঠিল,—এক পদাঘাতে তাহাকে ভূপতিত করিয়া রমেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইবামাত্র আরও দুইজন তাহাকে আক্রমণ করিল,—রমেশ যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল।

(২)

কেমন করে কি হ'ল কিছু জানি না নিশীথ! আজ সকাল বেলায় যখন শুনলাম, খোকার কথা—আমার অদৃষ্টের দোষ! কিছুদিন হ'ল ও যেন কেমন কেমন হয়ে গিয়েছিল, আগেতো, বেশী কথা কইতো না, প্রাণ খুলে হাসতো না—মায়ের প্রাণ তো বোঝ—জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তর দিত না। সেদিন দুপুরবেলা খেতে বসে ভাল করে না খেয়েই উঠে গেল। সমস্তদিন নিজের ঘরে শুয়েছিল। বিকেল বেলায় জলখাবার নিয়ে গিয়ে দেখি বালিশের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে; আমার ডাক শুনে চমকে চাইলে—চোখদুটী লাল, ফুলে উঠেছে।

কত কথা জিজ্ঞাসা করলাম,—বিরক্ত হয়ে—বল্‌লে কি হয়েছে আবার! তারপর বেলা ৫টার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, রাত্রে আর ফেরেনি। আর যাহাকে তাহা দেখিলাম না—

চাসপাতালে রোগীর ক্ষুদ্র শয্যাপার্শ্বে টুলের উপর বসিয়া নার্স রমেনের মায়ের কথা নীরবে শুনিতেছিল। বুকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত রমেন অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, মাঝে মাঝে বেদনার অসহ্য তীব্র ক্রন্দনে তাহার পাতুর ওষ্ঠ দুইটী কাঁপিতেছিল। সন্তানের পাণ্ডু মুখখানির প্রতি চাহিয়া জননী কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"সিষ্টার! ডাক্তার সাহেব কি বলেছেন—বাছা আমার সেরে উঠবে-ত?"

নার্স ব্যথিত কণ্ঠে উত্তর দিলে, সারবেন বৈ-কি মা! তবে বড় খারাপ অবস্থা যাচ্ছে! ঈশ্বর আছেন, সেরে যাবেন বৈ-কি! রাত বড়...৩টা বাজল, এইবার আপনাকে 'ওয়ার্ডের বাইরে যেতে হবে। রোগীর চৈতন্য হ'লে আপনাকে দেখলে হয়ত উত্তেজনার কতস্থান থেকে রক্তস্রাব হতে পারে। আপনি ভাববেন না, সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হবে না। আপনি কাল বিকালে আবার আসবেন।

'নার্স' টির অস্বাভাবিক ব্যবহার ও সহানুভূতিতে দুঃখিনী জননীর চিত্ত গলিয়া গেল। ছেলেকে পরের হাতে রাখিয়া চলিয়া যাইতে মায়ের পা উঠিতেছিল না। পাশের অন্যান্য রোগী শুনিতে পায় এই ভয়ে জননী অতি কষ্টে ক্রন্দন চাপিয়া রাখিলেন। একবার অতি ধীরে কল্যাণ হস্তখানি পুত্রের ললাটে, গণ্ডে ও ওষ্ঠে বুলাইয়া কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিয়া জননী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চলিয়া যাইতে দুইবার ফিরিয়া সকরুণ স্নেহে পুত্রের প্রতি চাহিলেন।

৫ মিনিটের মধ্যে রোগীদের আত্মীয় স্বজনেরা চলিয়া গেলেন, 'ওয়ার্ড' নিস্তব্ধ হইল। 'নার্স' স্নেহকাতর জননীর কথা চিন্তা করিতে করিতে রমেনের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। তাহারও মায়ের মুখ মনে পড়িল, সেই করুণ সুন্দর স্নেহবিগলিত দৃষ্টি, সে আজ এক অপরিচিতা জননীর চক্ষে দেখিল।

'নার্স' টির বয়স আঠা। তাহার বন্ধ চক্ষুদুটীর মধ্যে এখনও কৈশোরের আনন্দ দীপ্তি নাচিয়া বেড়াইতেছে; মুখখানি দেখিলে নিতান্ত বালিকা বলিয়া মনে হয়। কুঞ্চিত কেশগুলি তাহার ললাটে, কর্ণমূলে, গণ্ডের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—যেন মূর্ত্তিমতী করুণা। বালিকা হইলেও রোগীর সেবায় সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। কেমন করিয়া রোগীর বেদনার লাঘব করিতে হয় তাহা সে ভালরূপে জানিত। মায়ের মত, বড় বোনের মত আদর করিয়া সে রোগীকে সান্ত্বনা দিত। তাহাকে শয্যাপার্শ্বে দেখিলে রোগীরা যেন অর্দ্ধেক জ্বালা ভুলিয়া যাইত।

মধ্যরাত্রে রমেন চক্ষু মেলিয়া চাহিল, 'নার্স' তাহার পার্শ্বেই বসিয়াছিল। সে যেন কি জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া কথা বলিতে চেষ্টা করিল। 'নার্স' অমনি বাধা দিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিল। বাধ্য শিশুর মত রমেন চোখ বুজিল।

পরদিন প্রভাতে 'সিষ্টার' সযত্নে রমেনকে 'গ্রুপ' খাওয়াইয়া দিল, ঔষধ খাওয়াইল। কোমলহস্তে ব্যাণ্ডেজটা ঠিক করিয়া দিল। এ সমেহ সেবা রমেনের মর্ম্মস্পর্শ করিল। সেবা-গৌরবের বিনম্র মহিমায় উদ্ভাসিত সিষ্টারের তরুণ সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল; কোন কথা বলিতে পারিল না। 'সিষ্টার' প্রায় সর্ব্বদাই তাহাকে দেখিতেছিল। প্রতিবারই রমেন কি কথা কহিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। এমনি করিয়া তিনদিন অতিবাহিত হইল। ইহার মধ্যে রমেন কয়েকবার অতি কষ্টে লজ্জায় দুষ্টিত হইয়া ডাকিয়াছে,—

—'সিষ্টার'

'সিষ্টার' তাহার চক্ষের উপর নত হইয়া বলিয়াছে,—কি? কি চাই? বল। রমেন বলিতে পারে নাই, সেই করুণা কাতর চক্ষুদুটীর প্রতি চাহিয়া রমেন নতদৃষ্টিতে মৃদুস্বরে বলিয়াছে,—না, কিছু না।

একদিন প্রভাতে রমেন সাহস করিয়া বলিল,—"আমার এখানে আসার পর থেকে কেউ আমায় দেখতে আসেনি?" "হাঁ, এসেছিলেন বৈ কি? তোমার মা প্রত্যহই তোমায় দেখে যান! কেন কাল তোমার সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেওয়া হয়েছিল।" "আর কেউ আসে নি?" "না আর কেউ ত আসেনি।" 'সিষ্টার' লজ্জা করিল, রমেন মুখ ফিরাইয়া ক্ষোভের

জল মুছিল। তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?"

রমেশের প্রাণের মধ্যে যে মর্ম্মান্তিক লজ্জার কাহিনী কাঁদিয়া ফিরিতেছিল, তাহা প্রকাশ করিবার আগ্রহে তাহার প্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠিল। এই সেবা, অযাচিত সহানুভূতি, এই স্নেহ ব্যবহার—বিচলিত রমেশ আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না,—"এত দয়া আপনার,—আপনাকে বল্‌লে হয়তো কতকটা শান্তি পাব। যা কিছু জানে না। হয়ত ভেবেছে এ একটা দুর্ঘটনা—কিন্তু আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম···। ইঙ্গিতে তাহাকে নীরব হইতে বলিয়া সিষ্টার বলিল "তিনি কতকটা সেইরকমই অনুমান করেছেন,—কিন্তু "আঃ" বলিয়া রমেশ কিছুক্ষণ নীরবে রহিল, তারপর মাথা নাড়িয়া বলিল,—দুঃখিনী মা আমার—আমি তাঁকে কত না কষ্ট দিলাম। কিন্তু কি করবো—বেঁচে আমার সুখ নেই, তাকে ছেড়ে কেমন করে বাঁচবো! ওঃ তাকে আমি কত ভাল বাসতাম্—সে কিনা আমায় রাস্তার কুকুরের মত তাড়িয়ে দিল। সিষ্টার, সে জানে আমি এই হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায়—তারই জন্য আমি আজ মর্ত্তে বসেছি,—একবার এসে দেখেও গেল না। পায়ের শব্দে আমি চম্‌কে উঠি, বুঝি সে আস্‌ছে—কৈ না? না, না....সে আর আস্‌বে না, তাকে আর আমি দেখ্‌তে পাব না...চাই না...আর নয়—আমিও আর তাকে দেখ্‌তে চাই না···সিষ্টার আর তার কথা তাব্‌বো না···তাকে আর ভালবাসা জানাবো না...না ..আমি তাকে আর ভালবাসি না···। রমেশের গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কি করুণ আত্মপ্রবঞ্চনা। কি দুঃসহ যন্ত্রণা। সহসা সে বলিয়া উঠিল—আত্মহত্যা করা মহাপাপ না সিষ্টার? নিশ্চয়! বোধহয় সকলের চেয়ে নিষ্ঠুর পাপ। কিন্তু যদি একজন সর্ব্বস্ব হারা হয় যদি আমার মৃত্যু রক্ষিত ও লাঞ্ছিত হয় তবে—তবে কি ভগবান তা বুঝবেন না...দেখ্‌বেন না···

'নার্স' তাহার বুকের উপর নত হইয়া ললাটে হস্তার্পণ করিল, মনোহর শ্রীবাভঙ্গি সহকারে তাহা মস্তকাবরণ খোলাইয়া ফেলিল "চুপ কর। চুপ কর। বেশী চিন্তা করলে মাথা গরম হ'য়ে উঠবে লক্ষী ছেলের মত চোখ বুজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দিকি।"

রমেশ আদেশ মান্য করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

(৪)

সন্ধ্যার পর হইতেই রমেশের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে লাগিল। রাত্রি ১টার সময় নার্স আসিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল। তখন রমেশ ছট্‌ফট্ করিতেছে। 'নার্স' তাহাকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলিল,—"একি তুমি কর্‌ছো কি—না, না ছট্‌ফট্ করো না, ঠাণ্ডা হয়ে থাক।" রমেশ বিড়বিড় করিয়া আপনমনে কি বলিতেছিল। 'নার্স' সস্নেহে তাহার হাতখানি, নিজের হাতে লইয়া অপর হস্তে সযত্নে তাহার ললাটের ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিল। এবং হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সে স্নেহস্পর্শে রমেশ কথঞ্চিৎ স্থির হইল। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হইয়া আসিল। কিন্তু সে নার্সের নিষেধ না মানিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল,—আজ আস্‌তে দেরী হয়ে গেছে বুঝ? হাতে যে কাজ ছিল...আচ্ছা কাল একটু তাড়াতাড়ি আসবো... বেলফুলের মালা! হাঃ হাঃ হাঃ—কাল এত মালা আন্‌বো তুমি পরবার জায়গা পাবে না...তোমাকে ফুল দিয়ে আমি পূজা করবো...দেখ্‌বে, আমি তোমায় কত ভালবাসি...তোমায় সব আমি ভালবাসি···ঐ চোখদুটী... তোমার হাসি, তোমার কথা...তোমার সব ভালবাসি... তুমি আমার জীবনের রাণী...তোমার হাসি গানের মত মধুর···তোমার অঙ্গে পদ্মের গন্ধ...

ক্রমে রমেশ অধীর হইয়া উঠিল, প্রলাপ বকিতে লাগিল, অর্থহীন কতকগুলি অস্ফুট শব্দ তাহার ম্লান কম্পিত ওষ্ঠে ফুটিয়াই মিলাইয়া যাইতে লাগিল। 'নার্স' আর কথা বলিল না—হতভাগ্য যুবকের মৃত্যু-কালিমা মাখা তরুণ মুখখানির প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া রহিল...এই পার্থিব প্রণয় বেদনার মর্ম্মান্তিক উল্লাস যেন বিশ্বাসী ভক্তের কাতর প্রার্থনার মত তাহার কর্ণে অনর্গল হইয়া বাজিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর রমেশ সহসা লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিল,—কি, যেতে হবে? আর আসবো না? আর তোমার সঙ্গে আমার আর...রমেশ হাঁপাইতে লাগিল। অতি কষ্টে টানিয়া টানিয়া শ্বাস ফেলিতে লাগিল। 'নার্স' চকিত হইয়া তাহার মুখের প্রতি উদ্বিগ্নভাবে চাহিল। রোগীর রক্তিম

চক্ষুদুটী যেন ইতস্ততঃ পাগলের মত কি অনুসন্ধান করিতে লাগিল,—তাহার চক্ষুপ্রান্তে, গণ্ডদ্বয়ে গাঢ়ী কৃষ্ণছায়া, ললাটে, মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম চুল বাহিয়া পড়িতে লাগিল—নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল—যেন মরণাহত রোগী অবশিষ্ট সামান্য সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত অতীত জীবনের সুখস্মৃতিগুলিকে নূতন করিয়া, দেখিবার অনুভব করিয়া লইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

'নার্স' তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল—যাও, তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে খবর দাও, ৬নং রোগীর অবস্থা অতি খারাপ।

রমেশ কাতর আগ্রহে নার্সের হাতদুটী চাপিয়া ধরিল। ধীরে অথচ স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিল.—না, না, যেয়ো না, যেয়ো না—তুমি যা চাও আমি তাই, যেয়ো... একটু আমার কাছে থাকো—আমি সব তোমায় দেবো... তুমি ছেড়ে গেলে আর আমি বাঁচবো না...দয়া কর...

রোগী বাইপাশে সিষ্টারের গলা জড়াইয়া ধরিল, অপর হস্তে আদর করিয়া তাহার চিবুক, গণ্ড, ললাট স্পর্শ করিল। ভাবে বিভোর হইয়া বলিল—কাছে থাকো—আমি তোমায় ভালবাসি।

রমেশ সিষ্টারের গাত্র স্পর্শ করিতেই সে চকিত হইয়া উঠিল এবং বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে চেষ্টা করিল।

না—না—আর যেয়ো না—একটু থাক—তুমি আমার সর্ব্বস্ব...তুমি স্বর্গের দেবী, আমার আরাধ্যা...

'নার্স' চক্ষু মুদিয়া মস্তক নত করিল। রমেশ আকুল আগ্রহে অধর স্থাপিত করিল,—কি প্রশান্ত ধীর আবেগময় চুম্বন—এইরূপ চুম্বনে সে বারবনিতার অপবিত্র আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মহারা হইয়া থাকিত।

ডাক্তার ঘরে ঢুকিতেই সিষ্টার কম্পিত দেহে রোগীর বাহু-বেষ্টন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। ডাক্তার রোগীর হাত ধরিয়া সবিস্ময়ে সিষ্টারের মুখের দিকে চাহিলেন,—সিষ্টার কোন কথা না বলিয়াই কম্পিতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল।

অভাগার জীবন-দীপ বহু-পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

---

## মনের ময়লা

( কবীর )

[ শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর ]

মনের ময়লা মোর কেমনে ধোয়াই,
সুবিমল বারি বিন্দু কোথাও না পাই।
চারিদিকে ঘোলা জল, চারিদিকে ক্লেদ
নিজ মলিনতা ধুতে নারে কোন' বেদ।
শত প্রতি জরাজীর্ণ কলঙ্কিত মন
ছুঁলে পরে যায়, কেবা করিবে যতন?
এ মনের মলিনতা কোথায় ঘুচাই
কবীর কহেন, গুরু ছাড়া গতি নাই।

---

## সময়ের খেলা

( সর্ব্বজ্ঞ )

[ শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ]

চাঁদের কালি ক্ষীণ তৃতীয়ায়,
সূর্য্যিমাতে পূর্ণকায়া;
খুব-ছোট যে বটেরি বীজ,
সে যেন আনে নিবিড় ছায়া;
সময় এসে' হাতটি ধোয়ায়,—
হঠাৎ লাগে ভেল্কি-মায়া!

---

জীবন রাখতে হলে
জীবন-রসায়ন
ইহা শরীরের রক্ত মাংস ও স্নায়ুর ক্ষতিপূরণ করে, পারে অথচ উত্তেজক নয়।
—তত্ত্ব লউন—শ্যামাদাস ঔষধালয়—৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# নারীর আত্মদান

[ শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ]

ভালবাসিতে ভালবাসা পাইতেই নারীর জন্ম। ভালবাসাই নারীর জীবন। আত্মত্যাগেই এ ভালবাসার উৎসকে সজীব রাখে। ত্যাগ ভিন্ন ভালবাসার জন্ম হইতে পারে না। সৃষ্টির জন্ম হইতে নর-নারীর প্রেম ও ভালবাসা চলিয়া আসিতেছে। পুরুষ নারীকে আপন ভুলিয়া সব বিলাইয়া দিয়াছে, নারীও সব ভুলিয়া ভালবাসার জনকে তাহার সর্ব্বস্ব প্রাণ মন সব নিঃশেষে বিলাইয়া সুখী হইয়াছে। একের হাসিমুখ দেখিয়া অপরের সুখ ও আনন্দ হয়—তাই সে আনন্দ লাভের জন্য যে দুঃখ কষ্টভোগ সে তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

নর ও নারীর এই ভালবাসা ও আত্মদানের ব্যাপারে যুগে যুগে পুরুষদের চেয়ে অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছে। সতী রাণী, সীতা দেবী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, সৈব্যা প্রভৃতি নারীরা আজও তাঁহাদের ভালবাসা ও ভালবাসার জনের জন্য আত্মত্যাগে স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছেন। ব্রজের গোপিনীরা কৃষ্ণ প্রেমে আপনাদিগের সত্তা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল।

পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে ঐ যুগেও নারীর এই আত্ম-ভোলা প্রেমের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বাংলার ঘরে ঘরে নারীরা তাহাদের স্বামী, পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য যথেষ্ট সহিতেছেন, আপনাদিগের সুখের পানে না চাহিয়া তাঁহারা ভালবাসার জনের সুখের জন্যই যেন আপনাদের বিলাইয়া দিয়াছেন। এই ভালবাসা এই আত্মদানেই নারীর সকল মাধুর্য্য সকল গৌরব। ভালবাসার জন্য নারীর এই যে সর্ব্বস্ব ত্যাগের কাহিনী ইহা কেবল যে ভারতেই প্রচুর মেলে তাহা নহে—কারণ নর নারীর প্রেম বিশ্বে সর্ব্বত্রই আছে তাহা এক ভারতেই সীমাবদ্ধ নহে। পাশ্চাত্য দেশেও নারীর প্রেমের এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। 'বাসন্তীর' পাঠক পাঠিকাদের আমরা তাহারই কিছু উপহার দিব।

'নারী স্বাধীনতার-উজ্জ্বল' নেত্রী পরমা সুন্দরী মেরী উল্টোনক্রাফট তাঁহার প্রেমিক কাপ্তেন ইমলেকে লিখিতেছিলেন 'আমি মরেও যদি তোমায় সুখী করতে পারি—তবে সে মরণ কত হাসিমুখে আমি বরণ করে নিতে পারি। তোমায় ভালবেসে আর কিছু চাই না আমি—চাই শুধু তোমার দুঃখ কষ্টের সমান ভাগ বইতে—তোমার ব্যথার ব্যথী হতে। জীবনের সকল বেদনা বিষাদ হতে যেন তোমায় দূরে সরিয়ে রেখে রাখতে পারি আমি। প্রতিদানে আর কিছু চাই না—চাই শুধু তোমার একটু সদয় ব্যবহার—মাঝে মাঝে একটু মধুর হাসি। আমার ভালবাসার প্রতিদান পাই আর না পাই শুধু এইটুকু যেন জানতে পারি—তুমি আমায় হৃদয় দান, বুঝেছ।'

নারী স্বাধীনতার অগ্রগামিনী এই মহিলা প্রেমিকের জন্য নিজের সুখ সব বিসর্জ্জন দিয়ে প্রেমিককে স্বেচ্ছায় তাঁর মনমত অপর সুন্দরীর হাতে তুলে দিয়ে সুখী হয়েছিলেন।

বেশ প্রেমিক প্যারিবাসির সুখের জন্য তাঁর পত্নী এনিতা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে দুর্গম স্থানে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, স্বামীর সঙ্গে জীবণ যুদ্ধক্ষেত্রে পর্য্যন্ত গিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরে, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে, সেই অবস্থায় তিনি সন্তানদের লালনপালন করেছেন ও স্বামীকে বিপদে আপদে সান্ত্বনা দিয়েছেন—কিন্তু স্বামী মোহাগিনী স্বামীর জীবনে শুধু তাঁর দুঃখেরই ভাগী হয়েছিলেন। সুখের দিন যখন এল তখন তিনি স্বর্গে চলে গেছেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বহু বিলাসিনী ফরাসী নারীরা স্বামীর সঙ্গে হাসিমুখে গিলোটিনে প্রাণ দিয়েছেন। রুশিয়ার কত নারী স্বামীর সঙ্গে রাজঅত্যাচারে হাসিমুখে সাইবেরিয়ার চির তুহিনাক্তর দেশে গিয়েছেন। সমাজের আনন্দ, বিলাসের আনন্দ, ভোগের আনন্দ সব ত্যাগে, স্বামী প্রেমে পূর্ণ হয়ে গেছে।

গলিত কুষ্ঠরোগী স্বামীর জন্য সুন্দরী উইলেট সমাজের বিলাস, ব্যসন সুখ সম্ভোগ সব ছেড়ে দিয়ে চিররোগী স্বামীকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে নির্জ্জনবাসকেই জীবনের চরম আনন্দ বলে গ্রহণ করেছিলেন।

ভালবাসার কাছে কত নারী রাজমুকুট—বিশাল রাজ্য সম্পদের প্রলোভন পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছেন। স্পেনের

সাম্রাজ্ঞী ইসাবেলা যখন এক ইটালীয় পাচকের পুত্র কার্লোস মারকোরির প্রেমে পড়ে গেলেন তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এ প্রেম কিনতে হবে তাঁর রাজসিংহাসনের বিনিময়ে। ভালবাসা যখন সত্য—প্রেম যখন নিবিড় তখন ভালবাসার জন্য রাজসিংহাসন ছাড়তে তার একটুও কষ্ট হোল না। রাণী একদিন তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে রাজসম্পদের চেয়েও কোন এক পরম সুখের প্রেম রাজ্যে চলে গেলেন।

রুশ সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ মেষপালক পুত্র এলেক্সিস্ গ্যাজোবের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেলেন। সাম্রাজ্ঞী জানতেন এ কে বিয়ে করলে রাজ্যের লোকেরা তাঁকে ঘৃণা করবে। কিন্তু প্রেমের কাছে এ ঘৃণা তুচ্ছ। তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল—সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের মত প্রেমিক ও স্বামী সোহাগিনী খুব কমই ছিলেন। মরণ সময়ে স্বামীর হাতে হাতখানি রেখে তিনি বলেছিলেন 'ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমি তোমার ভালবাসা পেয়েছিলাম। এ ভালবাসা আমার রাজমুকুটের চেয়েও ঢের সুখী করেছে। তোমার ভালবাসাই আমার জীবনের সত্য রাজমুকুট ও সুখ ছিল।'

সাম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন প্যাটিওবস্কিনকে ভালবেসেছিলেন। প্রেমিক মরে গেলে তিনি দিন রাত্রি নির্জ্জন গৃহে শুধু কেঁদেছিলেন—কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বড় দুঃখে প্রিয়কে সাম্রাজ্ঞী লিখেছিলেন 'কি ভয়ানক আঘাতে আমার প্রাণ একেবারে ভেঙ্গে গেছে। আমার বড় ভালবাসার দেবতার মত প্যাটিওবস্কির আর নাই। তার সঙ্গে জীবনের সব সুখ সাধ আমার চলে গেছে।'

স্পেনের ইনফ্যান্টা জোসেফাইন ও কবি ওয়েলি রেচির প্রেমে পড়ে নিজের সব বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। কবি রেচির জীবনও ছিল অদ্ভুত। জার্মেনার সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ করে কোন রকমে ইনি দিন গুজরাণ করতেন। এই সময়ে একজন ধনীর মেয়ের সঙ্গে ইনি প্রেমে পড়ে যান ও তাঁর পিতার কাছে বিবাহের কথা উত্থাপন করেন।

ধনী লেখকের কথা শুনে মহা রেগে বললেন 'দূর হও বাপু আমার সম্মুখ থেকে—আমার মেয়ের জন্যে যখন আমি বর খুঁজবো তখন তোমার মত হা ভাত লেখককে খুঁজতে যাবো না।'

রেচিও বিয়ে করতে এসে অপমানিত হয়ে রাগের সঙ্গে মেয়ের পয়লাওয়ালা বাপকে বললে—'যদাই লেখক বলে খ্যাতি আমার তেমন হয়ে কি আর আপনার কাছে মেয়ে চাইতে আসব—তখন রাজপ্রাসাদে গিয়ে কবির জীবনসঙ্গিনী খুঁজবো—জানবেন।

রাগে, দুঃখে রেচি স্পেনে গিয়ে সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করলেন। কত দুঃখ কষ্ট সয়ে তিনি কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতনামা হলেন। কবি তাঁর অনেক কাব্যই রাজকুমারী জোসেফাইনকে উৎসর্গ করতে লাগলেন। সুন্দরী রাজকুমারী কাব্যভাবে বিমুগ্ধ হয়ে তরুণ কবির পরিচয় নিলেন। কবির কাব্যের চেয়েও কবিকেই তাঁর ভাল লাগল। মুগ্ধা সুন্দরী একদিন কবিকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন—গোপনে ভ্যাটাভোলিডে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল। সর্ব্বস্ব দিয়ে রাজকুমারী প্রেমের সাধনা করলেন, প্রেমযজ্ঞে আত্মাহুতি দিলেন। রাজপ্রাসাদের সুখ সম্ভোগ ছেড়ে রাজকুমারী তাঁর কবি স্বামীর আবরিণী হয়ে পরম আনন্দে কুটীরে বাস করতে লাগলেন।

ব্যাভোরিয়ার রাজকুমারী এলিজাবেথও একজন সেনানীর প্রেমে পড়ে সহস্র বাধা বিঘ্ন এড়িয়েও তাঁকে বিয়ে করেন। এতে তাঁকে অবশ্য রাজকুমারীর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সবই বিসর্জ্জন দিতে হয়েছিল। কিন্তু প্রাণের জিনিসকে পেতে হলে বাহিরের সবই যে ছেড়ে দিতে হয়। প্রেমিক প্রেমিকার এ সম্মেলন সুখের হয়েছিল। রাজকুমারী বিয়ের পর তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন 'এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে কোরো না—যে কাজ আমি করেছি তার জন্য বিন্দুমাত্রও অনুতপ্ত—এ সুখের তুলনায় রাজমুকুটের সুখ অতি তুচ্ছ।'

ভালবাসার জন্য এমনি আত্মদানের কাহিনী পাশ্চাত্য সমাজ থেকে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ব্যাভোরিয়ার রাজকুমারী এলিজিয়া সব সম্পদ ছেড়ে জোগা নামক একজন অতি সামান্য অবস্থার লোকের পত্নী হয়েছিলেন। স্পেনের রাজকুমারী এলিজিয়া একজন অখ্যাতনামা আর্টিষ্টকে তাঁর হৃদয় দিয়ে তাঁর পত্নী হন। বিপুল বিত্তশালিনী জেনোয়ার ডাচেস একজন সামান্য অবস্থার লোককে ভালবেসে তাঁর সঙ্গে বিয়ে করে সুখী হয়েছিলেন।

ফ্রান্সানির ক্রাউন প্রিন্সের দুইয়া রাজমর্য্যাদা ছেড়ে এনরিকো টোমেলি নামে একজন তরুণ ইটালীয় সঙ্গীতজ্ঞের পত্নী হওয়া ভাগ্য বলে মনে করেছিলেন। লেডী এলেনবরো একজন আরব উষ্ট্রচালককে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। আগে এই লোকটাকেই লেডী 'নোংরা কালো আরবী' বলে ডাকতেন। প্রেমের চোখে কালও সুন্দর হয়। পরে এই নারীই তার প্রেমিকের সব ইচ্ছার দাসী হয়েছিলেন। মরুভূমিতে এই মহিলা স্বামীর উষ্ট্র মোহন করেছেন। স্বামীকে বেঁধে দিয়েছেন, খেতে বসলে পাখার বাতাস করেছেন। যে লোক পায়ের জুতা পরিয়ে দেবারও যোগ্য নয়,—প্রেমে ভালবাসায় প্রেমিকা তাঁর তৃপ্তি বিধান করেই আনন্দিতা।

আর্ল অব ষ্ট্রাটমুরের বিধবা স্ত্রী তাঁর ঘোড়ার সহিসকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে নারী যখন তাঁকে প্রেম নিবেদন করেন তা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে ফোবস বলেছিল 'কিন্তু আমাদের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। আপনি দেশের একজন বড় সম্ভ্রান্ত মহিলা—আর আমি যে কিছুই না।—'

উত্তরে কাউন্টেস বললেন 'ও কথা বোলো না। আমার এ অর্থ-সম্মানের চেয়ে তুমি আমার অনেক বড়। তোমায় পেয়ে আমার যত সুখ হবে—এত সুখ এসব জিনিসে কোনদিনই আমায় দিতে পারবে না।'

প্রেমে অসম্ভবকেও সম্ভব করে। ষ্ট্রাটমুরের পরমা সুন্দরী কাউন্টেস—ডিউক ও রাজাদের বংশের মেয়ে ভালবেসে ঘোড়ার সহিসকে আত্মদান করলেন, বিবাহ করে আনন্দিতা হলেন।

প্রেমের রাজ্যে ভেদাভেদ নাই। প্রেম অসুন্দরীকে সুন্দর করে। ছোটকে বড় করে দেয়। নারী আত্মদান করেই চিরকাল এমনি করে প্রেমের মর্য্যাদা বিশ্বে রেখে আসছে।

---

# ফরাসী বিপ্লবে নারী

[ শ্রীসুমতি দেবী ]

সুন্দরী প্রিন্সেস ডি লাম্বেলের বাল্যকাল টিউরিনের কোর্টে অতিবাহিত হয়। সুন্দরী মাতার নিকট সঙ্গ-প্রভার দৃষ্টিক্ষা পাইয়াছিলেন। আঠার বৎসর বয়সের সময় এই সুন্দরীর ডিউক ডি পেনথিভারের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। সুন্দরীর স্বামী অতি অসৎ চরিত্রের যুবক ছিলেন। পত্নীর অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইনি বিবাহের পর কয়েক সপ্তাহ অত্যন্ত পত্নী-প্রেমিক হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পাঁচ মাস পরেই ইনি বাহিরের এক সুন্দরীর প্রেমে পড়িয়া গেলেন এবং কিছুকাল অত্যন্ত অসংযত জীবন যাপন করিয়া অসুস্থ হইয়া মৃত্যুর পর পত্নীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ম্যাডাম ডি লাম্বেল অনেক সাহিত্য পত্নীর ন্যায় স্বামীকে ভালবাসিতেন। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন। রাজসভার আনন্দময় বিলাস জীবন ইনি ত্যাগ করিলেন।

পরে পঞ্চদশ লুইয়ের কন্যা ম্যাডাম এ্যাডিলেড ইহার সৌন্দর্য্য, চরিত্র মাধুর্য্য ও দুঃখময় জীবনকাহিনীতে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় ইহাকে রাজসভায় লইয়া যান। পঞ্চদশ লুইয়ের সঙ্গে ইহার বিবাহের প্রস্তাবও চলিয়াছিল এমনকি তাহা লইয়া অনেক গুজব ও উঠিয়াছিল কিন্তু বিবাহ হয় নাই। পরে রাজকুমারী দেবী এ্যান্টয়নেটের সঙ্গে ডফিনের বিবাহ হওয়ার পর ইনি ফরাসী রাজসভায় বিশেষ করিয়া যোগ দেন। মেরী এ্যান্টয়নেট একজন বন্ধুর অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিলেন—তিনি এই সুন্দরীর দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মেরী এ্যান্টয়নেট ফরাসী সাম্রাজ্ঞী হইয়া বন্ধুকে রাজদরবারের তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। বন্ধুকে সব সময় নিকটে রাখিতে পাইয়া রাজ্ঞী লিখিতেছেন 'বন্ধুকে সুখী করিতে পাইয়া তাঁহাকে নিকটে রাখিতে পারিয়া আমি তাঁহার চেয়েও বেশী সুখী। এই সময়ে ম্যাডাম ল্যাম্বেলের সঙ্গে রাণীর ভালবাসার আরও একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া গেল। কাউন্টেস জুলেস ডি পলিগ্ন্যাক রাণীর প্রাণের বন্ধু হইয়া রাজদরবারের সর্ব্বময়ী হইয়া পড়িলেন। সুন্দরী ল্যাম্বলে রাজসুহৃদ ছাড়িয়া দূরে গেলেন?

এই সময়ে ফরাসী বিপ্লবের ভেরী বাজিয়া উঠিল। রাজা রাণীর জীবনের উপরেই বিপ্লববাদীদিগের ক্রোধ। বুদ্ধিমতী কাউন্টেস বিপদ বুঝিয়া রাজসুহৃদ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। এই বিপদের সময় রাণীর পুরাণ বন্ধুর কথা মনে পড়িল। তিনি ম্যাডাম ল্যাম্বলেকে কাছে আসিতে লিখিলেন। রাণীর সব সময় ভয় সব সময় চিন্তা কখন কি বিপদ হয়। ল্যাম্বলে নারীর শক্তিতে যতদূর কুলায় সেই ভাবে রাণীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময় রাণী ও ল্যাথলের বিচ্ছেদ হইল। রাণী আর জীবনের আশা নাই দেখিয়া ল্যাথলেকে প্যারীতে আসিতে নিষেধ করিলেন। কার্লাইল লিখিতেছেন

প্রিন্সেস ডি ল্যাথেল।

'সুন্দরী প্রিন্সেস ডি ল্যাথেল ইচ্ছা করিলে এই সময় লণ্ডনে গিয়া নিরাপদ হইতে পারিতেন। কিন্তু সুন্দরী তাহা না করিয়া ভীতিপ্রদ পরিণামই বরণ করিলেন।' সুন্দরী এল্-লা-চ্যাপেলে রহিলেন। এই সময়ে রাণী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে আবার প্যারীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সুন্দরীর বন্ধুরা বলিলেন 'এখন প্যারীতে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত।'

সুন্দরী উত্তর করিলেন 'রাণী আমায় চাহিয়াছেন। বাঁচি বা মরি রাণীর কাছে আমায় যাইতে হইবেই।' বিপদ জানিয়াও বন্ধুর বিপদে তাঁহাকে যতটা সান্ত্বনা দেওয়া যায় তাহা দিতেই হইবে। সুন্দরী নিরাপদে প্যারী পৌঁছিলেন। বিপ্লবপন্থীদিগের রক্তের ক্ষুধা ক্রমেই তীব্র হইতেছিল। বিপ্লবপন্থীরা রাজভবন আক্রমণ করিল। রাণী শুনিলেন রাজারাণীর জীবনের জন্য তাহারা চীৎকার করিতেছে। রাণী তখন পরামর্শ সভায় ছিলেন—বিপ্লববাদীরা রাজার কক্ষ ভাঙ্গিয়া তথায় ঢুকিয়া রাজাকে আক্রমণ করিয়াছে। রাণী ছুটিয়া রাজার পাশে যাইতে চাহিলেন, সুন্দরী ল্যাথলে রাণীকে বাধা দিলেন। রাজবন্দীদিগকে ধরিয়া লওয়া হইল। সুন্দরী ল্যাথলেও সেই সঙ্গে রাণীর সঙ্গিনী হইলেন। বিপ্লববাদীদিগের বিচারালয়ে সুন্দরী ল্যাথলেকে উপস্থিত করা হইল।

বিচারালয় ক্ষুব্ধ, জনতাপূর্ণ। গরমে ও রক্তের খেলায় সুন্দরী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য মাত্র। সুন্দরী উঠিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইলেন। সুন্দরীকে শপথ করিতে বলা হইল—'স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের ও রাজবংশের প্রতি ঘৃণা। সুন্দরী বীরভাবে উত্তর করিলেন 'প্রথম দুইটি শপথ আমি একান্ত মনে করিতে পারি। কিন্তু শেষটি আমি করিতে পারিব না কারণ আমার অন্তরে সে কথা বলে না।' একজন বন্ধু বলিলেন—'শপথ কর—নতুবা তোমার জীবন যাইবে।' সুন্দরী বলিলেন 'আমি কিছুই বলিব না। দু'দিন আগে বা পাছে মৃত্যু আমার পক্ষে সমান। আমি জীবন আমার উৎসর্গ করিয়াছি।'

সিলোটিনে হত্যার পর সুন্দরীর মৃতদেহ প্রকাশ্য রাজপথে লইয়া বেড়ান হইল। কার্লাইল লিখিয়াছেন, নারী সুন্দরী ছিলেন, সৎ ছিলেন, জীবনে তিনি কখনো সুখের আস্বাদ পান নাই। পূজার যোগ্য সৌন্দর্য্য যাহা—রাজার পূজিত—ভগবানের দান সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য যুগে যুগে যুবকদিগের চিত্ত ব্যথিত করিবে। হায় অভাগিনী ভগিনী নারী—আমি কেন সেথায় আজ তরবারি ও হাতুড়ী হস্তে উপস্থিত ছিলাম না?'

নব বসন্তে
প্রিয়জনকে উপহার দিতে, গৃহ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের অ্যাইভিস্ক্রাল গ্রীটিংস্কার্ড এবং মেসিন প্রভৃতি—চন্দন, বরেল, বকুল, বাস ও অরেলেট সাবান ব্যবহার করুন।
ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী
৩৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

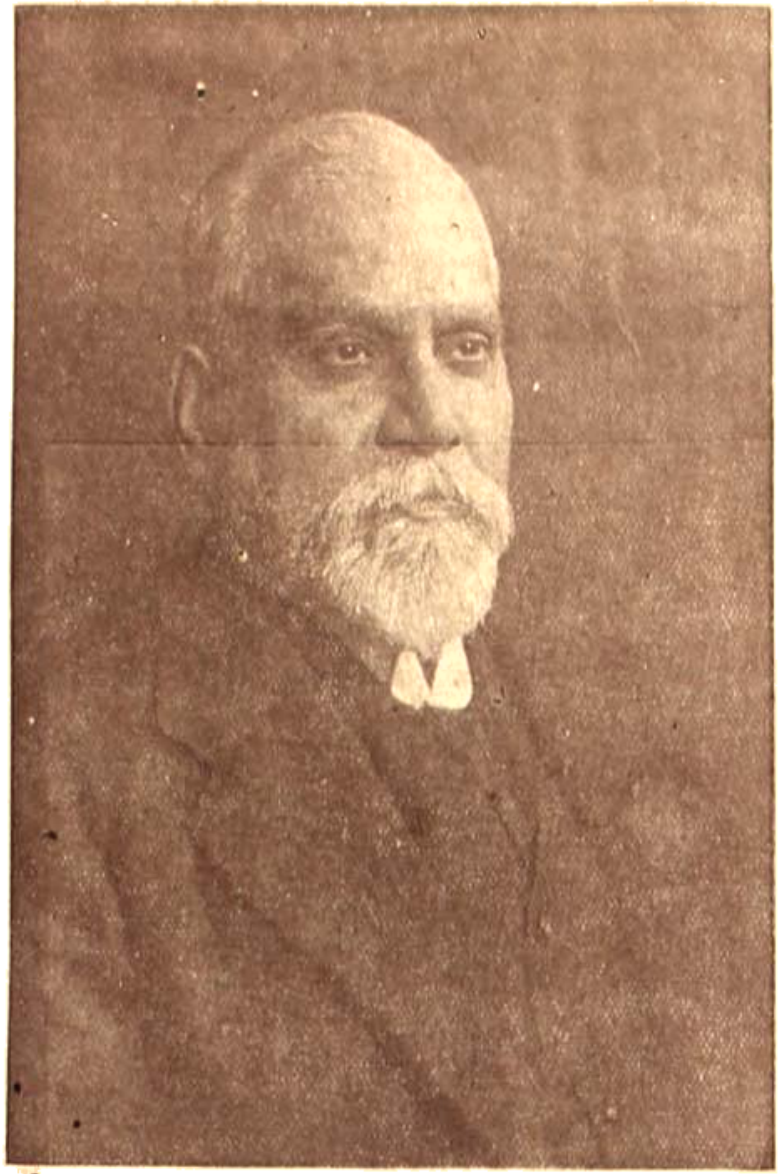

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার
মাননীয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

দেশপ্রেমিক
শ্যামসুন্দর

# স্মৃতি-মন্দির

কামনা বাড়ী আসিয়া, নিজের ঘরটির দ্বার জানালা খুলিয়া দিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। কয়েক ঘণ্টা পূর্বে যে একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, তাহারই দৃশ্যটা তাহার চোখের সামনে তখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছিল এবং যত তুচ্ছ, সামান্য মনে করিয়াই সে চলিয়া আসুক, ব্যাপারটা যে কখনই তুচ্ছ থাকিবে না, তাহাও এখন যতই ভাবিতেছিল, চিন্তাটা মনের মধ্যে ততই দৃঢ় হইয়া বসিতেছিল। তবে ইহাও সত্য যে তার জন্য একবিন্দু অনুতাপও তাহার আসে নাই। বরং সে এই মনে করিয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছিল যে আর তাহাকে "সভ্যতার" খোলস আঁটিয়া, দিনরাত অন্যের অনুকরণে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না। কামনার মত স্বাধীন-চিত্ত মেয়ের পক্ষে এই মুক্তির আনন্দ যে কত প্রবল, কত কাম্য তাহা সকলে বুঝিবেন না। হয়ত কেবল তিনিই বুঝিতে পারিবেন যাঁহাকে কখনও তাহার মত অনভ্যস্ত সভ্য বিধি-বিধানের মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। "সভ্যতা" বলিতে যেখানে কেবল জামা-জুতা-ই বোঝায়, অপরিচিত, অদৃষ্টপূর্ব পুরুষের সহিত হাসি তামাসা করিতে না পারা যেখানে অসভ্যতা, সেখানে কামনার মত নির্জন গৃহপালিতা মেয়ের বাস যে কতটা অস্বাচ্ছন্দ্যের, তাহা বেশী করিয়া না বলিলেও চলে।

কয়মিনিটের মধ্যেই কামনা স্থির করিয়া ফেলিল, অতঃপর সে এইখানেই বাস করিবে! কোন কারণেই আর কোথাও যাইবে না। তার তাহার মনে কোনদিনই আধিপত্য করিতে পারে নাই, আজও পারিল না, লোকলজ্জার ভয়ও তাহার বড় বেশী নাই, কে কি বলিবে না বলিবে, সে চিন্তা কোনদিনই কামনার মস্তিষ্ক উচ্চ স্থান পায় নাই, আজও করিল না; পিতা যে কামনার মতেই মত দিবেন, সে সম্বন্ধেও তাহার একতিল সন্দেহ ছিল না। তাই মনের মধ্যে সঙ্কল্প উদিত হইতেই সে ভৃত্যকে ডাকিয়া থাকিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

পাচককে ছুটি দিয়া, দেশে পাঠানো হইয়াছে, এখনি সহস্র চেষ্টা করিলেও নূতন পাচক মিলিবার পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, ভৃত্য তাহাই বলিল।

শুনিয়া কামনা হাসিয়া ফেলিল; বলিল—ঠাকুর নাই-বা রইল সদানন্দ! তোমার দিদিমণির হাতের রান্না কি কোনদিন তুমি খাও নি?

সদানন্দ স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে দিদিমণির সঙ্গে মা অন্নপূর্ণার একটা নিকট সম্বন্ধ বর্তমান আছে।... তবুও বেচারা সদানন্দ কেমন একটা সন্দেহে পড়িয়াছিল। এতবড় বাড়ীতে দিদিমণি একলা থাকিবেন, কে-ই বা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে, ভগবান না করুন, অসুখ-বিসুখই যদি হয়, তবে ত আরও মুস্কিল হইবে, সদানন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিল।

কামনা বলিল—সদানন্দ, তুমি বাজারে যাও, জিনিষ-পত্তর দেখে শুনে সব কিনে আনো গে। টাকাকড়ি তোমার কাছে না থাকে ত দরওয়ানের কাছ থেকে আমার নাম করে' কিছু টাকা নিয়ে নাও, আজকের দিনটা ত কাটিয়ে দাও, কালকের ব্যবস্থা কাল তখন করা যাবে।

সদানন্দ চলিয়া যাইতেছিল, কামনা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—আর দেখ, সদানন্দ, দরওয়ানকে বল, আস্তাবলে একবার খবর দিয়ে আসুক, গাড়ীখানা আমার একবার চাই।

আজ ত?

কাল নয়, সদানন্দ, আজই চাই, এখনি, আমি একবার বেরুব।

সদানন্দকে উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সহাস্যমুখে কহিল—ভয় নেই সদানন্দ, আমার দেরী হবে না, দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসব।

সদানন্দর মনে অন্য কোন ভয়ের লেশমাত্রও ছিল না, যে কথাটা তাহার মনের মাঝে উঁকি দিতেছিল,

বলি-বলি করিয়াও যাহা বলিবার সাহস তাহার হইতেছিল না, কামনার হাসিমাখা প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া, সহানন্দ তাহা বলিয়া ফেলিল।

বলিল—ট্রেডিখনি, মামার বাড়ীতে বলে এসেছ ত?

কামনার হাসিমুখ তখনি গম্ভীরভাব ধরিল, সে ধীর-কণ্ঠে কহিল—না সহানন্দ, বলে আসা হয় নি, তবে···

সেইখানেই যাবে ত গাড়ী···

না, সেখানে যাবে না। তাঁরা দেখ্‌তে না পেলেই বুঝবেন'খন। আমি যাব, একবার শান্তবাবুর বাসায়। শান্তবাবুকে ত তুমি জান সহানন্দ!

সহানন্দ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, জানে! মুখে সে একটী কথাও বলিল না। মাতুলালয় হইতে না বলিয়া চলিয়া আসার কোনি হেতু বেচারা খুঁজিয়া ত পাইলই না, বরং এমন ধারাও যে হইতে পারে ইহা ভাবিতেও তাহার বাক্য হরিয়া যাইতেছিল।

তাহাকে তখনও একইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কামনা বলিল—দেরী কর' না সহানন্দ, আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

সহানন্দ নিঃশব্দে চলিয়া গেল এবং দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া, গাড়ী ফটকে দাঁড়াইয়াছে, খবর দিল।

কামনা ত্বরিতপদে দাঁড়াইয়া উঠিল। কম্পবিলম্বিত বৃহৎ মুকুরে একবার কামনার মুহূর্ত্তে রেহলতাটি প্রতি-বিম্বিত হইল, কামনা তাহা দেখিল। একবার বুঝি বা কেশবাস একটুখানি বিন্যাস করিয়া লইতে ইচ্ছা হইল, তখনই কামনা সে ইচ্ছা দমন করিয়া ফেলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

দরোয়ান বিনা বাক্যব্যয়ে লাঠি হাতে গাড়ীর উপরে উঠিতেছিল, কামনা তাহাকে ডাকিয়া সুশান্তর ঠিকানা বলিয়া দিল।

সুশান্ত বাসায় নাই, দরোয়ান অনেক জিজ্ঞাসাপড়া করিয়া এইটুকু সংবাদই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। কামনা কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে নিজেই নামিয়া বাসায় ঢুকিল। এ-হেন অপ্রত্যাশিত ভাবে একটী অল্প যুবতী মহিলাকে আসিতে দেখিয়া যুবকগণের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। তাহাদেরই একজন খবর দিল, সুশান্ত দেশে চলিয়া গিয়াছে। কবে ফিরিবে, তাহার স্থিরতা নাই। তাহার কাছে দেশের ঠিকানা ছিল, চট্‌পট একখানা খাতার পাতা ছিঁড়িয়া ঠিকানা লিখিয়া সসম্ভ্রমে কামনার হাতে তুলিয়া দিল।

কামনা লালদীঘির তারঘরে যাইতে বলিয়া গাড়ীর দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে ইহা তাহার মনের মধ্যে স্থির হইয়া গেল যে সুশান্ত কলিকাতায় কাজকর্মের সন্ধান করিতে না পারিয়াই দেশে চলিয়া গিয়াছে।···এই সিদ্ধান্তে সে যেন নিজে কতকটা সুখী ও আশ্বস্ত হইতে পারিল।

তার লাগাইয়া যখন গাড়ীতে উঠিবে, দারবান জিজ্ঞাসিল—বাবুজীকো তার লাগায়া দিদিমণি?

নেহি—শান্তবাবুকো তার দিয়া।

দারবান ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কোচবক্সে উঠিয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

---

## কালার শ্রবণশক্তি

( রঙ্গ-কবিতা )

[ শ্রীপঞ্চানন রক্ষিত ]

কালার শ্রবণে
গান বাণী যাহা
না পায় পশিতে;
পড়ে সে ফাঁকি।
এক কানে যদি,
নিন্দে তার মোর,
কর্ণে কহিতে
রাখে না বাকী॥

---

## স্খলন

[ শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ]

( তামিল কবিতা )

বিশিষ্টতা নাই কিছু ফুলের পতনে,
পতনের পতনে ঘটে গর্ত্ত হয় গুঁড়া;
কুটির নিম্নস্থে পড়ে পবন-তাড়নে,
অট্টালিকা পড়ে ভূমে চূর্ণ হয় চূড়া।

---

# বিদেশের স্মৃতি

[ শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল ]

৭ই ডিসেম্বর—রাত্রি ৪টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আরও আধঘণ্টাখানেক শুইয়া থাকিলাম। এখানে মশা নাই বলিলেই হয়, সুতরাং ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। ৪—৩০টায় উঠিয়া জিনিষ পত্র বাঁধিতে লাগিলাম। তারপর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়াই বেদি চা প্রস্তুত। চা পান করিয়া ম্যানেজারের নিকট গিয়া ২ ঘরের ভাড়া ১৲ দিলাম। রসীদ মিলিল না—বোধহয় টাকাটা তাঁহারই পকেটে গেল। পূর্ব্বের দিনের মত ৩ খানি যান লইয়া ষ্টেশনের দিকে চলিলাম। সুন্দর ওয়ালটেয়ার বিদায়। আর এ জীবনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না কে জানে।

'জি'বাবুকে এখান হইতে ভাড়া দিতে হইবে সুতরাং তিনি 'বহুরোটী' পর্য্যন্ত ৩ খানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট করিলেন। আমি যাজাপ পর্য্যন্ত Inter class এর টিকিট করিলাম। তাঁহার Bezwada তে একদিন থাকিয়া Mixed trainএ যাজাপ যাইবেন আর আমি Bezwada হইতে Mail ধরিয়া তাঁহাদের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১—৫০ এ পৌঁছিয়া বাসস্থান স্থির করিব এবং সন্ধ্যার গাড়ীতে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিব। অদ্ভুত স্থান। গাড়োয়ান্ কুলী প্রভৃতির কাহুনি কিছুতেই যায় না। ৵০ দিলেও কাহুনি আবার ১৲ দিলেও সেই একই প্রকার কাহুনী। আজ খুব কম করিয়া দিলাম। কাহুনী চলিতে লাগিল। প্রায় আধঘণ্টা পর প্রত্যেক গাড়ীকে আর ১৲ কাহুনি দিয়া বিদায় করিলাম। ফলে পূর্ব্ব-দিনের প্রায় অর্দ্ধেক সময়ের কাজ হইল।

৭—৪০ ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। Inter class এর গাড়ী গুলি বেশ। এ Pass passenger অথবা Waltair mixed এর মত জঘন্য নয়। এবারেও European compartment এ উঠি নাই কিন্তু টুপীর গুণে একেবারে পাহাড়ের গায়েই পাহাড়। মাঝের সমতল ক্ষেত্রে বেশ চাষ হইয়াছে। আর অসংখ্য তালগাছ সমুদ্র সান্নিধ্য জ্ঞাপন করিতেছে।

ট্রেণখানা হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়া ভীষণ শব্দে ও বেগে চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কাঁকুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। সুশীতল সমুদ্র শীকরবাহী বাতাসে কাঁকুনির যন্ত্রণা কতকটা কম বোধ হইতেছিল।

চাষারা মাঠে লাঙ্গল চালাইতেছে, একেবারে বাঙ্গলা দেশের মত। চারিদিকে সারি সারি ধানের মরাইএর মত চূড়াযুক্ত নারিকেল পাতার ঘরগুলি একেবারে মাটি হইতেই উঠিয়াছে। শুইয়া না পড়িলে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা অসাধ্য।

এখন ট্রেণখানি হাঁফাইয়া পড়িয়াছে আর সে বেগ নাই। কাঁকুনিটাও কমিয়া গিয়াছে। পাহাড়গুলি দূরে সরিয়া গিয়াছে। যেন বিরাট নৈবেদ্যের মত পাশাপাশি বসিয়া আছে। Durrk র দৃশ্য অতি সুন্দর। তালবন গুলিই দেশটীকে আরও সুন্দর করিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে আবার দুইপাশেই খুব নিকটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাহাড়। ছেলে বুড়া মেয়ে পুরুষ সকলেরই মুখে একটী করিয়া Cigar, হরিতবর্ণ পাকা ধানের ক্ষেতগুলি পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত আর মাঝে মাঝে আকের ক্ষেত। শুধু পাহাড়গুলি বাদ দিলেই একেবারে বাঙ্গলা মুলুক। Arakapali ষ্টেশনটী একটু বড় রকমের। একটী জরির পোষাকধারী দেশীয় লোক আমার গাড়ীর দিকে আসিয়া টুপী দেখিয়াই পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। অপর পাশে অনেক গুলি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। এ অবশ্য দেশ। এখানকার মেয়েরা অল্প বয়সেই যুবতী হয় কিন্তু বাঙ্গলা দেশের মত আবার অল্প বয়সে বৃদ্ধা হয় না। একটী ছোট প্রায় শুষ্কগর্ভ নদী পার হইলাম। বোধহয় এ সহরটী নদীর উপরেই অবস্থিত। একটী ছোট পাহাড়ের মাথায় একটী মন্দির। ষ্টেশ Kasumkola ষ্টেশনে দাঁড়াইল। কয়েকটি ছেলে মেয়ে বিপরীত দিক দিয়া দৌড়াইতেছিল। একটু এদিক ওদিক দেখিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

সেই একই দৃশ্য। পাহাড়ের পর উপত্যকা। উপত্যকার পর পাহাড়। ডানদিকে (৪৩৫ মাইল) একটী বস্তি। সেই ধানের মরাইএর মত তালপাতার ঘর।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোকগুলি তালের পাতার ঝুড়ি মাথায়

ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিলেন, "Bengal যে first যে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।" এই দৃষ্টান্তটী তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল এই কথাটুকু বলিবার জন্য যে, "বাঙালী জাতেরও আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল। এই বিশ্বাস বশতই আমি সহজে মান্‌তে চাইনে যে বাঙালী জাতির প্রাণ-শক্তির দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে।

বাঙালীর প্রাণ-শক্তি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু যে নিরাশাবাদী নহেন, ইহা জানিয়া আমরা কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইলাম উক্ত অ-বাঙালী নেতার ব্যবহার, যাহা প্রমথবাবুর মতে 'অবশ্য বাঙ্গলার সৌজন্য বলা চলে না,' আমরাও তাহা অসৌজন্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু ঐ অ-বাঙালী নেতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "(ইতিমধ্যে তিনি বন্‌-কো-অপারেসানের উপনেতা হিসাবে খুব নাম করেছেন)"—এই ভাবে পরিচয় দিবার ভঙ্গীর মধ্যে, বীরবলী-সৌজন্য থাকিতে পারে, কিন্তু 'উপনেতা' এই শব্দটী প্রয়োগ ও তাঁহার সমগ্র লিখন-ভঙ্গীর মধ্যে বর্ত্তমান আন্দোলনের উপর এমন একটা অশিষ্ট বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহাকে বিজ্ঞতম অজ্ঞতা বলিয়াও উপেক্ষা করা কঠিন।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে তিনি সম্ভবতঃ প্রাণের সাড়া পান নাই, তাই তিনি প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশে বিষয়ান্তরে 'প্রাণের সাড়ার নূতন সুরটীর' সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিয়াছেন। এই প্রাণের সাড়া বা নূতন সুর হইল - নারী বিদ্রোহ। অর্থাৎ, (ক) 'স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার দাবী আজকের দিনে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকেরাই তুলেছে।' (খ) 'বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্তঃপুরবাসিনীরা যে মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন, সে মনোভাব সামাজিক Evolution নয়, সামাজিক revolution এর পূর্ব্বাভাষ!'

এই সম্পর্কে আধুনিক কয়েকজন নারী লেখিকার যে সব প্রবন্ধ আজকাল বাহির হইতেছে, তৎসম্পর্কে কিঞ্চিৎ দার্শনিক তত্ত্বপ্রতত্ত্ব ও বিজ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া প্রমথবাবু বলিয়াছেন, 'অতএব দেশে আজ পলিটিক্যাল আন্দোলনের বড় বড় ঢেউ উঠ্‌ছে না বলে, হতাশ হবার কোন কারণ নেই।' এবং এই সব লেখা পড়িয়া, তিনি "বাঙলা ভারতবর্ষের আর-একটা নবযুগের অগ্রদূত হবে—" বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা অবশ্য ভবিষ্যদ্বক্তা নহি। যে ঘটনা অদ্যাপিও ইতিহাসে ফুটিয়া উঠে নাই, তৎসম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিতে অক্ষম। তবে সেই নবযুগের 'পূর্ব্বাভাষ যদি এই সব লেখিকা উদ্ভাস হয় তবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে না হউক, বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে হতাশ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বিলাতী নমুনায় কিছুদিন হইল আমাদের দেশে নারী সমস্যা 'নারীর সত্যিকার স্থান ও অধিকার' ইত্যাদি তত্ত্ব লইয়া উপন্যাস রচিত হইতেছে। অধিকাংশ মহিলা-লেখিকার লেখার সেইসব ঔপন্যাসিক বাঁধা ছক পরিধানেই থাকে। ইঁহাদের লেখার বিষয় ও ভঙ্গীমা দেখিয়া পূজ্যপাদ ৺ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভবিষ্যবাণীর সার্থকতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। তিনি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "এক্ষণে আমাদের দেশে মেয়ে মেঠাই সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু মনে আশঙ্কার উদয় হইতেছে, আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা যত বিস্তৃত হইবে, ততই ঐ শ্রেণীর মেঠা বৃদ্ধি পাইবে। আমাদিগের কোন বন্ধু সেদিন আমাদিগের নিকট গল্প করিতেছিলেন যে তিনি রেলের গাড়ীতে একটী মেঠাইমার হস্তে পড়িয়াছিলেন। মেঠাইমা ধর্ম্মসংস্কারের বিষয় কিছুই বুঝেন না, কিন্তু সে বিষয় বিলক্ষণ মেঠাইমো করিতেছিলেন—ইত্যাদি।

অবশ্যদৃষ্টে ইহা সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। প্রকৃত বেদনা বোধ ও আন্তরিকতা থাক আর নাই-থাক, আজকাল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'নারীবিদ্রোহ' সম্বন্ধে একটা লেখা দেওয়া রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে। এবং এই লেখাগুলি মহিলাদের হইলেই শোভন হয় এই ধারণায় মহিলার লেখামাত্রই নির্ব্বিচারে ছাপা হইতেছে। ফলে দুই একজনের লেখা ছাড়া অধিকাংশেই যে অসংযত উচ্ছ্বাস তাহা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিবার ধৃষ্টতাকে অবশ্যই 'নারী-নিগ্রহের' দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কোন লেখিকা আমাকে মনস্তাপ দিবেন না। বর্ত্তমানের বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার আশু পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, নারীর যথাযোগ্য স্থান ও অধিকার সমাজে থাকা উচিত—এই গুরুতর কার্য্যে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন,—তাঁহারা 'ডুরিংরুমস্থীর কম্‌প্লিমেণ্ট প্রত্যাশী অনুচিত্ত তরুণীগণের' ন্যায় সামাজিক সাহিত্যে হাস্য-রসের তান না বলিয়া, জীবন প্রভাতের ললিত ভৈরবী আলাপ করুন। অন্যথা বাচালতা ও 'মেঠাইমো'—কোন নবযুগের অগ্রদূত হইতে পারিবে না, বাঙ্গালার সমাজ-জীবনে 'নারী-সমস্যা' মীমাংসা করিতে পারিবে না—এমন কি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সার্টিফিকেট দিলেও না—ইহা ধ্রুব এবং সত্য!

---

এবারকার ইহা 'সিলেক্টেড' পার্সেল হইয়াছিল, কিন্তু 'রিজেক্ট' করিবার ইহা একান্ত অভিপ্রায়ে পরিবর্ত্তিত করায় 'বাসন্তীতে এখানির স্থান হইল না।

(সম্পাদক)

[ লেখকের সহিত [illegible] ]

### খাসদখলে

বিংশ শতাব্দীতে থাকা থাকিয়াও আমাদের দেশের রঙ্গালয়গুলিতে বিংশ শতাব্দীর হাওয়া লাগে না; সেগুলি অ-টুলে শতাব্দীতে যাহা ছিল, বিংশ শতাব্দীতেও ঠিক তাহাই আছে। এখানে কি নাচে, কি কথাবার্ত্তায়, কি গানে পুরাযাত্রার সেই রাজা মাহাত্তার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া আছে। সেই থিয়েটারগুলিতে "Grand Revival" পুরাতনের পুনরাগমন প্রবৃত্তির অসদ্ভাব নাই, কিন্তু এই 'পুরাতনের পুনরাগমন' প্রায়ই এমন নূতনত্ব বর্জ্জিত হইয়া দেখা দেয়, যে ইহাতে পুরাতনের অবমাননাই হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, অতীতে বিশ্বস্তর বাবু প্রতাপাদিত্য সাজিয়া ষ্টেজ মাতাইয়া দিয়াছেন তখনি বর্ত্তমানের কৃষ্ণকালী বাবু যদি তাঁহার অনুকরণে হাসিটি, কাসিটি, এমন-কি মিশাগটি পর্য্যন্ত ফেলিয়া ষ্টেজে আগুন ধরাইয়া দিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে বিশ্বম্ভর বাবু স্বর্গেই থাকুন আর নরকেই থাকুন, তাঁহার মাথা কাঁপিয়া উঠিবেই আর দর্শকেরাও সে অনুকরণ দেখিতে দেখিতে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িবেন ইহা একরূপ নিশ্চিত। আমাদের রঙ্গালয়ে পুরাতনের পুনরাগমন প্রায় এই কারণেই দর্শক আকৃষ্ট করিতে পারে না।

"খাসদখলের" নিতাই-এর ভূমিকা স্বয়ং গ্রন্থকার [illegible] অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহার পরেও দু'চারিজন অভিনেতা যথেষ্ট দক্ষতার সহিত অনেক অভিনয় করিয়াছেন, শুনিয়াছি, কেহ কেহ না-কি "আলাইয়াও" নিতাইয়ের ভূমিকায় যদি কোন অভিনেতা রসাল [illegible] হইয়া দাঁড়ান, সেই গভীরজলচারী [illegible] ষ্টেজের উপর নিতাইলীলা [illegible] তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা [illegible]

আজনে পোড়া মিনার্ভা থিয়েটার পার্শী এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে মাঝে মাঝে এটা-ওটা-সেটা করিয়া তাঁহাদের অধিত্ব বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। সেখানেই খাসদখলের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। এই "Grand Revival" এ দেখিলাম নূতনত্ব রক্ষিত হইয়াছে। শুধু রক্ষিত হইয়াছে বলিলে ঠিক হইবে না, ভাল রকমই রক্ষিত হইয়াছে। যাঁহারা "খাসদখলের" সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারাই জানেন, নিতাই-এর নাটকের প্রাণস্বরূপ! সেদিন নিতাইয়ের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, নবীন ও জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। নিতাই লোকটা ছিল খোসামুদে বলুন, ভাঁড় বলুন, পরাণহেলে বলুন—সব, কিন্তু লোকটা ছিল আসলে খাঁটী। তাই সকল সে খোসামুদী করিত, ভাঁড়ামি করিত, "বাবুর" পাতের লুচি কচুরী খাইয়া সে কথা খোলা মনে বলিয়া ফেলিত, তখন লক্ষ ইয়ার্কি'র বক্স-ফেস করিয়া চাসির তুফান উঠিলেও, অন্তরে করুণ কাতর ক্রন্দনে গুমরিয়া উঠিত! নিতাইয়ের ভূমিকা যদি ইতিপূর্ব্বে "অলিয়া" গিয়া থাকে তবে এই নবীন অভিনেতার 'হাতে পড়িয়া' এখন সেটি একেবারে 'ছাই' হইয়া গেল! দুঃখের জ্বালায় বৈরাগ্যের ভাণে, অভাবের পীড়নে নিতাই যখনই হাসিয়াছে হাসাইয়াছে, তাহার বুকের ভিতরে সে কাঁদিয়াছে, সহানুভূতির অশ্রুতে দর্শকদেরও কাঁদাইয়াছে। রাধিকাবাবু নিতাইয়ের যে নূতন মূর্ত্তি, অভিনব নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখাইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই সুন্দর, উপভোগ্য! আর একটি নূতনত্ব লক্ষ্য করিলাম, আচার্য্য মাইতির ভূমিকায় নরেন্দ্রবালার অভিনয়টি। 'মাইতি' বলিয়া বোঝান যায় না, বুঝিতে হইলে মাইতিকে দেখিতে হয়।

মিনার্ভার খাসদখলের অভিনয়ে অন্যান্য চরিত্রে পুরাতন অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ আছেন বলিয়াই তাঁহাদের সম্বন্ধে "Grand Revival" করার দরকার দেখি না।

# দেশ ও বিদেশ

## রৌপ্যহর্ষণ দেবতার নির্য্যাতন।

(গল্প)

[illegible] ১৯শে চৈত্র রবিবার হরিঘোষ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে পল্লীর "সমাজহিতৈষণী সমিতির" তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর পূজোপলক্ষে রাত্রে একটী সাধারণ সভা আহূত হইয়া ছিল। এই শিবনাথ পল্লীর অধিবাসী বেশী; বহু প্রাচীন কাল হইতে এই পল্লীতে বিবাহ অনুষ্ঠানের [illegible] এবং ইহা নিকটস্থ ও বহুদূর গ্রাম সমূহের বর কন্যা বিক্রয়ের স্থল। এ কারণ এই ব্রাহ্মণপ্রধান সুবৃহৎ পল্লীর অধিবাসীরা ইদানীং বৎসরের অধিক কাল অবস্থিতি করিতেন। গত ১৯শে চৈত্র এখানেই বিনা মূল্যে এই প্রথমে নারী ফুটবলের উপর ফ্রেঞ্চের প্রথম শিক্ষণ হয়। ইহা সভার পল্লীর ও দূরস্থ সাধারণ অভিভাবকগণ এই ব্যাপারের জন্য পল্লীর মহিলাদের প্রকাশ্য অঙ্গে ও ব্যবহৃত বস্ত্রে এই কার্য্যের ঘোর প্রতিবাদ করেন। সভাতে বাক্যে পল্লীবাসে স্বাধীনতা অধিকার এক একটী ভাবগভীর সংঘর্ষ ঘটিয়া হইয়াছে।

---

ইংরেজ মুদ্রিত ঘটিতে। সভাদেষ্টা বিশেষ এক সময়ের অনুকূল ব্যবস্থা হিন্দিস্থানের ফ্রেঞ্চীবাস মুখ সমাজভাবে এক স্থানে তিন দিবা পার্শ্বাইবেশন এবং অধিবাসীদের প্রতি মাসে অধিক অধিবাসি হইতে ৮০ টাকা লেভন হইবে। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বিশেষ উপকার হইবে।

---

সন ১৯২১ সালের জুলাই মাসে নিযুক্ত বোম্বাই ব্যাঙ্ক-সমাজ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটী ১৭ জন বড় বড় ব্যাঙ্কার নিয়ে গঠিত হইয়াছিল। কমিটী এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাধারণ পরিবারের আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য ও স্থায়ীত্বের অনুরোধে বেতন বাড়িয়া ৩০০৲ হওয়া উচিত। সভাপতি সমস্ত সেক্রেটারিয়েট বোম্বাই হইতে পুণাতে স্থানান্তরিত করার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সেক্রেটারি মিঃ পি, এন খাদী ইহাতে সম্মতি দেন নাই। (খাদান্ত)

---

সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে, আগামী ১লা মে হইতে মূল্যের ১৫% টাকার নোট বাহির হইবে। এই নূতন প্রকার নোট হইলে এক নোট হইতে আর এক নোটের পার্থক্য বেশ সহজে বুঝা যাইবে, অধিকন্তু উহা আল করাও খুব কঠিন হইবে। অঃ

---

কার্য্যকরী সভার গত পূর্ণ মুখরোচের অধিবেশনে ডাঃ ঘোষের এক বিশ্ব নিমিত্ত আবেদন বিশেষ আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত কার্ণিক প্রস্তাব করেন যে, এই বিল পাস করার পূর্ব্বে উহা পুনরায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করা হউক। কিন্তু উহার প্রস্তাবটির কোনো পরিবর্ত্তন হয়। অতএব বিলটীর আবশ্যকতা বিষয়ে আলোচনা হয়। তৎ পরবর্তী উহার ভাষা সংশোধন করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত নিবন্ধে আমার ও অন্যান্য অনেকে বিলটী সমর্থন করেন। বিলটী শেষটি গৃহীত হইয়াছে।

---

আমরা বড় দুঃখিত হইলাম যে, [illegible] গ্রামের চাঁদ মাতৃ ঐবেন বিশ্বের (৫ বর্ষ) তাহাদের নিজস্ব পরিবারের শোচনীয় অবস্থার ১১১৲ টাকা সাহায্য এবং ঐবেন মাতৃদিগে পাঠাইতে সমর্থ করিয়াছেন। এ দীর্ঘ সময়ের ঐবেন বাস্তু অতি দুঃখের ছিল। সুস্থের এখনও [illegible] ভিনি পরিশ্রম করিয়া প্রবল অভিলাষিলেন। আমরা তাহ সমাপ্তি এ দীর্ঘ-ঐবেন সব দেখিতে আশিয়াছিলেন। রাজনীয় কাজের এমন মূল পরিশ্রম দীর্ঘ জীবন লাভ করা, আই ঘটে না।

---

বরেন্দ্রের জেলার যোহরকপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনমোহন সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্র সেন অনরেবল ম্যাজিষ্ট্রিক ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। এই বয়সে তিনি ৩০ বছরের ক্ষমতাপন্ন জ্যেষ্ঠের গাড়ী চালিত রাখেন। ৩ টন বোঝাই যে কোন গাড়ী দুর্গ ঘাটি সহজে দুরুহ উঁচু পথিতে ও ঘাটিতে পারেন। পুলিস জেলার দুরুহ পরীক্ষার বিভাগ সফলতাবে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে লাভ সহজেই উহাকে ঘটি দেখিয়া উহাকে একটী সোনার ঘোড়ার বিলাসেন। এবং ব্যবসায়ী ঘোষক উহাকে সম্মান হিসু (তাহাই নিয়ে) উপাধি বিলাসেন।

---

এখন হইতে আর একটী বিষয় প্রকাশ যে, ফরাসীগণ ফ্রন্টের একটী প্রধান অস্ত্র করিবার কারখানা হলে করিলে ব্রাহ্মণ-অবস্থিতিগণ তাহ বন্ধ করিয়া যেন। তাহাদের একজন কারখানার মালিক বন্ধ হইয়াছেন। এই বন্ধ ফরাসীগণ মেলিকাগণ পাইয়া আসে এবং হাতে আসি চলাচ্ছে। ফলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ১১ জন হত এবং ৩৩ জন ভিক্ষোপজীবী হইয়াছে। তবে ব্রাহ্মণীবিগণ একবারি ফরাসী [illegible] ফ্রন্টের কারখানার কার্য্যের ভার করিয়া যেন। ফ্রন্টের কারখানার কার্য্যের [illegible]

### পাচলক্ষ লোকের মহিষ্কার

ফরাসী সেনাপতি জেনারেল এক আদেশ জারী করিয়া বিলাসেন যে, কাজে যোগ না দিলে ব্রাহ্মণ যোদ্ধাদের কর্ম্মচারীদিগকে ফরাসী ভূমিকৃত স্থান হইতে তাড়িয়া করিয়া দেওয়া হইবে। ফলস্বরূপ এই সকল ফরাসীদের ব্রাহ্মণ অধিবাসী যোদ্ধা বিতাড়িত।

### ওজনীতি

ফরাসীদের ওজনীতি একটুও বদলায় যাই। ফরাসীদিগের আদেশ অবাধে করার একজন ব্রাহ্মণ যোদ্ধাদিগকে কিন পুরুষের কারাদণ্ড বিধি করিয়াছে এবং ঐ একই অপরাধের অন্য আর এক জন ব্রাহ্মণীর ১০ বৎসরের কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

---

বাজারে একটা নাতনার অবস্থা যাক দুরুহ হইয়াছে—সেটা [illegible]। খোলা যায় এক এক মহাপুরুষে ৪-৫টা [illegible] পরিণত হইয়া পরিচয় দিয়া-সাজা। স্বামী পরিশ্রমকারী ঘরে, পুরুষ সাধু উপায়ে উপার্জ্জন করেন। অর্থের যত হাত বাড়ান করেন, উপায়ের পথ্যাদান ব্যবসায়ের হাত করেন, আসরে ওজন পরে যেন, সমাজে জীবনে যেন সাম্যবাদপূর্ণ ব্রাহ্মণ যোদ্ধাদী যেন সকলে ভোজনে উপবেশ উচিত মুখে বিদেশ করাই বিধিবিধি পর্ব। সকলে সকল সময় সময় পরিবার ওজনিত্ব হাতে ধরে, আজ পৃথি ঔষধি করে, আজকালের কাজে ওজন আসনে সাজে হাজরা আসিয়া থাকে, ছুটা পরিবর্ত্ত ওজে আসে, সাম আসি পূর্ণ। যোদ্ধে আসন, উপরে উপবেশ, এইরূপ যোদ্ধাই, সমাজের সমের আসা ভিন্ন পাই যোদ্ধ, বিদেশের কুমার্থ আসে পড়ি, ওজনে সমাজের এই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগের ওজন বিশেষ কর্ত্তব্যপরায়ণ [illegible] ব্রাহ্মণদিগের ওজন [illegible] আমাদের কর্ত্তব্য।

আমরা এই সভা প্রতিদিন বিশেষ, কাজেই সভা পরিচালনা পারে না; একদিন পরিচালনা, তাই আমাদিগকে বিশেষ [illegible] করা।